সৈয়দ মুজতবা আলী
রচনাবলী

দশম খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ (৩৩০০), ১৩৬৫

সম্পাদক
গজেন্দ্রকুমার মিত্র
সুমথনাথ ঘোষ
সবিতেন্দ্রনাথ রায়
মণীশ চক্রবর্তী

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
চুনী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
সিল্ক স্ক্রীন ও
চয়নিকা প্রেস

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩ হইতে এস এন রায় কর্তৃক
প্রকাশিত ও বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার, কলি-৯ হইতে বংশীধর সিংহ কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

দেশে বিদেশে (দ্বিতীয় খণ্ড) ... ১
চাচা কাহিনী (দ্বিতীয় খণ্ড) ... ১১১
পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ... ১৬৯
অপ্রকাশিত রচনা ... ২১৩
দিনলিপি ... ৩২১
পত্রাবলী ... ৩৮৫
পাঠকের নিবেদন ... ৪২৯

পরিশিষ্ট

বংশপরিচয় ও জীবনের ঘটনাপঞ্জী ... [১]
গ্রন্থপঞ্জী ... [৪]
সমগ্র রচনাবলীর বর্ণানুক্রমিক সূচী ... [৭]

মুখবন্ধ

অবশেষে বহু অসুবিধা পার হইয়া সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলীর শেষ ও দশম খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে দেশে বিদেশের শেষার্ধ, চাচা কাহিনীর বাকী অংশ, পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা, অপ্রকাশিত বিভিন্ন রচনা, দিনলিপি ও পত্রাবলী সংকলিত হইয়াছে।

'দেশে বিদেশে' নাম লইয়া পাঠকমহলের কোন কোন অংশে ভ্রান্তি আছে। কেহ কেহ দ্রুত উল্লেখ করিয়া যাইবার সময়ে 'দেশ-বিদেশে' বলিয়া থাকেন—এবিষয়ে স্বয়ং মুজতবা আলীই মন্তব্য করিয়াছেন, বইটির শুরু বলা চলিতে পারে অবিভক্ত ভারতের পেশোয়ার শহর বা সীমান্ত প্রদেশ হইতে, শেষ হইয়াছে আফগানিস্থানে বাস সম্পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত। কাহিনীর খানিকটা দেশে, বাকিটা বিদেশে—এই জন্যই নাম 'দেশে বদেশে'। প্রথমের অংশটা গিয়াছে নবম খণ্ডে, দ্বিতীয় অংশটা বক্ষ্যমাণ খণ্ডে। অবশ্য দেশের অংশ ও বিদেশের অংশ চুলচেরা ভাগ করা হয় নাই। 'চাচা কাহিনী' গল্পগ্রন্থেরও প্রথম দিকের গল্পগুলি নবম খণ্ডে ও বাকী গল্পগুলি দশম খণ্ডে স্থান পাইয়াছে, দুইটি খণ্ডই যাহাতে সম-গুরুত্বপূর্ণ হয় সেইজন্যই এই ব্যবস্থা, অন্য উদ্দেশ্য নাই। 'দেশে বিদেশে' সম্পূর্ণ গ্রন্থ ও 'চাচা কাহিনী'র সব কটি গল্প লইয়াই বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন নবম খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম রসজ্ঞ সমালোচক অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। পূর্ব-পাকিস্তানের ভাষা আন্দোলনই বর্তমান বাংলাদেশের প্রাণবীজ-স্বরূপ একথা বলিলে অন্যায় হইবে না। পাকিস্তানের তথা পশ্চিম-পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ যখন পূর্ববঙ্গের তাবৎ অধিবাসীর উপর জোর করিয়া উর্দু চাপাইবার চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন যে সব বুদ্ধিজীবী ইহার প্রতিবাদ করেন, সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁহাদের অন্যতম। 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' মুজতবা আলীর প্রতিবাদের বাস্তব নিদর্শন। তবে এই বইটিকে কেবল রাজনৈতিক প্রতিবাদ বা দলিল আখ্যা দিলে লঘু করা হইবে। ইহার প্রতিপৃষ্ঠায় যে তত্ত্ব ও তথ্য পাওয়া যায় তাহা লেখকের দীর্ঘকালব্যাপী সুগভীর চিন্তা-সঞ্জাত। যে ভাষা আন্দোলনে

পূর্ববঙ্গের অগণিত তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রী আত্মাহুতি দেন, যে আন্দোলন ক্রমে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) জনসাধারণের স্বাধিকার আন্দোলন ও ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত হয়, তাহার পিছনে এই গ্রন্থটির অবদান একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।

মুজতবা আলী সাংসারিক জীবনে আদর্শ গৃহস্থ মানুষ বলিতে যাহা বোঝায় তাহা ছিলেন না। বস্তুত শিল্পীসত্তা তাঁহার ব্যক্তিসত্তাকে এমন ভাবেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা কাটাইয়া উঠিয়া গৃহস্থ সাজা তাঁহার মত শিল্পী বা সাহিত্যিকের পক্ষে অসম্ভব। এই গৃহস্থপনার অভাবই দেখা যায় তাঁহার নিজের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত রচনাগুলির রক্ষণাবেক্ষণে। নিজ সৃষ্টি সম্বন্ধে এই ধরনের অনাসক্তি অবশ্য খুব কম শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবনেই চোখে পড়ে। মুজতবা আলী নিজে পাতঞ্জল, লাওৎ-সে ও সুফী সাধনার বিষয়ে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতেন। এই দর্শন-চর্চাই তাঁহাকে পাথিব বিষয়ে নিরাসক্ত করিয়া তোলে কিনা কে বলিতে পারে। তাঁহার তিরোধানের পর দেখা যায়, স্বনামে ও ছদ্ম নামে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিস্তর রচনা পড়িয়া রহিয়াছে যাহা গ্রন্থাকারে এ যাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। এই রচনাগুলির একটি বড় অংশ অষ্টম খণ্ডে ও নবম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। তাহার পরেও যাহা ছিল তাহা 'অপ্রকাশিত রচনা' শিরোনামায় দশম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হইল। তবে আশংকা—আরও বেশ কিছু রচনা ইতস্তত আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকিয়া গেল, হয়তো সেগুলি দিয়া ভবিষ্যতে রচনাবলীর একটি অতিরিক্ত খণ্ডও গ্রন্থিত করা যাইতে পারে।

অপ্রকাশিত রচনাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইল কয়েকটি কবিতা, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত প্রবন্ধাবলী, ভাষা রাষ্ট্র ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ক নানা প্রবন্ধ। মুজতবা আলীর কবিতার সহিত পাঠকদের পরিচয় বহুদিনকার। অবধূত লিখিত 'নীলকণ্ঠ হিমালয়ে'র একটি অনবদ্য ভূমিকাও মুজতবা আলী লিখিয়াছিলেন। তাহাও গ্রন্থশেষে সংযোজিত হইল। এই সকল রচনা হইতে বঞ্চিত হইলে পাঠক-পাঠিকারা একটি মূল্যবান সম্পত্তি হারাইতেন।

অনেকে বলিয়া থাকেন, কথাশিল্পীরা সৃষ্টির মধ্যেই নিজেকে প্রতিফলিত করেন। উক্তিটির মধ্যে হয়তো আংশিক সত্যতা আছে। কিন্তু মুজতবা আলী যে বিভিন্ন ধরনের রচনা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে আসল মানুষটিকে খুঁজিয়া পাওয়া সম্ভব নয়। তবে আমাদের সৌভাগ্য, মুজতবা আলী মাঝে মধ্যে

দিনলিপি রাখিতেন, যদিও খুব নিয়মিত নয়। আবার এমনও হইতে পারে, দিনলিপি লেখার পর স্বভাব-ঔদাসীন্যে সেগুলির প্রতি যত্ন লন নাই। ফলে সম্পূর্ণ কোন দিনলিপি পাওয়া যায় নাই। তবে দিনলিপির যে-সব অংশ মুদ্রিত হইয়াছে তাহাতে গোটা শিল্পী মানুষটাকে না পাওয়া যাক, তাঁহার ব্যক্তি-মানসের একটা দিক যে ফুটিয়া উঠিয়াছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই মানুষটি প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখিয়া পাগল হন, বন্ধুর চিকিৎসার জন্য কাজকর্ম ফেলিয়া বন্ধুর সহিত দূর বিদেশে যাইতে দ্বিধা করেন না, আবার বেশি কায়িক পরিশ্রমও পছন্দ করেন না, পারিবারিক স্নেহ-আবেষ্টনীর মধ্যে বাস করিয়া নিরতিশয় তৃপ্তি পান, তাঁহার চিত্ত সর্বদাই পুত্রদ্বয়ের জন্য বাৎসল্য-রসে টল্‌টল করে, অথচ এই মানুষই আবার যখন সাহিত্যকর্মে মনোনিবেশ করেন তখন জগৎসংসার বিস্মৃত হয়, পুত্র-পত্নী সমগ্র পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘকালীন বিরহও তাঁহাকে শিল্পকর্ম হইতে বিরত করিতে পারে না। দিনলিপির মধ্যে খেয়াল-খুশির রচনা—কিছু গান ও কবিতাও দেখা যায়। একটি গান এক ভারতপ্রসিদ্ধ গায়ক কর্তৃক স্বরারোপিত বলিয়া উল্লিখিত।

মুজতবা আলী বহু সময়েই অনেককে দীর্ঘ পত্র লিখিতেন। এই সব পত্র ভাষা, ধ্বনি, বানান, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বহু সুচিন্তিত আলোচনা ও তত্ত্ব-তথ্যে পূর্ণ। এইগুলি লেখক গুছাইয়া ব্যবহার করিলেই একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধ হইয়া যাইত। স্থানাভাবে সব পত্র সংকলিত করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু যেগুলি পাঠকরা হাতে পাইতেছেন, তাহার মূল্যও অনেক। এই পত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক সম্ভবত পুত্রদ্বয়কে লিখিত পত্রগুলি। মুজতবা আলী যখন এই পত্রগুলি লেখেন তখন পুত্রেরা নিতান্তই শিশু। নিশ্চয় সে সময়ে তাহাদের পড়িবার বা রসগ্রহণের ক্ষমতা আদৌ হয় নাই। কিন্তু লেখক তাহাদের পর্যাপ্ত বয়স্ক ধরিয়াই পত্রগুলি লিখিয়াছেন। নিছক লেখার আনন্দেই এ লেখা। এই পত্রগুলি লেখকের ঐকান্তিক পুত্রস্নেহ, দেখিবার ও দেখাইবার, জানিবার ও জানাইবার আগ্রহ এবং সর্বোপরি লেখকের মনের এক অনাবিল আনন্দময়তার উজ্জ্বল নিদর্শন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত, এই পত্রগুলি লেখকের দিনলিপিতেই লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়।

গ্রন্থশেষে সৈয়দ মুজতবা আলীর সংক্ষিপ্ত বংশপরিচয় ও জীবনী, গ্রন্থপঞ্জী এবং সমগ্র রচনার একটি যথাসম্ভব বর্ণানুক্রমিক সূচী সংযোজিত হইল। কোন উৎসুক পাঠকের কাজে লাগিলেও লাগিতে পারে।

পরিশেষে নিবেদন, এত বড় একটি কর্ম সম্পাদনা আমাদের সীমিত ক্ষমতায় ত্রুটিহীন হইবে এ অহংকার বা দুরাকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই। এ বিষয়ে সহানুভূতিশীল সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার উপদেশ ও পরামর্শাদি আমরা সাদরে গ্রহণ করিব।

সবিতেন্দ্রনাথ রায়
সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে

দেশে বিদেশে

দ্বিতীয় খণ্ড

উনত্রিশ

কবি বলেছেন, 'দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে রাজেন্দ্র সঙ্গমে।' আমান উল্লা ইয়োরোপ ভ্রমণে বেরলেন, আমিও শীতের দু'মাসের ছুটি পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। কিন্তু সত্যযুগ নয় বলে প্রবাদের মাত্র আধখানা ফলল—আমি ইয়োরোপ গেলুম না, গেলুম দেশ।

উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটল না কিন্তু ভারতবর্ষে দেখি আমান উল্লার ইয়োরোপ ভ্রমণ নিয়ে সবাই ক্ষেপে উঠেছে। আমান উল্লার সম্মানে প্রাচ্য ভারতবাসী যেন নিজের সম্মান অনুভব করছে।

আমাকে ধরল হাওড়া স্টেশনে কাবুলী পাজামা আর পেশাওয়ারের টিকিট দেখে—হয়ত লাণ্ডিকোটাল থেকে খবরও পেয়েছিল। তন্ন তন্ন করে সার্চ করলো অনেকক্ষণ ধরে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল তারও বেশীক্ষণ ধরে—যেন আমি মেকি সিকিটা। কিন্তু আমি যখন কাবুলের কাস্টম হৌসে তালিম পেয়েছি, তখন ধৈর্যে আমাকে হারাতে পারে কোন্ বাঙালী অফিসার। খালাস পেয়ে অজানাতে তবু বেরিয়ে গেল, 'আচ্ছা গেরো রে বাবা।'

বাঙালী অফিসার চমকে উঠলেন, বললেন, 'দাঁড়ান, আপনি বাঙালী, তাহলে আরো ভালো করে সার্চ করি।'

বললুম, 'করুন, আমার নাম কমলাকান্ত।'

দেশে পৌঁছে মাকে দিলুম এক স্যুটকেসভর্তি বাদাম, পেস্তা—অষ্ট গণ্ডা পয়সা খরচ করে কাবুল শহরে কেনা। মা পরমানন্দে পাড়ার সবাইকে বিলোলেন। পাড়াগাঁয়ে যে বোনটির বিয়ে হয়েছিল, সে-ও বাদ পড়ল না।

কিন্তু থাক। সাত মাস কাবুলে কাটিয়ে একটা তথ্য আবিষ্কার করেছি যে, বাঙালী কাবুলীর চেয়ে ঢের বেশী হুঁশিয়ার। তারা যে আমার এ-বই পয়সা খরচ করে কিনবে, সে আশা কম। তাই ভাবছি, এ দু'মাসের গর্ভাঙ্কটা 'সফর-ই হিন্দ' নাম দিয়ে ফার্সীতে ছাপাবো। তাই দিয়ে যদি দু'পয়সা হয়। কাবুলী কিনুক আর না-ই কিনুক, উত্তমটার প্রশংসা নিশ্চয়ই করবে। কারণ ফার্সীতেই প্রবাদ আছে—

'খর বাশ ও খুক বাশ ও ইয়া সগে মুরদার বাশ।
হরচে বাশী বাশ আম্মা আন্দকী জরদার বাশ ॥'

'হও না গাধা, হও না শুয়র, হও না মরা কুকুর।
যা ইচ্ছে হও কিন্তু রেখো রত্তি সোনা টুকুর ॥'

ত্রিশ

ফিরে দেখি সর্বত্র বরফ, দোরের গোড়ায় আবদুর রহমান আর ঘরের ভিতর গনগনে আগুন। আমি তখন শীতে জমে গিয়েছি।

আবদুর রহমান হাসিমুখে আমার হাতে চুমো খেল, কিন্তু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। 'দাঁড়ান হুজুর' বলে আমাকে কোলে করে এক লাফে উঠানে নেবে গেল। এক মুঠো পেঁজা বরফ হাতে নিয়ে আমার নাক আর কানের ডগা সেই বরফ দিয়ে ঘন ঘন ঘষে আর ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে 'চিন্ চিন্' করছে কিনা। আমি ভাবলুম, এও বুঝি পানশিরের কোনো জঙ্গলী অভ্যর্থনার আদিখ্যেতা। বিরক্ত হয়ে বললুম, 'চল, চল, ঘরের ভিতর চল, শীতে আমার হাড়মাস জমে গিয়েছে।' আবদুর রহমান কিন্তু তখন তার শালপ্রাংশু মহাবাহু দিয়ে আমাকে এমনি জড়িয়ে ধরে দু'কানে বরফ ঘষছে যে, আমি কেন, কিঙ্কড় সিংয়েরও সাধ্যি নেই যে, সে-ব্যূহ ছিন্ন করে বেরতে পারে। আবদুর রহমান শুধু বরফ ঘষে আর একটানা মন্ত্রোচ্চারণের মত শুধায়, 'চিন্ চিন্ করছে, চিন্ চিন্ করছে ?' শেষটায় অনুভব করলুম সত্যই নাক আর কানের ডগায় ঝিঁ ঝিঁ ছাড়ার সময় যে রকম চিন্ চিন্ করে সে রকম হতে আরম্ভ করেছে। আবদুর রহমানকে সে খবরটা দেওয়া মাত্রই সে আমাকে কোলে করে আরেক লাফে ঘরে ঢুকল, কিন্তু বসাল আগুন থেকে দূরে ঘরের আরেক কোণে। রোদে-পোড়া মোষ যে রকম কাদার দিকে ধায়, আমিও সেই রকম আগুনের দিকে যতই ধাওয়া করি, আবদুর রহমান ততই আমাকে ঠেকিয়ে রেখে বলে, 'সর্বাঙ্গে রক্ত চলাচল শুরু হোক, হুজুর, তারপর যত খুশি আগুন পোয়াবেন !'

ততক্ষণে সে আমার জুতো খুলে পায়ের আঙুলগুলো পরখ করে দেখছে সেগুলোর রঙ কতটা নীল। আবদুর রহমানের চেহারা থেকে আন্দাজ করলুম

নীল রঙের প্রতি তার গভীর বিতৃষ্ণা। ঘষে ঘষে আঙুলগুলোকে যখন বেশ বেগুনী করে ফেলল তখন সে চেয়ারসুদ্ধ আমাকে আগুনের পাশে এনে বসাল। আমি ততক্ষণে দস্তানা খুলতে গিয়ে দেখি কমলী ছোড়তে চায় না,—আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গিয়েছে। দুষ্টু ছেলে যেরকম খাওয়ার সময় মাকে পেট কামড়ানোর খবর দেয় না আমিও ঠিক সেই রকম আঙুল ফোলার খবরটা চেপে গেলুম। সরল আবদুর রহমান ওদিকে আমার পায়ের তদারক করছে আমি এদিকে আগুনের সামনে হাত বাড়িয়ে আরাম করে দেখি, কলাগাছ বটগাছ হতে চলেছে। ততক্ষণে আবদুর রহমান লক্ষ্য করে ফেলেছে যে, আমার হাত তখনো দস্তানা-পরা। টমাটোর মত লাল মুখ করে আমাকে শুধাল, 'হাতের আঙুলও যে জমে গিয়েছে সে কথাটা আমায় বললেন না কেন?' এই তার প্রথম রাগ দেখলুম। ভৃত্য আবদুর রহমানের গলায় আমীর আবদুর রহমানের গলা শুনতে পেলুম। আমি চিঁ চিঁ করে কি একটা বলতে যাচ্ছিলুম। আমার দিকে কান না দিয়ে বলল, 'চা খাওয়ার পরও যদি দস্তানা না খোলে তবে আমি কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলব!'

আমি শুধালুম, 'কি কাটবে? হাত না দস্তানা?'

আবদুর রহমান অত্যন্ত বেরসিক। আমি আরো ঘাবড়ে গেলুম।

কিন্তু শুধু আমিই ঘাবড়াইনি। দস্তানা পর্যন্ত আবদুর রহমানের গলা শুনে বুঝতে পেরেছে যে, সে চটে গেলে দস্তানা, দস্ত কাউকে আস্ত রাখবে না। চায়ের পেয়ালায় হাত দেবার পূর্বেই অক্টোপাশের পঞ্চপাশ খসে গেল।

সে রাত্রে আবদুর রহমান আমাকে সাত-তাড়াতাড়ি খাইয়ে দিয়ে আপন হাতে বিছানায় শুইয়ে দিল। লেপের তলায় আগেই গরম জলের বোতল ফ্ল্যানেলে পেঁচিয়ে রেখে দিয়েছিল। সেটাতে পা ঠেকিয়ে আমি মুনি-ঋষিদের সিংহাসনে পদাঘাত করার সুখ অনুভব করলুম। পেটের ভিতরে চর্বির ঘন শুরুয়া, লেপে-চাপা গরম বোতলের ওম, আর আবদুর রহমানের বাঘের থাবার ডলাই-মলাই তিনে মিলে এক পলকেই চোখের পলক বন্ধ করে ফেলেছিলুম।

সমস্ত কাহিনীটি যে এত বাখানিয়া বললুম তার প্রধান কারণ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ বই কোনো দিন কারো কোনো কাজে লাগবে না। আর আজকের দিনের ভারতদগ্ডিন কম্যুনিস্টরা বলেন, যে-আর্ট কাজে লাগে না সে-আর্ট আর্টই নয়। অর্থাৎ শিবলিঙ্গ দিয়ে যদি দেয়ালে মশারির পেরেক পোঁতা না যায় তবে সে শিবলিঙ্গের 'কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন।'

তবু যদি কোনো দিন পাকচক্রে ফ্রস্টবিট্‌ন্ হন তবে প্রলেতারিয়ার প্রতীক ওঝা আবদুর রহমানকে স্মরণ করে তার দাওয়াই চালাবেন। সেরে উঠবেন নিশ্চয়ই, এবং তখন যেন আপনার কৃতজ্ঞতা আবদুর রহমানের দিকে ধায়। আবদুর রহমানের প্রাপ্য প্রশংসা আমি কেতাবের মালিকরূপে কেড়ে নিয়ে 'শোষক', 'বুর্জুয়া' নামে পরিচিত হতে চাইনে।

পরদিন সকাল বেলা দেখি, তিন মাইল বরফ ভেঙ্গে বৃদ্ধ মীর আসলম এসে উপস্থিত ; বললেন, 'আত্মজনের বাচনিক অবগত হইলাম তুমি কল্য রজনীর প্রথম যামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছ। কুশল-সন্দেশ কহ। শৈত্যাধিক্যে পথমধ্যে অত্যধিক ক্লেশ হয় নাই তো ?'

আমি আবদুর রহমানের কবিরাজির সালঙ্কার বর্ণনা দিলে মীর আসলম বললেন, 'নাতিদীর্ঘদিবস তথা শর্বরীর প্রথম যামই স্বতশ্চলশকটারোহীকে শিশির-বিদ্ধ করিতে সক্ষম। কৃশানুসংশ্রব হইতে রক্ষা করিয়া তোমার পরিচারক বিচক্ষণের কর্ম করিয়াছে। অপিচ লক্ষ্য করো নাই, স্বদেশে আতপতাপে দগ্ধ হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন মাত্রই সুশীলা জননী তদ্দণ্ডেই শীতল জল পান করিতে নিষেধ করেন, আবগাহনকক্ষ উন্মোচন করেন না ? সঙ্কটদ্বয় আয়ুর্বেদের একই সূত্রে গ্রথিত।'

হক্ কথা।

বললুম, 'ইয়োরোপে আমান উল্লার সম্বর্ধনা নিয়ে হিন্দুস্থানের হিন্দু-মুসলমান বড়ই গর্ব অনুভব করছে।'

মীর আসলম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'বিদেশে সম্মান-প্রাপ্ত নৃপতির সম্মান স্বদেশে লাঘব হয়।'

এ যেন চাণক্য শ্লোকের তৃতীয় ছত্র। ভাবলুম, জিজ্ঞেস করি, মহাশয় ভারতবর্ষে কোন্ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, মুসলমানী না হিন্দুয়ানী, কিন্তু চেপে গিয়ে বললুম, 'আমান উল্লা বিদেশে সম্মান পাওয়াতে স্বদেশে সংস্কার কর্ম করবার সুবিধা পাবেন না ?'

মীর আসলম বললেন, 'সংস্কার-পঙ্কে যে নৃপতি কণ্ঠমগ্ন, বৈদেশিক সম্মানমুকুটের গুরুভার তাঁহাকে অধিকতর নিমজ্জিত করিবে।'

আমি বললুম, 'রানী সুরাইয়াকে দেখবার জন্য প্যারিসের ছেলে-বুড়ো পর্যন্ত রাস্তায় ভিড় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।'

মীর আসলম বললেন, 'ভদ্র, অদ্য যদি তুমি তোমার পদদ্বয়ের ব্যবহার পরিত্যাগপূর্বক মস্তকোপরি দণ্ডায়মান হও, তবে তোমার মত স্বল্পপরিচিত মনুষ্যেরও

এবম্বিধ বাতুলতা নিরীক্ষণ করিবার জন্য কাবুলহট্ট সম্মিলিত হইবে।'

আমি বললুম, 'কী মুশকিল, তুলনাটা আদপেই ঠিক হল না ; রানী তো আর কোনোরকম পাগলামি করছেন না।'

মীর আসলম বললেন, 'মুসলমান রমণীর পক্ষে তুমি অন্য কোন্ বাতুলতা প্রত্যাশা করো ? অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া প্রশস্ত রাজবর্ত্মে কোন্ মুসলমান রমণী এবম্বিধ অশাস্ত্রীয় কর্ম করিতে পারে ?'

আমি বললুম, 'আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী কুরান-হদীস পড়েছেন ; মুখ দেখানো তো আর কুরান-হদীসে বারণ নেই।'

মীর আসলম বললেন, 'আমার ব্যক্তিগত শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে অবান্তর। পার্বত্য উপজাতির শাস্ত্রজ্ঞান এস্থলে প্রযোজ্য। তাহা তোমার অজ্ঞাত নহে।'

আমি আলোচনাটা হাল্কা করবার জন্য বললুম,'জানেন, ফরাসী ভাষায় 'সুরীর' শব্দের অর্থ 'মৃদু হাস্য'। রানী সুরাইয়ার নাম তাই প্যারিসের সকলের মুখে হাসি ফুটিয়েছে।'

মীর আসলম বললেন, 'আমীর হবীব উল্লার নামের অর্থ 'প্রিয়তম বান্ধব' ; ইংরেজ শতবার এই শব্দার্থের প্রতি আমীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করত শপথ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যখন শত্রুহস্তের লৌহকীলক তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিল, তখন হবীব উল্লার কোন 'হবীব' তাঁহাকে স্মরণ করিল ? অপিচ, হবীব উল্লার হবীববর্গই তাঁহাকে পুলসিরাতের (বৈতরণীর) প্রান্তদেশে অকারণে, অসময়ে দণ্ডায়মান করাইয়া দিল।'

আমি বললুম, 'ও তো পুরোনো কাসুন্দি। কিন্তু ঠিক করে বলুন তো আপনি কি আমান উল্লার সংস্কার পছন্দ করেন না ?'

বললেন, 'বৎস, গুরুর পদসেবা করিয়া আমি শিক্ষালাভ করিয়াছি, আমি শিক্ষাসংস্কারের বিরুদ্ধে কেন দণ্ডায়মান হইব ? কিন্তু আমান উল্লা যে ফিরিঙ্গী-শিক্ষা প্রবর্তনাভিলাষী আমি তাহা ভারতবর্ষে দর্শন করিয়া ঘৃণাবোধ করিয়াছি। কিন্তু ভদ্র, তোমার সুমিষ্ট চৈনিক যুষ পরিত্যাগ করিয়া এই তিক্ত বিষয়ের আলোচনায় কি লভ্য ? যুষপত্র কি তুমি স্বদেশ হইতে আনয়ন করিয়াছ ? গুরুগৃহের সুগন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছে।'

আমি বললুম, 'আপনার জন্যও এক প্যাকেট এনেছি।'

মীর আসলম সন্দিগ্ধ নয়নে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু ভদ্র, শুল্কদ্ধরণিকের ন্যায্য প্রাপ্য অর্পণ করিয়াছ সত্য ?'

আমি বললুম, 'আপনার কোনো ভয় নেই। কাবুল কাস্টম হৌসকে ফাঁকি দেবার মত এলেম আমার পেটে নেই। বিছানার ছারপোকাকে পর্যন্ত সেখানে পাসপোর্ট দেখাতে হয়, মাশুল দিতে হয়। আমি তাদের সব অন্যায্য দাবীদাওয়া কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করেছি। আপনাকে হারাম খাইয়ে আমি কি আখেরে জাহান্নমে যাব ?'

মীর আসলম আমাকে শীতকালে কোন্ কোন্ বিষয়ে সাবধান হতে হয় সে সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন, আবদুর রহমানকে ডেকে ঘৃতলবণতৈলতণ্ডুলবস্ত্রইন্ধন সম্বন্ধে নানা সুযুক্তি দিয়ে বিদায় নিলেন।

খবর পেয়ে তারপর এলেন মৌলানা। আমি আমান উল্লার বিদেশে সম্মান পাওয়া, আর সে সম্বন্ধে মীর আসলমের মন্তব্য তাঁকে বললুম। মৌলানা বললেন, 'আমান উল্লা যাদের কথায় চলেন, তারা তো বাদশাহের সম্মানে নিজেদের সম্মানিত মনে করছে। তারা বলছে, 'মুস্তফা কামাল যদি তুর্কীকে, রেজা শাহ যদি ইরানকে প্রগতির পথে চালাতে পারেন, তবে আমান উল্লাই বা পারবেন না কেন ?' এই হল তাদের মনের ভাব; কথাটা খুলে বলার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করে না। কারণ কোনো রকম বাধাও তো কেউ দিচ্ছে না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু মৌলানা, কতকগুলো সংস্কারের প্রয়োজন আমি মোটেই বুঝে উঠতে পারিনে। এই ধরো না শুক্রবারের বদলে বৃহস্পতিবার ছুটির দিন করা।'

মৌলানা বললেন, 'শুক্রবার ছুটির দিন করলে জুম্মার নমাজের হিড়িকে সমস্ত দিনটা কেটে যায়, ফালতো কাজ-কর্ম করার ফুরসত পাওয়া যায় না। তাই আমান উল্লা দিয়েছেন সমস্ত বৃহস্পতিবার দিন ছুটি, আর শুক্রবারে জুম্মার নমাজের জন্য আধ ঘণ্টার বদলে এক ঘণ্টার ছুটি। কিন্তু জানো, আমি আরেকটা কারণ বের করেছি। এই দেখ না অ্যারোপ্লেনে করে যদি তুমি শান্তিনিকেতনের ছুটির দিন বুধবারে বেরোও, এখানে পৌছবে ছুটির দিন বৃহস্পতিবারে, তারপর ইরাক পৌছবে শুক্রবারে সেও ছুটির দিন, তারপরের দিন প্যালেস্টাইনে—সেখানে ইহুদীদের জন্য শনিবারে ছুটি, তারপরের দিন রবিবারে ইয়োরোপ, তারপরের দিন সাউথ-সী-আয়লেণ্ডে, সেখানে তো তামাম হপ্তা ছুটি।'

আমি বললুম, 'উত্তম আবিষ্কার করেছ, কিন্তু বেশ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে এখানে এসেছ তো ? না হলে বরফ ভেঙে কাবুলে ফিরবে কি করে ?'

মৌলানা বললেন, 'দু'-একদিনের মধ্যেই বরফের উপর পায়ে-চলার পথ পড়ে

যাবে ; আসতে যেতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু আমি চললুম দেশে, বউকে নিয়ে আসতে। বেনওয়া সায়েব মত দিয়েছেন, তুমি কি বল ?'

আমি শুধালুম, 'বউ রাজী আছেন ?'

মৌলানা বললেন, 'হাঁ'।

আমি বললুম, 'তবে আর কাবুল-অমৃতসরে প্লেবিসিট্ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন ? তোমাদেরই ভাষায় তো রয়েছে বাপু,—

'মিয়া বিবি রাজী
কিয়া করে কাজী ?' '

মনে মনে বললুম, 'বগদানফ গেছেন, তোমার দাড়িটির দর্শনও এখন আর কিছু দিনের তরে পাব না। নতুন বউয়ের 'কা তব কান্তা' হতে অন্তত ছ'টি মাস লাগার কথা।'

মৌলানা চলে যাওয়ার পর আবদুর রহমানকে ডেকে বললুম, 'দাও তো হে কুর্সিখানা জানালার কাছে বসিয়ে ; বাকি শীতটা তোমার ঐ বরফ দেখেই কাটাব।'

আবদুর রহমানের বর্ণনামাফিক সব রকমেরই বরফ পড়ল। কখনো পেঁজা পেঁজা, কখনো গাদা গাদা, কখনো ঘূর্ণিবায়ুর চক্কর খেয়ে দশদিক অন্ধকার করে, কখনো আস্বচ্ছ যবনিকার মত গিরি-প্রান্তর ঝাপসা করে দিয়ে ; কখনো অতি কাছে আমারই বাতায়ন পাশে, কখনো বহুদূরে সানুশ্লিষ্ট হয়ে, শিখর চুম্বন করে। আস্তে আস্তে সব কিছু ঢাকা পড়ে গেল, শুধু পত্রবিবর্জিত চিনার গাছের সারি দেখে মনে হয় দাঁত-ভাঙা পুরোনো চিরুনিখানা ঠাকুরমা যেন দেয়ালের গায়ে খাড়া করে রেখে বরফের পাকা চুল এলিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন।

কিন্তু আবদুর রহমান মর্মাহত। আমাকে প্রতিবার চা দেবার সময় একবার করে বাইরের দিকে তাকায় আর আর্তস্বরে বলে, 'না হুজুর, এ বরফ ঠিক বরফ নয়। এ শহুরে বরফ, বাবুয়ানী বরফ। সত্যিকার খাঁটি বরফ পড়ে পানশিরে। চেয়ে দেখুন বরফের চাপে এখনো গেট বন্ধ হয়নি। মানুষ এখনো দিব্যি চলাফেরা করছে, ফেঁসে যাচ্ছে না।'

আবদুর রহমানের ভয়, পাছে আমাকে বোকা পেয়ে কাবুল উপত্যকা তার ভেজাল বরফ গছিয়ে দেয়। নিতান্তই যদি কিনতে হয় তবে যেন আমি কিনি আসল, খাঁটি মাল 'মেড্ ইন পানশির'।

একত্রিশ

শীত আর বসন্ত ঘরে বসে, ডুব সাঁতার দিয়ে কাটাতে হল।

এদেশে বসন্তের সঙ্গে আমাদের বর্ষার তুলনা হয়। সেখানে গ্রীষ্মকালে ধরণী তপ্তশয়নে পিপাসার্তা হয়ে পড়ে থাকেন, আষাঢ়স্য যে কোনো দিবসেই হোক্ ইন্দ্রপুরীর নববর্ষণ বারতা পেয়ে নূতন প্রাণে সঞ্জীবিত হন। এখানে শীতকালে ধরিত্রী প্রাণহীন স্পন্দন-বিহীন মহানিদ্রায় লুটিয়ে পড়েন, তার পর নববসন্তের প্রথম রৌদ্রে চোখ মেলে তাকান। সে তাকানো প্রথম ফুটে ওঠে গাছে গাছে।

দূর থেকে মনে হল ফ্যাকাশে সাদা গাছগুলোতে বুঝি কোনোরকম সবুজ পোকা লেগেছে। কাছে গিয়ে দেখি গাছে গাছে অগুন্তি ছোট্ট ছোট্ট পাতার কুঁড়ি; জন্মের সময় কুকুরছানার বন্ধ চোখের মত। তারপর কয়েকদিন লক্ষ্য করিনি, হঠাৎ একদিন সকালবেলা দেখি সেগুলো ফুটেছে আর দুটি দুটি করে পাতা ফুটে বেরিয়েছে—গাছগুলো যেন সমস্ত শীতকাল বকপাখির মত ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ ডানা মেলে ওড়বার উপক্রম করেছে। সহস্র সহস্র সবুজ বলাকা যেন মেলে ধরেছে লক্ষ লক্ষ অঙ্কুরের পাখা।

ছিন্ন হয়েছে বন্ধন বন্দীর।

গাছে গাছে দেখন-হাসি, পাতায় পাতায় আড়াআড়ি—কে কাকে ছেড়ে তাড়াতাড়ি গজিয়ে উঠবে। কোনো গাছ গোড়ার দিকে সাড়া দেয়নি, হঠাৎ একদিন একসঙ্গে অনেকগুলো চোখ মেলে দেখে আর সবাই ঢের এগিয়ে গেছে, সে তখন এমনি জোর ছুট লাগাল যে, দেখতে না দেখতে আর সবাইকে পিছনে ফেলে, বাজী জিতে, মাথায় আইভি মুকুট পরে সগর্বে দুলতে লাগল। কেউ সারা গায়ে কিছু না পরে শুধু মাথায় সবুজ মুকুট পরল, কেউ ধীরে সুস্থে সর্বাঙ্গে যেন সবুজ চন্দনের ফোঁটা পরতে লাগল। এতদিন বাতাস শুকনো ডালের ভিতর দিয়ে হুহু করে ছুটে চলে যেত, এখন দেখি কী আদরে পাতাগুলোর গায়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

কাবুল নদীর বুকের উপর জমে-যাওয়া বরফের জগদ্দল-পাথর ফেটে চৌচির হল। পাহাড় থেকে নেমে এল গম্ভীর গর্জনে শত শত নব জলধারা—সঙ্গে নেমে আসছে লক্ষ লক্ষ পাথরের নুড়ি আর বরফের টুকরো। নদীর উপরে কাঠের পুলগুলো কাঁপতে আরম্ভ করেছে—সিকন্দর শাহের আমল থেকে তারা হাঁটু ভেঙে কতবার নুয়ে পড়েছে, ভেসে গিয়েছে, ফের দাঁড়িয়ে উঠেছে তার হিসেব কেউ

কখনো রাখতে পারেনি।

উপরে তাকিয়ে দেখি গভীর নীলাম্বুজের মত নবীন নীলাকাশ হংসশুভ্র মেঘের ঝালর ঝুলিয়ে চন্দ্রাতপ সাজিয়েছে।

উপত্যকার দিকে তাকিয়ে দেখি সবুজের বন্যায় জনপদ অরণ্য ডুবে গিয়েছে। এ রকম সবুজ দেখেই পূর্ববঙ্গের কবি প্রিয়ার শ্যামল রঙের স্মরণে বলেছিলেন।

ও বন্ধুয়া, কোন্ বন-ধোওয়া ছাঁওলা নীলা পানি,
গোসল করি হইলা তুমি সকল রঙের রানী।

কিন্তু এ-উপত্যকা এ-বনরাজি এ-রকম সবুজ পেল কোথা থেকে?

নীলাকাশের নীল আর সোনালী রোদের হলদে মিশিয়ে।

কিন্তু আমাদের বর্ষা আর এদেশের বসন্তে একটা গভীর পার্থক্য রয়েছে। বর্ষায় আমাদের মন ঘরমুখো হয়, এদেশের জনপ্রাণীর মন বাহিরমুখো হয়। গাছপালার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যে সুপ্তোত্থিত নব যৌবনের স্পন্দন অনুভব করে তারই স্মরণে কবি বলেছেন—

শপথ করিনু রাত্রে পাপ পথে আর যেন নাহি ধায়,
প্রভাতে দ্বারেতে দেখি শপথঘ্ন মধুঋতু কি করি উপায়!

শুধু ওমর খৈয়াম দোটানার ভিতর থাকা পছন্দ করেন না। তিনি গর্জন করে বললেন,—

বিধিবিধানের শীতপরিধান
ফাগুন আগুনে দহন করো।
আয়ুবিহঙ্গ উড়ে চলে যায়
হে সাকি, পেয়ালা অধরে ধরো।*

কাবুলীরা তাই বেরিয়ে পড়েছে, না বেরিয়ে উপায়ও নেই—শীতের জ্বালানী কাঠ ফুরিয়ে এসেছে, দুম্বা ভেড়ার জাবনা তলায় এসে ঠেকেছে, শুঁটকি মাংসের পোকা কিলবিল করছে। এখন আতপ্ত বসন্তের রোদে শরীরকে কিঞ্চিৎ তাতানো যায়, দুম্বা ভেড়া কচি ঘাসে চরানো যায় আর আধখেঁচড়া শিকারের জন্য দু'চার দল পাখিও আস্তে আস্তে ফিরে আসছে। আবদুর রহমান বললো, পানশির অঞ্চলে ভাঙা বরফের তলায় কি এক রকমের মাছও নাকি এখন ধরা যায়। অনুমান করলুম, কোন রকমের স্প্রিং ট্রাউটই হবে।

---

* অনুবাদকের নাম মনে নেই বলে দুঃখিত।

রথ দেখার সময় যাঁরা কলা বেচার দিকেও মাঝে মাঝে নজর দেন তাঁদের মুখে শুনেছি কুবের যে যক্ষকে ঠিক একটি বৎসরের জন্যই নির্বাসন দিয়েছিলেন তার একটা গভীর কারণ আছে। ছয় ঋতুতে ছয় রকম করে প্রিয়ার বিরহযন্ত্রণা ভোগ না করা পর্যন্ত মানুষ নাকি পরিপূর্ণ বিচ্ছেদবেদনার স্বরূপ চিনতে পারে না; আর বিদগ্ধ জনকে এক বছরের বেশী শাস্তি দেওয়াতেও নাকি কোনো সূক্ষ্ম চতুরতা নেই—সোজা বাঙলায় তখন তাকে বলে মরার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়া মাত্র।

আফগান-সরকার অযথা বিঘ্ন-সন্তোষী নন বলে ছয়টি ঋতু পূর্ণ হওয়া মাত্রই আমাকে পাণ্ডববর্জিত গণ্ডগ্রামের নির্বাসন থেকে মুক্তি দিয়ে শহরে চাকরি দিলেন। এবারে বাসা পেলুম লব-ই-দরিয়ায় অর্থাৎ কাবুল নদীর পারে, রাশান দূতাবাসের গা ঘেঁষে, বেনওয়া সায়েবের সঙ্গে একই বাড়িতে।

প্রকাণ্ড সে বাড়ি। ছোটখাটো দুর্গ বললেও ভুল হয় না। চারদিকে উঁচু দেয়াল, ভিতরে চকমেলানো একতলা দোতলা নিয়ে ছাব্বিশখানা বড় বড় কামরা। মাঝখানের চত্বরে ফুলের বাগান, জলের ফোয়ারাটা পর্যন্ত বাদ যায়নি। বড়লোকের বাড়ি সরকারকে ভাড়া দেওয়া হয়েছে—বেনওয়া সায়েব ফন্দি-ফিকির করে বাড়িটা বাগিয়েছিলেন।

আমি নিলুম এক কোণে চারটে ঘর আর বেনওয়া সায়েব রইলেন আরেক কোণে আর চারটে ঘর নিয়ে। বাকি বাড়িটা খাঁ খাঁ করে, আর সে এতই প্রকাণ্ড যে আবদুর রহমানের সঙ্গীত-রবও কায়ক্লেশে আঙ্গিনা পাড়ি দিয়ে ওপারে পৌঁছয়।

শহরে এসে গুষ্টিসুখ অনুভব করার সুবিধে হল। রাশান রাজদূতাবাসে রোজই যাই—দু'দিন না গেলে দেমিদফ এসে দেখা দেন।—সইফুল আলম মাঝে মাঝে ঢুঁ মেরে যান, সোমথ বউ সম্বন্ধে অহরহ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মৌলানার দাড়ির দর্শনও মাঝে মাঝে পাই, দোস্ত মুহম্মদ ঘূর্ণিবায়ুর মত বেলা-অবেলায় চক্কর মেরে বেরবার সময় 'কলাডা মুলাডা' ফেলে যান, বিদগ্ধ মীর আসলম সুসিদ্ধ চৈনিক যুষ পান করে যান, তা ছাড়া ইনি উনি তিনি তো আছেনই আর নিতান্ত বান্ধব বাড়ন্ত হলে বিরহী যক্ষ বেনওয়া তো হাতের নাগাল।

রাশান রাজদূতাবাসে আরো অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হল; দেমিদফকে বাদ দিলে সকলের পয়লা নাম করতে হয় বলশফের। নামের সঙ্গে অর্থ মিলিয়ে তাঁর দেহ—ব্যূঢ়োরস্ক, বৃষস্কন্ধ শালপ্রাংশুমহাবাহু বললে আবদুর রহমান বরঞ্চ অপাংক্তেয় হতে পারে, ইনি সে বর্ণনা গলাধঃকরণ করে অনায়াসে সেকেণ্ড হেল্‌পিং চাইতে পারেন।

আবদুর রহমানের সঙ্গে পরিচয় করে দেবার সময় যে দ্বিতীয় নরদানবের কথা বলেছিলুম ইনিই সে-বিভীষিকা।

বহুবার এঁর সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি—কাবুল বাজারের মত পপুলার লীগ অব নেশনসে আজ পর্যন্ত এমন দেশী বিদেশী চোখে পড়েনি যে তাঁকে দেখে হকচকিয়ে যায়নি।

হুঁশিয়ার সোয়ার হলে তক্ষুনি ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরেছে—বহু ঘোড়াকে ঘাবড়ে গিয়ে সামনের পা দুটো আকাশে তুলতে দেখেছি।

টেনিস-কোর্টে রেকেট নিয়ে নামলে শত্রুপক্ষ বেজ-লাইনের দশ হাত দূরে তারের জালের গা ঘেঁষে দাঁড়াত। বলশফ বেজে দাঁড়ালে তাঁর কোনো পার্টনার নেটে দাঁড়াতে রাজী হত না, শত্রুপক্ষের তো কথাই ওঠে না। তাঁতের রেকেট ঘন ঘন ছিঁড়ে যেত বলে অ্যালুমিনিয়ম জাতীয় ধাতুর রেকেট নিয়ে তিনি তাড়ু হাঁকড়াতেন, স্বচ্ছন্দে নেট ডিঙোতে পারতেন—লাফ দেবার প্রয়োজন হত না—আর ঝোলা নেট টাইট করার জন্য এক হাতে হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেন মেয়েরা যেরকম সেলাই কলের হাতল ঘোরায়।

শুনেছি বিলেতে কোনো কোনো ফিল্‌ম্ নাকি ষোলো বছরের কম বয়স হলে দেখতে দেয় না—চরিত্র দোষ হবে বলে; যাদের ওজন একশ' ষাট পৌণ্ডের কম তাদের ঠিক তেমনি বলশফের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করা বারণ ছিল, পাছে হাতের নড়া কাঁধ থেকে খসে যায়। মহিলাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা।

বীরপুরুষ হিসেবে রাশান রাজদূতাবাসে বলশফের খাতির ছিল। ১৯১৬ সাল থেকে বলশেভিক বিদ্রোহের শেষ পর্যন্ত তিনি দেশে বিদেশে বিস্তর লড়াই লড়েছেন। ১৯১৬-১৭ সালের শীতকালে যখন রুশবাহিনী পোল্যাণ্ডে লড়াই হেরে পালায় তখন বলশফ রাশান ক্যাভাল্‌রিতে ছোকরা অফিসার। সেবারে ঘোড়ায় চড়ে পালাবার সময় তার পিটের চোদ্দ জায়গায় জখম হয়েছিল—বিস্তর ঝুলোঝুলির পর একদিন শার্ট খুলে তিনি আমায় দাগগুলো দেখিয়েছিলেন। কোনো কোনোটা তখনো আধ ইঞ্চি পরিমাণ গভীর। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'পৃষ্ঠে তব অস্ত্র-লেখা।'

বলশফকে কেউ কখনো চটাতে পারেনি বলেই রসিকতাটা করেছিলুম। তিনি ভারতবর্ষের ক্ষাত্র বীরত্বের 'কোড্' শুনে বললেন, 'যদি সেদিন না পালাতুম তবে ত্রৎস্কির আমলে পোলদের বেধড়ক পাল্টা মার দেবার সুখ থেকে যে বঞ্চিত হতুম, তার কি?'

মাদাম দেমিদফ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ‘আর জানেন তো, মসিয়ো, ঐ লড়াইতেই সোভিয়েট রাশার অনেক পথ সুরাহা হয়ে যায়।’

বলশফের একটা মস্ত দোষ দুদণ্ড চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। হাত দুখানা নিয়ে যে কি করবেন ঠিক করতে পারেন না বলে এটা সেটা নিয়ে সব সময় নাড়াচাড়া করেন, বেখেয়ালে একটু বেশী চাপ দিতেই কর্কস্ক্রুটা পর্যন্ত ভেঙে যায়। তিনি ঘরে ঢুকলেই আমরা টুকিটাকি সব জিনিস তাঁর হাতের নাগাল থেকে সরিয়ে ফেলতুম। আমার ঘরে ঢুকলে আমি তৎক্ষণাৎ তাকে একথালা আস্ত আখরোট খেতে দিতুম।

দুটো একটা খেতেন মাঝে সাঝে—যাওয়ার পর দেখা যেত সব ক’টি আখরোটের খোসা ছাড়িয়ে ফেলেছেন, চহারমগজশিকন (হাতুড়ি) না দেওয়া সত্ত্বেও।

এ রকম অজাতশত্রু লোক সমস্ত কাবুল শহরে আমি দুটি দেখিনি। একদিন তাই যখন দেমিদফের ঘরে আলোচনা হচ্ছিল তখন বলশফের সব চেয়ে দিলী-দোস্ত রোগাপটকা স্নিয়েশকফ বললেন, ‘বলশফের সঙ্গে সকলের বন্ধুত্ব তার গায়ের জোরের ভয়ে।’

বলশফ বললেন, ‘তা হলে তো তোমার সব চেয়ে বেশী শত্রু থাকার কথা।’

স্নিয়েশকফ যা বললেন, পদাবলীর ভাষায় প্রকাশ করলে তার রূপ হয়—

‘বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তুঁহারি রূপে—’

বাকিটা তিনি আর প্রাপের ভয়ে বলেননি।

বলশফ বললেন, ‘রোগা লোকের ঐ এক মস্ত দোষ। খামকা বাজে তর্ক করে। বলে কি না ‘ভয়ে বন্ধুত্ব!’ যত সব পরস্পরদ্রোহী, আত্মঘাতী বাক্যাড়ম্বর!’

বলশফ সম্বন্ধে এত কথা বললুম তার কারণ তিনি তখন আমান উল্লার অ্যার-ফোর্সের ডাঙর পাইলট। বলশেভিক-বিদ্রোহ জুড়িয়ে গিয়ে থিতিয়ে যাওয়ায় তাঁর সঙ্কটাকাঙ্ক্ষী মন কাবুলে এসে নূতন বিপদের সন্ধানে আমান উল্লার চাকরি নিয়েছিল।

শেষদিন পর্যন্ত তিনি আমান উল্লার সেবা করেছিলেন।

বত্রিশ

আমান উল্লা ইউরোপ থেকে নিয়ে এলেন একগাদা দামী আসবাবপত্র, অগুনতি মোটর গাড়ি আর বক্তৃতা দেবার বদ অভ্যাস। প্রাচ্যদেশের লোক খেয়েদেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে আরামে গা এলিয়ে দেয়, পশ্চিমে ডিনারের পর স্পীচ, লাঞ্চের পর অরেটরি—তাও আবার যত সব শিরঃপীড়াদায়ক পোলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে।

সায়েবরা বিলেতে লাঞ্চে ডিনারে আমান উল্লাকে যে নেশার পয়লা পাত্র খাইয়ে দিয়েছিল তার খোয়ারি তিনি চালালেন কাবুলে ফিরে এসে, মাত্রা বাড়িয়ে, লম্বা লম্বা লেকচার ঝেড়ে। পর পর তিন দিনে নাকি তিনি একুনে ত্রিশ ঘণ্টা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

কিন্তু কারো কথায় তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না, কাবুলে চিঁড়ের প্রচলন নেই—কাজেই শ্রোতারা কেউ ঘুমলো, কেউ শুনলো, দু'-একজন মনে মনে ইউরোপে তাঁর বাজে খর্চার আঁক কষলো।

তারপর আরম্ভ হল সংস্কারের পালা। একদিন সকালবেলা মৌলানার বাড়ি যেতে গিয়ে দেখি পনরো আনা দোকানপাট বন্ধ। বড় দোকানের ভিতর গ্রামোফোন-ফোটোগ্রাফের দোকানটা খোলা ছিল। দোকানদার পাঞ্জাবী, অমৃতসরের লোক; আমাদের সঙ্গে ভাব ছিল।

খবর শুনে বিশ্বাস হল না। আমান উল্লার হুকুম, 'কার্পেটের উপর পদ্মাসনে বসে দোকান চালাবার কায়দা বেআইনী করা হল; সব দোকানে বিলিতী কায়দায় চেয়ার টেবিল চাই।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা? ছুতোর কামার, কালাইগর, মুচী?'

'সব, সব।'

'ছোট ছোট খোপের ভিতর চেয়ার টেবিল ঢোকাবে কি করে, পাবেই বা কোথায়?'

নিরুত্তর।

'যারা পয়সাওয়ালা, যাদের দোকানে জায়গা আছে?'

'রাতারাতি মেজ-কুর্সি পাবে কোথায়? ছুতোরও ভয়ে দোকান বন্ধ করেছে। বলে, চেয়ারে বসে টেবিলে তক্তা রেখে সে নাকি র‍্যাদা চালাতে শেখেনি।'

‘আগের থেকে নোটিশ দিয়ে হুঁশিয়ার করা হয়নি ?’

‘না। জানেন তো, আমান উল্লা বাদশার সব-কুছ ঝটপট্।’

পাক্কা তিন সপ্তাহ চোদ্দ আনা দোকানপাট বন্ধ রইল। গম ডাল অবশ্যি পিছনের দরজা দিয়ে আড়ালে আবডালে বিক্রি হল, তাদের উপরে চোটপাট করে পুলিশ দু’পয়সা কামিয়ে নিল।

আমান উল্লা হার মানলেন কিনা জানিনে তবে তিন সপ্তাহ পরে একে একে সব দোকানই খুলল—পূর্ববৎ, অর্থাৎ বিন্ চেয়ার-টেবিল। কাবুলের সবাই এই ব্যাপারে চটে গিয়েছিল সন্দেহ নেই কিন্তু রাজার খামখেয়ালিতে তারা অভ্যস্ত বলে অত্যধিক উষ্মাবোধ করেনি। কাবুলীদের এ মনোভাবটা আমি ঠিক ঠিক বুঝতে পারিনি, কারণ আমরা ভারতবর্ষে অত্যাচার-অবিচারে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু খামখেয়ালি বড় একটা দেখতে পাইনে।

আমার মনে খটকা লাগল। পাগমানের পাগলামির কথা মনে পড়ল—গাঁয়ের লোককে শহরে ডেকে এনে মর্নিংস্যুট পরাবার বিড়ম্বনা। এ যে তারি পুনরাবৃত্তি; এ যে আরো পীড়াদায়ক, মূল্যহীন, অর্থহীন, ইয়োরোপের অন্ধানুকরণ।

মীর আসলমের সঙ্গে দেখা হলে পর তিনি আমাকে সবিস্তর আলোচনা না করতে দিয়ে যেটুকু বললেন বাঙলা ছন্দে তার অনুবাদ করলে দাঁড়ায়—

কয়লাওয়ালার দোস্তী ? তওবা !
ময়লা হতে রেহাই নাই
আতরওয়ালার বাক্স বন্ধ
দিলখুশ তবু পাই খুশবাই।

আমি বললুম, ‘এ তো হল সূত্র, ব্যাখ্যা করুন !’

মীর আসলম বললেন, ‘পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতি ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়ের সঙ্গে গাত্র ঘর্ষণ করতঃ আমান উল্লা যে কৃষ্ণ-প্রস্তর চূর্ণ সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া আসিয়াছেন তদ্দ্বারা তিনি কাবুল-হট্ট মসীলিপ্ত করিবার বাসনা প্রকাশ করিতেছেন।

‘তথাপি অস্মদ্দেশীয় বিদগ্ধজনের শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত যদি নৃপতি প্রস্তরচূর্ণের সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ প্রস্তরখণ্ডও আনয়ন করিতেন। তদ্দ্বারা ইন্ধন প্রজ্বলিত করিলে দীন দেশের শৈত্য নিবারিত হইত।’

আমি বললুম, ‘চেয়ারটেবিল চালানো যদি মসীলেপন মাত্রই হয় তবে তা নিয়ে এমন ভয়ঙ্কর দুঃখ করবার কি আছে বলুন।’

মীর আসলম বললেন, 'অযথা শক্তিক্ষয়। নৃপতির অবমাননা। ভবিষ্যৎ অন্ধকার।'

কিন্তু আর পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে দেখলুম যে, তাঁরা মীর আসলমের মত কালো চশমা পরে ভবিষ্যৎ এত কালো করে দেখছেন না। ছোকরাদের চোখে তো গোলাপী চশমা; গোলাপী বললেও ভুল বলা হয়,—সে চশমা লাল টকটকে, রক্ত-মাখানো। তারা বলে, 'যেসব বদমায়েশরা এখনো কার্পেটে বসে দোকান চালাচ্ছে তাদের ধরে ধরে কামানের মুখে বেঁধে হাজারো টুকরো করে উড়িয়ে দেওয়া উচিত। আমান উল্লা নিতান্ত ঠাণ্ডা বাদশা বলেই তাদের রেহাই দিয়েছেন।'

ভেবে চিন্তে আমি গোলাপী চশমাই পরলুম।

তার কিছুদিন পরে আরেক নয়া সংস্কারের খবর আনলেন মৌলানা। আফগান সেপাইদের মানা করা হয়েছে, তারা যেন কোনো মোল্লাকে মুরশীদ না বানায় অর্থাৎ গুরু স্বীকার করে যেন মন্ত্র না নেয়।

খাঁটি ইসলামে গুরু ধরার রেওয়াজ নেই। পণ্ডিতেরা বলেন, 'কুরান শরীফ 'কিতাবুম্মুবীন' অর্থাৎ 'খোলা কিতাব'; তাতেই জীবনযাত্রার প্রণালী আর পরলোকের জন্য পুণ্য সঞ্চয়ের পন্থা সোজা ভাষায় বলে দেওয়া হয়েছে; গুরু মেনে নিয়ে তার অন্ধানুসরণ করার কোনো প্রয়োজন নেই।

অন্য দল বলেন, 'একথা আরবদের জন্য খাটতে পারে, কারণ তারা আরবীতে কুরান পড়তে পারে। কিন্তু ইরানী, কাবুলীরা আরবী জানে না; গুরু না নিলে কি উপায়?'

এ-তর্কের শেষ কখনো হবে না।

কিন্তু বিষয়টা যদি ধর্মের গণ্ডির ভিতরেই বন্ধ থাকত, তবে আমান উল্লা গুরু-ধরা বারণ করতেন না। কারণ, যদিও মানুষ গুরু স্বীকার করে ধর্মের জন্য, তবু দেখা যায় যে, শেষ পর্যন্ত গুরু দুনিয়াদারীর সব ব্যাপারেও উপদেশ দিতে আরম্ভ করেছেন এবং গুরুর উপদেশ সাক্ষাৎ আদেশ।

তাহলে দাঁড়ালো এই যে, আমান উল্লার আদেশের বিরুদ্ধে মোল্লা যদি তাঁর শিষ্য কোনো সেপাইকে পাল্টা আদেশ দেন, তবে সে সেপাই মোল্লার আদেশই যে মেনে নেবে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

চার্চ বনাম স্টেট।

গোলাপী চশমাটা কপালে তুলে অনুসন্ধান করলুম, দেয়ালে কোনো লেখা

ফুটে উঠেছে কিনা, আমান উল্লা কেন হঠাৎ এ আদেশ জারী করলেন। তবে কি কোনো অবাধ্যতা, কোনো বিদ্রোহ, কোনো—? কিন্তু এসব সন্দেহ কাবুলে মুখ ফুটে বলা দূরের কথা, ভাবতে পর্যন্ত ভয় হয়।

আমার শেষ ভরসা মীর আসলম। তিনি দেখি কালো চশমায় আরেক পোঁচ ভুসো মাখিয়ে রাজনৈতিক আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। খবরটা দেখলুম তিনি বহু পূর্বেই জেনে গিয়েছেন। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'ইহলোক পরলোক সর্বলোকের জন্যই গুরু নিষ্প্রয়োজন। তৎসত্ত্বেও যদি কেহ অনুসন্ধান করে, তবে তাহাকে প্রতিরোধ করাও ততোধিক নিষ্প্রয়োজন।

আমি বললুম, 'কিন্তু আপনি যখন আপনার ভারতীয় গুরুর কথা স্মরণ করেন, তখনই তো দেখেছি তাঁর প্রশংসায় আপনি পঞ্চমুখ।'

মীর আসলম বললেন, 'গুরু দ্বিবিধ; যে গুরুগৃহে প্রবেশ করার দিন তোমার মনে হইবে, গুরু ভিন্ন পদমাত্র অগ্রসর হইতে পারো না এবং ত্যাগ করার দিন মনে হইবে, গুরুতে তোমার প্রয়োজন নাই, তিনিই যথার্থ গুরু—গুরুর আদর্শ তিনি যেন একদিন শিষ্যের জন্য সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন হইতে পারেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর গুরু শিষ্যকে প্রতিদিন পরাধীন হইতে পরাধীনতর করেন। অবশেষে গুরুবিনা সে-শিষ্যও নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস কর্ম পর্যন্ত সুসম্পন্ন করিতে পারে না। আমার গুরু প্রথম শ্রেণীর। আফগান সৈন্যের গুরু দ্বিতীয় শ্রেণীর।'

আমি বললুম, 'অর্থাৎ আপনার গুরু আপনাকে স্বাধীন করলেন; আফগান সেপাইয়ের গুরু তাকে পরাধীন করেন। পরাধীনতা ভালো জিনিস নয়, তবে কেন বলেন, গুরু নিষ্প্রয়োজন? বরঞ্চ বলুন, গুরুগ্রহণ সেখানে অপকর্ম।'

মীর আসলম বললেন, 'ভদ্র, সত্য কথা বলিয়াছ, কিন্তু প্রশ্ন, সংসারে কয়জন লোক স্বাধীন হইয়া চলিতে ভালোবাসে বা চলিতে পারে। যাহারা পারে না, তাহাদের জন্য অন্য কি উপায়?'

আমি বললুম, 'খুদায় মালুম। কিন্তু উপস্থিত বলুন, সৈন্যদের বিদ্রোহ করার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা?'

মীর আসলম বললেন, 'নৃপতির সন্নিকটস্থ সেনাবাহিনী কখনো বিদ্রোহ করে না, যতক্ষণ না সিংহাসনের জন্য অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হন।'

আমি ভারী খুশী হয়ে বিদায় নিতে গিয়ে বললুম, 'কয়েক দিন হল লক্ষ্য করছি, আপনার ভাষা থেকে আপনি কঠিন আরবী শব্দ কমিয়ে আনছেন। সেটা কি সজ্ঞানে?'

মীর আসলম পরম পরিতোষ সহকারে মাথা দোলাতে দোলাতে হঠাৎ অত্যন্ত গ্রাম্য কাবুলী ফার্সীতে বললেন, 'এ্যাদ্দিনে বুঝতে পারলে চাঁদ? তবে হক কথা শুনে নাও। আর বছর যখন হেথায় এলে তখন ফার্সী জানতে ঢু-ঢু। তাইতে তোমায় তালিম দেবার জন্য আরবী শব্দের বেড়া বানাতুম, তুমি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে পেরোতে; গোড়ার দিকে ঠ্যাঙগুলো জখম-টখমও হয়েছে। এখন দিব্যি আরবী ঘোড়ার মত আরবী বেড়া ডিঙোচ্ছো বলে খামকা বখেড়া বাঁধার কম্ম বন্ধ করে দিলুম। গুরু এখন ফালতো। মাথার ভসভসে ঘিলুতে তুরপুন সিঁধোলো?'

আমি বাড়ি ফেরার সময় ভাবলুম, 'লোকটি সত্যিকার পণ্ডিত। গুরু কি করে নিজেকে নিষ্প্রয়োজন করে তোলেন, সেটা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিলেন।'

তারপর বেশী দিন যায়নি, এমন সময় একদিন নোটিশ পেলুম, একদল আফগান মেয়েকে উচ্চ শিক্ষার জন্য তুর্কীতে পাঠানো হবে; স্বয়ং বাদশা উপস্থিত থেকে তাদের বিদায়-আশীর্বাদ দেবেন।

আমি যাইনি। বৃটিশ রাজদূতাবাসের এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কর্মচারীর মুখ থেকে বর্ণনাটা শুনলুম। তার নাম বলব না, সে নাম এখনো মাঝে মাঝে ভারতবর্ষের খবরের কাগজে ধূমকেতুর মত দেখা দেয়। বললেন, 'গিয়ে দেখি, জনকুড়ি কাবুলী মেয়ে গার্ল গাইডের ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে। আমান উল্লা স্বয়ং উপস্থিত, অনেক সরকারী কর্মচারী, বিদেশী রাজদূতাবাসের গণ্যমান্য সভ্যগণ, আর একপাশে মহিলারা। রানী সুরাইয়াও আছেন, হ্যাটের সামনে পাতলা নেটের পরদা।

'আমান উল্লা উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক খাঁটি এবং পুরানো কথা দিয়ে অবতরণিকা শেষ করে বললেন, "আমি পর্দা-প্রথার পক্ষপাতী নই, তাই আমি এই মেয়েদের বিনা বোরকায় তুর্কী পাঠাচ্ছি। কিন্তু আমি স্বাধীনতাপ্রয়াসী; তাই কাবুলের কোনো মেয়ে যদি মুখের সামনের পর্দা ফেলে দিয়ে রাস্তায় বেরোতে চায়, তবে আমি তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত। আবার আমি কাউকে জোর করতেও চাইনে, এমন কি, মহিষী সুরাইয়াও যদি বোরকা পরাই পছন্দ করেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই।"

কর্মচারিটি বললেন, 'এতটা ভালোয়-ভালোয় চলল। কিন্তু আমান উল্লার বক্তৃতা শেষ হতেই রানী সুরাইয়া এগিয়ে এসে নাটকি ঢঙে হ্যাটের সামনের পর্দা ছিঁড়ে ফেললেন। কাবুল শহরের লোক সভাস্থলে আফগানিস্থানের রাজমহিষীর

মুখ দেখতে পেল।'

কর্মচারিটির রসবোধ অত্যন্ত কম, তাই বর্ণনাটা দিলেন নিতান্ত নীরস-নির্জলা। কিন্তু খুঁটিয়ে খুটিয়ে যে জিজ্ঞেস করব, তারও উপায় নেই। হয়ত ঘুঘু এসেছেন রিপোর্ট তৈরি করবার মতলব নিয়ে—ঘটনাটা ভারতবাসীর মনে কি রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, তাই হবে রিপোর্টের মশলা। আমিও 'পোকার' খেলার জুয়াড়ীর মত মুখ করে বসে রইলুম।

যাবার সময় বললেন, 'এরকমধারা ড্রামাটিক কায়দায় পর্দা ছেঁড়ার কি প্রয়োজন ছিল? রয়েসয়ে করলেই ভালো হত না?'

আমি মনে মনে বললুম, 'ইংরেজের সনাতন পন্থা। সব কিছু রয়েসয়ে। সব কিছু টাপেটোপে। তা সে ইংরিজী লেখাপড়া চালানোই হোক, আর ঢাকাই মসলিনের বুক ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করাই হোক। ছুঁচ হয়ে ঢুকবে, মুষল হয়ে বেরবে।'

কিছু একটা বলতে হয়। নিবেদন করলুম, 'এসব বিষয়ে এককালে ভারতবাসী মাত্রই কোনো না কোনো মত পোষণ করত। কারণ তখনকার দিনে আফগানিস্থান ভারতবর্ষের মুখের দিকে না তাকিয়ে কোনো কাজ করত না, কিন্তু এখন আমান উল্লা নিজের চোখে সমস্ত পশ্চিম দেখে এসেছেন, রাস্তা তাঁর চেনা হয়ে গিয়েছে; আমরা একপাশে দাঁড়িয়ে শুধু দেখব, মঙ্গল কামনা করব, ব্যস।'

কর্মচারী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে ভাবলুম।

কিন্তু একটা কথা এখানে আমি আমার পাঠকদের বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি এবং কাবুলের আর পাঁচজন তখন আমান উল্লার এসব সংস্কার নিয়ে দিনরাত মাথা ঘামাইনি। মানুষের স্বভাব আপন ব্যক্তিগত সুখদুঃখকে বড় করে দেখা—হাতের সামনের আপন মুঠি হিমালয় পাহাড় ঢেকে রাখে। দ্বিতীয়ত যে-সব সংস্কার করা হচ্ছিল তার একটাও আমার মত পাঁচজনের স্বার্থকে স্পর্শ করেনি। সুট সঙ্গে নিয়েই আমরা কাবুল গিয়েছি, কাজেই সুট পরার আইন আমাদের বিচলিত করবে কেন; আর আমরা পাতলা নেটের ব্যবসাও করিনে যে, মহারানী তাঁর হ্যাটের নেট ছিঁড়ে ফেললে আমাদের দেউলে হতে হবে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, ইরান-আফগানিস্থানের বাদশা দেশের লোকের মাল-জানের মালিক। আর সকলেই জানে এই দুই বস্তুই অত্যন্ত 'ফানী'—নশ্বর। নশ্বর জিনিস এমনি যাবে অমনিও যাবে—বাদশাহের খামখেয়ালি নিমিত্তের ভাগী মাত্র। রাজা বাদশা তো আর গাধাখচ্চর নন যে, শুধু দেশের

মোট পিঠে করে বইবেন আর জাবর কাটবেন—তাঁরা হলেন গিয়ে তাজী ঘোড়ার জাত। দেশটাকে পিঠে নিয়ে যেমন হঠাৎ প্রগতির দিকে খামকা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটবেন, তেমনি কারণে অকারণে সোয়ারকে তুটো চারটে লাথি-চাটও মারবেন। তাই বলে তো আর ঘোড়ার দানাপানি বন্ধ করে দেওয়া যায় না।

কাজেই কাবুল শহরের লোকজন খাচ্ছে-দাচ্ছে ঘুমুচ্ছে, বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

এমন সময় আমান উল্লার প্রতিজ্ঞা যে—তিনি সব মেয়েদের বেপর্দায় বেরবার সাহায্য করবেন এক ভিন্নরূপ নিয়ে প্রকাশ পেল—শোনা গেল বাদশার হুকুম, কোনো স্ত্রীলোক যদি বেপর্দা বেরতে চায় তবে তার স্বামী যেন কোনো ওজর-আপত্তি না করে। যাদের আপত্তি আছে, তারা যেন বউদের তালাক দিয়ে দেয়। আর তারা যদি সরকারী চাকরী করে, তবে আমান উল্লা দেখে নেবেন। কি দেখে নেবেন? সেটা পষ্টাপষ্টি বলা হয়নি, তবে চাকরীটাও হয়ত বউয়ের সঙ্গে সঙ্গে একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সাধে কি আর বাঙলায় বলি, 'বিবিজান চলে যান লবে-জান করে।' শুধু বিবিজান চলে গেলে সুস্থ মানুষ—প্রেমিকদের কথা আলাদা—'লবে-জান' হবে কেন? সঙ্গে সঙ্গে চাকরীটা গেলে পর মানুষ অনাহারে 'লবে-জান' হয়।

মীর আসলম বললেন, 'গিন্নীকে গিয়ে বন্নু, 'ওগো চোখে সুরমা লাগিয়ে বে-বোরকায় কাবুল শহরে এট্টা রোঁদ মেরে এস।' বিশ্বাস করবে না ভায়া, বদনা ছুঁড়ে মারলে। তা জানো তো, মোল্লার পাগড়ি, বদনাটাই খেল টোল। আম্মো অবশ্যি টাল খেয়ে খেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম।'

আমি বললুম, 'হাঁ হাঁ জানি, পাগড়ি অনেক কাজে লাগে।'

মীর আসলম বললেন, 'ছাই জানো, বে করলে জানতে। বেয়াড়া বউকে তোমার তো আর বেঁধে রাখতে হয় না।'

আমি বললুম, 'বাজে কথা। বাঁধন আমান উল্লা ক্যাঁচ করে কেটে দিয়েছেন। আর ভালোই করেছেন, বউকে বেঁধে রাখতে হয় মনের শিকল দিয়ে, হৃদয়ের জিঞ্জির দিয়ে।'

মীর আসলম বললেন, 'হৃদয়মনের কথা ওঠে যেখানে তরুণ-তরুণীর ব্যাপার। ষাট বছরের বুড়ো ষোল বছরের বউকে কোন্ মনের শেকল দিয়ে বাঁধতে পারে বলো? সেখানে কাবিন-নামা, সর্বাঙ্গ-ঢাকাবোরকা, আর পাগড়ির ন্যাজ।'

আমি বললুম, 'তাতো বটেই।'

মীর আসলম বললেন, 'আমান উল্লা যে পর্দা ছেঁড়ার জন্য তন্বী লাগিয়েছেন,

তাতে জোয়ানদের কি? বেদনাটা সেখানে নয়। বুড়া সর্দারদের ভিতর চিংড়ি বউদের ঠেকাবার জন্য সামাল সামাল রব পড়ে গিয়েছে।'

আমি শুধালুম, 'তরুণীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছেন নাকি?'

তিনি বললেন, 'ভ্যালা রে বিপদ, আমাকে তুমি নওরোজের আকবর বাদশা ঠাওরালে নাকি? চিংড়িদের আমি চিনব কোত্থেকে? ইস্তক মেয়ে নেই, ছেলের বউও নেই। গিন্নীর বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু বয়স ভাঁড়িয়ে হাফ-টিকিট কেটেছেন, দেখলে বোঝা যায় শ' খানেক হবে।'

আমি বললুম, 'তবে কি বুড়োরা থামকা ভয় পেয়েছেন?'

মীর আসলম বললেন, 'শোনো। খুলে বলি। আমান উল্লার হুকুম শোনা মাত্র চিংড়িরা যদি লাফ দিয়ে উঠত, তবে বুড়োরাও না হয় তার একটা দাওয়াই বের করত; এই মনে করো তুমি যদি হঠাৎ তলোয়ার নিয়ে কাউকে হামলা করো, সেও কিছু একটা করবে। বীর হলে লড়বে, বকরীর কলিজা হলে ন্যাজ দেখাবে। কিন্তু এ তো বাপু তা নয়, এ হল মাথার ওপর ঝোলানো নাঙা তলোয়ার। চিংড়িরা হয়ত সব চুপ করে বসে আছে—রাস্তায় তো এখনো চাঁদের হাট বসেনি—কিন্তু এক একজন এক এক শ' খানা তলোয়ার হয়ে চাঁদির ওপর ঝুলে আছেন। চোখ দুটি বন্ধ করে একটিবার দেখে নাও, বাপু।'

শিউরে উঠলুম!

তেত্রিশ

একদিন সকালবেলা ঘুম ভাঙতে দেখি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরূপ মূর্তি। চেনা চেনা মনে হল অথচ যেন অচেনা। তার হাতের ট্রের দিকে নজর যেতে দেখি সেটা সম্পূর্ণ চেনা। তার উপরকার রুটি, মাখন, মামলেট, বাসি কাবাবও নিত্যিকার চেহারা নিয়ে উপস্থিত। ধূম দেখলে বহ্নির উপস্থিতি স্বীকার করতেই হয়; সকালবেলা আমার ঘরে এ রকমের ট্রে হাওয়ায় দুলতে পারে না, বাহক আবদুর রহমানের উপস্থিতি স্বীকার করতে হয়।

কিন্তু কী বেশভূষা! পাজামা পরেনি, পরেছে পাতলুন। কয়েদীদের পাতলুনের মত সেটা নেমে এসেছে হাঁটুর ইঞ্চি তিনেক নিচে; ঊরুতে আবার সে পাতলুন এমনি টাইট যে, মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসী নাইট সাটিনের

ব্রিচেস্ পরেছেন। শার্ট, কিন্তু কলার নেই। খোলা গলার উপর একটা টাই বাঁধা। গলা বন্ধ কোট, কিন্তু এত ছোট সাইজের যে, বোতাম লাগানোর প্রশ্নই ওঠে না—তাই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে শার্ট আর টাই। তু'কান ছোঁয়া হ্যাট, ভুরু পর্যন্ত গিলে ফেলেছে। দোকানে যে রকম হ্যাট-স্ট্যাণ্ডের উপর খাড়া করানো থাকে!

পায়ে নাগরাই, চোখে হাসি, মুখে খুশী।

আবতুর রহমানের সঙ্গে এক বছর ঘর করেছি। চটে গিয়ে মাঝে মাঝে তাকে হস্তীর সঙ্গে নানাদিক দিয়ে তুলনা করেছি, কিন্তু সে যে সম্পূর্ণ সুস্থ, তার মাথায় যে ছিট নেই সে বিষয়ে আমার মনে দৃঢ়প্রত্যয় ছিল। তাই চোখ বন্ধ করে বললুম, 'বুঝিয়ে বল।'

আমার যে খটকা লাগবে সে বিষয়ে সে সচেতন ছিল বলে বলল, 'দেরেশি পুশিদম'—অর্থাৎ 'সুট পরেছি।'

আমি শুধালুম, 'সরকারী চাকরী পেলে লোকে দেরেশি পরে; আমার চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ নাকি?'

আবতুর রহমান বলল, 'তওবা তওবা, আপনি সায়েব আমার সরকার, আমার রুটি দেনেওয়ালা।'

'তবে?'

'সকালবেলা রুটি কিনতে গেলে পর পুলিশ ধরলো। বলল, "বাদশার হুকুম আজ থেকে কাবুলের রাস্তায় পাজামা, কুর্তা, জোব্বা পরে বেরোনো বারণ—সবাইকে দেরেশি পরতে হবে।" আমার কাছ থেকে এক পাই জরিমানাও আদায় করল। রুটি কিনে ফেরাবার পথে আর তু'তিনটে পুলিশ ধরল। আপনার দোহাই পেড়ে কোনো গতিকে বাড়ি ফিরেছি। বাড়ির সামনে আমাদের পড়শী কর্নেল সায়েবের সঙ্গে দেখা, তিনি ডেকে নিয়ে এই দেরেশি দিলেন, আমাকে তিনি বড্ড স্নেহ করেন কিনা, আমিও তাঁর ফাইফরমাশ খেটে দিই।'

গুম্ হয়ে শুনলুম। শেষটায় বললুম, "দর্জির দোকানে তো এখন ভিড় হওয়ার কথা। তু'দিন বাদে গিয়ে তোমার পছন্দমত একটা দেরেশি করিয়ে নিয়ো।'

আবতুর রহমান হিসেবী লোক; বলল, 'এই তো বেশ।'

আমি বললুম, 'চুপ। আর তুপুরবেলা এক জোড়া বুট কিনে নিয়ো।'

আবতুর রহমান কলরব করে বলল, 'না হুজুর তার দরকার নেই। পুলিশের ফিরিস্তিতে বুটের নাম নেই।'

প্রথমটায় অবাক হলুম। পরে বুঝলুম ঠিকই তো ; লক্ষ্মণ না হয় সীতাদেবীর পায়ের দিকে তাকাতে পারেন—রাজাপ্রজায় তো সে সম্পর্ক নয় !

বললুম, 'চুপ। দুপুর বেলা কিনবে। আর দেখো, এবার হ্যাটটা খুলে ফেলো।'

আবদুর রহমান চুপ।

বললুম, 'খুলে ফেলো।'

আবদুর রহমান আস্তে আস্তে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, 'হুজুরের সামনে ?' তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ মনে পড়ল উত্তর আফগানিস্থান তুর্কিস্থানে মানুষ শয়তানের ভয় পেলে পাগড়ি খুলে ফেলে। শুধু-মাথা দেখলে নাকি শয়তান পালায়। তাই আবদুর রহমান ফাঁপরে পড়েছে। তখন মনে পড়ল যে, হৌস অব কমন্সে হ্যাট না পরা থাকলে কথা কইতে দেয় না। বললুম, 'থাক তাহলে তোমার মাথায় হ্যাট।'

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি শহর অন্যদিনের তুলনায় ফাঁকা। দেরেশির অভাবে লোকজন বাড়ি থেকে বেরতে পারেনি। পর্দা তুলে দেওয়াতে যেমন রাস্তাঘাটে মেয়েদের ভিড় বাড়ার কথা ছিল তেমনি দেরেশির রেওয়াজ এক নূতন ধরনের পর্দা হয়ে পুরুষদের হারেমবন্ধ করল।

যারা বেরিয়েছে তাদের দেরেশির বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। যত রকম ছেঁড়া নোংরা, শরীরের তুলনায় হয় ছোট নয় বড়, কোট-পাতলুন, প্লাস-ফোর, ব্রিচেস্ দিয়ে যত রকমের সম্ভব অসম্ভব খিচুড়ি পাকানো যেতে পারে তাই পরে কাবুল শহর রাস্তায় বেরিয়েছে—গোটা দশেক পাগলা গারদকে হলিউডের গ্রীনরুমে ছেড়ে দিলেও এর চেয়ে বিপর্যয় কাণ্ড সম্ভবপর হত না।

ইয়োরোপীয়রা বেরিয়েছে তামাশা দেখতে। আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল। আফগানিস্থানকে আমি কখনো পর ভাবিনি।

শহরতলী দিয়ে আমাকে কাজে যেতে হয়। সেখানে দেখি আরো কঠোর দৃশ্য। গ্রামের লাকড়ীওলা, সব্জীওলা, আণ্ডাওলা যেই শহরের চৌহদ্দির ভিতরে পা দেয় অমনি পুলিশ তাদের ধরে ধরে এক এক পাই করে জরিমানা করে। বেচারীদের কোনো রসিদ দেওয়া হয় না ; কাজেই দশ পা যেতে না যেতে তাদের কাছ থেকে অন্য পুলিশ এসে আবার নূতন করে জরিমানা আদায় করে। দুনিয়ার যত পুলিশ সেদিন কাবুলের শহরতলীতে জড়ো হয়েছে। খবর নিয়ে শুনলুম যারা এ সময়ে অফ্-ডিউটি তারাও উর্দি পরে পয়সা রোজকার করতে লেগে গিয়েছে—

জরিমানার পয়সা নাকি সরকারী তহবিলে জমা দেওয়ার কোনো বন্দোবস্ত করা হয়নি।

দিবাদ্বিপ্রহরে যে কাবুলী পুলিশ রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমনোতে রেকর্ড ব্রেক করতে পারে, তার ব্যস্ততা দেখে মনে হল, যেন তার বাস্তুবাড়িতে আগুন লেগেছে।

এ অত্যাচার ক'দিন ধরে চলেছিল বলতে পারিনে।

দুই সপ্তাহ ধরে দেশের খবরের কাগজ চিঠিপত্র পাইনি। খবর নিয়ে শুনলুম জলালাবাদ-কাবুলের রাস্তা বরফে ঢাকা পড়ায় মেল-বাস্ আসতে পারেনি ; দু'-একজন ফিস্‌ফিস্ করে বলল, রাস্তায় নাকি লুটতরাজও হচ্ছে। মীর আসলম সাবধান করে গেলেন যেন যেখানে সেখানে যা-তা প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করি।

অন্য কাজ শেষ হলে মেয়েদের ইস্কুলের হেডমিস্ট্রেস ও সেকেণ্ড মিস্ট্রেসকে আমি ইংরিজী পড়াতুম। আফগান মেয়েরা চালাক ; জানে যে ধনীর কাছ থেকে টাকা বের করা শক্ত, কিন্তু গরীবের দরাজ-হাত। জ্ঞানের বেলাতেও এই নীতি খাটবে ভেবে এই দুই মহিলা আমাকেই বেছে নিয়েছিলেন।

হেড মিস্ট্রেসের বয়স পঞ্চাশের উপর ; মাতৃভাষা বাদ দিলে জীবনে তিনি এই প্রথম ভাষা শিখছেন। কাজেই কাবুলের পাথরফাটা শীতেও তাঁকে আমি ইংরেজী বানান শেখাতে গিয়ে ঘেমে উঠতুম। ইংরিজী ভাষা শিখতে বসেছেন, কিন্তু ঐ এক বিষয় ছাড়া দুনিয়ার আর সব জিনিসে তাঁর কৌতূহলের সীমা ছিল না। বিশেষ করে মাস্টার মশায়ের বয়স কত, দেশ কোথায়, দেশের জন্য মন খারাপ হয় কিনা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতেই তাঁর বাধতো না। তবে খুব সম্ভব আমার এপেনডিক্সের সাইজ ও এ-জগতে আমার জন্মাবার কি প্রয়োজন ছিল, এ দুটো প্রশ্ন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেননি। আমার উত্তর দেবার কায়দাও ছিল বিচিত্র। আমার দেশ ? আমার দেশ হল **Bengal** বানানটা শিখে নিন, বি ই এন জি এ এল। উচ্চারণটাও শিখে নিন ; কেউ বলে বেন্‌গোল, আবার কেউ বলে বেঙোল। ঠিক তেমনি **France**—এফ আর—।' তিনি বলতেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি, তা বলুন তো, বাঙালী মেয়েরা দেখতে কি রকম ? শুনেছি তাদের খুব বড় চুল হয়, 'জুলফেবাঙাল' বলে একরকম তেল এদেশে পাওয়া যায়। আপনি কী তেল মাখেন ?' আমাদের দু'জনার এই চাপান-উতোরের মাঝখানে পড়ে ইংরেজী ভাষা

বেশী এগতে পারতো না, বিশেষ করে তিনি যখন আমাকে আমার মায়ের কথা জিজ্ঞেস করতেন। মায়ের কথা বলার ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে শট্‌কে শেখাবার এলেম আমার পেটে নেই।

সেকেণ্ড মিস্ট্রেসের বয়স কম—ত্রিশ হয় না হয়। দুটি বাচ্চার মা, থলথলে দেহ, খাঁদা নাক, মুখে এক গাদা হাসি, পরনে বারো মাস স্লিপওভার, লম্বা-হাতা ব্লাউজ আর নেভি ব্লু ফ্রক। কর্নেলের বউ, বুদ্ধিশুদ্ধি আছে আর আমি যখন কর্ত্রীর প্রশ্নের চাপে নাজেহাল হতুম, তখন তিনি মিটমিটিয়ে হাসতেন আর নিতান্ত বেয়াড়া প্রশ্নে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলে মাঝে মাঝে উদ্ধার করে দিতেন।

জোর শীত কিন্তু তখনো বরফ পড়েনি এমন সময় একদিন পড়াতে গিয়ে ঘরে ঢুকে দেখি কর্নেলের বউ বইয়ের উপর মুখ গুঁজে টেবিলে ঝুঁকে পড়েছেন আর কর্ত্রী তার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন। আমার পায়ের শব্দ শুনে কর্নেলের বউ ধড়মড় করে উঠে বসলেন। দেখি আর দিনের মত মুখের হাসির স্বাগতসম্ভাষণ নেই। চোখ দুটো লাল, নাকের ডগায় চামড়া যেন ছড়ে গিয়েছে।

এসব জিনিস লক্ষ্য করতে নেই। আমি বই খুলে পড়াতে আরম্ভ করলুম। দু'মিনিটও যায়নি হঠাৎ আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মাঝখানে কর্নেলের বউ দু'হাতে মুখ ঢেকে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললেন। আমি চমকে উঠলুম। কর্ত্রী শান্তভাবে তাঁর পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে থাকলেন, 'অধীর হয়ো না, অধীর হয়ো না। খুদাতালা মেহেরবান। বিশ্বাস হারিয়ো না, শান্ত হও।'

আমি চোখের ঠারে কর্ত্রীকে শুধালুম, 'আমি তাহলে উঠি ?'

তিনি ঘাড় নেড়ে যেতে বারণ করলেন। দু'মিনিট যেতে না যেতে আবার কান্না, আবার সান্ত্বনা; আমি যে সে অবস্থায় কি করব ভেবেই পাচ্ছিলুম না। কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে যা বলছিলেন তার থেকে গোড়ার দিকে মাত্র এইটুকু বুঝলুম যে, তিনি তাঁর স্বামীর অমঙ্গল চিন্তা করে দিশেহারা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু ভালো করে কিছু বলতে গেলেই কর্ত্রী বাধা দিয়ে তাঁকে ওসব কথা তুলতে বারণ করছিলেন। বুঝলুম যে, অমঙ্গল চিন্তা সম্পূর্ণ অমূলক নয় এবং এমন সব কারণও তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে, সেগুলো প্রকাশ্যে বলা বাঞ্ছনীয় নয়।

কিন্তু তিনি তখন এমনি আত্মকর্তৃত্ব হারিয়ে বসেছেন যে, তাঁকে ঠেকানো মুশকিল। কখনও বলেন, 'শিনওয়ারীরা বর্বর জানোয়ার' কখনো বলেন, 'সাত দিন ধরে সরকারী কোনো খবর পাওয়া যায়নি', কখনো বলেন, 'শিনওয়ারীরা শহরে পৌঁছলে কোনো অফিসার পরিবারের রক্ষা নেই।'

জলালাবাদ অঞ্চলে লুঠতরাজ হচ্ছে আগেই গুজব হিসেবে শুনেছিলুম ; তার সঙ্গে এসব ছেঁড়াছেঁড়া খবর জুড়ে দিয়ে বুঝতে পারলুম যে, সে অঞ্চলে শিনওয়ারীরা বিদ্রোহ করে কাবুলের দিকে রওয়ানা হয়েছে, আমান উল্লা তাদের ঠেকাবার জন্য যে ফৌজ পাঠিয়েছিলেন সাতদিন ধরে তাদের সম্বন্ধে কোনো বিশ্বাস্য খবর পাওয়া যায়নি, আর কাবুলের অফিসার-মহলে গুজব, সে বাহিনীর অফিসাররা শিনওয়ারীদের হাতে ধরা পড়েছেন।

এত বড় দুঃসংবাদ ইংরিজী পড়ার চেষ্টা দিয়ে দমন করা অসম্ভব। আর আমি এসব সংবাদ জেনে ফেলেছি সেটাও কর্ত্রী আদপেই পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু কর্নেলের বউকে তিনি কিছুতেই ঠেকাতেও পারছিলেন না। শেষটায় আমি এক রকম জোর করে ওঠবার চেষ্টা করলে কর্নেলের বউ হঠাৎ চোখ মুছে বললেন, 'না, মুআল্লিম সাহেব, আপনি যাবেন না, আমি পড়াতে মন দিচ্ছি।'

এ রকম পড়া আমাকে যেন জীবনে আর না পড়াতে হয়। এবার যখন ভেঙে পড়লেন, তখন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললেন, 'বাদশা আমান উল্লার মত যারা গোঁপ রেখেছে তাদের ধরে ধরে উপরের ঠোঁট কেটে ফেলছে।' আমান উল্লা ঠিক নাকের তলায় একটুখানি গোঁফ রাখেন—সেই টুথ-ব্রাশ মুস্টাশ ফ্যাশান ফৌজী অফিসারদের ভিতর ছড়িয়ে পড়েছিল।

এবারে আমি একটু সান্ত্বনা দেবার সুযোগ পেলুম। বললুম, 'লড়াইয়ের সময় কত রকম গুজব রটে সে সব কি বিশ্বাস করতে আছে? আপনি অধীর হয়ে পড়েছেন তাই অমঙ্গল সংবাদ মাত্রই বিশ্বাস করছেন।'

আবার চোখ মুছে উঠে বসলেন। আমি যে পর-পুরুষ সে কথা ভুলে গিয়ে হঠাৎ আমার দু'হাত চেপে ধরে বললেন, 'মুআল্লিম সায়েব, সত্যি বলুন, আপনি কয় সপ্তাহ ধরে হিন্দুস্থানের চিঠি পাননি?'

হিন্দুস্থানের ডাক শিনওয়ারী অঞ্চল হয়ে কাবুলে আসে। তিন সপ্তাহ ধরে সে ডাক বন্ধ ছিল।

আমি উঠে দাঁড়ালুম। তাঁর চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললুম, 'আমি এ সপ্তাহেই দেশের চিঠি পেয়েছি।'

তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন দেখে আমি বললুম, 'আপনি তো আর পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে মেশেন না যে, হক খবর পাবেন। মেয়েরা স্বভাবতই একটুখানি বেশী ভয় পায়, আর নানারকম গুজব রটায়, তাই তো বাদশাহ আমান উল্লা পরদা পছন্দ করেন না।'

কর্ত্রী আমার সঙ্গে সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, 'যে সব খবর শুনলেন সেগুলো আর কাউকে বলবেন না।'

আমি বললুম, 'এসব খবর নয়, গুজব। গুজব রটালে শুধু কি আপনাদের বিপদ ? আমি বিদেশী, আমাকে আরো বেশী সাবধান থাকতে হয়।'

রাস্তায় বেরিয়ে একা হতেই বুঝলুম, মিথ্যা সান্ত্বনা দেবার বিড়ম্বনাটা কি। সেটা কাটাবার জন্য পাঞ্জাবী গ্রামোফোনওলার দোকানে ঢুকলুম। আমার গ্রামোফোন নেই, আমি রেকর্ড কিনিনে তবু 'দেশের ভাই শুকুর মুহম্মদ' বলে দোকানদার আমাকে সব সময় আদর-আপ্যায়ন করত। জিজ্ঞেস করলুম, 'মৌলানার বাঙলা রেকর্ডগুলো কলকাতা থেকে এসেছে ?'

দোকানদার বলল 'না', এবং ভাবগতিক দেখে বুঝলুম খোঁচাখুঁচি করলে কারণটা বলতেও তার বাধবে না। আমি কিন্তু তাকে না ঘাঁটিয়েই খানকয়েক রেকর্ড শুনে বাড়ি চলে এলুম।

কিন্তু ঘাঁটাঘাঁটি খোঁচাখুঁচি কিছুই করতে হল না। স্তরে স্তরে বরফ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নানারকম গুজব এসে কাবুলের বাজারে স্তূপীকৃত হতে লাগল। সে-বাজার অন্ন বিক্রয় করে অর্থের পরিবর্তে, কিন্তু সন্দেশ দেয় বিনামূল্যে এবং বিনামূল্যের জিনিস যে ভেজাল হবে তাতে আর আশ্চর্য হবার কি আছে ? খবরের চেয়ে গুজব রটল বেশী।

কিন্তু এ-বিষয়ে কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না যে, আমান উল্লা অস্ত্রবলে বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হননি, এখন যদি অর্থবলে কিছু করতে পারেন।

পূর্বেই বলেছি আফগানিস্থানের উপজাতি উপজাতিতে খুনোখুনি লড়াই প্রায় বারোমাস লেগে থাকে। সন্ধির ফলে কখনো কখনো অস্ত্রসংবরণ হলেও মিত্রতাহৃদ্যতার অবকাশ সেখানে নেই। কাজেই আফগান কূটনীতির প্রথম সূত্র : কোনো উপজাতি যদি কখনো রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তৎক্ষণাৎ সেই উপজাতির শত্রুপক্ষকে অর্থ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। যদি অর্থে বশ না হয়, তবে রাইফেল দেবে। রাইফেল পেলে আফগান পরমোৎসাহে শত্রুকে আক্রমণ করবে—কাষ্ঠ-রসিকেরা বলেন সে আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বন্দুকগুলোর তাগ পরীক্ষা করা।

কিন্তু এস্থলে দেখা গেল, বিদ্রোহের নীল-ছাপটা তৈরী করেছেন মোল্লারা এবং তাঁরা একথাটা সব উপজাতিকে বেশ করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, যদি কোনো উপজাতি 'কাফির' আমান উল্লার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তবে তারা তখন

দীন ইসলামের রক্ষাকর্তা। রাইফেল কিম্বা টাকার লোভে অথবা ঐতিহ্যগত সনাতন শত্রুতার স্মরণে তখন যারা আমান উল্লার পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়বে, তারাও তখন আমান উল্লার মতই কাফির। শুধু যে তারাই তখন দোজখে যাবে তা নয়, তাদের পূর্বতন অধস্তন চতুর্দশ পুরুষ যেন স্বর্গদ্বার দর্শন করবার আশা মনে পোষণ না করে।

এ বড় ভয়ঙ্কর অভিসম্পাত। ইহলোকে বক্ষলগ্ন থাকবে রাইফেল, পরলোকে হুরী, এই পুরুষ-প্রকৃতির উপর আফগান-দর্শন সংস্থাপিত। কোনোটাতেই চোট লাগলে চলবে না। কিন্তু প্রশ্ন আমান উল্লা কি সত্যই কাফির ?

এবারে মোল্লারা যে মোক্ষম যুক্তি দেখাল তার বিরুদ্ধে কোনো শিনওয়ারী কোনো খুগিয়ানী একটি কথাও বলতে পারল না। মোল্লারা বলল, 'নিজের চোখে দেখিসনি আমান উল্লা গণ্ডা পাঁচেক কাবুলী মেয়ে মুস্তফা কামালকে ভেট পাঠিয়েছে ; তারা যে একরাত জলালাবাদ কাটিয়ে গেল, তখন দেখিসনি, তারা বেপর্দা বেহায়ার মতন বাজারের মাঝখানে গট্‌গট্‌ করে মোটর থেকে উঠল নামল ?'

কথা সত্যি যে, বিস্তর শিনওয়ারী খুগিয়ানী সেদিনকার হাটবারে জলালাবাদে এসেছিল ও সেখানে বেপর্দা কাবুলী মেয়েদের দেখেছিল। আরো সত্যি যে, গাজী মুস্তফা কামাল পাশা আফগান মোল্লাদের কাছ থেকে কখনো গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাননি।

তবু নাকি এক 'মূর্খ' বলেছিল যে, মেয়েরা তুর্কী যাচ্ছে ডাক্তারি শিখতে। শুনে নাকি শিনওয়ারীরা অট্টহাস্য করেছিল—'মেয়ে ডাক্তার! কে কবে শুনেছে মেয়েছেলে ডাক্তার হয়! তার চেয়ে বললেই হয়, মেয়েগুলো তুর্কীতে যাচ্ছে গোঁপ গজাবার জন্য!'

কে তখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবে যে, শিনওয়ারী মেয়েরাই বিনা পর্দায় ক্ষেতে-খামারে কাজ করে, কে বোঝাবে যে, বুড়ীদাদীমা যখন হলুদ-পট্টী বাঁধতে, কপালে জোঁক লাগাতে পুরুষের চেয়েও পাকাপোক্ত, তখন কাবুলী মেয়েরাই বা ডাক্তার হতে পারবে না কেন ? কিন্তু এ সব বাজে তর্ক, নিষ্ফল আলোচনা। আসল একটা কারণের উল্লেখ কেউ কেউ করেছিলেন। কিন্তু সেটা কতদূর সত্য, অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি। আমান উল্লা নাকি রাজকোষের অর্থ বাড়াবার জন্য প্রতি আফগানের উপর পাঁচ মুদ্রা ট্যাক্স বসিয়েছিলেন।

আমান উল্লা এ সব কথাই আস্তে আস্তে জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু আর পাঁচজনের মত তিনিও সেই ফার্সী বয়েৎটা জানতেন, সোনার রত্তিটুকু থাকলে

মানুষ মরা কুকুরকেও আদর করে। আমান উল্লা সব উজিরদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, উপজাতিকে ঘুষ দেওয়ার ব্যাপারে কে কি জানেন?

আমার বন্ধু আধ-পাগলা দোস্ত মুহম্মদ ভুল বলেননি; দেখা গেল অনেকেই অনেক কিছু জানেন, শুধু জানেন না, কোন্ উপজাতির সঙ্গে কোন্ উপজাতির শত্রুতা, কোন উপজাতির বড় বড় সর্দার উপস্থিত কারা, কাদের মধ্যস্থতায় তাদের কাছে গোপনে ঘুষ পাঠানো যায়, কোন্ মোল্লার কোন্ খুড়ো উপস্থিত কাবুলে যে তার উপর চোটপাট করলে দেশের ভাইপো শায়েস্তা হবেন—অর্থাৎ জানবার মত কিছুই জানেন না।

তখন অনাদৃত উপেক্ষিত প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী বৃদ্ধদের ডাকা হল—তাঁরা বললেন যে, গত দশ বৎসর ধরে তাঁরা কোনো প্রকার কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন না বলে আফগান উপজাতিদের সঙ্গে তাঁদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। রাজানুকম্পা বিগলিত হয়ে যে অর্থবারি তাঁদের পয়ঃপ্রণালী দিয়ে উপজাতিদের কাছে পৌঁছত, সে-সব পয়ঃপ্রণালী দশ বৎসরের অনাদরে জঞ্জালাবদ্ধ। এখন বন্যা ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

অনেক ভেবে-চিন্তে আমান উল্লা তাঁর ভগিনীপতি আলী আহমদ খানকে জলালাবাদে পাঠালেন। শিনওয়ারীদের টাকার বানে ভাসিয়ে নেবার জন্য সঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, কেউ বলে দশ লাখ, কেউ বলে বিশ লাখ।

শাস্ত্রের তর্কে, দর্শনের লড়াইয়ে দিশেহারা হলে ওমর খৈয়াম মৃৎপাত্র ভরে সুরা পান করতেন। সেই মাটির ভাঁড়ই নাকি তখন তাঁকে গভীরতম সত্যের সন্ধান দিত।

আমার মৃৎপাত্র আবদুর রহমান। তাকে সব খুলে বলে তার মতামত জানতে চাইলুম। গোড়ার দিকে সে আমাকে রাজনৈতিক আলোচনা করতে বারণ করত, কিন্তু শিনওয়ারী বিদ্রোহের পাকাপাকি খবর শহরে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে রাজার গল্প গল্পের রাজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আবদুর রহমান বরফের জহুরী, আর সেই বরফই তার মাপকাঠি। সে বলল, 'নানা লোকে নানা কথা কয়, তার হিসেব-নিকেশ আমি করব কি করে? কিন্তু একটা কথা ভুলবেন না, হুজুর, এই বরফ ভেঙে শিনওয়ারীরা কিছুতেই কাবুল পৌঁছতে পারবে না। ওদের শীতের জামা নেই। বরফ গলুক, তারপর দেখা যাবে।' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তাই বুঝি প্রবাদ, কাবুল স্বর্ণহীন হোক আপত্তি নেই, কিন্তু বরফহীন যেন না হয়!'

ভেবে দেখলুম আবদুর রহমান কিছু অন্যায় বলেনি। ইতিহাসে দেখেছি,

বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা দেশের বিদ্রোহবিপ্লবও ছেঁড়া কাঁথা গায়ে টেনে দিয়ে 'নিদ্রা যায় মনের হরিষে' !

চৌত্রিশ

এমন সময় যা ঘটল তার জন্য কেউ তৈরী ছিলেন না ; প্রবীণ অর্বাচীন কারো কোনো আলোচনায় আমি এ ব্যাপারে কোনো আভাস ইঙ্গিত পাইনি।

বেলা তখন চারটে হবে। দোস্ত মুহম্মদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি রাস্তায় তুমুল কাণ্ড। দোকানীরা দুদ্দাড় করে দরজাজানলা বন্ধ করছে, লোকজন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটোছুটি করছে, চতুর্দিকে চিৎকার, 'ও ভাই কোথায় গেলি', 'ও মামা শিগগির এসো'। লোকজনের ভিড়ের উপর দিয়ে টাঙ্গাওয়ালারা খালি গাড়ি, বোঝাই গাড়ি এমনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে চালিয়েছে যে, আমার চোখের সামনে একখানা গাড়ি হুড়মুড়িয়ে কাবুল নদীর বরফের ওপর গিয়ে পড়ল, কেউ ফিরে পর্যন্ত তাকাল না।

সব কিছু ছাপিয়ে মাঝে মাঝে কানে চিৎকার পেঁছিয়, 'বাচ্চায়ে সকাও আসছে, বাচ্চায়ে সকাও এসে পড়ল।' এমন সময় গুড়ুম করে রাইফেলের শব্দ হল। লক্ষ্য করলুম শব্দটা শহরের উত্তর দিক থেকে এল। সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য জনতা যেন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল। যাদের হাতে কাঁধে বোঁচকা-বুঁচকি ছিল তারা সেগুলো ফেলে দিয়ে ছুটলো, একদল রাস্তার পাশে নয়ানজুলিতে নেমে গেছে, অন্য দল কাবুল নদীতে জমে-যাওয়া জলের উপর ছুটতে গিয়ে বারে বারে পিছলে পড়ছে। রাস্তার পাশে যে অন্ধ ভিখারী বসতো সে দেখি উঠে দাঁড়িয়েছে, ভিড়ের ঠেলায় এদিক ওদিক টাল খাচ্ছে আর দু'হাত শূন্যে তুলে সেখানে যেন পথ খুঁজছে।

আমি কোনো গতিকে রাস্তা থেকে নেমে, নয়ানজুলি পেরিয়ে এক দোকানের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালুম। স্থির করলুম, বিদ্রোহ বিপ্লবের সময় পাগলা ঘোড়ার চাট খেয়ে অথবা ভিড়ের চাপে দম বন্ধ হয়ে মরব না ; মরতে হয় মরব আমার হিস্যার গুলী খেয়ে।

এক মিনিট যেতে না যেতে আরেক ব্যক্তি এসে জুটলেন। ইনি ইটালিয়ান 'কলোনেল্লো' অর্থাৎ কর্নেল। বয়স ষাটের কাছাকাছি, লম্বা করোগেটেড দাড়ি।

এই প্রথম লোক পেলুম যাকে ধীরেসুস্থে কিছু জিজ্ঞাসা করা যায়। বললুম,

'আমি তো শুনেছিলুম, ডাকাত-সর্দার বাচ্চায়ে সকাও আসবে আমান উল্লার হয়ে শিনওয়ারীদের সঙ্গে লড়বার জন্য। কিন্তু এ কী কাণ্ড?'

কলোনেল্লো বললেন, 'মনে হচ্ছে ভুল খবর। এ তো আসছে শহর দখল করবার জন্য।'

তাই যদি হয় তবে আমান উল্লার সৈন্যেরা এখনো শহরের উত্তর দিকে যাচ্ছে না কেন, এ রকম অতর্কিতে বাচ্চায়ে সকাও এসে পৌঁছলই বা কি করে, তার দলে কি পরিমাণ লোকজন, শুধু বন্দুক না কামান-টামান তাদের সঙ্গে আছে —এ সব অন্য কোনো প্রশ্নের উত্তর কলোনেল্লো দিতে পারলেন না। মাঝে মাঝে শুধু বলেন, 'কী অদ্ভুত অভিজ্ঞতা!'

আমি বললুম, 'সাধারণ কাবুলী যে ভয় পেয়েছে সে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কিন্তু ইয়োরোপীয়ানরা এদের সঙ্গে জুটল কেন? এরা যাচ্ছে কোথায়?'

কলোনেল্লো বললেন, 'আপন আপন রাজদূতাবাসে আশ্রয়ের সন্ধানে।'

ততক্ষণে বন্দুকের আওয়াজ বেশ গরম হয়ে উঠেছে—ভিড়ও দেখলুম ঢেউয়ে ঢেউয়ে যাচ্ছে, একটানা স্রোতের মত নয়। দুই ঢেউয়ের মাঝখানে আমি কলোনেল্লোকে বললুম, 'চলুন বাড়ি যাই।' তিনি বললেন যে, শেষ পর্যন্ত না দেখে তিনি বাড়ি যাবেন না। মিলিটারি খেয়াল, তর্ক করা বৃথা।

বাড়ির দোরের গোড়ায় দেখি আবদুর রহমান। আমাকে দেখে তার দুশ্চিন্তা কেটে গেল। বাড়ি ঢুকতেই সে সদর দরজা বন্ধ করে তার গায়ে এক গাদা ভারী ভারী পাথর চাপাল। বিচক্ষণ লোক, ইতিমধ্যে দুর্গ রক্ষা করার যে বন্দোবস্তের প্রয়োজন সেটুকু সে করে নিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'বেনওয়া সাহেব কোথায়?' বললো, তিনি মাত্র একটি সুটকেস নিয়ে টাঙ্গায় করে ফ্রেঞ্চ লিগেশনে চলে গিয়েছেন।

ততক্ষণে বন্দুকের শব্দের সঙ্গে মেশিনগানের একটানা ক্যাট্‌ক্যাট্ যোগ দিয়েছে। আবদুর রহমান চা নিয়ে এসেছিল। কান পেতে শুনে বলল, 'বাদশার সৈন্যেরা গুলি আরম্ভ করেছে। বাচ্চা মেশিনগান পাবে কোথায়?'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'বাদশার সৈন্যেরা কি এতক্ষণে বাচ্চার মুখোমুখি হল? তবে কি সে বিনা বাধায় কাবুলে পৌঁছল?'

আবদুর রহমান বলল, 'দোরের গোড়ায় দাঁড়িয়ে অনেককেই তো জিজ্ঞেস করলুম, কেউ কিছু বলতে পারল না। বোধ হচ্ছে বাচ্চা বিনা বাধায়ই এসেছে। ওর দেশ হল কাবুলের উত্তর দিকে, আমার দেশ পানশির—তারও উত্তরে।

ওদিকে কোনো বাদশাহী সৈন্যের আনাগোনা হলে আমি দেশের লোকের কাছে থেকে বাজারে খবর পেতুম। বাদশাহী সৈন্যের সবাই তো এখন পুব দিকে শিনওয়ারীদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়েছে—আলী আহমদ খানের তাঁবেতে।

গোলাগুলি চলল। সন্ধ্যা হল। আবদুর রহমান আমাকে তাড়াতাড়ি খাইয়েদাইয়ে আগুনের তদারকিতে বসল। তার চোখমুখ থেকে আন্দাজ করলুম, সে কাবুলীদের মত ভয় পায়নি। কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলুম, বাচ্চা যদি জেতে তবে লুটতরাজ নিশ্চয় হবে এবং তাই নিয়ে আমার মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধে সে ঈষৎ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কিন্তু এ সব ছাপিয়ে উঠছে তার কৌতূহল আর উত্তেজনা—শহরে সার্কাস ঢুকলে ছেলেপিলেদের যে রকম হয়।

কিন্তু এই বাচ্চায়ে সকাওটি কে? আবদুর রহমানকে জিজ্ঞেস করতে হল না, সে নিজের থেকেই অনেক কিছু বলল এবং তার থেকে বুঝলুম যে, আবদুর রহমান বরফের জহুরী, ফ্রস্ট-বাইটের ওঝা, রন্ধনে ভীমসেন, ইন্ধনে নলরাজ, সব কিছুই হতে পারেন, কিন্তু বসওয়েল হতে এখনো তার ঢের দেরি। বাচ্চায়ে সকাও সম্বন্ধে সে যা বলল তার উপরে উত্তম রবিনহুড খাড়া করা যায়, কিন্তু সে বস্তু জলজ্যান্ত মানুষের জীবনী বলে চালানো অসম্ভব।

চোদ্দ আনা বাদ দেওয়ার পরও যেটুকু রইল তার থেকে বাচ্চার জীবনের এইটুকু পরিচয় পাওয়া গেল যে, সে প্রায় শ'তিনেক ডাকাতের সর্দার, বাসস্থান কাবুলের উত্তরদিকে কুহিস্তানে, ধনীকে লুটে গরীবকে পয়সা বিলোয়, আমান উল্লা যখন ইউরোপে ছিলেন তার পরাক্রম তখন এমনি বেড়ে গিয়েছিল যে, কাবুল-কুহিস্তানের পণ্য-বাহিনীর কাছ থেকে সে রীতিমত ট্যাক্স আদায় করত। আমান উল্লা ফিরে এসে কুহিস্তানের হাটে-বাজারে নোটিশ লাগান, "ডাকাত বাচ্চায়ে সকাওয়ের মাথা চাই, পুরস্কার পাঁচশ' টাকা"; বাচ্চা সেগুলো সরিয়ে পাল্টা নোটিশ লাগায়, "কাফির আমান উল্লার মাথা চাই, পুরস্কার এক হাজার টাকা।"

আবদুর রহমান জিজ্ঞেস করল, 'কর্নেলের ছেলে আমাকে শুধালো যে, আমি যদি আমান উল্লার মুণ্ডুটা কাটি, আর আমার ভাই যদি বাচ্চায়ে সকাওয়ের মুণ্ডুটা কাটে তবে আমরা দু'জনে মিলে কত টাকা পাব। আমি বললুম, দেড় হাজার টাকা। সে হেসে লুটোপুটি; বলল, এক পয়সাও নাকি পাব না। বুঝিয়ে বলুন তো, হুজুর, কেন পাব না?'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, 'কেউ জ্যান্ত নেই বলে তোমাদের টাকাটা মারা যাবে বটে, কিন্তু কর্নেলের ছেলেকে বলো যে, তখন আফগানিস্থানের তখৎ

তোমাদের পরিবারে যাবে।'

আরো শুনলুম, বাচ্চায়ে সকাও নাকি দিন দশেক আগে হঠাৎ জবলুস্-সিরাজের সরকারী বড় কর্তার কাছে উপস্থিত হয়ে কোরান ছুঁয়ে কসম খেয়েছিল যে, সে আমান উল্লার হয়ে শিনওয়ারীদের সঙ্গে লড়বে এবং সেই কসমের জোরে, শ'খানেক রাইফেল্স তাঁর কাছ থেকে বাগিয়ে নিয়ে ফের উধাও হয়ে গিয়েছিল।

তবে কি সেই বন্দুকগুলো নিয়েই বাচ্চার দল আমান উল্লাকে আক্রমণ করেছে? আশ্চর্য হবার কি আছে? আমান উল্লা যখন উপজাতিদের কাছ থেকে তোলা ট্যাক্সের পয়সায় ফৌজ পুষে তাদের কাবুতে রাখেন তখন বাচ্চাই বা আমান উল্লার কাছ থেকে বন্দুক বাগিয়ে তাঁকে আক্রমণ করবে না কেন?

রাত তখন বারোটা। আবদুর রহমান বলল, 'আজ আমি আপনার বসবার ঘরে শোব।'

আমি বললুম, 'তুমি তো ঠাণ্ডা ঘর না হলে ঘুমোতে পারো না। আমার প্রাণ রক্ষার জন্য তোমাকে এত দুর্ভাবনা করতে হবে না।'

আবদুর রহমান বলল, 'কিন্তু আমি অন্য ঘরে শুলে আমার বিপদ-আপদের খবর আপনি পাবেন কি করে? আমার জান বাবা আপনার হাতে সঁপে দিয়ে যাননি?'

কথাটা সত্যি। আবদুর রহমান আমার চাকরিতে ঢুকেছে খবর পেয়ে তার বুড়ো বাপ গাঁ থেকে এসে আমাকে তার জানের মালিক, স্বভাবচরিত্রের তদারকদার এবং চটে গেলে খুন করবার হক দিয়ে গিয়েছিল। আমি বুড়োকে খুশি করবার জন্য 'সিংহ ও মুষিকের' গল্প বলেছিলুম।

কিন্তু আবদুর রহমানের ফন্দিটা দেখে অবাক হলুম। সাক্ষাৎ নিউটন। এদিকে বাক্সে দুটো ফুটো করে দুটো বেরালের জন্য, অন্য দিকে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্বও আবিষ্কার করতে পারে—একদিকে কর্নেলের ছেলের ধাঁধায় বোকা বনে যায়, অন্য দিকে তর্কে বাঙালীকেও কাবু করে আনে।

আবদুর রহমান শুয়ে শুয়ে 'কতলে-আম্' অর্থাৎ পাইকারী খুনখারাবি লুটতরাজের যে বর্ণনা দিল তার থেকে বুঝলুম বাচ্চায়ে সকাও যদি শহর দখল করতে পারে তবে তার কোনোটাই বাদ যাবে না। চেঙ্গিস, নাদির রাজা-বাদশা হয়ে যখন এ পব করতে পেরেছেন তখন বাচ্চা ডাকাত হয়ে এ সব করবে না সে আশা দিদিমার রূপকথাতেও করা যায় না।

ইরান আফগানিস্থান চীন প্রভৃতি সভ্য দেশে সাজা দেওয়ার নানারকম বিদগ্ধ

পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দেওয়া, কোমর অবধি মাটিতে পুঁতে চতুর্দিক থেকে পাথর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করে মারা, পেট কেটে চোখের সামনে নাড়িভুঁড়ি বের করে করে মারা, জ্যান্ত অবস্থায় চামড়া তুলে মারা ইত্যাদি বহুতর কায়দার অনেক চাক্ষুষ বর্ণনা আমি শুনেছি। তার মধ্যে একটা হচ্ছে দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে লম্বা পেরেক দিয়ে দু'কান দেওয়ালের সঙ্গে গেঁথে দেওয়া। আবদুর রহমানের কাছ থেকে শোনা, সে অবস্থায়ও নাকি মানুষের ঘুম পায় আর মাথা বার বার ঝুলে পড়ে। তার তুলনায় রাইফেল-মেশিনগানের শব্দ, আর চেঙ্গিস নাদিরের কাহিনীস্মরণ ধূলি-পরিমাণ। কাজেই সেই অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়াটা বীর অথবা কাপুরুষ কোনো কিছুরই লক্ষণ নয়।

সকাল বেলা দেউড়ি খুলে দেখি শহরে মেলার ভিড়। কাবুল শহরের আশেপাশের গাঁ থেকে নানা রকম লোক এসে জড়ো হয়েছে, সুযোগসুবিধে পেলে লুটে যোগ দেবে বলে। অনেকের কাঁধেই বন্দুক, শীতের ভারী ভারী জামার ভিতর যে ছোরা-পিস্তলও আছে সেটাও অনায়াসে বোঝা গেল। আবদুর রহমানের বাধা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়লুম ব্যাপারটার তদারকতদন্ত করবার জন্য।

আর্ক কাবুল শহরের ভিতরকার বড় দুর্গ—হুমায়ুনের জন্ম এই আর্কের ভিতরেই হয়েছিল। আর্ক থেকে বড় রাস্তা বেরিয়ে এসে কাবুল নদীর পারে ঠেকেছে তাকেই কাবুলের চৌরঙ্গী বলা যেতে পারে। সেখানে দেখি একটা বড় রকমের ভিড় জমেছে। কাছে গিয়ে বুঝলুম কোনো এক বড় রাজকর্মচারী—অফিসারও হতে পারেন—কাবুল শহরের লোকজনকে বাচ্চার বিরুদ্ধে লড়বার জন্য সলা-মন্ত্রণা দিচ্ছেন।

"ওজার্ম সিতোআইয়াঁ"—"ধরো হাতিয়ার, ফ্রান্সের লোক, বাঁধো দল, বাঁধো দল" ধরনের ওজস্বিনী ফরাসিনী বক্তৃতা নয়—ভদ্রলোকের মুখ শুকনো, ফ্যাকাশে ঠোঁট কাঁপছে আর বিড় বিড় করে যা বলছেন দশ হাত দূর থেকে তা শোনা যাচ্ছে না।

টিমের কাপ্তান যে রকম প্র্যাকটিসের পূর্বে আঁটা আঁটা হকিস্টিক বিলোয় তেমনি গাদা গাদা দামী ঝকঝকে রাইফেল বিলোনো হচ্ছে। বলা নেই কওয়া নেই, যার যা ইচ্ছে এক-একখানা রাইফেল কাঁধে ঝুলিয়ে এদিক ওদিক চলে যাচ্ছে। শুধু লক্ষ্য করলুম উত্তর দিকে কেউই গেল না—অথচ লড়াই হচ্ছে সেই দিকেই।

রাইফেল বিলোনো শেষ হতেই ভদ্রলোক তড়িৎ গতিতে চলে গেলেন। বিপজ্জনক অবশ্য-কর্তব্য-কর্ম অর্ধসমাধান করে মানুষ যে রকম তড়িঘড়ি অকুস্থান

থেকে সরে পড়ে। তখন চোখে পড়ল তার পরনে পাজামা-কুর্তা-জুব্বা-পাগড়ি—দেরেশি নয়। তারপর চারদিকে তাকিয়ে দেখি কারো পরনেই দেরেশি নয়, আর সক্কলের মাথায়ই পাগড়ি। আমার পরনে সুট, মাথায় হ্যাট—অস্বস্তি বোধ হতে লাগল।

এমন সময় দেখি ভিড় ঠেলে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছেন মীর আসলম। কোনো কথা না কয়ে আমার কাঁধে হাত দিয়ে আমাকে বাড়ির দিকে টেনে নিয়ে চললেন—আমার কোনো প্রশ্নের উত্তরে মুখ না খুলে, কোনো কথায় কান না দিয়ে। বাড়ি পৌঁছতেই আমাদের তুজনকে দেখে আবদুর রহমান কি একটা বলে তিন লম্ফে বাড়ি থেকে রাস্তায় বেরোল।

মীর আসলম আমাকে বলতে আরম্ভ করলেন। এ কি তামাশা দেখার সময়, না, ইয়ার্কি করে ঘুরে বেড়াবার মোকা। তাও আবার দেরেশি পরে।

আমি শুধু বললুম, 'কি করে জানব বলুন যে, দেরেশি পরার আইন মকুব হয়ে গিয়েছে।'

মীরা আসলম বললেন, 'মকুব বাতিলের প্রশ্ন এখন কে শুধায় বাপু! যে কোনো মুহূর্তে বাচ্চায়ে সকাও শহরে ঢুকতে পারে। কাবুলীরা তাই দেরেশি ফেলে ফের 'মুসলমান' হয়েছে। দেখলে না ইস্তক সর্দার —খান জোব্বা পরে রাইফেল বিলোলেন?'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'সে কি কথা, রাজপরিবার পর্যন্ত ভয় পেয়ে দেশেরি ছেড়েছেন?'

মীর আসলম বললেন, 'উপায় কি বলো? বাদশাহী ফৌজ থেকে সৈন্যেরা সব পালিয়েছে। এখন আমান উল্লার একমাত্র ভরসা যদি কাবুল শহরের লোক রাইফেল বন্দুক নিয়ে বাচ্চাকে ঠেকাতে পারে। তাদের খুশী করার জন্য দেরেশি বর্জন করা হয়েছে।'

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'কিন্তু আপনিই তো বলেছিলেন রাজধানীর সৈন্যেরা কখনো বিদ্রোহ করে না।'

'বিদ্রোহ তারা করেনি। তারা সব পালিয়েছে। যাদের বাড়ি বহু দূরে, বরফ ভেঙে এখন যে সব জায়গায় পৌঁছনো যায় না, তারা এখনো শহরে গা-ঢাকা দিয়ে আছে। যারা নিতান্ত গা-ঢাকাও দিতে পারেনি, তারাই লড়তে গেছে, অন্ততঃ আমান উল্লার বিশ্বাস তাই। আসলে তারা দেহ্-আফগানানের পাহাড়ের গায়ে বসে চন্দ্রসূর্য তাগ করে গুলি ছুঁড়ছে। বাচ্চাকে এখনো ঠেকিয়ে রেখেছে

আমান উল্লার দেহরক্ষী খাস সৈন্যদল।'

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, 'কিন্তু মৌলানার বাসা তো দেহ্-আফগানানের পাহাড়ের গায়ে। চলুন, তাঁর খবর নিয়ে আসি।'

মীর আসলম বললেন, 'শান্ত হও। আমি সকালে সেদিকেই গিয়েছিলুম, কিন্তু মৌলানার বাড়ি পর্যন্ত পৌছতে পারিনি। সেখানে লড়াই হচ্ছে। আমি মোল্লা মানুষ—কাবুল শহর আমাকে চেনে। আমি যখন সেখানে পৌছতে পারিনি, তুমি যাবে কি করে?'

এ সংবাদ শুনে আমার মন থেকে অন্য সব প্রশ্ন মুছে গেল। চুপ করে বসে বসে ভাবতে লাগলুম, কিছু করার উপায় আছে কি না। মীর আসলম আমাকে বাড়ি থেকে বেরতে পই পই করে বারণ করে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে আবদুর রহমান একখানা নূতন রাইফেল নিয়ে উপস্থিত। চোখে মুখে খুশি উপচে পড়ছে। বলল, 'হুজুর, চট করে একখানা কাগজে লিখে দিন আপনার রাইফেল নেই। আমি আরেকটা নিয়ে আসি।' আমি তখন মৌলানার কথা ভাবছি—আমার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে আবদুর রহমান চলে গেল।

লুটপাট আরম্ভ হয়নি সত্য, কিন্তু হতে কতক্ষণ? সকাল বেলা যখন বেরিয়েছিলুম তখন কোথাও কোনো পুলিশ দেখতে পাইনি। রাজার দেহরক্ষীরা পর্যন্ত বাচ্চাকে ঠেকাতে গিয়েছে, এখন শহর রক্ষা করবে কে? আর এ-পরিস্থিতি আফগান ইতিহাসে কিছু অভিনব বস্তু নয়। বাবুর বাদশাহ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, কাবুল শহরে কোনো প্রকার অশান্তির উদ্ভব হলেই আশপাশের চোর-ডাকাত শহরের আনাচেকানাচে শিকারের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করত। মীর আসলম আবার আরেকটা সুখবর দিলেন যে, বাবুরের আমলে কাবুল আজকের চেয়ে অনেক বেশী সভ্য ছিল। অসম্ভব নয়, কারণ বাবুর লিখেছেন অশান্তির পূর্বাভাস দেখতে পেলেই তিনি রাস্তায় রাস্তায় সেপাই মোতায়েন করতেন; আমান উল্লা যে পারেননি সে তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

অবশ্য একটা সান্ত্বনার কথা হচ্ছে এই যে, কাবুলের বসতবাড়ি লুট করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেক বাড়ি দুর্গের মত করে বানানো—চারিদিকে উঁচু পাঁচিল, সেও আবার খানিকটা উঠে ভিতরের দিকে বেঁকে গিয়েছে—তাতে সুবিধে এই যে, মই লাগিয়ে ভিতরে লাফিয়ে পড়ার উপায় নেই। দেয়ালের গায়ে আবার এক সারি ছেঁদা; বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে সে ছেঁদা দিয়ে রাইফেল গলিয়ে নির্বিঘ্নে বাইরে গুলি চালানো যায়। বাড়িতে ঢোকার জন্য মাত্র একখানা

বড দরজা—সে দরজা আবার শক্ত ঝুনো কাঠে তৈরী, তার গায়ে আবার ফালি ফালি লোহার পাত পেরেক দিয়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে।

মোক্ষম বন্দোবস্ত। দুখানা রাইফেল দিয়ে পঞ্চাশজন ডাকাতকে অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখা যায়। কারণ যারা রাস্তা থেকে হামলা করবে তাদের কোনো আচ্ছাদন আবরণ নেই যার তলা থেকে রাইফেলের গুলি বাঁচিয়ে দেওয়াল ভাঙবার বা দরজা পোড়াবার চেষ্টা করতে পারে।

কিন্তু প্রশ্ন, এই ডিসেম্বরের শীতে সমস্ত রাত ছাদের উপর টহল দিয়ে নজর রাখবে কে? বড় পরিবার হলে কথা নেই; পালা দিয়ে পাহারা দেওয়া যায়, কিন্তু এস্থলে সেই প্রাচীন সমস্যা 'কাকা আর আমি একা, চোর আর লাঠি দু'জন'। বরঞ্চ তার চেয়েও খারাপ। চোর না হয়ে এরা হবে ডাকাত, হাতে লাঠি নয় বন্দুক—আর সংখ্যায় এদের নারায়ণী সেনা হতেও আপত্তি নেই।

এ অবস্থায় মৌলানা আর তাঁর তরুণী ভার্যাকে ডেকে আনি কোন্ বুদ্ধিতে? কিন্তু ওদিকে তাঁরা হয়তো রয়েছেন 'আণ্ডার দি ফায়ার' দুই ফৌজের মাঝখানে। স্থির করলুম, বেশী ভেবে কোনো লাভ নেই। মৌলানার পাড়ায় ঢুকবার সুযোগ পেলেই তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বলে নির্বাচনের ভারটা তাঁরই হাতে ছেড়ে দেব।

আবদুর রহমান খবর দিল, বাচ্চার ডাকুরা অ্যারোড্রাম দখল করে ফেলেছে বলে আমান উল্লার হাওয়াই জাহাজ উঠতে পারছে না।

আমি শুধালুম, 'কিন্তু আমান উল্লা বিদেশ থেকে যে সব ট্যাঙ্ক সাঁজোয়া গাড়ি এনেছিলেন সে সব কি হল?'

নিরুত্তর।

'কাবুল বাসিন্দাদের যে রাইফেল দেওয়া হল তারা লড়তে যায়নি?'

আবদুর রহমান যা বললো তার হুবহু তর্জমা বাঙলা প্রবাদে আছে। শুধু এ স্থলে উলুখড়ের দুখানা পা আছে বলে দু' রাজার মাঝখানে সে যেতে রাজী হচ্ছে না। আমি বললুম, 'তাজ্জবের কথা বলছ আবদুর রহমান, বাচ্চায়ে সকাও ডাকাত, সে আবার রাজা হল কি করে?' আবদুর রহমান যা বললো তার অর্থ, বাচ্চা শুক্রবার দিন মোল্লাদের হাত থেকে তাজ পেয়েছে, খুতবায় (আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে) তার নাম বাদশা হিসেবে পড়া হয়েছে, আমান উল্লা কাফির সে ফতোয়া প্রচারিত হয়েছে ও বাচ্চায়ে সকাও বাদশাহ হবীব উল্লা খান নাম ধারণ করে কাবুল শহর থেকে 'কাফির' আমান উল্লাকে বিতাড়িত করবার জন্য জিহাদ ঘোষণা করেছেন।

অদৃষ্টের পরিহাস! আমান উল্লার পিতার নাম হবীব উল্লা। আততায়ীর হস্তে নিহত হবীব উল্লার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা কি স্বীয় নামেই প্রতিহিংসার রক্ত অনুসন্ধান করছে!

সন্ধ্যার দিকে আবদুর রহমান তার শেষ বুলেটিন দিয়ে গেল; আমান উল্লার হাওয়াই জাহাজ কোনো গতিকে উঠতে পারায় বোমা ফেলেছে। বাচ্চার দল পালিয়ে গিয়ে মাইলখানেক দূরে থানা গেড়েছে।

পঁয়ত্রিশ

জনমানবহীন রাস্তা। অথচ শান্তির সময় এ-রাস্তা গমগম করে। আমার গা ছমছম করতে লাগল।

দুদিকের দোকান-পাট বন্ধ। বসত-বাড়ীর দেউড়ি বন্ধ। বাসিন্দারা সব পালিয়েছে না ঘুপটি মেরে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়েছে, বোঝবার উপায় নেই। যে-কুকুর-বেড়াল বাদ দিয়ে কাবুলের রাস্তার কল্পনা করা যায় না, তারা সব গেল কোথায়? যেখানে গলি এসে বড় রাস্তায় মিশেছে, সেখানে ডাইনে-বাঁয়ে উঁকি মেরে দেখি একই নির্জনতা। এসব গলি শীতের দিনেও কাচ্চাবাচ্চার চিৎকারে গরম থাকে, মানুষের কানের তো কথাই নেই, বরফের গাদা পর্যন্ত ফুটো হয়ে যায়। এখন সব নিঝ্ঝুম, নীরব। গলিগুলোর চেহারা এমনিতেই নোংরা থাকে, এখন জনমানবের আবরণ উঠে যাওয়াতে যেন সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে সর্বাঙ্গের ঘা-পাঁচড়া দেখাতে আরম্ভ করেছে।

শহরের উত্তরপ্রান্ত। পর্বতের সানুদেশ। মৌলানার বাড়ী এখনো বেশ দূরে। বাচ্চার একদল ডাকাত এদিকে আক্রমণ করেছিল। তারা সব পালিয়েছে, না আড়ালে বসে শিকারের অপেক্ষা করছে, কে জানে?

হঠাৎ দেখি দূরে এক রাইফেলধারী। আমার দিকে এগিয়ে আসছে। ডাইনে-বাঁয়ে গলি নেই যে ঢুকে পড়ব। দাঁড়িয়ে অথবা পিছন ফিরে লাভ নেই—আমি তখন মামুলী পাখী-মারা বন্দুকের পাল্লার ভিতরে। এগিয়ে চললুম। মনে হল রাইফেলধারীও আমাকে দেখতে পেয়েছে, কিন্তু আমাকে হাতিয়ারহীন দেখে কাঁধে ঝোলানো রাইফেল হাতে তোলার প্রয়োজন বোধ করেনি। দু'জনে মুখোমুখি হলুম, সে একবার আমার মুখের দিকে তাকালোও না। চেহারা দেখে

বুঝলুম, সে গভীর চিন্তায় মগ্ন। তবে কি আমারই মত কারো সন্ধানে গিয়েছিল, নিরাশ হয়ে ফিরছে ? কে জানে, কি ?

মৌলানার বাড়ী গলির ভিতরে। সেখানে পৌছনো পর্যন্ত দ্বিতীয় প্রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল না। কিন্তু এবারে নতুন বিপদ ; দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে হাতে কড়া পড়ে গেল—কোনো সাড়াশব্দ নেই। তবে কি মৌলানারা কেউ নেই ? অথবা সে শীতে দরজা-জানলা সব কিছু বন্ধ বলে কড়া নাড়া, আমার চিৎকার, কিছুই তাঁদের কানে পৌচচ্ছে না। কতক্ষণ ধরে চেঁচামেচি করেছিলুম বলতে পারব না, হঠাৎ আমার মনে আরেক চিন্তার উদয় হল। মৌলানা যদি গুম হয়ে গিয়ে থাকেন, আর তার বউ বাড়ীতে খিল দিয়ে বসে আছেন, স্বামীর গলা না শুনলে দরজা খুলবে না ; অথবা একা থেকে থেকে ভয়ে মূর্ছা গেছেন ? আমার গলা থেকে বিকৃত চিৎকার বেরতে লাগল। নিজের নাম ধরে পরিচয় দিয়ে চেঁচাচ্ছি, মনে হচ্ছে, এ আমার গলা নয়, আমার নাম নয়।

হঠাৎ শুনি মেঁয়াও ; জিয়াউদ্দীনের বেড়াল। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। মৌলানা। চোখ ফোলা, গাল এমনিতে ভাঙা—আরো বসে গিয়েছে। দুদিনে দশ বছর বুড়িয়ে গিয়েছেন।

বললেন, পরশুদিন প্রথম গোলমাল শুরু হতেই চাকরকে টাঙা আনতে পাঠিয়েছিলেন, সে এখনো ফেরেনি। পাড়ার আর সবাই পালিয়েছে। ইতিমধ্যে বাচ্চার সেপাই দুবার এ-রাস্তা দিয়ে নেমে এসে দুবার হটে গিয়েছে। স্বামী-স্ত্রী আল্লার হাতে জান সঁপে দিয়ে ডাকাতের হানার অপেক্ষা করছিলেন।

সে তো হল। কিন্তু এখন চল। এই নির্জন ভূতুড়ে পাড়ায় আর এক মুহূর্ত থাকা নয়। তখন মৌলানা যা বললেন, তা শুনে বুঝলুম, এ সহজ বিপদ নয়। তাঁর স্ত্রী আসন্নপ্রসবা। আমার বাড়ী পর্যন্ত হেঁটে যাবার মত অবস্থা হলে তিনি বহু পূর্বেই চলে আসতেন।

বললুম, 'তাহলে আর বসব না। টাঙার সন্ধানে চললুম।'

শহরে ফিরে এসে পাক্কা দু'ঘণ্টা এ-আস্তাবল, সে-বাগগীখানা অনুসন্ধান করলুম। একটা ঘোড়া দেখতে পেলুল না ; শুনলুম, ডাকাত এবং রেকুইজিশনের ভয়ে সবাই গাড়ী ফেলে ঘোড়া নিয়ে পালিয়েছে।

এখন উপায় ? একমাত্র উপায় আবদুর রহমানের গায়ের জোর। সে মৌলানার বউকে কোলে-কাঁধে করে বাড়ী নিয়ে আসতে পারবে নিশ্চয়ই কিন্তু—। নাঃ, এতে কোনো কিন্তু নেই। রাজী করাতেই হবে।

কিন্তু বাড়ী ফিরে যে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখলুম, তেমনটা জীবনে আর কখনো দেখিনি। আমার আঙ্গিনা যেন শান্তিনিকেতন লাইব্রেরির সামনের গৌর-প্রাঙ্গণ; বেনওয়া সায়েব আর মৌলানা নিত্যিকার মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছেন। আবদুর রহমানও সসম্ভ্রম গলা-খাঁকারি দিয়ে বোঝালো, 'পুরা বাঁধকে,—জনানা হ্যায়।'

জিয়াউদ্দীন বললেন যে, আমি চলে আসার ঘণ্টাখানেক পরেই নাকি তাঁর চাকর টাঙা নিয়ে উপস্থিত হয়। আনন্দের আতিশয্যে প্রশ্ন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করলুম না, এ-দুর্দিনে সে টাঙা পেল কোথায়।

তারপর তাকিয়ে দেখি, বেনওয়া সায়েবের গালে দু'দিনের দাড়ি, কোট-পাতলুন দুমড়ানো, চেহারা অধৌত। ভদ্রলোক ফরাসী, হামেশাই ফিটফাট থাকেন—শান্তিনিকেতনের সবাই জানে যে, বিদেশীদের মধ্যে একমাত্র তিনিই বাঙালী ফিটবাবুর মত ধুতি কুঁচিয়ে পরতে জানতেন, শুধু তাই নয়, বাঁ-হাত দিয়ে কোঁচাটি ডানদিকে টেনে নিয়ে খানিকটা উঁচুতে তুলে দরকার হলে হনহন করে হাঁটতেও পারতেন।

বললেন, পরশু দিন টাঙা ফরাসী লিগেশনে পৌঁছতে পারেনি—লিগেশন শহরের উত্তর দিকে বলে পাগলা জনতা উজিয়ে গাড়ী খানিকটে চলার পর গাড়ী-গাড়োয়ান দু'জনেই দিশেহারা হয়ে যায়; শেষটায় গাড়োয়ান সায়েবের কথায় কান না দিয়ে সোজা গ্রামের রাস্তা ধরে পুবদিকে তিন মাইল দূরে নিজের গাঁয়ে উপস্থিত হয়। সায়েব দু'রাত্তির একদিন গরীব চাষার গোয়াল-ঘরে না আর কোথাও লুকিয়ে কাটিয়েছেন। দু'চার ঘণ্টা অন্তর অন্তর নাকি গাড়োয়ান আর তার ভাই-বেরাদর গলার উপর হাত চালিয়ে সাহেবকে বুঝিয়েছে যে, কাবুল শহরের সব ফিরিঙ্গীকে জবাই করা হচ্ছে। বেনওয়া সায়েব ভালো সাহিত্যিক, কাজেই বর্ণনাটা দিলেন বেশ রসিয়ে রসিয়ে, আপন দুশ্চিন্তা-উদ্বেগটা ঢেকে-চেপে, কিন্তু চেহারা দেখে বুঝতে পারলুম যে, ১৯১৪-১৮ সালের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতার তুলনায় এ-অভিজ্ঞতার মূল্য তিনি কিছু কম দেননি।

মৌলানা বললেন, 'সায়েব, বড় বেঁচে গেছেন; গাঁয়ের লোক যে আপনার গলা কেটে 'গাজী' হবার লোভ সম্বরণ করতে পেরেছে, সেই আমাদের পরম সৌভাগ্য।'

বেনওয়া বললেন, 'চেষ্টা হয়নি কি না বলতে পারব না। যখনই দেখেছি দু'তিনজন মিলে ফিসফাস করছে, তখনই সন্দেহ করেছি, আমাকে নিয়েই বুঝি

কথাবার্তা হচ্ছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস বাড়ীওয়ালা আমাকে অতিথি হিসেবে ধরে নিয়ে আমার প্রাণ বাঁচানো নিজের কর্তব্য বিবেচনা করে আর পাঁচজনকে ঠেকিয়ে রেখেছিল।'

আমি বললুম, 'আমি কাবুলের গাঁয়ে এক বছর কাটিয়েছি, আমার বিশ্বাস, কাবুল উপত্যকার সাধারণ চাষা অত্যন্ত নিরীহ। পারতপক্ষে খুন-খারাবি করতে চায় না।'

বেনওয়া সায়েব বেশভূষা পরিবর্তন করে আপন লিগেশনে চলে গেলেন।

আমি মৌলানাকে বললুম, 'দেখলে? ফরাসী, জর্মন, রুশ, তুর্ক, ইরানী, ইতালী সবাই আপন আপন লিগেশনে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে। শুধু তোমার আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।'

মৌলানা বললেন, 'বৃটিশ লিগেশন বৃটিশের জন্য—বাঙলা কথা। যদিও লিগেশন তৈরী ভারতীয় অর্থে, চলে ভারতের পয়সায়, ইস্তেক হিজ ব্রিটানিক ম্যাজেস্টিস মিনিস্টার লেফটেনাণ্ট কর্নেল স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিস নুন খান ভারত সরকারের।'

আমি বললুম, 'বিস্তর নুন; মাসে তিন চার হাজার টাকার।'

দু'জনেই একবাক্যে স্বীকার করলুম যে, পরাধীন দেশের অবমাননা লাঞ্ছনা বিদেশ না গেলে সম্যক হৃদয়ঙ্গম হয় না।

জর্মন কবি গ্যোটে বলেছেন, যে বিদেশ যায়নি, সে স্বদেশের স্বরূপ চিনতে পারেনি।

ছত্রিশ

চারদিন অরাজকতার ভিতর দিয়ে কাটল। কনফুৎসিয় বলেছেন, 'বাঘ হতে ভয়ঙ্কর অরাজক দেশ', আমি মনে মনে বল্‌লুম, 'তারও বাড়া হবে ডাকু পরে রাজবেশ।'

আমান উল্লা বসে আছেন আর্কের ভিতরে। তাঁর চেলা-চামুণ্ডারা শহরের লোককে সাধ্য-সাধনা করছে বাচ্চার সঙ্গে লড়াই করবার জন্য। কেউ কান দিচ্ছে না। শহর চোরডাকাতে ভর্তি। যেসব বাড়ী পাকাপোক্ত মাল দিয়ে তৈরি নয়,

সেগুলো লুট হচ্ছে। একটুখানি নির্জন রাস্তায় যাবার জো নেই—ওভারকোটের লোভে শীত-কাতুরে ফিচকে ডাকাত সব কিছু করতে প্রস্তুত। টাকার চেয়েও ডাকাতের লোভ ঐ জিনিসের উপর—কারণ টাকা দিয়েও কোনো কিছু কেনার উপায় নেই। হাট বসছে না বলে দুধ, মাংস, আলু, পেঁয়াজ কিছুই কেনা যাচ্ছে না। গম-ডালের মুদীও গ্যাঁট হয়ে বসে আছে, দাম চড়বার আশায়—কাবুল শহর বাকি দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

শ্বেতাঙ্গরা রাস্তায় বেরচ্ছে না; একমাত্র রুশ পাইলটরা নির্ভয়ে শহরের মাঝখান দিয়ে ভিড় ঠেলে বিমানঘাঁটিতে যাওয়া-আসা করছে। হাতে রাইফেল পর্যন্ত নেই, কোমরে মাত্র একটি পিস্তল।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য হলুম খাস কাবুল বাসিন্দাদের ব্যবহার দেখে। রাইফেল ঝুলিয়েছে কাঁধে, বুলেটের বেল্ট বেঁধেছে কোমরে, কেউ পরেছে আড়াআড়ি করে পৈতের মত বুকের উপরে, কেউ বা বাজুবন্ধ বানিয়ে বাহুতে, কেউ কাঁকন করে কব্জীতে, দু'একজন মল করে পায়ে!

যে অস্ত্র বিদ্রোহী, নরঘাতক, দস্যুর বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য দীন আফগানিস্থান নিরন্ন থেকে ক্রয় করেছিল, সে আজ অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত হল!

কিন্তু আশ্চর্য, নগরী রক্ষা করাতে এদের কোনো উৎসাহ নেই? দস্যু জয়লাভ করলে লুণ্ঠিত হবার ভয় নেই, প্রিয়জনের অপমৃত্যুর আশঙ্কা সম্বন্ধে এরা সম্পূর্ণ উদাসীন, সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা এদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি?

মীর আসলম কানে কানে বললেন, তিনি খবর পেয়েছেন, কাবুলের বড় বড় মহল্লার সর্দার আর বাচ্চার ভিতরে গোপনে বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে যে, কাবুলীরা যদি আমান উল্লার হয়ে না লড়ে, তবে বাচ্চা শহর লুট করবে না।

কথাগুলো যীশুখ্রীষ্টের করাঙ্গুলি হয়ে আমার অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দিল। মীর আসলমের খবর সত্য বলে ধরে নিলে কাবুলবাসীর নির্বিকল্প সমাধির চূড়ান্ত সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু হায়, অস্ত্রবলে হীন, অর্থ-সামর্থ্যে দীন যে রাজা শুদ্ধ সাহসের বলে বিশ্বরাজ ইংরেজকে পরাজিত করে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করলেন, অনুর্বর অনুন্নত দেশকে যে রাজা প্রগতিপথে চালিত করবার জন্য আপন সুখ-শান্তি বিসর্জন দিলেন, বিশ্বের সম্মুখে যে নরপতি আপন দেশের মুখোজ্জ্বল করলেন তাঁকে বর্জন করে কাবুলের লোক বরণ করল ঘৃণ্য নীচ দস্যুকে? একেই কি বলে কৃতজ্ঞতা, নিমকহালালি?

তবে কি আমান উল্লা 'কাফির'?

মীর আসলম গর্জন করে বললেন, 'আলবৎ না; যে-রাজা প্রজার ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না, নমাজ, রোজা যিনি বারণ করেননি, হজে যেতে জকাত দিতে যিনি বাধা দেননি, তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা মহাপাপ, তাঁর শত্রুর সঙ্গে যোগ দেওয়া তেমনি পাপ। পক্ষান্তরে বাচ্চায়ে সকাও খুনী ডাকাত—ওয়াজিবউল-কৎল্, কতলের উপযুক্ত। সে কস্মিন্‌কালেও আমীর-উল-মুমিনীন (বাদশা) হতে পারে না।'

মীর আসলম বহু শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত। আমার বিবেকবুদ্ধিও তাঁর কথায় সায় দিল। তবু বললুম, 'কিন্তু আপনি আবার কবে থেকে আমান উল্লার খয়ের খাঁ হলেন?'

মীর আসলম আরো জোর হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'আমি যা বলেছি, তা সম্পূর্ণ নেতিবাচক। আমি বলি, আমান উল্লা কাফির নয়। তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না-জায়িজ—অশাস্ত্রীয়।'

নাস্তিক রাশান রাজদূতাবাসে গিয়ে শুনি সেখানেও ঐ মত। দেমিদফকে বললুম, 'রেভলিউশন আরম্ভ হয়েছে।' তিনি বললেন, 'না, রেবেলিয়ন।' আমি শুধালুম, 'তফাৎটা কি?' বললেন 'রেভলিউশন প্রগতিকামী, রেবেলিয়ন প্রগতিপরিপন্থী।'

ভাবলুম মীর আসলমকে এ-খবরটা দিলে তিনি খুশী হবেন। বুড়ো উল্টে গম্ভীর হয়ে বললেন, 'সমরকন্দ বুখারার মুসলিমদের উচিত রুশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। রুশ সরকার তাদের মক্কায় হজ করতে যেতে দেয় না।'

খামখেয়ালি ছোটলাটের আশু আগমন সংবাদ শুনে যে রকম গাঁয়ের পণ্ডিত হতবুদ্ধি হয়ে যান, মৌলানা আর আমি সেই রকম একে অন্যের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাই। মৌলানার বউ যে-বড়লাটকে নিমন্ত্রণ করে বসে আছেন, তিনি কোন্ দিন কোন্ গাড়ীতে কি কায়দায় আসবেন, তাঁকে কে অভ্যর্থনা করবেন, তিনি এলে তাঁকে কোথায় রাখতে হবে, কি খাওয়াতে পরাতে হবে, সে সম্বন্ধে কোনো প্রকারের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার সুযোগ আমাদের কারো হয়নি—মৌলানার বউও কিছুই জানেন না; তাঁর এই প্রথম বাচ্চা হচ্ছে।

শুনেছি আফগান মেয়েরা ক্ষেতের কাজ খানিকক্ষণের জন্য ক্ষান্ত দিয়ে গাছের আড়ালে গিয়ে সন্তান প্রসব করে—আসন্নপ্রসবার জন্য আফগান পণ্যবাহিনীও নাকি প্রতীক্ষা করে না। সে নাকি বাচ্চা কোলে করে একটু পা চালিয়ে

পণ্যবাহিনীতে আবার যোগ দেয়। মৌলানার বউ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, তাঁর কাছ থেকে এরকম কসরৎ আশা করা অন্যায়। লক্ষণ দেখেও আমরা ঘাবড়ে গেলুম। কিছু খেতে পারেন না, রাত্তিরে ঘুম হয় না, সমস্ত দিন ঢুলুঢুলু চোখ, মৌলানাকে এক মিনিটের তরে সেই ঢুলুঢুলু চোখের আড়াল হতে দেন না।

অন্যের প্রাণহরণ করা ব্যবসা হলেও নিজের প্রাণ দেবার বেলা সব মানুষের একই আচরণ। ডাক্তার কিছুতেই বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরতে রাজী হল না। সেদিন তাকে যা সাধ্য-সাধনা করেছিলুম, তার অর্ধেক তোষামোদে কালো ভঙ্গজ মেয়ের জন্য বিনাপণে নিকষ্যি নটবর বর মেলে। বাড়ী ফেরার সময় সেদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলুম যে, মৌলানার যদি ছেলে হয়, তবে তাকে ডাক্তারি পড়াব। শ্মশান-বৈরাগ্যের মত এ হল শ্মশান-প্রতিজ্ঞা।

সিভিল সার্জন যে রকম গরীব রোগীর অর্থ-সামর্থ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আড়াই গজী প্রেসক্রিপশন ঝেড়ে যান, কাবুলী ডাক্তার তেমনি পথ্যির ফিরিস্তি আউড়ে গেলেন। শুনে ভয় পেয়ে মৌলানা আর আমি খাটের তলায় আশ্রয় নিলুম। চারদিন ধরে খাচ্ছি রুটি, দাল আর বিন-দুধ চা—এ দুর্দিনে স্বয়ং আমান উল্লা ওসব ফেন্সি পথ্যি যোগাড় করতে পারবেন না। দুধ! আঙুর!! ডিম!!! বলে কি? পাগল, না মাথা খারাপ?

আবদুর রহমান সবিনয় নিবেদন করল, সন্ধ্যার সময় তাকে একটা রাইফেল আর দু'ঘণ্টার ছুটি দিলে সে চেষ্টা করে দেখতে রাজী আছে। ডাকাতিতে আমার মরাল অবজেকশন নেই—যস্মিন দেশাচার, তদুপরি প্রবাসে নিয়ম নাস্তি—কিন্তু সব সময় সব ডাকাত তো আর বাড়ী ফেরে না। যদি আবদুর রহমান বাড়ী না ফেরে? তবে যে বাড়ী অচল হয়ে যাবে।

এখনও মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি বাচ্চায়ে সকাও যেন ডাক্তারের বেশ পরে স্টেথসস্কোপ গলায় ঝুলিয়ে নাঙ্গা তলোয়ার হাতে করে আমাকে বলছে, 'হয় দাও আঙুর, না হয় নেব মাথা।'

সাঁইত্রিশ

চারদিনের দিন আবদুর রহমান তার দৈনিক বুলেটিনের এক বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে খবর জানালো, বাচ্চা মাইল দশেক হটে গিয়েছে। দিন দশেকের ভিতর শহরের ইস্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত খুলল।

আমান উল্লা দম ফেলবার ফুরসৎ পেলেন।

কিন্তু বাচ্চাকে তাড়াতে পেরেও তিনি ভিতরে ভিতরে হার মেনেছেন। দেরেশির আইন নাকচ করে দেওয়া হয়েছে, মেয়ে স্কুল বন্ধ করা হয়েছে আর রাস্তা-ঘাট থেকে ফ্রক-ব্লাউজ সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। যে সব মেয়েরা এখন রাস্তায় বেরোন তারা পরেন সেই তাম্বু ধরণের বোরকা। হ্যাট পরার সাহস আর পুরুষ স্ত্রীলোক কারো নেই—হয় পাগড়ি, নয় পশমের টুপি। যেসব স্কুল-কলেজের ছাত্রেরা এই ডামাডোলের বাজারে পালিয়েছিল তাদের ধরে আনবার কোনো চেষ্টা করা হল না—করার উপায়ও ছিল না, কারণ পুলিশের দল তখনো ‘ফেরার’, আসামী ধরবে কে?

মৌলানা বললেন, ‘সবসুদ্ধ মিলিয়ে দেখলে বলতে হবে ভালোই হয়েছে। আমান উল্লা যদি এ যাত্রা বেঁচে যান তবে বুঝতে পারবেন যে দেরেশি চাপানো, পর্দা তুলে দেওয়া আর বৃহস্পতিবারে ছুটির দিন করা এই অনুন্নত দেশের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার নয়। বাকি রইল শিক্ষাবিস্তার আর শিল্পবাণিজ্যের প্রসার—এবং এ দুটোর বিরুদ্ধে কখনো কেউ কোনো আপত্তি তোলেনি। বিপদ কাটার পর আমান উল্লা যদি এই দুটো নিয়ে লেগে যান তবে আর সব আপনার থেকেই হয়ে যাবে।’

মীর আসলম এসে বললেন, ‘অবস্থা দেখে বিশেষ ভরসা পাওয়া যাচ্ছে না। শিনওয়ারীরা এখনো মারমুখো হয়ে আছে। আমান উল্লার সঙ্গে তাঁদের সন্ধির কথাবার্তা চলছে। তার ভিতরে দুটো শর্ত হচ্ছে, তুর্কী থেকে কাবুলী মেয়ে ফিরিয়ে আনা আর রানী সুরাইয়াকে তালাক দেওয়া। রানী নাকি বিদেশে পর-পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে মানইজ্জত খুইয়ে এসেছেন।’

আমরা বললুম, ‘সে কি কথা? সমস্ত পৃথিবীর কোথাও তো রানী সুরাইয়া সম্বন্ধে এ রকম বদনাম রটেনি। ভারতবর্ষের লোক পর্দা মানে, তারা পর্যন্ত রানী সুরাইয়ার প্রশংসা ভিন্ন নিন্দা করেনি। শিনওয়ারীরা এ আজগুবী খবর-পেলে কোথেকে আর রটাচ্ছে কোন্ লজ্জায়।’

মীর আসলম বললেন, ‘শিনওয়ারী মেয়েরা বিনা পর্দায় খেতের কাজ করে বটে কিন্তু পরপুরুষের দিকে আড়নয়নে তাকালেও তাদের কি অবস্থা হয় সে কথা সকলেই জানে—আমান উল্লাও জানেন। তবে বল দেখি, তিনি কোন্ বুদ্ধিতে সুরাইয়াকে বল্ নাচে নিয়ে গেলেন ? জালালাবাদের মত জংলী শহরেও দু’এক-খানা বিদেশী খবরের কাগজ আসে—তাতে ছবি বেরিয়েছে রানী পরপুরুষের গলা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। সমস্ত ব্যাপারটা যে কতদূর মারাত্মক, আমান উল্লা এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি—তাঁর মা পেরেছেন, তিনি আমান উল্লাকে পীড়াপীড়ি করছেন সুরাইয়াকে তালাক দেবার জন্যে।’

রানী-মার প্রতি আমার অগাধ ভক্তি। উল্লসিত হয়ে বললুম, ‘রানী-মা ফের আসরে নেমেছেন ? তাহলে আর ভাবনা নেই ; শিনওয়ারী, খুগিয়ানী, বাচ্চা, কাচ্চা সবাইকে তিনি তিন দিনের ভিতর চাটনি বানিয়ে দেবেন।’

মীর আসলম বললেন, ‘কিন্তু আমান উল্লা তাঁর উপদেশে কান দি[illegible]ন না।’

শুনে অত্যন্ত নিরাশ হলুম। মীর আসলম যাবার সময় বললেন, ‘তোমাকে একটা প্রাচীন ফার্সী প্রবাদ শিখিয়ে যাই। রাজ্য চালনা হচ্ছে, সিংহের পিঠে সওয়ার হয়ে জীবন কাটানো। ভেবে চিন্তেই বললুম ‘জীবন কাটানো’—অর্থাৎ সে-সিংহের পিঠ থেকে এক মুহূর্তের জন্য নামবার উপায় নেই। যতক্ষণ উপরে আছ, সিংহ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, কিন্তু তোমাকেও অহরহ সজাগ থাকতে হবে। আমান উল্লা সন্ধির কথাবার্তা তুলেছেন, অর্থাৎ সিংহের পিঠ থেকে নেবে দু’দণ্ড জিরোতে চান—সেটি হবার জো নেই। শিনওয়ারী-সিংহ এইবার আমান উল্লাকে গিলে ফেলবে।’

আমি চুপ করে কিছুক্ষণ ভেবে বললুম, ‘কিন্তু আমার মনে হয় প্রবাদটার জন্মভূমি এদেশ নয়। ভারতবর্ষেই তখৎকে ‘সিংহাসন’ বলা হয়। আফগানিস্থানে কি সিংহ জানোয়ারটা আছে ?’

এমন সময় আবদুর রহমান এসে খবর দিল পাশের বাড়ীর কর্নেল এসেছেন দেখা করতে। যদিও প্রতিবেশী তবু তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়নি। খাতির যত্ন করে বসাতেই তিনি বললেন যে লড়াইয়ে যাবার পূর্বে আমাদের আশীর্বাদ মঙ্গল-কামনা ভিক্ষা করতে এসেছেন। মীর আসলম তৎক্ষণাৎ হাত তুলে দোয়া (আশীর্বাদ-কামনা) পড়তে আরম্ভ করলেন, আমরাও দুহাত তুলে ‘আমেন, আমেন’ (তথাস্তু, তথাস্তু) বললুম। আবদুর রহমান তামাক নিয়ে এসেছিল, সেও মাটিতে বসে প্রার্থনায় যোগ দিল।

কর্নেল চলে গেলেন। মীর আসলম বললেন, ‘পাড়া প্রতিবেশীর আশীর্বাদ ও ক্ষমা ভিক্ষা করে যুদ্ধযাত্রা করা আফগানিস্থানের রেওয়াজ!’

আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় বাচ্চা কাবুল শহরের উত্তর প্রান্তে শহর-আরায় ঢুকতে পেরেছিল। সেখানে হবীবিয়া ইস্কুল। ডাকাতদলের অগ্রভাগ—বাঙলা ‘আগডোম বাগডোম’ ছড়ার তারাই ‘অগ্রডোম’ বা ভ্যানগার্ড—ইস্কুলের হস্টেলে প্রথম রাত কাটায়। বেশীর ভাগ ছেলেই ভয়ে পালিয়েছিল, শুধু বাচ্চার জন্মস্থান কুহিস্তানের ছেলেরা ‘দেশের ভাই, শুকুর মুহম্মদের’ প্রতীক্ষায় আগুন জেলে তৈরী হয়ে বসেছিল। ডাকাতরা হস্টেলের চাল চর্বি দিয়ে পোলাও রাঁধে, ইস্কুলের বেঞ্চি টেবিল, স্টাইনগাস ভলাস্টনের মোটা মোটা অভিধান, ছেলেদের ক্লাসের পাঠ্য বই খাতাপত্র দিয়ে উনুন জ্বালায়। তবে সব চেয়ে তারা নাকি পছন্দ করেছিল ক্যাম্বিস আর কাঠের তৈরী রোল করা মানচিত্র।

আমান উল্লা ‘কাফির’, পুঁথিপত্র ‘কাফিরী’, চেয়ার টেবিল ‘কাফিরীর’ সরঞ্জাম—এসব পুড়িয়ে নাকি তাদের পুণ্যসঞ্চয় হয়েছিল।

ডাকাতেরও ধর্মজ্ঞান আছে। হস্টেলের ছেলেরা যদিও ‘কাফির’ আমান উল্লার তালিম পেয়ে ‘কাফির’ হয়ে গিয়েছে তবু তারা তাদের অভুক্ত রাখেনি। শুধু খাওয়ার সময় একটু অতিরিক্ত উৎসাহের চোটে তাদের পিঠে দু’চারটে লাথি চাঁটি মেরেছিল। বাচ্চার দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নে নাকি হস্টেল-বাসিন্দা ছিল; সে মামার হয়ে ফপরদালালি করেছে; তবে বাচ্চার পলায়নের সময় অবস্থাটা বিবেচনা করে ‘কাফিরী তালিম’ ত্যাগ করে পালিয়ে গিয়ে ‘গাজীত্ব’ লাভ করেছে।

বাড়ী ফেরায় সময় দেখলুম ছোট ছোট ছেলেরা রাস্তা থেকে বুলেটের খোসা কুড়োচ্ছে।

খবর পেলুম, ব্রিটিশ রাজদূত স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিসের মতে কাবুল আর বিদেশীদের জন্য নিরাপদ নয়। তাই তিনি আমান উল্লার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের এদেশ থেকে সরিয়ে ফেলবার বন্দোবস্ত করেছেন। আমান উল্লা সহজেই সম্মতি দিয়েছেন, কারণ তিনিও চাননি যে বিদেশীরা আফগানিস্থানের এই ঘরোয়া ব্যাপারে অনর্থক প্রাণ দেয়। কাবুল বাকি পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন বলে অ্যারোপ্লেনের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

অ্যারোপ্লেন এল। প্রথম মেয়েদের পালা। ফরাসী গেল, জর্মন গেল, পোল গেল, এককথায় দুনিয়ার অনেক জাতের অনেক স্ত্রীলোক গেল, শুধু ভারতীয়

মেয়েদের কথা কেউ শুধালো না। অ্যারোপ্লেনগুলো ভারতীয় অর্থে কেনা, পাইলটরা ভারতীয় তনখা খায়। অথচ সব চেয়ে বিপদাপন্ন ভারতীয় মেয়েরাই— অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা আপন আপন লিগেশনের আশ্রয়ে ছিল, কিন্তু ভারতীয়দের দেখে কে? প্রফেসর, দোকানদার, ড্রাইভারের বউকে ব্রিটিশ লিগেশনে স্থান দিলে স্যার ফ্রান্সিস বিদেশী সমাজে মুখ দেখাবেন কি করে? বামুনের জাত গেলে প্রায়শ্চিত্ত আছে, আর মুসলমানের তো জাত যায় না। কিন্তু ইংরেজের জাতিভেদ বড় ভয়ঙ্কর জিনিস। তার দেশের যেরকম কাগজে কলমে লেখা, আইনে বাঁধা কনসটিটুশন নেই—ঠিক তেমনি তার জাতিভেদ প্রথা কোনো বাইবেল-প্রেয়ার বুকে আপ্তবাক্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অথচ সে জাতিভেদ রবীন্দ্রনাথের ভূতের কানমলার মত। 'সে কানমলা না যায় ছাড়ানো, তার থেকে না যায় পালানো, তার বিরুদ্ধে না চলে নালিশ, তার সম্বন্ধে না আছে বিচার'। দর্শন, অঙ্ক শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হোন, মার্কসিজমের দিগ্বিজয়ী কৌটিল্যাই হোন, অথবা কয়লার খনির মজুরই হোন, এই কানমলা স্বীকার কবে করে হৌস অব লর্ডসে না পৌঁছানো পর্যন্ত দর্শন মিথ্যা, মার্ক্‌সিজ্‌ম্‌ ভুল, শ্রমিকসঙ্ঘের দেওয়া সম্মান ভণ্ডুল। যে এই কানমলা স্বীকার করে না ইংরেজের কাছে সে আধপাগল। তার নাম বার্নার্ড শ।

বাড়াবাড়ি করছি? মোটেই না। ধান ভানতে শিবের গীত? তাও নয়। বিপ্লব-বিদ্রোহ রক্তপাত-রাহাজানি মাত্রই রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্য—এতক্ষণ সে কথাই হচ্ছিল, এখন তাঁর নন্দীভৃঙ্গী-সম্বাদের পালা।

ইংরেজের এই 'আভিজাত্য', এই 'স্নবারি' ছাড়া অন্য কোনো কিছু দিয়ে ব্রিটিশ রাজদূতের মনোবৃত্তির যুক্তিযুক্ত অর্থ করা যায় না। ব্রিটিশ লিগেশনের যা আকার তাতে কাবুলের বাদবাকি সব ক'টা রাজদূতাবাস অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। একখানা ছোটখাটো শহর বললেও অত্যুক্তি হয় না—নিজের জলের কল, ইলেকট্রিক পাওয়ার-হৌস, এমন কি ফায়ার-ব্রিগেড পর্যন্ত মৌজুদ। শীতকালে সায়েব-সুবোদের খেলাধুলোর জন্য চা-বাগানের পাতা শুকোবার ঘরের মত যে প্রকাণ্ড বাড়ি থাকে তারই ভিতরে সমস্ত ভারতীয় আশ্রয়প্রার্থিনীর জায়গা হতে পারত। আহারাদি? ব্রিটিশ লিগেশন কাবুল থেকে পালিয়ে আসার সময় যে টিনের খাদ্য ফেলে এসেছিল তাই দিয়ে মেয়েদের পাকা ছ'মাস চলতে পারত।

ফ্রেঞ্চ লিগেশনের যে মিনিস্টারকে বেনওয়া সায়েব রসিকতা করে 'সিনিস্টার অব দি ফ্রেঞ্চ নিগেশন' বলতেন, তিনি পর্যন্ত আশ্রয়-প্রার্থী ফরাসীদের মন চাঙ্গা

করার জন্য ভাণ্ডার উজাড় করে শ্যাম্পেন খাইয়েছিলেন।

ডাক্তার আসে না, অন্ন জুটছে না, পথ্যের অভাব, দাই নেই, আসন্নপ্রসবার আশ্রয় জুটছে না; তাকে ফেলে রেখে ভারতীয় পয়সায় কেনা হাওয়াই জাহাজ ভারতবর্ষে যাচ্ছে ইংরেজ, ফরাসী, জর্মন, সকল জাতের মেম সায়েবদের নিয়ে! হে দ্রৌপদী-শরণ, চক্রধারণ, এ দ্রৌপদী যে অন্তঃসত্ত্বা!

উত্তরদিকে থেকে কাবুল শহর আক্রমণ করতে হলে ব্রিটিশ রাজদূতাবাস অতিক্রম করে আরো এক মাইল ফাঁকা জায়গা পেরতে হয়। বাচ্চা তাই করে শহর-আরা হস্টেলে পৌঁচেছিল। সুবে আফগানিস্থান জানে সে সময় পাকা চারদিন ব্রিটিশ রাজদূতাবাস তথা মহামান্য স্যার ফ্রান্সিসের জীবন বাচ্চার হাতের তেলোয় পুঁটি মাছের মত এক গণ্ডূষ জলে খাবি খাচ্ছিল। বাচ্চা ইচ্ছে করলেই যে কোনো মুহূর্তে সমস্ত লিগেশনকে কচু-কাটা করতে পারত—একটা ঔদাসীন্য দেখালেই তার উদ্‌গ্রীব সঙ্গীরা সবাইকে কতল করে বাদশাহী লুট পেত, কিন্তু জলকরঙ্কবাহীর তস্করপুত্র অভিজাততনয়ের প্রাণ দান করল। তবু দস্যুদত্ত করুণালব্ধ সে-প্রাণ বিপন্না নারীর দুঃখে বিগলিত হল না।

গল্প শুনেছি, জর্জ ওয়াশিংটন তাঁর নাতিকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। পথে এক নিগ্রো হ্যাট তুলে দু'জনকে নমস্কার করল। ওয়াশিংটন হ্যাট তুলে প্রতিনমস্কার করলেন, কিন্তু নাতি নিগ্রোকে তাচ্ছিল্য করে নমস্কার গ্রহণ করল না। জর্জ ওয়াশিংটন নাতিকে বললেন, 'নগণ্য নিগ্রো তোমাকে ভদ্রতায় হার মানালো।'

দয়া-দাক্ষিণ্যে, করুণা-ধর্মে মহামান্য সম্রাটের অতিমান্য প্রতিভূ হিজ একসেলেন্সি লেফটেনেন্ট কর্নেল স্যার ফ্রান্সিসকে হার মানালো ডাকুর বাচ্চা!

চিরকুট পেলুম, দেমিদফ লিখেছেন রাশান এম্বেসিতে যেতে। এ রকম চিঠি আর কখনো পাইনি, কারণ কোনো কিছুর দরকার হলে তিনি নিজেই আমার বাড়িতে উপস্থিত হতেন।

চেহারা দেখেই বুঝলুম কিছু একটা হয়েছে। দোরের গোড়াতেই বললুম, 'কি হয়েছে, বলুন।' দেমিদফ কোনো উত্তর না দিয়ে আমাকে ঘরে এনে বসালেন। মুখোমুখি হয়ে বসে দু'হাত দু'জানুর উপর রেখে সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলশফ মারা গিয়েছেন।'

আমি বললুম, 'কি ?'

দেমিদফ বললেন, 'আপনি জানতেন যে, বিদ্রোহ আরম্ভ হতেই বলশফ নিজের থেকে আমান উল্লার কাছে উপস্থিত হয়ে বাচ্চায়ে সকাওয়ের দলের উপর অ্যারোপ্লেন থেকে বোমা ফেলার প্রস্তাব করেন। কাল বিকেলে—'

আমি ভাবছি, বলশফ কিছুতেই মরতে পারে না, অবিশ্বাস্য।

'—কাল বিকেলে অন্য দিনের মত বোমা ফেলে এসে এম্বেসির ক্লাব ঘরে দাবা খেলতে বসেছিলেন। ব্রিচেসের পকেটে ছোট্ট একটি পিস্তল ছিল; বাঁ হাত দিয়ে ঘুঁটি চালাচ্ছিলেন, ডান হাত পকেটে রেখে পিস্তলের ঘোড়াটা নিয়ে খেলা করছিলেন,—জানেন তো, বলশফের স্বভাব, কিছু একটা নাড়াচাড়া না করে বসতে পারতেন না। হঠাৎ ট্রিগারে একটু বেশী চাপ পড়াতেই গুলি পেটের ভিতর দিয়ে হৃৎপিণ্ডের কাছ পর্যন্ত চলে যায়। ঘণ্টা ছয়েক বেঁচে ছিলেন, ডাক্তার কিছু করতে পারলেন না।'

আমার তখনও কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না বলশফের মত বটগাছ কি করে বিনা ঝড়ে পড়ে যেতে পারে। এত লড়াই লড়ে, এত জখম কাটিয়ে উঠে শেষে নিজের হাতে—?

দেমিদফ বললেন, 'আপনার খুব লাগবে আমি জানতুম তাই সংক্ষেপে বললুম; আর যদি কিছু জানতে চান—?'

আমি বললুম, 'না।'

'চলুন, দেখতে যাবেন।'

আমি বললুম, 'না।' বাড়ি যাবার জন্য উঠলুম।

মাদাম তাড়াতাড়ি আমার সামনে পথ বন্ধ করে বললেন, 'এখানে খেয়ে যান।'

আমি বললুম, 'না।'

টেনিস কোর্টের পাশ দিয়ে বেরবার সময় হঠাৎ যেন শুনতে পেলুম বলশফের গলা, 'জদ্রাস্‌ভুইয়িতে, মই প্রিয়াতেল—এই যে বন্ধু, কি রকম?' চমকে উঠলুম। আমার মন তখনো বিশ্বাস করছে না, বলশফ নেই। এই টেনিস কোর্টেই তাঁর সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়েছিল আর এই যে দেউড়ি দিয়ে বেরচ্ছি এরই ভিতর দিয়ে কতবার তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছি।

বাড়ি এসে না খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে ঘুম ভাঙতেই দেখি আমার অজানাতে মন সমস্ত রাত বলশফের কথা ভেবেছে। ঘুম ভাঙতে যেন শুধু সচেতন হলুম। মনে পড়ল তাঁর সঙ্গে শেষ কথাবার্তা। ঠাট্টা করে বলেছিলুম, 'বলশফ, তুমি আমান উল্লার হয়ে লড়ছ কেন? আমান উল্লা রাজা, বাচ্চার দল

প্রলেতারিয়েস্ট অব দি প্রলেতারিয়া। তোমার উচিত বাচ্চার দলে যোগ দিয়ে লড়া।'

বলশফ বলেছিল, 'বাচ্চা কি করে প্রলেতারিয়া হল? সেও তো রাজার মুকুট পরে এসেছে। রাজায় রাজায় লড়াই। এক রাজা প্রগতিপন্থী, আরেক রাজা প্রগতির শত্রু। চিরকাল প্রগতির জন্য লড়েছি, এখনো লড়ছি, তা সে ত্রৎস্কির নেতৃত্বেই হোক আর আমান উল্লার আদেশেই হোক।'

আমান উল্লার সেই চরম দুর্দিনে সব বিদেশীর মধ্যে একমাত্র বলশফের কর্তৃত্বে রাশান পাইলটরাই তাঁকে সাহায্য করেছিল। বাচ্চা জিতলে তাদের কি অবস্থা হবে সে সম্বন্ধে একদম পরোয়া না করে।

দিন পনেরো পরে খবর পেলুম, অ্যারোপ্লেন কাবুল থেকে বিদেশী সব স্ত্রীলোক কাচ্চা-বাচ্চা ঝেঁটিয়ে নিয়ে গিয়েছে; বিদেশী বলতে এখন বাকি শুধু ভারতীয়। তিন লম্ফে ব্রিটিশ লিগেশনে উপস্থিত হয়ে মৌলানার বউয়ের কথাটা সকাতর সবিনয় নিবেদন করলুম। ব্রিটিশের দয়া অসীম। ভারতবাসিনী-লাদাই উড়োজাহাজের প্রথম ক্ষেপেই তিনি স্থান!পেলেন। পুনরপি তিন লম্ফে বাড়ি পৌঁছে আঙিনা থেকেই চিৎকার করে বললুম, 'মৌলানা, কেল্লা ফতেহ, সীট পেয়ে গিয়েছি। বউকে বলো তৈরী হতে। এখন ওজন করাতে নিয়ে যেতে হবে,—কর্তারা ওজন জানতে চান।'

মৌলানা নিরুত্তর। আমি অবাক। শেষটায় বললেন যে, তাঁর বউ নাকি একা যেতে রাজী নন, বলছেন, মরবার হলে এদেশে স্বামীর সঙ্গেই মরবেন। আমি শুধালুম, 'তুমি কি বলছ?' মৌলানা নিরুত্তর। আমি বললুম, 'দেখ মৌলানা, তুমি পাঞ্জাবী, কিন্তু শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে আর গুরুদেবের মোলায়েম গান গেয়ে গেয়ে তুমি বাঙালীর মত মোলায়েম হয়ে গিয়েছ। 'বাঁধিনু যে রাখি-টাখি' এখন বাদ দাও।' মৌলানা তবু নিরুত্তর। চটে গিয়ে বললুম, 'তুমি হিন্দু হয়ে গিয়েছ, তাও আবার ১৮১০ সালের—সতীদাহে বিশ্বাস করো। কিন্তু জানো, যে গুরুদেবের নাম শুনে অজ্ঞান হও, তাঁরই ঠাকুর্দা দ্বারকানাথ ঠাকুর টাকা দিয়ে সতীদাহের বিরুদ্ধে বিলেতে মোকদ্দমা লড়িয়েছিলেন।' মৌলানা নিরুত্তর। এবারে বললুম, 'শোনো ব্রাদার, এখন ঠাট্টামস্করার সময় নয়, কিন্তু ভেবে দেখো, তোমার বউয়ের কবে বাচ্চা হবে, তার হিসেব-টিসেব রাখোনি—না হয় বস্তি পেলুম, ধাই পেলুম, কিন্তু যদি বাচ্চা হওয়ার পর তোমার বউয়ের—' বার তিনেক গলা-

খাঁকারি দিয়ে বললুম—'তাহলে আমি দুধ যোগাড় করব কোথা থেকে? বাজারে ফের কবে দুধ উঠবে, তার তো কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই।'

মৌলানা বউয়ের কাছে গেলেন। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে অল্প অল্প কান্নার শব্দ শুনতে পেলুম। মৌলানা বেরিয়ে এসে বললেন, 'রাজী হচ্ছেন না।'

তখন মৌলানাকে বাইরে রেখে ভিতরে গেলুম। বললুম, 'আপনি যে মৌলানাকে ছেড়ে যেতে চাইছেন না, তার কারণ যে আমি বুঝতে পারছিনে তা নয়; কিন্তু ভেবে দেখুন তো, আপনার না যাওয়াতে তাঁর কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? আপনি যদি চলে যান, তবে তিনি যেখানে খুশী কোনো ভাল জায়গায় গিয়ে আশ্রয় নিতে পারবেন; শুধু তাই নয়, অবস্থা যদি আরো খারাপ হয়, তবে হয়ত তাঁকেও এদেশ ছাড়তে হবে। আপনি না থাকলে তখন তাঁর পক্ষে সব কিছুই অনেক সহজ হয়ে যাবে। এসব কথা তিনি আপনাকে কিছুই বলেননি, কারণ এখন তিনি নিজের কথা আদপেই ভাবছেন না, ভাবছেন শুধু আপনার মঙ্গলের কথা। আপনি তাঁর স্ত্রী, আপনার কি এদিকে খেয়াল করা উচিত নয়?'

ওকালতি করছি আর ভাবছি মৌলানার যদি ছেলে হয়, তবে তাকে ব্যারিস্টারি পড়াব। মেয়ে হলে আমান উল্লার মায়ের হাতে সঁপে দেব।

ওষুধ ধরল। ভারত নারীর শ্মশানচিকিৎসা স্বামীর স্বার্থের দোহাই পাড়া।

পরদিন সকাল বেলা মৌলানা বউকে নিয়ে অ্যারোড্রোমে গেলেন। বিপদ-আপদ হলে আবদুর রহমানের কাঁধ কাজে লাগবে বলে সেও সঙ্গে গেল। আমি রইলুম বাড়ি পাহারা দিতে। দিন পরিষ্কার ছিল বলে ছাতে দাঁড়িয়ে দেখলুম, পুব থেকে প্রকাণ্ড ভিকারস্ বমার এল, নামল, ফের পুব দিকে চলে গেল। মাটিতে আধ ঘণ্টার বেশী দাঁড়ায়নি—কাবুল নিরাপদ স্থান নয়।

জিয়াউদ্দীন ফিরে এসে মুখ ঝামর করে উপরে চলে গেলেন। আবদুর রহমান বলল, 'মৌলানা সাহেবের বিবির জামা-কাপড় দেখে পাইলট বলল যে, অ্যারোপ্লেন যখন আসমানে অনেক উপরে উঠবে, তখন ঠাণ্ডায় তাঁর পা জমে যাবে। তাই বোধ হয় তারা সঙ্গে খড় এনেছিল—মৌলানা সাহেব সেই খড় দিয়ে তাঁর বিবির দু'পা বেশ করে পেঁচিয়ে দিলেন—দেখে মনে হল যেন খড়ে জড়ানো বিলিতী সিরকার বোতল। সব মেয়েদেরই পা এরকম কায়দায় সফর-দুরস্ত করতে হল।'

আমরা দেউড়িতে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছিলুম। এমন সময় আমাদের সামনে দিয়ে একটা মড়া নিয়ে কয়েকজন লোক চলে যাচ্ছে দেখে আবদুর রহমান হঠাৎ কথাবার্তা বন্ধ করে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। ভারবাহীরা আমার প্রতিবেশী

কর্নেলের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আবহুর রহমান কড়া নাড়ল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ, আর্ত ক্রন্দনধ্বনি যেন তীরের মত বাতাস ছিঁড়ে আমার কানে এসে পৌঁছল—মড়া দরজা দিয়ে বাড়িতে ঢোকাতে যতক্ষণ সময় লাগল, ততক্ষণ গলার পর গলা সে আর্তনাদে যোগ দিতে লাগল। চিৎকারে চিৎকারে মানুষের বেদনা যেন সপ্তম স্বর্গে ভগবানের পায়ের কাছে পৌঁছতে চাইছে।

কান্না যেন হঠাৎ কেউ গলা টিপে বন্ধ করে দিল—মড়া বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে, দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই নিস্তব্ধতা তখন যেন আমাকে কান্নার চেয়ে আরো বেশী অভিভূত করে ফেলল। আমি ছুটে গিয়ে মৌলানার ঘরে ঢুকলুম। আবহুর রহমান এসে খবর দিল, 'কর্নেল লড়াইয়ে মারা গিয়েছেন।'

মৌলানা দু'হাত তুলে দোয়া পড়তে আরম্ভ করলেন। আবহুর রহমান আর আমি যোগ দিলুম। দোয়া শেষে মৌলানা বললেন, 'লড়াইয়ে যাওয়ার আগে কর্নেল আমাদের দোয়া মাঙতে এসেছিলেন, আমাদের উপর এখন তাঁর হক্ আছে!' তারপর মৌলানা ওজু করে কুরান শরীফ পড়তে আরম্ভ করলেন।

তুপুরবেলা মৌলানার ঘরে গিয়ে দেখি, কুরান পড়ে পড়ে তাঁর চেহারা অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছে। আসন্নপ্রসবা স্ত্রীর বিরহ ও তাঁর সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা মন থেকে কেটে গিয়েছে।

কর্নেলের প্রতি আমার মনে শ্রদ্ধা জাগল। কোনো কোনো মানুষ মরে গিয়েও অন্যের মনে শান্তির উপলক্ষ্য হয়ে যান।

কিন্তু আমার মনে খেদও জেগে রইল। যে-মানুষটিকে পাঁচ মিনিটের জন্য চিনেছিলুম তাঁর মৃত্যুতে মনে হল যেন একটি শিশু-সন্তান অকালে মারা গেল। আমাদের পরিচয় তার পরিপূর্ণতা পেল না।

আটত্রিশ

আফগান প্রবাদ 'বাপ-মা যখন গদগদ হয়ে বলেন, 'আমাদের ছেলে বড় হচ্ছে' তখন একথা ভাবেন না যে, ছেলের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরাও গোরের দিকে এগিয়ে চলেছেন।' আমান উল্লা শুধু তাঁর প্রিয় সংস্কার-কর্মের দিকেই নজর রেখেছিলেন, লক্ষ্য করেননি যে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রাজত্বের দিনও ফুরিয়ে আসছে। কিন্তু শুধু আমান উল্লাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই—তাঁর উজির-নাজির সঙ্গী-সাথী ও রাস্তার আর পাঁচজন বাচ্চার পালিয়ে যাওয়াতে অনেকটা আশ্বস্ত হয়ে দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যাবার চেষ্টাতে ছিল।

বাচ্চার আক্রমণের ঠিক এক মাস পরে—জানুয়ারীর কঠোর শীতের মাঝামাঝি—একদিন শরীর খারাপ ছিল বলে লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে আছি, এমন সময় এক পাঞ্জাবী অধ্যাপক দেখা করতে এলেন। শহর তখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, দিনের বেলা চলাফেরা করাতে বিশেষ বিপদ নেই।

জিজ্ঞেস করলেন, 'খবর শুনেছেন ?'

আমি শুধালুম, 'কি খবর ?'

বললেন, 'তাহলে জানেন না, শুনুন। এরকম খবর আফগানিস্থানের মত দেশেও রোজ রোজ শোনা যায় না।

'ভোরবেলা চাকর বলল, রাজপ্রাসাদে কিছু একটা হচ্ছে, শহরের বহুলোক সেদিকে যাচ্ছে। গিয়ে দেখি প্রাসাদে আফগানিস্থানের সব উজির, তাঁদের সহকারী, ফৌজের বড় কড় অফিসার এবং শহরের কয়েকজন মাতব্বর ব্যক্তিও উপস্থিত। সকলের মাঝখানে মুইন-উস্‌-সুলতানে ইনায়েত উল্লা খান ও তাঁর বড় ছেলে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখি যে, শহরের এত বড় মজলিসের মাঝখানে আমান উল্লা নেই। কাউকে জিজ্ঞেস করার আগেই এক ভদ্রলোক—খুব সম্ভব রইস-ই-শুরাই (প্রেসিডেণ্ট অব দি কৌন্সিল) হবেন—একখানা ফরমান পড়তে আরম্ভ করলেন। দূরে ছিলুম বলে সব কথা স্পষ্ট শুনতে পাইনি ; কিন্তু শেষের কথাগুলো পাঠক বেশ জোর দিয়ে চেঁচিয়ে পড়লেন বলে সন্দেহের কোনো অবকাশ রইল না। আমান উল্লা সিংহাসন ত্যাগ করেছেন ও বড় ভাই মুইন-উস্‌-সুলতানে ইনায়েত উল্লাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করেছেন।'

আমি উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'হঠাৎ ? কেন ? কি হয়েছে ?'

'শুনুন, ফরমান পড়া শেষ হলে কাবুলের এক মাতব্বর ব্যাক্তি আফগানিস্থানের পক্ষ থেকে ইনায়েত উল্লাকে সিংহাসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। তখন ইনায়েত উল্লা অত্যন্ত শান্ত এবং নির্জীব কণ্ঠে যা বললেন, তার অর্থ মোটামুটি এই দাঁড়ায় যে, তিনি কখনও সিংহাসনের লোভ করেননি—দশ বৎসর পূর্বে যখন নসর উল্লা আমান উল্লায় রাজ্য নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়, তখনও তিনি অযথা রক্তক্ষয়ের সম্ভাবনা দেখে আপন অধিকার ত্যাগ করেছিলেন।'

অধ্যাপক দম নিয়ে বললেন, 'তারপর ইনায়েত উল্লা যা বললেন সে অত্যন্ত খাঁটি কথা। বললেন, 'দেশের লোকের মঙ্গলচিন্তা করেই আমি একদিন ন্যায্য সিংহাসন গ্রহণ করিনি; আজ যদি দেশের লোক মনে করেন যে, আমি সিংহাসন গ্রহণ করলে দেশের মঙ্গল হবে তবে আমি শুধু সেই কারণেই সিংহাসন গ্রহণ করতে রাজী আছি।'

আমি বললুম, 'কিন্তু আমান উল্লা?'

অধ্যাপক বললেন, 'তখন খবর নিয়ে শুনলুম, আমান উল্লার ফৌজ কাল রাত্রে লড়াই হেরে গিয়ে পালিয়েছে। খবর ভোরের দিকে আমান উল্লার কাছে পৌঁছয়; তিনি তৎক্ষণাৎ ইনায়েত উল্লাকে ডেকে সিংহাসন নিতে আদেশ করেন। ইনায়েত নাকি অবস্থাটা বুঝে প্রথমটায় রাজী হননি—তখন নাকি আমান উল্লা তাঁকে পিস্তল তুলে ভয় দেখালে পর তিনি রাজী হন।

'আমান উল্লা ভোরের দিকে মোটরে করে কান্দাহার রওয়ানা হয়েছেন। যাবার সময় ইনায়েত উল্লাকে আশ্বাস দিয়ে গিয়েছেন, পিতৃপিতামহের দুরানী ভূমি কান্দাহার তাকে নিরাশ করবে না। তিনি শীঘ্রই ইনায়েত উল্লাকে সাহায্য করার জন্য সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হবেন।'

আমান উল্লা তাহলে শেষ পর্যন্ত পালালেন। চুপ করে অবস্থাটা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করতে লাগলুম।

অধ্যাপক হেসে বললেন, 'আপনি তো টেনিস খেলায় ইনায়েত উল্লার পার্টনার হন। শুনেছি, তিনি তাঁর বিরাট বপু নাড়াচাড়া করতে পারেন না বলে আপনি কোর্টের বারোআনা জমি সামলান—এইবার আপনি আফগানিস্থানের বারোআনা না হোক অন্তত দু'চারআনা নিন।'

আমি বললুম, 'তা তো বটেই। কিন্তু বাচ্চার বুলেটের অন্তত দু'চারআনা ঠেকাবার ভার তাহলে আমার উপর পড়বে না তো?'

অধ্যাপক বললেন, 'তওবা, তওবা। বাচ্চা এখন আর লড়বে কেন, বলুন।

তার কাছে ইত্যবসরে শোরবাজারের হজরত আর সর্দার ওসমান খান ইনায়েত উল্লার পক্ষ থেকে খবর নিয়ে গিয়েছেন যে, 'কাফির' আমান উল্লা যখন সিংহাসন ত্যাগ করে পালিয়েছে তখন আর যুদ্ধবিগ্রহ করার কোনো অর্থ হয় না। বাচ্চা যেন বাড়ি ফিরে যান—তাঁর সঙ্গে ইনায়েত উল্লার কোনো শত্রুতা নেই।'

অধ্যাপক চলে গেলে পর আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর্কের দিকে চললুম।

এবারে শহরের দৃশ্য আরো অদ্ভুত। বাচ্চার প্রথম ধাক্কার পর তবু কাবুল শহরে রাজা ছিলেন, তিনি দুর্বল না সবল সাধারণ লোকে জানত না বলে রাজদণ্ডের মর্যাদা তখনো কিছু কিছু ছিল কিন্তু এখন যেন আকাশেবাতাসে অরাজকতার বিজয়লাঞ্ছনা অঙ্কিত। যারা রাস্তা দিয়ে চলেছে তারা স্পষ্টত কাবুলবাসিন্দা নয়। তাদের চোখে মুখে হত্যালুণ্ঠনের প্রতীক্ষা আর লুক্কায়িত নয়। এরা সব দল বেঁধে চলেছে—কেউ কোথাও একবার আরম্ভ করলে এদের আর ঠেকানো যাবে না।

ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরি করলুম কিন্তু একটিমাত্রও পরিচিত লোককে দেখতে পেলুম না। তখন ভালো করে লক্ষ্য করলুম যে, প্রায় সবাই দল বেঁধে চলছে, ভিখারী-আতুর ছাড়া একলাএকলি আর কেউ বেরোয়নি।

খাঁটি খবর দিতে পারে এমন একটি লোক পেলুম না। আভাসে আন্দাজে বুঝলুম, ইনায়েত উল্লা আর্কের ভিতর আশ্রয় নিয়ে দুর্গ বন্ধ করেছেন। আমান উল্লার কি পরিমাণ সৈন্য ইনায়েত উল্লার বশ্যতা স্বীকার করে দুর্গের ভিতরে আছে তার কোনো সন্ধান পেলুম না।

দোস্ত মুহম্মদ আমান উল্লার হয়ে লড়তে গিয়েছেন জানতুম, তাই একমাস ধরে তাঁর বাড়ি বন্ধ ছিল। ভাবলুম এবার হয়ত ফিরেছেন, কিন্তু সেখানে গিয়েও নিরাশ হতে হল। বাড়ি ফিরে দেখি মৌলানা তখনো আসেননি, তাই পাকাপাকি খবরের সন্ধানে মীর আসলমের বাড়ি গেলুম।

বুড়ো আবার সেই পুরোনো কথা দিয়ে অরেম্ভ করলেন, যখন কোনো দরকার নেই তখন এই বিপজ্জনক অবস্থায় ঘোরাঘুরি করি কেন ?

আমি বললুম, 'সামলে কথা বলবেন, স্যার। জানেন বাদশা আমার পার্টনার। চাট্টিখানি কথা নয়। আপনার কি চাই বলুন,যা দরকার বাদশাকে বলে করিয়ে দেব।'

মীর আসলম অনেকক্ষণ ধরে হাসলেন। তারপর বললেন, 'ফার্সীতে একটা প্রবাদ আছে, জানো,

'রাজত্ববধূরে যেই করে আলিঙ্গন
তীক্ষ্ণ-ধার অসি পরে সে দেয় চুম্বন!'

'*কিন্তু তোমার বাদশাহ অদ্ভুত! সাধারণ বাদশাহ কামানবন্দুক চালিয়ে* অন্ততঃপক্ষে পিস্তলের ভয় দেখিয়ে সিংহাসন দখল করে, তোমার বাদশাহ ইনায়েত উল্লা পিস্তলের ভয় পেয়ে কাঁপতে কাঁপতে সিংহাসনের উপরে গিয়ে বসলেন !'

আমি বললুম, 'কিন্তু দেখুন, শেষ পর্যন্ত সিংহাসনে যার হক ছিল তিনিই বাদশাহ হলেন। কাবুলের লোকজন তো আর ভুলে যায়নি যে, ইনায়ত উল্লা শহীদ বাদশাহ হবীব উল্লার বড় ছেলে।'

মীর আসলম বললেন, 'সে কথা ঠিক কিন্তু হক্কের মাল এত দেরিতে পৌঁচেছে যে, এখন সে মালের উপর আরো পাঁচজনের নজর পড়ে গিয়েছে। শুনেছ বোধ হয় শোরবাজারের হজরত বাচ্চাকে ফেরাতে গিয়েছেন। তোমার কি মনে হয় ?'

আমি বললুম, 'ইনায়েত উল্লা তো আর 'কাফির' নন। বাচ্চা ফিরে যাবে।'

মীর আসলম বললেন, 'শোরবাজারের হজরতকে চেন না—তাই এ কথাটা বললে। তিনি আফগানিস্থানের সবচেয়ে বড় মোল্লা, আমান উল্লা বিদ্রোহের গোড়ার দিকেই তাঁকে জেলে পুরেছিলেন, সাহস সঞ্চয় করে ফাঁসী দিতে পারেননি। আজ শোরবাজার স্বাধীন, কিন্তু ইনায়েত উল্লা বাদশাহ হলে তাঁর কি লাভ ? আজ না হয় তিনি বিপদে পড়ে শোরবাজারের হাতে-পায়ে ধরে তাঁকে দূত করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বাচ্চা যদি ফিরে যায় তবে দু'দিন বাদে তাঁর শক্তি বাড়বে ; সিংহাসনে কায়েম হয়ে বসার পর তিনি আর শোরবাজারের দিকে ফিরে তাকাবেন না। রাজার ছেলে রাজা হলেন, তিনি রাজত্ব চালাতে জানেন, শোরবাজারকে তাঁর কি প্রয়োজন ?

'পক্ষান্তরে বাচ্চা যদি ইনায়েত উল্লাকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজা হতে পারে তবে তাতে শোরবাজারের লাভ। বাচ্চা ডাকাত, সে রাজ্যচালনার কি জানে ? যে মোল্লাদের উৎসাহে বাচ্চা আজ লড়ছে সেই মোল্লাদের মুকুটমণি শোরবাজার তখন রাজ্যের কর্ণধার হবেন।

'কিন্তু তারো চেয়ে বড় কারণ রয়েছে, বাচ্চা কেন ফিরে যাবে না। তার যে-সব সঙ্গী-সাথীরা এই এক মাস ধরে বরফের উপর কখনো দাঁড়িয়ে কখনো শুয়ে লড়ল, বাচ্চা তাদের শুধু-হাতে বাড়ি ফেরাবে কি করে ? কাবুল লুটের লালস দেখিয়েই তো বাচ্চা তাদের আপন ঝাণ্ডার তলায় জড়ো করেছে।'

আমি বললুম, 'বাঃ! আপনিই তো সেদিন বললেন, বাচ্চা মহল্লা-সর্দারদের কথা দিয়েছে যে, কাবুলীরা যদি আমান উল্লার হয়ে না লড়ে তবে সে কাবুল লুট করবে না।'

মীর আসলম বললেন, 'এরই নাম রাজনীতি। ইংরেজ যেরকম লড়াইয়ের সময় আরবদের বলল তাদের প্যালেস্টাইন দেবে, ইহুদীদের বলল তাদেরও দেবে।'

বাড়ি ফিরে এসে দেখি পাঞ্জাবী অধ্যাপকরা দল বেঁধে মৌলানাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসে আড্ডা জমিয়েছেন। আমাকে নিয়ে অনেক হাসি-ঠাট্টা করলেন, কেউ বললেন, 'দাদা, আমার ছ'মাসের ছুটির প্রয়োজন', কেউ বললেন, 'পাঁচ বছর ধরে প্রোমোশন পাইনি, বাদশাহকে সেই কথাটা স্মরণ করিয়ে দেবেন।' মৌলানা আমার হয়ে উত্তর দিয়ে বললেন, 'স্বপ্নেই যদি পোলাও খাবেন তবে ঘি ঢালতে কঞ্জুসি করছেন কেন? যা চাইবার দরাজ-দিলে চেয়ে নিন।'

দেখলুম, এদের সকলেরই বিশ্বাস বাচ্চা শুধু-হাতে বাড়ি ফিরে যাবে আর কাবুলে ফের হারুন-অর্-রশীদের রাজত্ব কায়েম হবে।

সন্ধ্যার দিকে আবদুর রহমান বুলেটিন ঝেড়ে গেল, বাচ্চা ফিরতে নারাজ, বলছে, 'যে-তাজ পাঁচজন আমাকে পরিয়েছেন, সে তাজ আমার শিরোধার্য।' বুঝলুম মীর আসলম ঠিকই বলেছেন, 'রাজা হওয়ার অর্থ সিংহের পিঠে সওয়ার হওয়া—একবার চড়লে আর নামবার উপায় নেই।'

সে রাত্রে বাড়িতে ডাকু হানা দিল। আবদুর রহমান তার রাইফেল ব্যবহার করতে পেয়ে যত না গুলি ছুঁড়ল তার চেয়ে আনন্দে লাফাল বেশী। ফিচকে ডাকাতই হবে, আবদুর রহমানের রণনাদ শুনে পালাল।

আবদুর রহমান তার বুলেটিনের মাল-মসলা সংগ্রহ করে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে। রাস্তা দিয়ে যে যায় তাকেই ডেকে পই পই করে নানা রকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে— আমান উল্লা চলে যাওয়ায় তার শেষ ডর ভয় কেটে গিয়েছে। তবে এখন বাচ্চায়ে সকাও না বলে সম্মানভরে হবীব উল্লা খান বলে।

দুপুরবেলার বুলেটিনের খবর 'ইনায়েত উল্লা খান আর্ক দুর্গের ভিতর বসে আমান উল্লার কাছ থেকে সাহায্যের প্রতীক্ষা করেছেন। বাচ্চা তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দিয়েছে। না হলে সে কাবুল শহরের কাউকে জ্যান্ত রাখবে না— ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেবে। ইনায়েত উল্লা উত্তর দিয়েছেন, 'কাবুলবাসীদের প্রচুর রাইফেল আর অপর্যাপ্ত বুলেট আছে, তাই দিয়ে তারা যদি আত্মরক্ষা না করতে পারে তবে এসব ভেড়ার পালের মরাই ভালো'।'

মৌলানা বললেন, 'বাচ্চা এখন আর কাবুলের মহল্লা-সর্দারদের কেয়ার করে না।' তারপর আবদুর রহমানকে পার্লিমেণ্টি কায়দায় সপ্লিমেণ্টরি শুধালেন, 'আর্কে কি পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য আছে? সৈন্যরা টিকতে পারবে কতদিন?' আবদুর রহমান

কাঁচা ডিপ্লোমেট—নোটিসের হুমকি দিল না। বলল, 'অন্তত ছয় মাস।'

তৃতীয় দিনের বুলেটিন : 'বাচ্চা বলেছে, ইনায়েতউল্লা যদি আত্মসমর্পণ না করেন তবে যে-সব আমীর-ওমরাহ সেপাই-শান্ত্রী তাঁর সঙ্গে আর্কে আশ্রয় নিয়েছেন, তাঁদের স্ত্রীপুত্রপরিবারকে সে খুন করবে। ইনায়েত উল্লা উত্তর দিয়েছেন, 'কুছ পরোয়া নেই'।'

ফালতো প্রশ্ন, 'বাচ্চা দুর্গ আক্রমণ করছে না কেন?'

অবজ্ঞাসূচক উত্তর, 'রাইফেলের গুলি দিয়ে পাথরের দেয়াল ভাঙা যায় না।'

সে সন্ধ্যায় ব্রিটিশ লিগেশনের এক কেরানী প্রাণের ভয়ে আমার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। শহরে এসেছিলেন কি কাজে; বাচ্চার ফৌজ দলে দলে শহরে ঢুকছিল বলে লিগেশনে ফিরে যেতে পারেননি। রাত্রে তাঁর মুখে শুনলুম যে, দুর্গের ভিতরে বন্ধ আমীর-ওমরাহদের স্ত্রীপুত্রপরিবার দুর্গের বাইরে। ইনায়েত উল্লার পরিবার দুর্গের ভিতরে। আমীরগণ ও বাদশাহের স্বার্থ এখন আর সম্পূর্ণ এক নয়। আমীরগণ তাঁদের পরিবার বাঁচাবার জন্য আত্মসমর্পণ করতে চান। ইনায়েত উল্লা নাকি নিরাশ হয়ে বলেছেন, যে-সব আমীর-ওমরাহদের অনুরোধে তিনি অনিচ্ছায় রাজা হয়েছিলেন, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখন তিনি আর দুর্গ রক্ষা করতে রাজী নন।

আবদুর রহমান সভাস্থলে উপস্থিত ছিল। বলল, 'আমি শুনেছি, সেপাইরা দুর্গ রক্ষা করতে রাজী, যদিও তাদের পরিবার দুর্গের বাইরে। তারা বলছে, 'বউবাচ্চার জান আমানত দিয়ে তো আর ফৌজে ঢুকিনি।' ভয় পেয়েছেন অফিসার আর আমীর-ওমরাহদের দল।'

কেরানী বললেন, 'আমিও শুনেছি, কিন্তু কোনটা খাঁটি কোনটা ঝুটা বুঝবার উপায় নেই। মোদ্দা কথা, ইনায়েত উল্লা সিংহাসন ত্যাগ করতে তৈরি, তবে তাঁর শর্ত : কোনো তৃতীয়পক্ষ যেন তাঁকে আর তাঁর পরিবারকে নিরাপদে আফগানিস্থানের বাইরে নিয়ে যাবার জিম্মাদারি নেন। স্যার ফ্রান্সিস রাজী হয়েছেন।'

আমরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'স্যার ফ্রান্সিসের কাছে প্রস্তাবটা পাড়ল কে?'

'বলা শক্ত। শোরবাজার, ইনায়েত উল্লা, বাচ্চা—থুড়ি হবীব উল্লা খান—তিনজনের একজন, অথবা সকলে মিলে। এখন সেই কথাবার্তা চলছে।'

সেরাত্রে অনেকক্ষণ অবধি মৌলানা আর কেরানী সায়েবেতে আফগান রাজ-

নীতি নিয়ে আলোচনা, তর্কবিতর্ক হল।

সকালবেলা আবদুর রহমান হাতে-সেঁকা রুটি, নুন আর বিনা দুধ-চিনিতে চা দিয়ে গেল। আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে কিন্তু ভদ্রলোক কিছুই স্পর্শ করতে পারলেন না। প্রবাদ আছে, 'কাজীর বাড়ির বাঁদীও তিন কলম লিখতে পারে।' বুঝতে পারলুম, 'ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের কেরানীও রাজভোগ খায়—এই দুর্ভিক্ষেও।'

দুপুরের দিকে কেরানী সায়েবের সঙ্গে শহরে বেরলুম। বাচ্চার সেপাইয়ে সমস্ত শহর ভরে গিয়েছে। আর্কের পাশের বড় রাস্তায় তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি—তিনি লিগেশনে যাবেন, আমি বাড়ি ফিরব—এমন সময় বলা নেই কওয়া নেই একসঙ্গে শ'খানেক রাইফেল আমাদের চারপাশে গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, রাস্তার লোকজন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে যে যেদিকে পারে সেদিকে ছুটছে। আশ্রয়ের সন্ধানে নিশ্চয়ই, কিন্তু কে কোন্ দিকে যাচ্ছে তার প্রতি লক্ষ্য না করে। চতুর্দিকে বাচ্চার ডাকাত, তাই সবাই ছুটেছে দিশেহারা হয়ে।

বাচ্চার প্রথম আক্রমণের দিনে শহরে যা দেখেছিলুম তার সঙ্গে এর তুলনা হয় না। সেদিনকার কাবুলী ভয় পেয়েছিল যেন বাঘের ডাক শুনে, এবারকার ত্রাস হঠাৎ বাঘের থাবার সামনে পড়ে যাবার। কেরানী সায়েব পেশাওয়ারের পাঠান। সাহসী বলে খ্যাতি আছে। তিনি পর্যন্ত আমাকে টেনে নিয়ে ছুটে চলেছেন—মুশকিল-আসানই জানেন কোন দিক দিয়ে। পাশ দিয়ে গা ঘেঁষে একটা ঘোড়া চলে গেল। নয়ানজুলিতে পড়তে পড়তে তাকিয়ে দেখি, ঘোড়-সওয়ারের পা জিনের পাদানে বেঁধে গিয়ে মাথা নিচের দিকে ঝুলছে আর ঘোড়ার প্রতি গ্যালপের সঙ্গে সঙ্গে মাথা রাস্তার শানে ঠোক্কর খাচ্ছে।

ততক্ষণে রাস্তার সুর-রিয়ালিস্টিক ছবিটার এলোপাতাড়ি দাগ আমার মনে কেমন যেন একটা আবছা আবছা অর্থ এনে দিয়েছে। কেরানী সায়েবের হাত থেকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজেকে খালাস করে দাঁড়িয়ে গেলুম। ছবিটার যে জিনিস আমার অবচেতন মন ততক্ষণে লক্ষ্য করে একটা অর্থ খাড়া করেছে, সে হচ্ছে যে ডাকুরা কাউকে মারার মতলবে, কোনো 'কৎলে আম্' বা পাইকারি কচু-কাটার তালে নয়—তারা গুলি ছুঁড়ছে আকাশের দিকে। কেরানী সায়েবের দৃষ্টিও সেদিকে আকর্ষণ করলুম।

ততক্ষণে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে শুধু বাচ্চার ডাকাত দল, কেরানী সায়েব আর আমি; বাদবাকি নয়ানজুলিতে, দোকানের বারান্দায়, না হয় কাবুল নদীর শক্ত বরফের উপর উঁচু পাড়ির গা ঘেঁষে।

তিন-চার মিনিট ধরে গুলি চলল—আমরা কানে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। তারপর আবার সবাই এক-একজন করে আশ্রয়স্থল থেকে বেরিয়ে এল। ডাকাতের দল ততক্ষণে হা-হা করে হাসতে আরম্ভ করেছে—'তাদের 'শাদীয়ানা' শুনে কাবুলের লোক এরকমধারা ভয় পেয়ে গেল!' 'কিসের 'শাদীয়ানা'?' 'জানো না খবর, ইনায়েত উল্লা তখ্‌ৎ ছেড়ে দিয়ে হাওয়াই জাহাজে করে হিন্দুস্থান চলে গিয়েছেন। তাই—বাচ্চা—থুড়ি—বাদশাহ হবীব উল্লা খান হুকুম দিয়েছেন রাইফেল চালিয়ে 'শাদীয়ানা' বা বিজয়োল্লাস প্রকাশ করার জন্য।'

জিন্দাবাদ 'বাদশাহ' 'গাজী' হবীব উল্লা খান!

বর্বরদেশে নতুন দলপতি উদ্‌খলে বসলে নরবলি করার প্রথা আছে। আফগানিস্থানে এরকম প্রথা থাকার কথা নয়, তবু অনিচ্ছায় গোটা পাঁচেক নরবলি হয়ে গেল। 'শাদীয়ানা'র হাজার হাজার বুলেট আকাশ থেকে নামার সময় যাদের মাথায় পড়ল তাদের কেউ কেউ মরল—পুরু মীর-আসলমী পাগড়ি মাথায় প্যাঁচানো ছিল না বলে।

পাগড়ি নিয়ে হেলাফেলা করতে নেই। গরীব আফগানের মামুলী পাগড়ি নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করতে গিয়ে আমান উল্লার রাজমুকুট খসে পড়ল।

উনচল্লিশ

ডাকাত সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথায় পরল।

মোল্লারা আশীর্বাদ করলেন।

পরদিন ফরমান বেরলো। তার মূল বক্তব্য, আমান উল্লা কাফির, কারণ সে ছেলেদের এলজেব্রা শেখাত, ভূগোল পড়াত, বলত পৃথিবী গোল। বিংশ শতাব্দীতে এ রকম ফরমান বেরতে পারে সেকথা কেউ সহজে বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু বাচ্চার মত ডাকাত যখন তখ্‌ৎ-নশীন হতে পারে তখন এরকম ফরমান আর অবিশ্বাস করার কোনো উপায় থাকে না। শুধু তাই নয়, ফরমানের তলায় মোল্লাদের সই ছাড়াও দেখতে পেলুম সই রয়েছে আমান উল্লার মন্ত্রীদের।

মীর আসলম বললেন, 'পেটের উপর সঙ্গীন ঠেকিয়ে সইগুলো আদায় করা হয়েছে। না হলে, বলো কোন্ সুস্থ লোক বাচ্চাকে বাদশাহী দেবার ফরমানে নাম সই করতে পারে?' রাগের চোটে তাঁর চোখ-মুখ তখন লাল হয়ে গিয়েছে, দাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গর্জন করে বললেন, 'ওয়াজিব্‌-উল-কৎল—

প্রত্যেক মুসলমানের উচিত যাকে দেখা মাত্র কতল করা সে কি না বাদশাহ হল !'

আমি বললুম, 'আপনি যা বলেছেন তা খুবই ঠিক কিন্তু আশা করি এসব কথা যেখানে সেখানে বলে বেড়াচ্ছেন না।'

মীর আসলম বললেন, 'শোনো সৈয়দ মুজতবা আলী, আমান উল্লার নিন্দা যখন আমি করেছি তখন সকলের সামনেই করেছি ; বাচ্চায়ে সকাওয়ের বিরুদ্ধে যা বলবার তাও আমি প্রকাশ্যে বলি। তুমি কি ভাবছ কাবুল শহরের মোল্লারা আমাকে চেনে না, ফরমানের তলায় আমার সই লাগাতে পারলে ওরা খুশী হয় না ? কিন্তু ওরা ভালো করেই জানে যে, আমার বাঁ হাত কেটে ফেললেও আমার ডান হাত সই করবে না। ওরা ভালো করেই জানে যে, আমি ফতোয়া দিয়ে বসে আছি, "বাচ্চায়ে সকাও ওয়াজিব্-উল্-কৎল্—অবশ্য বধ্য" ।'

মীর আসলম চলে যাওয়ার পর মৌলানা বললেন, 'যতদিন আফগানিস্থানে মীর আসলমের মত একটি লোকও বেঁচে থাকবেন ততদিন এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'হক কথা, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যতের ভাবনা এই বেলা একটু ভেবে নিলে ভালো হয় না ?'

দু'জনে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলুম ; কখনো মুখ ফুটে কখনো যার যার আপন মনে। বিষয় : বাচ্চা তার ফরমানে আমান উল্লা যে কাফির সে কথা সপ্রমাণ করে বলেছে, "এবং যেসব দেশী-বিদেশী মাস্টার প্রফেসর আমান উল্লাকে এ সব কর্মে সাহায্য করতো, তাদের ডিসমিস করা হল ; স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হল।"

শেষটায় মৌলানা বললেন, 'অত ভেবে কদ্দু হবে। আমরা ছাড়া আরো লোকও তো ডিসমিস হয়েছে—দেখাই যাক না তারা কি করে।' মৌলানার বিশ্বাস দশটা গাধা মিললে একটা ঘোড়া হয়।

কিন্তু এসব নিতান্ত ব্যক্তিগত কথা।

আবু হোসেন নাটক যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা হয়ত ভাবছেন যে কাবুলে তখন জোর রগড়। কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনায় তখন আমীর ফকির সকলেরই রসকষ কাবুল নদীর জলের মত জমে গিয়ে বরফ হয়ে গিয়েছে। বাচ্চাও শহরবাসীকে সন্দেহের দোদুলদোলায় বেশীক্ষণ দোলালো না। হুকুম হলো, আমান উল্লার মন্ত্রীদের ধরে নিয়ে এসো, আর তাদের বাড়ি লুঠ করো।

সে লুঠ কিস্তিতে কিস্তিতে হল। বাচ্চার খাস-পেয়ারারা প্রথম খবর পেয়েছিল বলে তারা প্রথম কিস্তিতে টাকা-পয়সা, গয়নাগাঁটি, দামী টুকিটাকি ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দ্বিতীয় কিস্তিতে সাধারণ ডাকাতরা আসবাবপত্র, কার্পেট, বাসন-কোসন, জামা-কাপড় বেছে বেছে নিয়ে গেল, তৃতীয় কিস্তিতে আর সব ঝড়ের মুখে উড়ে গেল—শেষটায় রাস্তার লোক কাঠের দরজা-জানালা পর্যন্ত ভেঙে নিয়ে গিয়ে শীত ভাঙালো।

মন্ত্রীদের খালি পায়ে বরফের উপর দাঁড় করিয়ে হরেক রকম সম্ভব অসম্ভব অত্যাচার করা হল গুপ্তধন বের করবার আশায়। তার বর্ণনা শুনে কাবুলের লোক পর্যন্ত শিউরে উঠেছিল—মৌলানা আর আমি শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করেছিলুম।

তারপর আমান উল্লার ইয়ারবক্সি, ফৌজের অফিসারদের পালা। বন্ধ দোর-জানালা ভেদ করে গভীর রাত্রে চিৎকার আসত—ডাকু পড়েছে। সে আবার সরকারী ডাকু—তার সঙ্গে লড়াই করার উপায় নেই, তার হাত থেকে পালাবার পথ নেই।

কিন্তু অভ্যাস হয়ে গেল—রাস্তায় উপর শীতে জমে-যাওয়া রক্ত, উলঙ্গ মড়া, রাত্রে ভীত নরনারীর আর্ত চিৎকার—সবই সহ্য হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্য, অভ্যাস হল না শুধু শুকনো রুটি, নুন আর বিনা দুধচিনিতে চা খাওয়ার। মায়ের কথা মনে পড়ল; তিনি একদিন বলেছিলেন, চা-বাগানের কুলীরা যে প্রচুর পরিমাণে বিনা দুধ চিনিতে লিকার খায় সে পানের তৃপ্তির জন্য নয়, ক্ষুধা মারবার জন্য। দেখলুম অতি সত্যি কথা, কিন্তু শরীর অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। কাবুলে ম্যালেরিয়া নেই, থাকলে তারপর চা-বাগানের কুলীর যা হয় আমারও তাই হত এবং তার পরমা গতি কোথায়, বাঙালীকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। মৌলানাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'না খেতে পেয়ে, বুলেট খেয়ে, ম্যালেরিয়ায় ভুগে, এ-তিন মার্গের ভিতর মরার পক্ষে কোনটা প্রশস্ততম বলো তো।'

মৌলানা কবিতা আওড়ালেন আরেক মৌলানার—কবি সাদীর—

চুন আহঙ্গে রফ্‌তন্ কুনদ্ জানে পাক্,
চি বর তখ্‌ৎ মুরদন্ চি বর্ সরে খাক্?

পরমায়ু যবে প্রস্তুত হয় মহাপ্রস্থান তরে
একই মৃত্যু—সিংহাসনেতে অথবা ধুলির পরে।

বাচ্চার ফরমান জারির দিন সাতেক পরে ভারতীয়, ফরাসী, জর্মন শিক্ষক-অধ্যাপকেরা এক ঘরোয়া সভায় স্থির করলেন, স্যার ফ্রান্সিসকে তাঁদের দুরবস্থা নিবেদন করে হাওয়াই জাহাজে ভারতবর্ষে যাওয়ার বন্দোবস্ত ভিক্ষা করা।

অধ্যাপকেরা বললেন, কাবুল থেকে বেরবার রাস্তা চতুর্দিকে বন্ধ ; স্যার ফ্রান্সিস বললেন, হাঁ ; অধ্যাপকেরা নিবেদন করলেন, কাবুলে কোনো ব্যাঙ্ক নেই বলে তাঁদের জমানো যা কিছু সম্বল তা পেশাওয়ারে এবং সে পয়সা আনাবার কোনো উপায় নেই ; স্যার ফ্রান্সিস বললেন, হুঁ ; অধ্যাপকেরা কাতর অনুনয়ে জানালেন, স্ত্রী-পরিবার নিয়ে তাঁরা অনাহারে আছেন ; সায়েব বললেন, অ ; অধ্যাপকেরা মরীয়া হয়ে বললেন, এখানে থাকলে তিলে তিলে মৃত্যু ; সায়েব বললেন, আ।

একদিকে ফুল্লরার বারমাসী, অন্যদিকে সায়েবের অ, আ করে বর্ণমালা পাঠ। ক্লাস সিক্সের ছেলে আর প্রথম ভাগের খোকাবাবু যেন একই ঘরে পড়াশোনা করছেন।

বর্ণমালা যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল তখন সায়েব বললেন, 'এখানকার ব্রিটিশ লিগেশন ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকারের মুখপাত্র। ভারতবাসীদের সুখ-সুবিধা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ব্রিটিশ লিগেশনের কর্তব্য নয়। আমি যদি কিছু করতে পারি, তবে সেটা 'ফেবার' হিসেবে করব, আপনাদের কোনো রাইট নেই।'

যাত্রাগানে বিস্তর দুর্যোধন দেখেছি। সায়েবের চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, না, কিছু কিছু গরমিল রয়েছে। দুর্যোধন 'ফেবার, রাইট' কোনো হিসেবেই পাঁচখানা গাঁ দিতে রাজী হননি, ইনি 'ফেবারেবল কনসিডারেশন' করতে রাজী আছেন।

এ অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ হলে হয়ত তিনি বগল বাজিয়ে সুখবর দেবার জন্য পাণ্ডব-শিবিরে ছুটে যেতেন, কিন্তু আমার মনে পড়ল যুধিষ্ঠিরের কথা। একটি মিথ্যে কথা বলবার জন্যে তাঁকে নরক দর্শন করতে হয়েছিল। ভাবলুম, এদিকে দুর্যোধন, ওদিকে বাচ্চায়ে সকাও, এর মাঝখানে যদি সাহস সঞ্চয় করে একটিবারের মত এই জীবনে সত্যি কথা বলে ফেলতে পারি তবে অন্তত একবারের মত স্বর্গ দর্শন লাভ হলে হতেও পারে। বললুম, 'হাওয়াই জাহাজগুলো ভারতীয় পয়সায় কেনা, পাইলটরা ভারতীয় তনখা খায়, পেশাওয়ারের বিমানঘাঁটি ভারতের নিজস্ব—এ অবস্থায় আমাদের কি কোনো হক্ নেই?' ব্রিটিশ লিগেশন যে ভারতীয় অর্থে তৈরি, সায়েব যে ভারতীয় নিমক খান, সেকথা আর ভদ্রতা করে বললুম না।

সায়েব ভয়ঙ্কর চটে গেলেন, অধ্যাপকরাও ভয় পেয়ে গেলেন। বুঝলুম,

জীবনমরণের ব্যাপার—ভারতীয়েরা কোনো গতিকে দেশে ফিরে যেতে পেলে রক্ষা পান—'মেহেরবানী, হক' নিয়ে নাহক তর্ক করে কোনো লাভ নেই। বললুম, 'আমি যা বলেছি, সে আমার ব্যক্তিগত মত। আমি নিজে কোনো 'ফেবার' চাইনে, কিন্তু আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা যেন আর পাঁচজনের স্বার্থে আঘাত না করে।'

এর পর কথা কাটাকাটি করে আর কোনো লাভ নেই। আমার যা বক্তব্য সায়েব পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন, আর সায়েবের বক্তব্য ভারতবাসীর কাছে কিছু নূতন নয়—'ফেবার' শব্দ দরখাস্তে যিনি যত ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখতে পারেন, তাঁকেই আমরা ভারতবর্ষে গেল একশ' বছর ধরে ইংরিজীতে সুপণ্ডিত বলে সেলাম করে আসছি।

সেই সন্ধ্যায়ই খবর পেলুম, যে সব ভারতবাসী স্বদেশে ফিরে যেতে চান, তাঁদের একটা ফিরিস্তি তৈরি করা হয়েছে। সায়েব স্বহস্তে আমার নামে ঢ্যারা কেটে দিয়েছেন।

আবদুর রহমান এখন শুধু আগুনের তদারকি করে। বাদাম নেই যে খোসা ছাড়াবে, কালি নেই যে জুতো পালিশ করবে। না খেয়ে খেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছে, দেখলে দু:খ হয়।

মৌলানা শুতে গিয়েছেন। আবদুর রহমান ঘরে ঢুকল। আমি বললুম, 'আবদুর রহমান, সব দিকে তো ডাকাতের পাল রাস্তা বন্ধ করে আছে। পানশিরে যাবার উপায় আছে?'

আবদুর রহমান আমার দু'হাত আপন হাতে তুলে নিয়ে শুধু চুমো খায় আর চোখে চেপে ধরে; বলে, 'সেই ভালো হুজুর, সেই ভালো। চলুন আমার দেশে। এরকম শুকনো রুটি আর নুন খেলে দু'দিন বাদে আপনি আর বিছানা থেকে উঠতে পারবেন না। তার চেয়ে ভালো খাওয়ার জিনিস আমাদেরই বাড়িতে আছে। কিছু না হোক, বাদাম, কিসমিস, পেস্তা, আঞ্জীর, মোলায়েম পনীর, আর হুজুর, আমার নিজের তিনটে দুম্বা আছে। আর একটি মাস, জোর দেড় মাস, তারপর বরফ গলতে আরম্ভ করলেই আপনাকে নদী থেকে মাছ ধরে এনে খাওয়াব। ভেজে, সেঁকে, পুড়িয়ে যে-রকম আপনার ভালো লাগে। আপনি আমাকে মাছের কত গল্প বলেছেন, আমি আপনাকে খাইয়ে দেখাব। আরামে শোবেন ঘুমোবেন, জানলা দিয়ে দেখবেন—'

আবদুর রহমানকে বাধা দিতে কষ্টবোধ হল। বেচারী অনেকদিন পরে

আবার প্রাণ খুলে কথা বলতে আরম্ভ করেছে, পানশিরের পুরানো স্বপ্নে নূতন রঙ লাগিয়ে আমার চোখে চটক লাগাবার চেষ্টা করছে ; তার মাঝখানে ভোরের কাকের মত কর্কশ কা-কা করে তার সুখ-স্বপ্ন কেটে ফেলতে অত্যন্ত বাধো বাধো ঠেকল। বললুম, 'না, আবদুর রহমান, আমি যাব না, আমি বলছি, তুমি চলে যাও। জানো তো আমার চাকরি গেছে, তোমাকে মাইনে দেবার টাকা আমার নেই। ডাল চাল ফুরিয়ে গিয়ে গমে এসে ঠেকেছে, তাও তো আর বেশী দিন চলবে না। তুমি বাড়ি চলে যাও, খুদা যদি ফের সুদিন করেন, তবে আবার দেখা হবে।'

ব্যাপারটা বুঝতে আবদুর রহমানের একটু সময় লাগল। যখন বুঝল, তখন চুপ করে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমারও মন খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু করিই বা কি ? আবদুর রহমানের সঙ্গে বহু সন্ধ্যা, বহু যামিনী কাটিয়ে বুঝতে পেরেছি যে, সে যদি নিজের থেকে কোনো জিনিস না বোঝে, তবে আমার যুক্তি-তর্ক তার মনের কোনো কোণে ঠাঁই পায় না। আমার ব্যবস্থাটা যে তার আদপেই পছন্দ হয়নি, সেটা বুঝতে পারলুম, কিন্তু আমি আশা করেছিলুম, সে আপত্তি জানাবে, আমি তাহলে তর্কাতর্কি করে তাকে খানিকটা শায়েস্তা করে নিয়ে আসব। দেখলুম তা নয়, সরল লোক আর সোজা সুপারি গাছে মিল রয়েছে ; একবার পা হড়কালে আপত্তি-অজুহাতের শাখা-প্রশাখা নেই বলে সোজা ভূমিতলে অবতরণ।

খানিকক্ষণ পরে নিজের থেকেই ঘরে ফিরে এল। মাথা নিচু করে বলল, 'আপনি নিজের হাতে মেপে সকালবেলা দু'মুঠো আটা দেবেন। আমার তাইতেই চলবে।'

কি করে লোকটাকে বোঝাই যে, আমার অজানা নয় সে মাসখানেক ধরে দু'মুঠো আটা দিয়েই দুবেলা চালাচ্ছে। আর খাবারের কথাই তো আসল কথা নয়—আমার প্রস্তাবে যে সে অত্যন্ত বেদনা অনুভব করেছে, সেটা লাঘব করি কি করে ? যুক্তিতর্ক তো বৃথা—পূর্বেই বলেছি, ভাবলুম মৌলানাকে ডাকি। কিন্তু ডাকতে হল না। আবদুর রহমান বলল, 'যখন সব কিছু পাওয়া যেত, তখন আমি এখানে যা খেয়েছি, আমার বাবা তার শ্বশুরবাড়িতেও সেরকম খায়নি।' তারপর বেশ একটু গলা চড়িয়ে বলল, 'আর আজ কিছু জুটছে না বলে আমাকে খেদিয়ে দিতে চান ? আমি কি এতই নিমকহারাম ?'

অনেক কিছু বলল। কিছুটা যুক্তি, বেশীর ভাগ জীবনস্মৃতি, অল্পবিস্তর ভৎর্সনা, সব কিছু ছাপিয়ে অভিমান। কখনো বলে, 'দেরেশি করিয়ে দেননি', কখনো বলে, 'নূতন লেপ কিনে দেননি—কাবুলের ক'টা সর্দারের ওরকম লেপ আছে', 'আমি

গেলে বাড়ি পাহারা দেবে কে' 'আমাকে তাড়িয়ে দেবার হক্ আপনার সম্পূর্ণ আছে—আপনার আমি কি খেদমত করতে পেরেছি ?'

যেন পানশিরের বরফপাত। গাদা-গাদা, পাঁজা-পাঁজা। আমি যেন রাস্তা হারিয়ে ফেলেছি, আর আমার উপর সে বরফ জমে উঠছে। আবদুর রহমানই আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিন বলেছিল, তখন নাকি সেই বরফ-আস্তরণের ভিতর বেশ ওম বোধ হয়। আমিও আরাম বোধ করলুম।

কিন্তু না খেতে পেয়ে আবদুর রহমানের পানশিরী তাগদ মিইয়ে গিয়েছে। সাত দিন ধরে বরফ পড়ল না—মিনিট খানেক বর্ষণ করেই আবদুর রহমান থেমে গেল। আমি বললুম, 'তা তো বটেই, তুমি চলে গেলে আমাকে বাঁচাবে কে ? অতটা ভেবে দেখিনি।'

আবদুর রহমান তদ্দণ্ডেই খুশ। সরল লোককে নিয়ে এই হল মস্ত সুবিধে। তক্ষুনি হাসিমুখে আগুনের তদারকিতে বসে গেল।

তার মন থেকে যে শেষ গ্লানিটুকু কেটে গিয়েছে সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারলুম শুতে যাবার সময়। তোষকের তলায় লেপ গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'জানেন, সায়েব, আমি যদি বাড়ি চলে যাই তবে বাবা কি করবে ? প্রথম আমার কাছ থেকে একটা বুলেটের দাম চেয়ে নেবে ; তারপর আমাকে গুলি করে মারবে। কতবার আমাকে বলেছে, 'তোর মত হতভাগাকে মারবার জন্য যে গাঁটের পয়সায় বুলেট কেনে সে তোর চেয়ে হতভাগা'।'

আমি বললুম, 'ও, তাই বুঝি তুমি পানশির যেতে চাও না ? প্রাণের ভয়ে ?'

আবদুর রহমান প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল। তারপর হাসল। আমারও হাসি পেল—যে আবদুর রহমান এতদিন ধরে 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠতি অগ্রে' রূপ ধারণ করে বিরাজ করত, আমার আলবাল-সিঞ্চনে সে যে একদিন রসবোধকিশলয়ে মুকুলিত হয়ে সরসতরুবর হবে সে আশা করিনি।

আবদুর রহমান একখানা খোলা-চিঠি দিয়ে গেল ; উপরে আমান উল্লার পলায়নের তারিখ।

'কমরত ব্ শিকনদ—

এতদিন বাদে মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। আগা আহমদের মাইনের পাঁচবছরের জমানো তিনশ' টাকা আর তার ভাইয়ের রাইফেল লোপাট মেরে আফ্রিদী মুল্লুকে চললুম। সেখানে গিয়ে পিতৃপিতামহের ব্যবসা ফাঁদব। শুনতে পাই খাইবারপাসের ইংরেজ অফিসার পাকড়ে পাকড়ে খালাসীর পয়সা আদায় করার

প্রাচীন ব্যবসা উপযুক্ত লোকের অভাবে অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়েছে।

কিন্তু আচ্ছা ইংরিজী জাননেওয়ালা একজন দোভাষীর আমার প্রয়োজন— আমার ইংরিজী বিদ্যে তো জান! তোমার যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে তবে পত্রপাঠ জলালাবাদের বাজারে এসে আমার অনুসন্ধান করো। মাইনে? কাবুলে এক বছরে যা কামাও, আমি এক মাসে তোমাকে তাই দেব। কাবুলের ডাকাতের চাকর হওয়ার চেয়ে আমার বেরাদর হয়ে ইমান-ইনসাফে কামানো পয়সার বখরাদার হওয়া ঢের ভালো।

আমান উল্লা নেই—তবু ফী আমানিল্লা। * দোস্ত মুহম্মদ

পুঃ। আগা আহমদ সঙ্গে আছে। কাঁধে আমান উল্লার বিলি করা একখানা উৎকৃষ্ট মাউজার রাইফেল্স।'

রাজা হয়ে ভিস্তিওয়ালার ডাকাত ছেলে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় রাজপ্রাসাদে কি রঙ্গরস করল তার গল্প আস্তে আস্তে বাজারময় ছড়াতে আরম্ভ করল। আধুনিক উপন্যাসে বালিগঞ্জের কাল্পনিক ডাইনিঙরুমে পাড়াগেঁয়ে ছেলে যা করে তারই রাজসংস্করণ। নূতনত্ব কিছু নেই—তবে একটা গল্প আমার বড় ভালো লাগল। মৌলানার কপি-রাইট।

আমান উল্লা লণ্ডনে পঞ্চম জর্জের সঙ্গে যে রোল্স্ রয়েস চড়ে কুচ-কাওয়াজ পালাপরবে যেতেন রাজা জর্জ সেই বজরার মত মোটর আমান উল্লাকে বিদায়-ভেট দেন। সে গাড়ি রাক্ষসের মত তেল খেত বলে আমান উল্লা পালাবার সময় সেখানা কাবুলে ফেলে যান।

বাচ্চা রাজা হয়ে বিশেষ করে সেই মোটরই পাঠাল বাস্তুগাঁয়ে বউকে নিয়ে আসবার জন্য। বউ নাকি তখন বাচ্চার বাচ্চার মাথার উকুন বাছছিল। সারা গাঁয়ের হুলুস্থুলের মাঝখানে বাচ্চার বউ নাকি ড্রাইভারকে বলল, 'তোমার মনিবকে গিয়ে বলো, নিজে এসে আমাকে খচ্চরে বসিয়ে যেন নিয়ে যায়।'

দিগ্বিজয় করে বুদ্ধদেব যখন কপিলবস্তু ফিরেছিলেন তখন যশোধরা এমনি ধারা অভিমান করেছিলেন।

'আমান উল্লা' কথার অর্থ 'আল্লার আমানত' এবং 'ফী আমান ইল্লা' কথার অর্থ (তোমাকে) 'আল্লার আমানতে রাখলুম।'

চল্লিশ

ফরাসডাঙার জরিপেড়ে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি আর ফুরফুরে রেশমী উড়ুনি পরে বসে আছি। কব্জিতে গোড়ে, গোঁফে আতর। চাকর ট্যাক্সি আনতে গিয়েছে—বায়স্কোপে যাব।

সত্যি নয়, তুলনা দিয়ে বলছি।

তখন যেমন ট্যাক্সির অপেক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোনো কাজে মন দেওয়া যায় না, আমাদের অবস্থা হল তখন তাই। তফাত শুধু এই, স্যার ফ্রান্সিসের হাতে হাওয়াই ট্যাক্সি রয়েছে—কিন্তু সাঁঝের বেলা শিখ ড্রাইভার যে রকম মদমত্ত হয়ে 'চক্ষু দুইডা রাঙা কইরা, এড্ডা চিক্কের দিয়া' বলে 'নহী জায়েঙ্গে', সাহেব তেমনি স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে বলছেন—চুলোয় যাকগে কি বলছেন।

অপেক্ষা করে করে এক মাস কাটিয়ে দিয়েছি।

চা ফুরিয়ে গিয়েছে—ক্ষুধা মারবার আর কোনো দাওয়াই নেই। এখন শুধু রুটি আর নুন—নুন আর রুটি। রুটিতে প্রচুর পরিমাণ নুন দিলে শুধু রুটিতেই চলে কিন্তু ভোজনের পদ বাড়াবার জন্য আবদুর রহমান নুন রুটি আলাদা আলাদা করে পরিবেষণ করত।

সপ্তাহ তিনেক হল বেনওয়া সাহেব অ্যারোপ্লেন করে হিন্দুস্থান চলে গিয়েছেন। পূর্বেই বলেছি, তিনি শান্তিনিকেতনে থেকে থেকে বাঙালী হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তা-হলে কি হয়। পাসপোর্টখানা তো ফরাসী দেশের—এবং তাঁর রংটা তো সাদা। তাই ভারতীয় বিমানে তিনি জায়গা পেলেন বিনা মেহন্নতে। আমাদের তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই কিন্তু সব ফরাসীর জন্য তো আর এ রকম দরাজদিল হতে পারব না।

যাবার আগের দিন বেনওয়া বাড়িতে এসে মৌলানা আর আমাকে গোপনে এক টিন ফরাসী তরকারী দিয়ে যান—সার্ডিন টিনের সাইজ। বহুকাল ধরে রুটি ভিন্ন অন্য কোনো বস্তু পেটে পড়েনি ; মৌলানাতে আমাতে সেই তরকারী গোগ্রাসে গোস্ত-গেলার পদ্ধতিতে খেয়ে পেটের অসুখে সপ্তাহ খানেক ভুগলুম। আমাদের ভুগন্তি অনেকটা গরীব চাষীর ম্যালেরিয়ায় ভোগার মত হল। চাষী যে রকম ভোগার সময় বিলক্ষণ বুঝতে পারে কুইনিন-ফুইনিন কোনো কিছুরই প্রয়োজন নেই, সাত দিন পেট ভরে খেতে পেলে দুনিয়ার কুল্লে জ্বর ঝেড়ে ফেলে উঠতে পারবে, আমরা তেমনি ঠিক জানতুম, তিন দিন পেট ভরে খেতে পেলে

আমাদেরও পেটের অসুখ আমান উল্লার সৈন্যবাহিনীর মত কর্পূর হয়ে উবে যাবে।

সেই অনাহার আর অসুখের দরুন মৌলানা আর আমার মেজাজ তখন এমনি তিরিক্ষি হয়ে গিয়েছে যে, বেরালটা কার্পেটের উপর দিয়ে হেঁটে গেলে তার শব্দে লাফ দিয়ে উঠি (অথচ স্নায়ু জিনিসটা এমনি অদ্ভুত যে, বন্দুকগুলির শব্দে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গ হয় না), কথায় কথায় দু'জনাতে তর্ক লাগে, মৌলানার দিকে তাকালেই আমার মনে হয়, ওরকম জঙলী দাড়ি মানুষ রাখে কেন, মৌলানা আমার চেহারা সম্বন্ধে কি ভাবতেন জানিনে, তবে প্রকাশ করলে খুব সম্ভব খুনোখুনি হয়ে যেত। মৌলানা পাঞ্জাবী কিন্তু আমিও তো বাঙাল।

মৌলানা লোকটা ভারী কুতর্ক করে। আমি যা বললুম সে কথা তাবৎ দুনিয়া সৃষ্টির আদিম কাল থেকে স্বীকার করে আসছে। আমি বললুম, 'সরু চালের ভাত আর ইলিশ মাছ ভাজার চেয়ে উপাদেয় খাদ্য আর কিছুই হতে পারে না।' মূর্খ বলে কি না বিরয়ানি-কুর্মা তার চেয় অনেক ভালো। পাঞ্জাবীদের সঙ্কীর্ণমনা প্রাদেশিকতার আর কি উদাহরণ দিই বলুন। শান্তিনিকেতনে থেকেও লোকটা মানুষ হল না। যে নরাধম ইলিশ মাছের অপমান করে তার মুখদর্শন করা মহা পাপ, অথচ দেখুন, বাঙালীর চরিত্র কী উদার, কী মহান ;—আমি মৌলানার সঙ্গে মাত্র তিন দিন কথা বন্ধ করে ছিলুম।

আর শীতটা যা পড়েছিল। বায়স্কোপে অজস্র গরমের ছ'হাজার ফুটী বর্ণনা দেখা যায়, কিন্তু মারাত্মক শীতের বয়ান তার তুলনায় বহুৎ কম। কারণ বায়স্কোপ বানানো হয় প্রধানতঃ সায়েবসুবোদের জন্য আর তেনারা শীতের তকলিফ বাবতে ওকিবহাল, কাজেই সে-জিনিস তাঁদের দেখিয়ে বক্স-আপিস ভরবে কেন ? আর যদি বা দেখানো হয় তবে শীতের সঙ্গে হামেশাই ঝড় ব্লিজার্ড জুড়ে দেওয়া যায়। কিন্তু আসলে যেমন কালবৈশাখী বিপজ্জনক হলেও তার সঙ্গে দিনের পর দিনের ১১২ ডিগ্রীর অত্যাচারের তুলনা হয় না, তেমনি বরফের ঝড়ের চেয়েও মারাত্মক দিনের পর-দিনের ১০ ডিগ্রীর অত্যাচার।

জামা ধুয়ে রোদ্দুরে শুকোতে দিলেন। জামার জল জমে বরফ হল, রোদ্দুরে সে জল শুকোনো দূরের কথা বরফ পর্যন্ত গলল না। রোদ থাকলেই টেম্পারেচার ফ্রিজিঙের উপরে ওঠে না। জামাটা জমে তখন এমনি শক্ত হয়ে গিয়েছে যে, এক কোণে ধরে রাখলে সমস্ত জামাটা খাড়া হয়ে থাকে। ঘরের ভিতরে এনে আগুনের কাছে ধরলে পর জামা চুবসে গিয়ে জবুথবু হয়।

বলবেন বানিয়ে বলছি, কিন্তু দেশ ভ্রমণের হলপ, দোতলা থেকে থুথু ফেললে সে-থুথু মাটি পৌঁছবার পূর্বেই জমে গিয়ে পেঁজা বরফের মত হয়ে যায়। আবদুর রহমান একদিন দুটো পেঁয়াজ যোগাড় করে এনেছিল—খুদায় মালুম চুরি না ডাকাতি করে—কেটে দেখি পেঁয়াজের রস জমে গিয়ে পরতে পরতে বরফের গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে।

সেই শীতে জ্বালানী কাঠ ফুরোলো।

খবরটা আবদুর রহমান দিল বেলা বারোটার সময়। বাইরের কড়া রৌদ্র তখন বরফের উপর পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, আমরা কিন্তু সে-সংবাদ শুনে ত্রিভুবন অন্ধকার দেখলুম। রোদ সত্ত্বেও টেম্পারেচার তখন ফ্রিজিঙ পয়েণ্টের বহু নিচে।

সে রাত্রে গরম বানিয়ান, ফ্লানেলের শার্ট, পুল-ওভার, কোট, ইস্তেক ওভার-কোট পরে শুলুম। উপরে দুখানা লেপ ও একখানা কার্পেট। মৌলানা তাঁর প্রিয়তম গান ধরলেন,

'দারুণ অগ্নিবাণে
হৃদয় তৃষায় হানে—'

আমি সাধারণতঃ বেসুরা পোঁ ধরি। সেরাত্রে পারলুম না, আমার দাঁতে দাঁতে করতাল বাজছে।

জানালার ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢুকে পর্দা সরিয়ে দিল। আকাশ তারায় তারায় ভরা। রবীন্দ্রনাথ উপমা দিয়ে বলেছেন।

'আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যা তারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার ভাসে।'

ফরাসী কবি অন্য তুলনা দিয়েছেন; আকাশের ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে তারা হয়ে গিয়েছে। আরেক নাম-না-জানা বিদেশী কবি বলেছেন, মৃতা ধরণীর কফিনের উপর সাজানো মোমবাতির গলে-যাওয়া জমে-ওঠা ফোঁটা ফোঁটা মোম তারা হয়ে গিয়েছে।

সব বাজে বাজে তুলনা, বাজে বাজে কাব্যি।

হে দিগম্বর ব্যোমকেশ, তোমার নীলাম্বরের নীলকম্বল যে লক্ষ লক্ষ তারার ফুটোয় ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। তাই কি তুমিও আমারই মতন শীতে কাঁপছ? কাবুলে যে শ্মশান জ্বালিয়েছ তার আগুন পোয়াতে পারো না?

তিন দিন তিন রাত্তির লেপের তলা থেকে পারতপক্ষে বেরইনি। চতুর্থ

দিনে আবদুর রহমান অনুনয় করে বলল, 'ওরকম একটানা শুয়ে থাকলে শরীর ভেঙে পড়বে সায়েব ; একটু চলাফেরা করুন, গা গরম হবে।'

আমাদের দেশের গরীব কেরানীকে যেরকম ডাক্তার প্রাতর্ভ্রমণ করবার উপদেশ দেয়। গরীব কেরানীরই মতন আমি চিঁ চিঁ করে বললুম, 'বড্ড ক্ষিদে পায় যে। শুয়ে থাকলে ক্ষিদে কম পায়।'

ডাকাতি করলে আমি তাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেব এ কথা আবদুর রহমান জানত বলেই সে তখনো রাইফেল নিয়ে রাজভোগের সন্ধানে বেরোয়নি। আবদুর রহমান মাথা নিচু করে চুপ করে গেল।

বেরাল পারতপক্ষে বাস্তুভিটা ছাড়ে না। তিন দিন ধরে আমার বেরাল দুটো না-পাত্তা। তার থেকে বুঝলুম, আমার প্রতিবেশীরা নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ভালো খাওয়া-দাওয়া করছে। তারা বিচক্ষণ, রাষ্ট্রবিপ্লবে ওয়াকিবহাল। গোলমালের গোড়ার দিকেই সব কিছু কিনে রেখেছিল।

শীতের দেশে নাকি হাতী বেশীদিন বাঁচে না। তবু আমান উল্লা শখ করে একটা হাতী পুষেছিলেন। কাবুলে কলাগাছ আনারস গাছ, বনবাদাড় নেই বলে সে কালো হাতীকে পুষতে প্রায় সাদা হাতী পোষার খর্চাই লাগত। কাবুলে তখন কাঠের অভাব ; তাই হাতী-ঘরে আর আগুন জ্বালানো হত না। বাচ্চার ডাকাত ভাই-বেরাদরের শখ চেপেছে হাতী চাপার। সেই দুর্দান্ত শীতে তারা হাতীকে বের করেছে চড়ে নগর প্রদক্ষিণ করার জন্য। তাকিয়ে দেখি হাতীর চোখের কোণ থেকে লম্বা লম্বা আইসিক্‌ল্ বা বরফের ছুঁচ ঝুলছে—হাতীর চোখের আর্দ্রতা জমে গিয়ে।

আমি জানতুম, হাতীটা ত্রিপুরা থেকে কেনা হয়েছিল। ত্রিপুরার সঙ্গে সিলেটের বিয়ে-সাদী লেন-দেন বহুকালের—সিলেটের জমিদার খুন করে ফেরারী হলে চিরকালই ত্রিপুরার পাহাড়ে টিপরাদের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে।

হাতীটার কষ্ট আমার বুকে বাজলো। তখন মনে পড়ল রেমার্কের চাষা বন্দুকগুলি অগ্রাহ্য করে ট্রেঞ্চের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, জখমি ঘোড়াকে গুলি করে মেরে তাকে তার যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি দেবার জন্য।

কুকুরের চোখেমুখে বেদনা সহজেই ধরা পড়ে। হাতীকে কাতর হতে কেউ কখনো দেখেনি, তাই তার বেদনাবোধ যখন প্রকাশ পায় তখন সে দৃশ্য বড় নিদারুণ।

আমান উল্লার বিস্তর মোটরগাড়ী ছিল। বাচ্চার সঙ্গীসাথীরা সেই মোটরগুলো চড়ে চড়ে তিন দিনের ভেতর সব পেট্রল শেষ করে দিল। শহরের সর্বত্র এখন দামী দামী মোটর পড়ে আছে—যেখানে যে-গাড়ীর পেট্রল্ শেষ হয়েছে বাচ্চার ইয়াররা সেখানেই সে-গাড়ী ফেলে চলে গিয়েছে। জানালার কাঁচ পর্যন্ত তুলে দিয়ে যায়নি বলে গাড়ীতে বৃষ্টি বরফ ঢুকছে ; পাড়ার ছেলেপিলেরা গাড়ী নিয়ে ধাক্কাধাক্কি করাতে দু'একটা নর্দমায় কাত হয়ে পড়ে আছে।

আমাদের বাড়ীর সামনে একখানা আনকোরা বীয়ুইক্ ঝল্মল্ করছে। আবদুর রহমানের ভারী শখ গাড়ীখানা বাড়ীর ভিতরে টেনে আনার। বিদ্রোহ শেষ হলে চড়বার ভরসা সে রাখে।

আমান উল্লা তো সেই কোন্ ফরাসী রাজার মত 'আপ্রে মওয়া ল্য দেল্যুজ' (হম্ গয়া তো জগ গয়া) বলে কান্দাহার পালালেন,—আবদুর রহমান বলে, 'আপ্রে ল্য দেল্যুজ, অতমবিল্' (বন্যার পর পলিমাটি)।

আমাদের কাছে যেমন সব ব্যাটা গোরার মুখ একরকম মনে হয়, আবদুর রহমানের কাছে তেমনি সব মোটরের এক চেহারা। কিছুতেই স্বীকার করবে না যে, 'দেল্যুজের' পর রাজবাড়ীর লোক চোরাই-গাড়ীর সন্ধানে বেরিয়ে গাড়ীখানা চিনে নিয়ে সেখানা পুরবে গারাজে আর তাকে পুরবে জেলে।

অপ্‌টিমিস্ট।

কাবুলে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়। অনেকটা শিলঙের মত। হলে সবাই ছুটে ঘর থেকে বেরোয়।

দুপুরবেলা জোর ভূমিকম্প হল। আমি আর মৌলানা দুই খাটে শুয়ে ধুঁকছি। কেউ খাট ছেড়ে বেরলুম না।

একচল্লিশ

যেন অন্তহীন মহাকাল ভ্যাজর ভ্যাজর করার পর এক ভাষণ-বিলাসী আপন বক্তৃতা শেষ করে বললেন, 'আপনাদের অনেক মূল্যবান সময় অজানাতে নষ্ট করে ফেলেছি বলে মাপ চাইছি। আমার সামনে ঘড়ি ছিল না বলে সময়ের আন্দাজ রাখতে পারিনি।' শ্রোতাদের একজন চটে গিয়ে বলল, 'কিন্তু সামনের দেয়ালে যে ক্যালেণ্ডার ছিল, তার কি ? সেদিকে তাকালে না কেন ?'

মৌলানা আর আমি বহুদিন হল ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকানো বন্ধ করে দিয়েছি। তবু জমে-যাওয়া হাড় ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেয় যে এখনো শীতকাল।

ইতিমধ্যে ফরাসী জর্মন প্রভৃতি বিদেশী পুরুষেরা ভারতীয় প্লেনে কাবুল ত্যাগ করেছেন—স্ত্রীলোকেরা তো আগেই চলে গিয়েছিলেন। শেষটায় শুনলুম ভারতীয় পুরুষদের কেউ কেউ স্যার ফ্রান্সিসের ফেবারে স্বদেশ চলে যেতে পেরেছেন। আমার নামে তো ঢ্যারা, কাজেই মৌলানাকে বললুম, তিনি যদি প্লেনে চাপবার মোকা পান তবে যেন পিছন পানে না তাকিয়ে যুধিষ্ঠিরের মত সোজা পিতৃলোক চলে যান। অনুজ যদি অনুগ হবার সুবিধে না পায় তবে তার জন্য অপেক্ষা করলে ফল পিতৃলোকে প্রত্যাগমন না হয়ে পিতৃলোকে মহাপ্রয়াণই হবে। চাণক্য বলেছেন, উৎসবে, ব্যসনে এবং রাষ্ট্রবিপ্লবে যে কাছে দাঁড়ায় সে বান্ধব। এস্থলে সে-নীতি প্রযোজ্য নয়, কারণ, চাণক্য স্বদেশের রাষ্ট্রবিপ্লবের কথাই ভাবছিলেন, বিদেশের চক্রব্যূহের খাঁচায় ইঁদুরের মত না খেয়ে মরবার উপদেশ দেননি।

অল্প অল্প জ্বরের অবচেতন অবস্থায় দেখি দরজা দিয়ে উর্দিপরা এক বিরাট মূর্তি ঘরে ঢুকছে। দুর্বল শরীর, মনও দুর্বল হয়ে গিয়েছে। ভাবলুম, বাচ্চায়ে সকাওয়ের জল্লাদই হবে; আমার সন্ধানে এখন আর আসবে কে?

নাঃ। জর্মন রাজদূতাবাসের পিয়ন। কিন্তু আমার কাছে কেন? ওদের সঙ্গে তো আমার কোনো দহরম-মহরম নেই। জর্মন রাজদূত আমাকে এই দুর্দিনে নিমন্ত্রণই বা করবেন কেন? আবার পইপই করে লিখেছেন, বড্ড জরুরী এবং পত্রপাঠ যেন আসি।

দু'মাইল বরফ ভেঙে জর্মন রাজদূতাবাস। যাই কি করে, আর গিয়ে হবেই বা কি? কোনো ক্ষতি যে হতে পারে না সে-বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত, কারণ আমি বসে আছি সিঁড়ির শেষ ধাপে, আমাকে লাথি মারলেও এর নিচে আমি নামতে পারি না।

শেষটায় মৌলানার ধাক্কাধাক্কিতে রওয়ানা হলুম। জর্মন রাজদূতাবাস যাবার পথ সুদিনে অভিসারিকাদের পক্ষে বড়ই প্রশস্ত—নির্জন, এবং বনবীথিকার ঘনপল্লবে মর্মরিত। রাস্তার একপাশ দিয়ে কাবুল নদী এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছেন; তারই রসে সিক্ত হয়ে হেথায় কুঞ্জ, হোথায় পঞ্চ-চিনার। নিতান্ত অরসিক জনও কল্পনা করে নিতে পারে যে লুকোচুরি, রসকেলির জন্য এর চেয়ে উত্তম বন্দোবস্ত মানুষ চেষ্টা করেও করতে পারত না।

কিন্তু এ-দুর্দিনে সে-রাস্তা চোরডাকাতের বেহেস্‌ৎ, পদাতিকের গোরস্তান।

আবদুর রহমান বেরবার সময় ছোট পিস্তলটা জোর করে ওভারকোটের পকেটে পুরে দিয়েছিল। নিতান্ত ফিচেল চোর হলে ওটা কাজে লেগে যেতেও পারে।

এসব রাস্তায় হাঁটতে হয় সগর্বে, সদম্ভে, ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে, মাথা খাড়া করে। কিন্তু আমার সে তাগদ কোথায়? তাই শিষ দিয়ে দিয়ে চললুম এমনি কায়দায় যেন আমি নিত্যিনিত্যি এ-পথ দিয়ে যাওয়া-আসা করি।

পথের শেষে পাহাড়। বেশ উঁচুতে রাজদূতাবাস। সে-চড়াই ভেঙে যখন শেষটায় রাজদূতের ঘরে গিয়ে ঢুকলুম তখন আমি ভিজে ন্যাকড়ার মত নেতিয়ে পড়েছি। রাজদূত মুখের কাছে ব্র্যাণ্ডির গেলাশ ধরলেন। এত দুঃখেও আমার হাসি পেল ; মুসলমান মরার পূর্বে মদ খাওয়া ছাড়ে, আমি মরার আগে মদ ধরব নাকি? মাথা নাড়িয়ে অসম্মতি জানালুম।

জর্মনরা কাজের লোক। ভণিতা না করেই বললেন, 'বেনওয়া সায়েবের মুখে শোনা, আপনি নাকি জর্মনিতে পড়তে যাবার জন্য টাকা কামাতে এদেশে এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার সব টাকা নাকি এক ভারতীয় মহাজনের কাছে জমা ছিল, এবং সে নাকি বিপ্লবে মারা যাওয়ায় আপনার সব টাকা খোয়া গিয়েছে?'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ।'

রাজদূত খানিকক্ষণ ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি বিশেষ করে কেন জর্মনিতেই যেতে চেয়েছিলেন, বলুন তো?'

আমি বললুম, 'শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে কাজ করে ও বিশ্বভারতীর বিদেশী পণ্ডিতদের সংসর্গে এসে আমার বিশ্বাস হয়েছে যে উচ্চশিক্ষার জন্য আমার পক্ষে জর্মনিই সব চেয়ে ভালো হবে।'

এ ছাড়া আরো একটা কারণ ছিল, সেটা বললুম না।

রাজদূতেরা কখন খুশী, কখন বেজার হন সেটা বোঝা গেলে নাকি তাঁদের চাকরি যায়। কাজেই আমি তাঁর প্রশ্নের কারণের তাল ধরতে না পেরে, বাঁয়াতবলা কোলে নিয়ে বসে রইলুম।

বললেন, 'আপনি ভাববেন না এই কটি খবর সঠিক জানবার জন্যই আপনাকে কষ্ট দিয়ে এখানে আনিয়েছি। আমি শুধু আপনাকে জানাতে চাই, আমা দ্বারা

যদি আপনার জর্মনি যাওয়ার কোনো স্থবিধা হয় তবে আমি আপনাকে সে সাহায্য আনন্দের সঙ্গে করতে প্রস্তুত। আপনি বলুন, আমি কি প্রকারে আপনার সাহায্য করতে পারি ?'

আমি অনেক ধন্যবাদ জানালুম। রাজদূত উত্তরের অপেক্ষায় বসে আছেন, কিন্তু আমার চোখে কোনো পন্থাই ধরা দিচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেল—খোদা আছেন, গুরু আছেন—বললুম, 'জর্মন সরকার প্রতি বৎসর দু'একটি ভারতীয়কে জর্মনিতে উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি দেন। তারই একটা যদি যোগাড় করে দিতে পারেন তবে—'

বাধা দিয়ে রাজদূত বললেন, 'জর্মন সরকার যদি একটি মাত্র বৃত্তি একজন বিদেশীকেও দেন তবে আপনি সেটি পাবেন, আমি কথা দিচ্ছি।'

আমি অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বললুম, 'পোয়েট টেগোরের কলেজে আমি পড়েছি, তিনি খুব সম্ভব আমাকে সার্টিফিকেট দিতে রাজী হবেন।'

রাজদূত বললেন, 'তাহলে আপনি এত কষ্ট করে কাবুল এলেন কেন ? টেগোরকে জর্মনিতে কে না চেনে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু পোয়েট সবাইকে অকাতরে সার্টিফিকেট দেন। এমন কি এক তেল-কোম্পানীকে পর্যন্ত সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে তাদের তেল ব্যবহার করলে নাকি টাকে নূতন চুল গজায়।'

রাজদূত মৃদুহাস্য করে বললেন, 'টেগোর বড় কবি জানতুম, কিন্তু সহৃদয় লোক সে-কথা জানতুম না।'

অন্য সময় হলে হয়ত এই খেই ধরে 'জর্মনিতে রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের মালমশলা যোগাড় করে নিতুম, কিন্তু আমার দেহ তখন বাড়ী ফিরে খাটে শোবার জন্য আঁকুবাঁকু লাগিয়েছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'এ দুর্দিনে যে আপনি নিজের থেকে আমার অনুসন্ধান করেছেন তার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দেবার মত ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছিনে। বৃত্তি হলে ভালো, না হলেও আমি সয়ে নিতে পারব। কিন্তু আপনার সৌজন্যের কথা কখনো ভুলতে পারব না।'

রাজদূতও উঠে দাঁড়ালেন। শেকহাণ্ডের সময় হাতে সহৃদয়তার চাপ দিয়ে বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই বৃত্তিটা পাবেন। নিশ্চিন্ত থাকুন।'

দূতাবাস থেকে বেরিয়ে বাড়ীটার দিকে আরেকবার ভালো করে তাকালুম। সমস্ত বাড়ীটা আমার কাছে যেন মধুময় বলে মনে হল। তীর্থের উৎপত্তি কি

করে হয় সে-সম্বন্ধে আমি কখনো কোনো গবেষণা করিনি ; আজ মনে হল, সহৃদয়তা, করুণা, মৈত্রীর সন্ধান যখন এক মানুষ অন্য মানুষের ভিতর পায় তখন তাঁকে কখনো মহাপুরুষ কখনো 'অবতার' কখনো 'দেবতা' বলে ডাকে এবং তাঁর পাদপীঠকে জড় জেনেও পুণ্যতীর্থ নাম দিয়ে অজরামর করে তুলতে চায়। এবং সে-বিচারের সময় মানুষ উপকারের মাত্রা দিয়ে কে 'মহাপুরুষ' কে 'দেবতা' সে-কথা যাচাই করে না, তার স্পর্শকাতর হৃদয় তখন কৃতজ্ঞতার বন্যায় সব তর্ক সব যুক্তি সব পরিপ্রেক্ষিত, সব পরিমাণজ্ঞান ভাসিয়ে দেয়

শুধু একটি পরিমাণজ্ঞান আমার মন থেকে তখনো ভেসে যায়নি এবং কস্মিন কালেও যাবে না—

যে ভদ্রলোক আমাকে এই দুর্দিনে স্মরণ করলেন তিনি রাজদূত, স্যার ফ্রান্সিস হামফ্রিসও রাজদূত।

কিন্তু আর না। ভাবপ্রবণ বাঙালী একবার অনুভূতিগত বিষয়-বস্তুর সন্ধান পেলে মূল বক্তব্য বেবাক ভুলে যায়।

তিতিক্ষু পাঠক, এস্থলে আমি করজোড়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। জর্মন রাজদূতের সঙ্গে আমার যোগাযোগের কাহিনীটা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং তার বয়ান ভ্রমণ-কাহিনীতে চাপানো যুক্তিযুক্ত কি না সে-বিষয়ে আমার মনে বড় দ্বিধা রয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে-হিরন্ময় পাত্রে সত্যস্বরূপ রস লুক্কায়িত আছেন তাঁর ব্যক্তি-হিরণ আপন চাকচিক্য দিয়ে আমার চোখ এমনি ধাঁধিয়ে দিয়েছে যে তাই দেখে আমি মুগ্ধ, সে-পূষণ কোথায় যিনি পাত্রখানি উন্মোচন করে আমার সামনে নৈর্ব্যক্তিক, আনন্দঘন, চিরন্তন রসসত্তা তুলে ধরবেন ?

বিপ্লবের একাদশী, ইংরেজ রাজদূতের বিদগ্ধ বর্বরতা, জর্মন রাজদূতের অযাচিত অনুগ্রহ অনাত্মীয় বৈরাগ্যে নিরীক্ষণ করা তো আমার কর্ম নয় !

জর্মন রাজদূতাবাস থেকে বেরিয়ে মনে পড়ল, বারো বৎসর পূর্বে আফগানিস্থান যখন পরাধীন ছিল তখন আমীর হবীব উল্লা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপকে এই বাড়ীতে রেখে অতিথি সৎকার করেছিলেন। এই বাড়ীর পাশেই হিন্দুস্থানের সম্রাট বাবুর বাদশার কবর ! সে-কবর দেখতে আমি বহুবার গিয়েছি, আজ যাবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু কেন জানিনে, পা দুখানা আমাকে সেই দিকেই টেনে নিয়ে গেল।

খোলা আকাশের নিচে কয়েকফালি পাথর দিয়ে বানানো অত্যন্ত সাদাসিদে কবর। মোগল সরকারের নগণ্যতম মুহুরিরের কবরও হিন্দুস্থানে এর চেয়ে বেশী জৌলুস ধরে। এ কবরের তুলনায় পুত্র হুমায়ুনের কবর তাজমহলেরও বাড়া। আর আকবর জাহাঙ্গীর যে-সব স্থপতি রেখে গিয়েছেন সেসব তো বাবুরের স্বপ্নও ছাড়িয়ে যায়।

বাবুরের আত্মজীবনী যাঁরা পড়েছেন তাঁরা এই কবরের পাশে দাঁড়ালে যে অনুভূতি পাবেন সে-অনুভূতি হুমায়ুন বা শাহজাহানের কবরের কাছে পাবেন না। বাবুর মোগল বংশের পত্তন করে গিয়েছেন এবং আরো বহু বহু বীর বহু বহু বংশের পত্তন করে গিয়েছেন কিন্তু বাবুরের মত সুসাহিত্যিক রাজা-রাজড়াদের ভিতর তো নেই-ই সাধারণ লোকের মধ্যেও কম। এবং সাহিত্যিক হিসেবে বাবুর ছিলেন অত্যন্ত সাধারণ মাটির মানুষ এবং সেই তত্ত্বটি তাঁর আত্মজীবনীর পাতায় পাতায় বার বার ধরা পড়ে। কবরের কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয় আমি আমারই মত মাটির মানুষ, যেন এক আত্মজনের সমাধির কাছে এসে দাঁড়িয়েছি।

আমাদের দেশের একজন ঐতিহাসিক সীজারের আত্মজীবনীর সঙ্গে বাবুরের আত্মজীবনীর তুলনা করতে গিয়ে প্রথমটির প্রশংসা করেছেন বেশী। তাঁর মতে বাবুরের আত্মজীবনী এ-শ্রেণীর লেখাতে দ্বিতীয় স্থান পায়। আমি ভিন্ন মত পোষণ করি। কিন্তু এখানে সে তর্ক জুড়ে পাঠককে আর হায়রান করতে চাইনে। আমার বক্তব্য শুধু এইটুকু : দুটি আত্মজীবনীই সাহিত্যসৃষ্টি, নীরস ইতিহাস নয়। এর মধ্যে ভালো মন্দ বিচার করতে হলে ঐতিহাসিক হবার কোনো প্রয়োজন নেই। যে-কোনো রসজ্ঞ পাঠক নিজের মুখেই ঝাল খেয়ে নিতে পারবেন। তবে আপসোস শুধু এইটুকু, বাবুর তাঁর কেতাব জগতাই-তুর্কীতে ও সীজার লাতিনে লিখেছেন বলে বই দুখানি মূলে পড়া আমাদের পক্ষে সোজা নয়। সান্ত্বনা এইটুকু যে, আমাদের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকও কেতাব দু'খানা অনুবাদে পড়েছেন।

পূর্বেই বলেছি কবরটি অত্যন্ত সাদামাটা এবং এতই অলঙ্কারবর্জিত যে তার বর্ণনা দিতে পারেন শুধু জবরদস্ত আলঙ্কারিকই। কারণ, বাবুর তাঁর দেহাস্থি কিভাবে রাখা হবে সে সম্বন্ধে এতই উদাসীন ছিলেন যে, নূর-ই-জহানের মত

'গরীব-গোরে দীপ জেল না ফুল দিও না
কেউ ভুলে—

শামা পোকার না পোড়ে পাখ, দাগা না পায়
বুলবুলে।’
(সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত)

কবিত্ব করেন নি, বা জহান-আরার মত

বহুমূল্য আভরণে   করিয়ো না সুসজ্জিত
কবর আমার
তৃণ-শ্রেষ্ঠ আভরণ   দীনা আত্মা জহান-আরা
সম্রাট-কন্যার।*

বলে পাঁচজনকে সাবধানে করে দেবার প্রয়োজনও বোধ করেননি। তবে একথা ঠিক, তিনি তাঁর শেষ শয্যা যেমন কর্মভূমি ভারতবর্ষে গ্রহণ করতে চাননি ঠিক তেমনি জন্মভূমি ফরগনাকেও মৃত্যুকালে স্মরণ করেননি।

যীশুখ্রীষ্ট বলেছেন—

“The foxes have holes and the birds of the air have nests: but the Son of the man hath not where to lay his head.”

রবীন্দ্রনাথও বলেছেন—

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিল
কে মোর আত্মপর ?
আমার বিধাতা আমাতে জাগিল
কোথায় আমার ঘর ?

জীবিতাবস্থায়ই যখন মহাপুরুষের আশ্রয়স্থল নেই তখন মৃত্যুর পর তার জন্মভূমিই বা কি আর মৃত্যুস্থলই বা কি ?

ইংরেজী ‘সার্ভে’ কথাটা গুজরাতীতে অনুবাদ করা হয় ‘সিংহাবলোকন’ দিয়ে। ‘বাবুর’ শব্দের অর্থ সিংহ। আমার মনে হল এই উঁচু পাহাড়ের উপর বাবুরের গোর দেওয়া সার্থক হয়েছে। এখান থেকে সমস্ত কাবুল উপত্যকা, পূর্বে ভারতমুখী গিরিশ্রেণী, উত্তরে ফরগনা যাবার পথের হিন্দুকুশ, সব কিছু ডাইনে বাঁয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে সিংহাবলোকনে দেখছেন সিংহরাজ বাবুর।

নেপোলিয়নের সমাধি-আস্তরণ নির্মাণ করা হয়েছে মাটিতে গর্ত করে সমতলভূমির বেশ খানিকটা নিচে। স্থপতিকে এরকম পরিকল্পনা করার অর্থ

---

* অনুবাদকের নাম ভুলে যাওয়ায় তাঁর কাছে লজ্জিত আছি।

বোঝাতে অনুরোধ করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, 'যে-সম্রাটের জীবিতাবস্থায় তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে সকলকেই মাথা হেঁট করতে হত, মৃত্যুর পরও তাঁর সামনে এলে সব জাতিকে যেন মাথা নিচু করে তাঁর শেষ-শয্যা দেখতে হয়।'

ফরগনার গিরিশিখরে দাঁড়িয়ে যে-বাবুর সিংহাবলোকন দিয়ে জীবনযাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, যে-সিংহাবলোকনদক্ষতা বাবুরের শিরে হিন্দুস্থানের রাজমুকুট পরিয়েছিল, সেই বাবুর মৃত্যুর পরও কি সিংহাবলোকন করতে চেয়েছিলেন ?

জীবনমরণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাই কি বাবুর কাবুলের গিরিশিখরে দেহাস্থি রক্ষা করার শেষ আদেশ দিয়েছিলেন ?

কিন্তু কি পরস্পর-বিরোধী প্রলাপ বকছি আমি ! একবার বলছি বাবুর তাঁর শেষ-শয্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন আর তার পরক্ষণেই ভাবছি মৃত্যুর পরও তিনি তাঁর বিহারস্থলের সম্মোহন কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবে কি মানুষের চিন্তা করার কল মগজে নয়, সেটা কি পেটে ? না-খেতে পেয়ে সে যন্ত্র স্টিয়ারিঙ-ভাঙা মোটরের মত চতুর্দিকে এলোপাতাড়ি ছুটোছুটি লাগিয়েছে ?

পিছন ফিরে শেষ বারের মত কবরের দিকে তাকাতে আমার মনের সব দ্বন্দ্বের অবসান হল। বরফের শুভ্র কম্বলে ঢাকা ফকীর বাবুর খোদাতালার সামনে সজদা (ভূমিষ্ঠ প্রণাম) নিয়ে যেন অন্তরের শেষ কামনা জানাচ্ছেন। কি সে কামনা ?

ইংরেজ-ধর্ষিত ভারতের জন্য মুক্তি-মোক্ষ-নজাত কামনা করছেন।

শিবাজী-উৎসবে গুরুদেব গেয়েছিলেন,

'মৃত্যু-সিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমর মূরতি
সমুন্নত ভালে
যে রাজ কীরিট শোভে তার দিব্যজ্যোতি লুকাবে না
কভু কোনো কালে।
তোমারে চিনেছি আজি হে রাজন, চিনেছি চিনেছি
তুমি মহারাজ
তব রাজকর লয়ে আট কোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ ॥'

প্রথম সেটি আবৃত্তি করলুম ; তারপর কুরান শরীফের আয়াত পড়ে, পরলোকগত আত্মার সদ্গতির জন্য মোনাজাত করে পাহাড় থেকে নেমে 'বাবুর-শাহ' গ্রামে এলুম।

শুনেছি মানস-সরোবর যাবার পথে নাকি তীর্থযাত্রীরা অসহ্য কষ্ট সত্ত্বেও মরে না,—মরে ফেরার পথে—শীত, বরফ, পাহাড়ের চড়াই ওৎরাই সহ্য হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। তখন নাকি তাদের সম্মুখে আর কোনো কাম্যবস্তু থাকে না বলে সব মনের জোর একদম লোপ পেয়ে যায়। ফিরে তো যেতে হবে সেই আপন বাসভূমে, দৈনন্দিন দুঃখযন্ত্রণা, আশা-নিরাশার একটানা জীবনস্রোতে। এ-বিরাট অভিজ্ঞতার পর সে-পতন এতই ভয়াবহ বলে মনে হয় যে তখন সামান্যতম সঙ্কটের সামনে তীর্থযাত্রী ভেঙে পড়ে আর বরফের বিছানায় সেই যে শুয়ে পড়ে তার থেকে আর কখনো ওঠে না।

আমার পা আর চলে না। কোমর ভেঙে পড়ছে। মাথা ঘুরছে।

শীতে হাত পায়ের আঙুলের ডগা জমে আসছে। কান আর নাক অনেকক্ষণ হল সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে গিয়েছে। জোরে হেঁটে যে গা গরম করব সে শক্তি আমার শরীরে আর নেই।

নির্জন রাস্তা। হঠাৎ মোড় ঘুরতেই সামনে দেখি উল্টো দিক থেকে আসছে গোটা আষ্টেক উর্দীপরা সেপাই। ভালো করে না তাকিয়েই বুঝতে পারলুম, এরা বাচ্চায়ে সকাওয়ের দলের ডাকাত—আমান উল্লার পলাতক সৈন্যদের ফেলে-দেওয়া উর্দী পরে নয়া শাহানশাহ বাদশার ভুঁইফোঁড় ফৌজের গণ্যমান্য সদস্য হয়েছেন। পিঠে চকচকে রাইফেল ঝোলানো, কোমরে বুলেটের বেল্ট আর চোখে মুখে যে ক্রূর, লোলুপ ভাব তার সঙ্গে তুলনা দিতে পারি এমন চেহারা আমি জেলের বাইরে ভিতরে কোথাও দেখিনি। জীবনের বেশীর ভাগ এরা কাটিয়েছে লোকচক্ষুর অন্তরালে, হয় গোরস্তানে নয় পর্বতগুহার আধা-আলো-অন্ধকারে। পুঞ্জীভূত আশুষ্ক পুরীষস্তূপকে শূকর উল্টেপাল্টে দিলে যে বীভৎস দুর্গন্ধ বেরোয় রাষ্ট্রবিপ্লবের উৎক্ষিপ্ত এই দস্যুদল আমার সামনে সেই রূপ সেই গন্ধ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল।

ডাকাতগুলোর গায়ে ওভারকোট নেই। সেই লোভেতেই তো তারা আমাকে খুন করতে পারে। নির্জন রাস্তায় নিরীহ পথিককে খুন করে তার সব কিছু লুটে নেওয়া তো এদের কাছে কোনো নূতন পুণ্যসঞ্চয় নয়।

আমার পালাবার শক্তি নেই, পথও নেই। তার উপরে আমি গাঁয়ের ছেলে। বাঘ দেখলে পালাই, কিন্তু বুনো শূয়োরের সামনে থেকে পালাতে কেমন যেন ঘেন্না বোধ হয়। পালাই অবশ্য দুই অবস্থাতেই।

আমার থেকে ডাকাতরা যখন প্রায় দশ গজ দূরে তখন তাদের সর্দার হঠাৎ

হুকুম দিল 'দাঁড়া'! সঙ্গে সঙ্গে আটজন লোক ভেড্ হন্ট্ করলো। দলপতি বলল, 'নিশান কর্'। সঙ্গে সঙ্গে আটখানা রাইফেলের গোল ছ্যাঁদা আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো।

ততক্ষণে আমিও থমকে দাঁড়িয়েছি কিন্তু তারপর কি হয়েছিল আমার আর ঠিক ঠিক মনে নেই।

আমার স্মরণশক্তির ফিল্ম পরে বিস্তর ডেভালাপ করেও তার থেকে এতটুকু আঁচড় বের করতে পারিনি। আমার চৈতন্যের শাটার তখন বিলকুল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে মনের সুপার ডবল এক্সও কোনো ছবি তুলতে পারেনি।

আটখানা রাইফেলের অন্ধকোটর আমার দিকে তাকিয়ে আর আমি ঠায় দাঁড়িয়ে, এ দৃশ্যটা আমি তারপর বারকয়েক স্বপ্নেও দেখেছি, কাজেই আজ আর হলপ করে বলতে পারব না কোন্ ঘটনা কোন্ চিন্তাটা সত্যি 'বাবুর শাহ' গ্রামের কাছে বাস্তবে ঘটেছিল আর কোন্টা স্বপ্নের কল্পনা মাত্র।

আবছা আবছা শুধু একটি কথা মনে পড়ছে, কিন্তু আবার বলছি হলপ করতে পারব না।

আমার ডান হাত ছিল ওভারকোটের পকেটে ও তাতে ছিল আবদুর রহমানের গুঁজে দেওয়া ছোট্ট পিস্তলটি। একবার বোধ করি লোভ হয়েছিল সেই পিস্তল বের করে অন্ততঃ এক ব্যাটা বদমাইশকে খুন করার। মনে হয়েছিল, মরব যখন নিশ্চয়ই তখন স্বর্গে যাবার পুণ্যটাও জীবনের শেষ মুহূর্তে সঞ্চয় করে নিই।

আজ আমার আর দুঃখের সীমা নেই, কেন সেদিন গুলি করলুম না।

'পাগলা' বাদশা মুহম্মদ তুগলুক তাঁর প্রজাদের ব্যবহারে, এবং প্রজারা তাঁর ব্যবহারে এতই তিতবিরক্ত হয়ে উঠেছিল যে তিনি যখন মারা গেলেন তখন তুগলুকের সহচর ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দিন বরনী বলেছিলেন, 'মৃত্যুর ভিতর দিয়ে বাদশা তাঁর প্রজাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলেন, প্রজারা বাদশার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল।'

সেদিন পুণ্যসঞ্চয়ের লোভে যদি গুলি চালাতুম তা হলে সংসারের পাঁচজন আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতেন, আমিও তাঁদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতুম।

হঠাৎ শুনি অট্টহাস্য। 'তরসীদ', 'তরসীদ', সবাই চেঁচিয়ে বলছে, 'তরসীদ'— অর্থাৎ 'ভয় পেয়েছে, ভয় পেয়েছে, লোকটা ভয় পেয়েছে রে।' আর সঙ্গে সঙ্গে সবাই হেসে কুটিকুটি। কেউ মোটা গলায় থক্ থক্ করে কেউ বন্দুকটা বগলদাবায়

চেপে খ্যাক খ্যাক করে, কেউ ড্রইংরুমবিহারিণীদের মত দু'হাত তুলে কলরব করে, আর দু-একজন আমার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মিটমিটিয়ে।

একজন হেঁড়ে গলায় বলল, 'এই মুরগীটাকে মারার জন্য আটটা বুলেটের বাজে খর্চা! ইয়া আল্লা!'

আমার দৈর্ঘ্য প্রস্থের বর্ণনা দেব না, কারণ গড়পরতা বাঙালীকে 'মুরগী' বলার হক্ এদের আছে।

'মুরগী' হই আর মোরগই হই, আমি কসাইয়ের হাত থেকে খালাস পাওয়া মুরগীর মত পালাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু পেটের ভিতর কি রকম একটা অদ্ভুত ব্যথা আরম্ভ হয়ে যাওয়াতে অতি আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করলুম।

আফগান রসিকতা হাস্যরস না রুদ্ররসের পর্যায়ে পড়ে সে বিচার আলঙ্কারিকেরা করবেন। আমার মনে হয় রসটা বীভৎসতাপ্রধান বলে 'মহামাংসে'র ওজনে এটাকে 'মহারস' বলা যেতে পারে।

কিন্তু এই আমার শেষ পরীক্ষা নয়।

বাড়ী থেকে ফার্লংখানেক দূরে আরেকদল ডাকাতের সঙ্গে দেখা; কিন্তু এদের সঙ্গে নূতন ঝকমকে য়ুনিফর্ম-পরা একটি ছোকরা অফিসার ছিল বলে বিশেষ দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হলুম না। দলটা যখন কাছে এসেছে, তখন অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে যেন চেনা-চেনা বলে মনে হল। আরে! এ তো দুদিন আগেও আমার ছাত্র ছিল। আর পড়াশোনায় এতই ডডনং এবং আকাটমূর্খ ছিল যে, তাকেই আমি আমার মাস্টারি জীবনে বকাঝকা করেছি সবচেয়ে বেশী।

সেই কথাটা মনে হতেই আমি আবার আটটা রাইফেলের চোঙা চোখের সামনে দেখতে পেলুম। ডাইনে গলি ছিল; বেয়াড়া ঘুড়ির মত গোত্তা খেয়ে সেদিকে ঢুঁ দিলুম। ছেলেটা যদি দাদ তোলার তাতে থাকে, তবে অক্কা না হোক কপালে বেইজ্জতি তো নিশ্চয়ই। হে মুরশিদ, কি কুক্ষণেই না এই দুশমনের পুরীতে এসেছিলুম। হে মৌলা আলী মেহেরবান, আমি জোড়া বকরী—।

পিছনে শুনি মিলিটারি বুটের ছুটে আসার শব্দ। তবেই হয়েছে। মুরশিদ, মৌলা সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছেন। ইংরিজী প্রবাদেরই তবে আশ্রয় নিই—'ইভ্‌ন দি ওয়ার্ম টার্নস।' ঘুরে দাঁড়ালুম। ছেলেটা চেঁচাচ্ছে, 'মুআল্লিম সায়েব, মুআল্লিম সায়েব।' কাছে এসে আবদুর রহমানী কায়দায় সে আমার হাত-দু'খানা তুলে ধরে বার বার চুমো খেল, কুশল জিজ্ঞেস করল এবং শেষটায় বেমক্কা ঘোরাঘুরির জন্য মুরুব্বির মত ঈষৎ তম্বীও করল। আমি 'হেঁ হেঁ, বিলক্ষণ, বিলক্ষণ,

তা আর বলতে, অল্‌হম্‌দুলিল্লা, অল্‌হম্‌দুলিল্লা, তওবা তওবা' বলে গেলুম—কখনো তাগ-মাফিক ঠিক জায়গায়, কখনো ভয়ের ধকল কাটাতে গিয়ে উল্টো-পাল্টা।

ফাঁড়া কেটে যাওয়ায় আমারও সাহস বেড়ে গিয়েছে। জিজ্ঞেস করলুম, 'এ বেশ কোথায় পেলে, বৎস?'

বাবুর-শাহ পাহাড়ের মত বুক উঁচু করে বৎস বলল, 'কর্নাইল শুদ্‌ম' অর্থাৎ আমি কর্নেল হয়ে গিয়েছি।

ইয়া আল্লা! উনিশ বছর বয়সে রাতারাতি কর্নেল। আমাদের সুরেশ বিশ্বাসও—চেনার মধ্যে তো উনিই আমাদের নীলমণি—তো এত বড় কসরৎ দেখাতে পারেননি। আমার লোভ বেড়ে গেল। শুধালুম, 'জেনরাইল হবার দিল্লী কতদূর?'

গম্ভীরভাবে বলল, 'দূর নীস্ত্‌।'

খুদাতালা মেহেরবান, বিপ্লবটা বড়ই পয়মন্ত।

কর্নেল সাহেব বুঝিয়ে বললেন, 'আমীর হবীব উল্লা খান আমার পিসির দেবরের মামাশ্বশুর।'

সম্পর্কটা ঠিক কি বলেছিল, আমার মনে নেই, তবে এর চেয়ে ঘনিষ্ঠতার নয়। আমি অত্যন্ত গর্ব বোধ করলুম; ধন্য আমার মাস্টারি, ধন্য আমার শিষ্য, ধন্য এ বিপ্লব, ধন্য এ উপবাস। আমার শিষ্য রাতারাতি কর্নেল হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই অবস্থায়ই গেয়েছিলেন—

'এতদিনে জানলেম, যে কাঁদনে কাঁদলেম
সে কাহার জন্য
ধন্য এ-জাগরণ, ধন্য এ-ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য!'

স্থির করলুম, ফুরসৎ পাওয়া মাত্রই 'প্রবাসী'তে 'বঙ্গের বাহিরে বাঙালী' পর্যায়ে আমার কীর্তির খবরটা পাঠাতে হবে। এলাহাবাদ ব্রাহ্মসমাজের বাঙালী দারোয়ান মারা গেলে যখন সাড়ম্বর খবর বেরতে পারে, তখন আমার এ-কীর্তি উড়ে বলে কি বামুন নয়? পরের বাড়ী জ্বলছে সত্যি, তাই বলে সে আগুনে আমি সিগারেট ধরাবো না? আব্দার?

বললুম, 'তাহলে বৎস, যদি অনুমতি দাও তবে বাড়ী যাই।'

মিলিটারি কণ্ঠে বলল, 'আপনাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। রাস্তায় অনেক ডাকু।' বলে অজানায় সে আপন সঙ্গীদের দিকেই তাকালো। তাই সই। দান

উল্টে গিয়েছে। এখন তুমি গুরু, আমি শিষ্য।

আমাকে বাড়িতে পৌঁছিয়ে দিয়ে আমার বসবার ঘরে কর্নেল দু'দণ্ড রসালাপ করলেন, আমান উল্লাকে শাপমন্যি দিলেন ও মৌলানাকে মিলিটারি স্ট্র্যাটেজি সম্বন্ধে তালিম দিলেন।

আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যাবার সময় কর্নেল আবদুর রহমানের খাস কামরায় ঢুকল। কাবুলে ছাত্রেরা গুরুগৃহে ভৃত্যের সঙ্গে ধূমপান করে। কিন্তু আবদুর রহমান তো বিপদে পড়ল, বহুকাল থেকে তার তামাক বাড়ন্ত। লোকটা আবার ধাপ্পা দিতে জানে না,—আমার সঙ্গে এতদিন থেকেও। কিন্তু তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি? বনমালীও গুরুদেবের সঙ্গে বাস করে কবিতা লিখতে শেখেনি।

মৌলানা বললেন, 'সমস্ত সকাল কাটালুম ব্রিটিশ লিগেশন আর বাচ্চার পররাষ্ট্র দফতরে। কান্নাকাটিও কম করিনি। দাড়িতে হাত রেখে শপথ করে বললুম, 'দু'মাস হল শুকনো রুটি ছাড়া আর কিছু পেটে পড়েনি। আসছে পরশু থেকে সে-রুটিও আর জুটবে না।' ব্রিটিশ লিগেশনে বললুম, 'কাবুলের পিঁজরা থেকে মুক্তি দাও। 'পররাষ্ট্র দফতরে বললুম, দু'মুঠো অন্ন দাও'।'

আমি বললুম, 'পররাষ্ট্র দফতর আর মুদির দোকান এক প্রতিষ্ঠান নাকি? তোমার উচিত ছিল বলা—

'মুরগে সইয়াদ তু অম্ ইফতাদে অম্ দর দামে ইশ্ক্।
ইয়া ব্ কুশ্, ইয়া দানা দেহ্ ইয়া অজ কফস আজাদ কুন॥'

'পাখির মতন বাঁধা পড়ে গেছি কঠিন প্রেমের ফাঁদ।
হয় মেরে ফেলো, নয় দানা দাও, নয় খোলো এই বাঁধ॥'

তুমি তো মাত্র দুটো পন্থা বাৎলালে, হয় দানা দাও, নয় খোলো বাঁধ। তৃতীয়টা বললে না কেন? নয় মেরে ফেলো। আপ্তবাক্যের বিকলাঙ্গ উদ্ধৃতি গোবধের ন্যায় মহাপাপ।'

মৌলানা বললেন, 'তাই সই। শিক-কাবাব করে খাবো।'

শীতে ধুঁকছি, যেন কম্প দিয়ে ম্যালেরিয়া জ্বর। মাঝে মাঝে তন্দ্রা লাগছে। কখনো মনে হয় খাট থেকে পড়ে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে পা দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে হঠাৎ টান লম্বা হয়ে যায়। কখনো চিৎকার করে উঠি, 'আবদুর রহমান,

আবদুর রহমান।' কেউ আসে না। কখনো দেখি আবদুর রহমান খাটের বাজুতে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে বসে ; কিন্তু কই, তাকে তো ডাকিনি। শুনি, যে দু'-চারটে সামান্য মন্ত্র সে জানে তাই বিড় বিড় করে পড়ছে।

তার সঙ্গে দুঃস্বপ্ন ; অ্যারোপ্লেনে বসে আছি, বাচ্চার ডাকাতদল আটটা রাইফেল বাগিয়ে ছুটে আসছে, অ্যারোপ্লেন থামাবার জন্য, এঞ্জিন স্টার্ট নিচ্ছে না। একসঙ্গে আটটা রাইফেলের শব্দ। ঘুম ভেঙে যায়। শুনি সত্যিকার রাইফেলের আওয়াজ আর চিৎকার। পাড়ায় ডাকু পড়েছে।

আর দেখি মা ইলিশ মাছ ভাজছেন।

মাগো।

অন্ধকার হয়ে আসছে। আবদুর রহমান সাঁঝের পিদিম দেখাচ্ছে না কেন ? ওঃ, ভুলেই গিয়েছিলুম, কেরোসিন ফুরিয়ে গিয়েছে। আর কী-ই বা হবে তেল দিয়ে, জীবনপ্রদীপ যখন—। চুলোয় যাক্‌গে কবিত্ব।

কিন্তু সামনে এ কি ? প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি। তার ভিতরে আটা, রওগন, মটন, আলু, পেঁয়াজ, মুর্গী আরো কত কি ? তার সামনে বসে ভুঁইফোঁড় কর্নেল ; মিটমিটিয়ে হাসছে। ভারী বেয়াদব। আবার আবদুর রহমানের মুখ এত পাঙাশ কেন ? আমার ঘুম ভাঙছে না দেখে ভয় পেয়েছে ? নাঃ, এ তো ঘুম নয়, স্বপ্নও নয়।

আবদুর রহমান বলল, 'হুজুর, কর্নাইল সায়েব সওগাত এনেছেন।'

একদিনে মানুষ কত উত্তেজনা সইতে পারে ?

আবদুর রহমান আবার তাড়াতাড়ি বলল, 'হুজুর আমাকে দোষ দেবেন না ; আমি কিছু বলিনি।'

কর্নেল বলল, 'হুজুর যে কত কষ্ট পেয়েছেন তা আপনার চেহারা থেকেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু সবই খুদাতালার মরজি। এখন খুদাতালার মরজিতেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আপনি যে আমাকে কত স্নেহ করতেন, সে-কথা কি আমি ভুলে গিয়েছি ?'

আমি বললুম, 'সে কি কথা। তোমাকেই তো আমি সবচেয়ে বেশী বকেছি।'

কর্নেল ভারী খুশী। 'হাঁ, হাঁ, হুজুর সেই কথাই তো হচ্ছে। আপনারও তা হলে মনে আছে। আমাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ না করলে সবচেয়ে বেশী বকলেন কেন ?' তারপর মৌলানার দিকে তাকিয়ে খুশীতে গদগদ হয়ে বলল, 'জানেন

সায়েব, একদিন মুআল্লিম সায়েব আমার উপর এমনি চটে গেলেন যে, আমাকে বললেন একটা বেত নিয়ে আসতে। ক্লাসের সবাই তাজ্জব হয়ে গেল। আমাদের দেশের মাস্টার বেত আনায় কাপ্তেনকে দিয়ে, না হয় দুষ্ট ছেলের দুশমনকে দিয়ে। সে তখন বেছে বেছে তেজ বেত নিয়ে আসে। আমি তখন কি করলুম জানেন? ভাবলুম, মুআল্লিম সায়েব যখন আর কাউকে কখনো চাবুক মারেননি, তখন তাঁর বউনিতে ফাঁকি দিলে আমার অমঙ্গল হবে। নিয়ে এলুম একখানা পয়লা নম্বরের বেত।' তারপর কর্নেল মৌলানার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, 'মুআল্লিম সায়েব তখন কি করলেন, জানেন? বেতখানা হাতে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেতের কাঁটাগুলো কেটে ফেলিস নি কেন?' ছেলেরা সবাই বলল, 'তাহলে লাগবে কি করে?'

মৌলানা বললেন, 'সেদিন মার খেয়েছিলে বলেই তো আজ কর্নেল হয়েছ।'

কর্নেল আপশোষ করে বলল, 'না, মুআল্লিম সায়েব মারেননি। আমি তো তৈরী ছিলুম। আমার হাতে বেত লাগে না।' বলে তার হাত দু'খানা মৌলানায় সামনে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাল।

চাষার ছেলে হাত। অল্পবয়স থেকে কুহিস্তানের (কুহপর্বত) শক্ত জমিতে হাল ধরে ধরে দু'খানা হাতে কড়া পড়ে গিয়ে চেহারা হয়েছে মোষের কাঁধের মত। নখে চামড়ায় কোনো তফাৎ নেই, আর হাতের রেখা দেখে জ্যোতিষ শাস্ত্রে আমার ভক্তি বেড়ে গেল। লাঙলের ঘষায় হাতে অবশিষ্ট রয়েছে কুল্লে দেড়খানা রেখা। আয়ুরেখা তেলোর ইস্পার উস্পার, হেডলাইন নেই, আর হার্ট লাইন তেলোর মধ্যিখানে এসে আচম্বিতে 'মরুপথে হারালো ধারা।' ব্যস্। এই দেড়খানা লাইন নিয়ে সে সংসার চালাচ্ছে,—জুপিটার, ভিনাস, সলমনের মাউণ্ট, রেখা কোনো কিচ্ছুর বালাই নেই। আর আঙুলগুলো এমনি কুষ্ঠরোগীর মত এবড়ো-খেবড়ো যে, হাতের আকার জ্যোতিষ-শাস্ত্রের কোনো পর্যায়েই পড়ে না। না পড়ারই কথা, কারণ ডাকাত-গুষ্ঠীর ছেলে কর্নেল হয়েছে সবসুদ্ধ ক'টা, আর তাদের সংস্পর্শে এসেছেন ক'জন বরাহমিহির ক'জন কেইরো?

আবদুর রহমান ঝুড়ির সামনে মাথা নিচু করে বসে আছে।

মৌলানা কর্নেলকে ধন্যবাদ দিয়ে আবদুর রহমানকে ঝুড়ি রান্নাঘরে নিয়ে যেতে বললেন। সে ঝুড়ি নিয়ে উঠে দাঁড়াল, কিন্তু ঘর থেকে বেরল না। আমি নিরুপায় হয়ে কর্নেলকে বললুম, 'রাত্রে এখানেই খেয়ে যাও।'

আবদুর রহমান তৎক্ষণাৎ রান্নাঘরে চলে গেল।

কর্নেল বলল, 'আমাকে মাফ করতে হবে হুজুর। বাদশার সঙ্গে আমার রাত্রে খানা খাওয়ার হুকুম।'

মৌলানা শুধালেন, 'বাদশা কি খান?'

কর্নেল বললেন, 'সেই রুটি পনির আর কিসমিস। ক্বচিৎ কখনো দু'মুঠো পোলাও। বলেন, 'যে-খানা খেয়ে আমান উল্লা কাপুরুষের মত পালাল, আমি সে-খানা খেয়ে কাপুরুষ হয়ে যাব না?' তারপর দুষ্টুহাসি হেসে বলল, 'আমি ওসব কথায় কান দিই না। আমান উল্লার বাবুর্চিই এখনো রাজবাড়ীতে রাঁধে। আমি তাই পেট ভরে খাই।'

কর্নেল যাবার সময় বলে গেল, আমি যেন আহারাদি সম্বন্ধে আর দুশ্চিন্তা না করি।

দশ মিনিটের ভিতর আবদুর রহমান কর্নেলের আনা কাঠ দিয়ে আগুন জ্বেলে দিল।

আমি সে-আগুনের সামনে বসে সর্বাঙ্গে, মাংসে, রক্তে, হাড়ে, মজ্জায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে যে সঞ্জীবনী বহ্নির অভিযান অনুভব করলুম, তার তুলনা বা বর্ণনা দিতে পারি এমনতরো শারীরিক অভিজ্ঞতা বা আলঙ্কারিক ক্ষমতা আমার নেই। রোদে-ফাটা জমি যে রকম সেচের জল ফাটলে ফাটলে ছিদ্রে ছিদ্রে, কণায়-কণায় শুষে নেয়, আমার শরীরের অণু-পরমাণু যেন ঠিক তেমনি আগুনের গরম শুষে নিল। আমার মনে হল, ভগীরথ যে রকম জহ্নুধারা নিয়ে সগররাজের সহস্র সন্তানের প্রাণদান করার বিজয় অভিযানে বেরিয়েছিলেন স্বয়ং ধন্বন্তরি ঠিক সেইরকম সূক্ষ্ম শরীর ধারণ করে বহ্নিধারা সঙ্গে নিয়ে আমার অঙ্গে প্রবেশ করলেন।

মুদ্রিত নয়নে শিহরণে শিহরণে অনুভব করলুম প্রতি ভস্মকণায় জহ্নুকণার স্পর্শ, আমার শিশির-বিদ্ধ অচেতন অণুতে অণুতে কৃশাণুর দীপ্ত স্পর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠার অভিষেক।

সমস্ত দেহমন দিয়ে বুঝলুম আর্য ঐতিহ্য, ভারতীয় সভ্যতা, সনাতনধর্মের প্রথম শব্দব্রহ্ম ঋগ্বেদের প্রথম পদে কেন

'অগ্নিমীড়ে পুরোহিতম'

রূপে প্রকাশিত হয়েছেন।

এবং সেমিতি ধর্মজগতেও তো তাই। ইহুদী, খ্রীষ্ট, ইসলাম তিন ধর্মই সম্মিলিত কণ্ঠে স্বীকার করে, একমাত্র মানুষ যিনি পরমেশ্বরের সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি মুসা (মোজেস) এবং তখন পরমেশ্বর তাঁর প্রকাশের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন রুদ্ররূপে

বা 'তজল্লিতে'। মুসা অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন, যখন জ্ঞান ফিরে পেলেন, তখন দেখলেন তাঁর সামনের সব কিছু ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে।

গ্রীক দেবতা প্রমিথিয়ুস ও দেবরাজ জুপিটারে কলহ হয়েছিল অগ্নি নিয়ে। মানব-সভ্যতা আরম্ভ হয় প্রমিথিয়ুসের কাছ থেকে পাওয়া সেই অগ্নি দিয়ে। নলরাজ ইন্ধন প্রজ্বালনে সুচতুর ছিলেন বলেই কি তিনি দেবতাদের ঈর্ষাভাজন হলেন? 'নল' শব্দের অর্থ 'চোঙা', প্রমিথিয়ুসও আগুন চুরি করেছিলেন চোঙার ভিতরে করে।

ভারতীয় আর্য, গ্রীক আর্য দুই গোষ্ঠী, এবং তৃতীয় গোষ্ঠী ইরানী আর্য জরথুস্ত্রী —সকলেই অগ্নিকে সম্মান করেছেন। হয়ত এঁরা সকলেই এককালে শীতের দেশে ছিলেন এবং অগ্নির মূল্য এঁরা জানতেন, কিন্তু সেমিতি ভূমি উষ্ণপ্রধান, সেখানে অগ্নিমাহাত্ম্য কেন? তবে কি মরুভূমির মানুষ সূর্যের একচ্ছত্রাধিপত্য সম্বন্ধে এতই সচেতন যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একচ্ছত্রাধিপতির রুদ্ররূপ বা 'তজল্লিতে' অগ্নিরই আভাস পায়?

আগুনের পরশমণির ছোঁয়া লেগে শরীর ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হচ্ছে আর ওদিকে মগজে হুশ হুশ করে থিয়োরির পর থিয়োরি গড়ে উঠছে; নিজের পাণ্ডিত্যের প্রতি এতই গভীর শ্রদ্ধা হল যে, 'সাধু, সাধু' বলে নিজের পিঠ নিজেই চাপড়াতে গিয়ে হাতটা মচকে গেল। এমন সময় হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শয়তান, ডেভিল, বিয়ালজিবাব, লুসিফার সবাই আগুনের তৈরী; তাঁরা আগুনের রাজা। নরকের আবহাওয়া আগুন দিয়ে ঠাসা, এঁদের শরীর আগুনে গড়া না হলে এঁরা সেখানে থাকবেন কি প্রকারে?

হায়, হায়, আমার বহু মূল্যবান থিয়োরিখানা শয়তানের পাল্লায় পড়ে নরকের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল!

কোথায় লাগে নরগিস্, রজনীগন্ধাকে বাখানিয়া কবিতা লেখে কোন্ মূর্খ! বিরয়ানি—কোর্মা—কাবাব—মুসল্লম থেকে যে খুশবাই বেরোয় তার কাছে সব ফুল হার তো মানেই, প্রিয়ার চিকুরসুবাসও তার কাছে নস্যি।

চোখ মেলে দেখি, আবদুর রহমান বেনকুয়েট সাজিয়েছে। মৌলানা ফশরঙ্গালালি করছেন আর আমার বেরাল দুটো এক মাস অজ্ঞাতবাস করে ফের থানা-কামরায় এসে উন্নাসিক হয়ে মাইভিয়ার মাইভিয়ার আওয়াজ বের করেছে।

আবহুর রহমান আমাদের পরিচয়ের পয়লা রাত্তিরে যে ডিনার ছেড়েছিল এ ডিনার সে মালেরই সিল্কে বাঁধানো, প্রিয়জনের উপহারোপযোগী, পূজোর বাজারের রাজ-সংস্করণ। জানটা তর হয়ে গেল। মৌলানা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন,

'জিন্দাবাদ গাজী আবহুর রহমান খান!'

আমি গলা এক পর্দা চড়িয়ে দোস্ত-মুহম্মদী কায়দায় বললুম,

'কমরৎ ব্ শিকনদ, খুদা তোরা কোর সাজদ্, ব্ পুন্দী, ব্ তরকী' (তোর কোমর ভেঙে দু' টুকরো হোক, খুদা তোর দু' চোখ কানা করে দিন, তুই ফুলে উঠে ঢাকের মত হয়ে যা, তারপর টুকরো টুকরো হয়ে ফেটে যা)।'

মৌলানা বজ্রাহত। গুণী লোক, এসব কটু-কাটব্যের সন্ধান তিনি পাবেন কি করে? কিন্তু বালাই দূর করবার এই জনপদ-পন্থা আবহুর রহমান বিলক্ষণ জানে।* অদৃশ্য সাবানে হাত কচলাতে কচলাতে বলল, 'হাত ধুয়ে নিন সায়েব, গরম জল আছে।'

কি বললে? গরম জল! আ-হা-হা। কতদিন বাদে গরম জলের সুখস্পর্শ পাব! কোথায় লাগে তার কাছে নববর্ষণে স্তনাঙ্কয়া বসন্তসেনার জলাভিষেক, কোথায় লাগে তার কাছে মুগ্ধ চারুদত্তের বিহ্বল প্রশস্তি। বললুম, 'বরাদর আবহুর রহমান, এই গরম জল দিয়ে তুমি যেন তোমার ডিনারখানা সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে দিলে।'

আবহুর রহমানের খুশির অন্ত নেই। আমার কোনো কথার উত্তর দেয় না, আর বেশী প্রশংসা করলে শুধু বলে, 'আলহামদুলিল্লা' অর্থাৎ 'খুদাতালাকে ধন্যবাদ'। যতক্ষণ এটা ওটা গুছোচ্ছিল আমার বার বার নজর পড়ছিল তার হাত দু'খানা কি রকম শুকিয়ে গিয়েছে, আর বাসন-বর্তন নাড়াচাড়া করার সময় অল্প অল্প কাঁপছে।

মৌলানা আমাকে সাবধান করে দিলেন, প্রতি গ্রাস যেন বত্রিশবার চিবিয়ে খাই। কাজের বেলা দেখা গেল, ডাকগাড়ী থেকে নেমে গোরারা যে-রকম রিফ্রেশমেণ্টরুমে খানা খায় আমরা সেই তালেই খাচ্ছি। পেটের এক কোণ ভর্তি হতেই আমি আবহুর রহমানকে লক্ষ্য করে বললুম, 'এরকম রান্না পেলে আমি আরো কিছুদিন কাবুলে থাকতে রাজী আছি।' সে-দুর্দিনে এর চেয়ে বড় প্রশংসা আর কি করা যায়!

---

* ঊনবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

কিন্তু মৌলানা প্রোষিত-ভার্যা। পেট খানিকটা ভরে যাওয়ায় তাঁর বিরহ-যন্ত্রণাটা যেন মাথা খাড়া করে দাঁড়াল। বললেন, 'না,

সন্গে ওতন্ অজ্ তখতে স্থলেমান বেশতর,
খারে ওতন্ অজ্ গুলে রেহান বেহতর,
ইউস্থফ কি দর মিস্র্ পাদশাহী মীকরদ
মীগুফ্ৎ 'গদা বুদনে কিনান খুশতর।'

দেশের পাথর স্থলেমান শার
    তখতের চেয়ে সেরা
বিদেশের ফুল হার মেনে যায়
    দিশী কাঁটা প্রাণ কাড়া।
মিশর দেশের সিংহাসনেতে
    বসিয়া ইস্থফ রাজা
কহিত, 'হায়রে এর চেয়ে ভালো
    কিনানে ভিখারী সাজা।'

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম,

'ইউস্থফে গুম্ গশ্তে বাজ্ আয়দ ব্ কনান,
    গম্ ম্ খুর্।
কুলবয়ে ইহজান্ শওদ রুজি গুলিস্তান,
    গম্ ম্ খুর্॥

দুঃখ করো না হারানো ইস্থফ
    কিনানে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ মরু পুনঃ
    হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।' (কাজী নজরুল ইসলাম)

কিন্তু বয়েত-বাজী বা কবির লড়াই বেশীক্ষণ চলল না। সাঁতারের সময় পয়লা দম ফুরিয়ে যাবার খানিকক্ষণ পরে মানুষ যে রকম দুসরা দম পায়, আমরা ঠিক সেই রকম খানিকক্ষন ক্ষান্ত দিয়ে আবার মাথায় গামছা বেঁধে খেতে লেগেছি।

এদিকে দেখি সব কিছু ফুরিয়ে আসছে—প্রথম পরিবেষণে কম মেকদারে দেওয়ার তালিম আবদুর রহমান আমার কাছ থেকেই পেয়েছে—কিন্তু আর কিছু আনছে না। থাকতে না পেরে বললুম, 'আরো নিয়ে এস।'

আবদুর রহমান চুপ। আমি বললুম, 'আরো নিয়ে এস।' তখন বলে কি না সব কিছু ফুরিয়ে গিয়েছে। মৌলানা আর আমি তখন যেন রক্তের স্বাদ পেয়ে হন্যে হয়ে উঠেছি। আমি ভয়ঙ্কর চটে গিয়ে বললুম, 'তোমার উপযুক্ত শিক্ষা হওয়ার প্রয়োজন। যাও তোমার নিজের জন্য যা রেখেছ তাই নিয়ে এস।' আবদুর রহমান যায় না। শেষটায় বললে, সে সব কিছুই পরিবেষণ করে দিয়েছে, নিজে রুটি পনির খাবে।

আমি তার কঞ্জুসি দেখে ক্ষিপ্ত-প্রায়। উন্মাদ, মূর্খ, হস্তী হেন শব্দ নেই যা আমি গালাগালে ব্যবহার করিনি। মৌলানা শান্ত প্রকৃতির লোক, কড়া কথা মুখ দিয়ে বেরোয় না। তিনি পর্যন্ত আপন বিরক্তি সুস্পষ্ট ফার্সী ভাষায় জানিয়ে দিলেন। আবদুর রহমান চুপ করে সব কিছু শুনল। হাসল না সত্যি—কিন্তু কই, মুখখানা একটু মলিনও হল না। আমি আরো চটে গিয়ে বললুম 'তোমাকে চাকর রাখার ঝকমারিটা বোঝাবার এই কি মোকা? এর চেয়ে তো শুকনো রুটি আর নুনই ভালো ছিল।' কথা যতই বলছি চটে যাচ্ছি ততই বেশী। শেষটায় বললুম, 'আমি মরে গেলে আচ্ছা করে খানা রেঁধে—আর প্রচুর পরিমাণে, বুঝলে তো?—মসজিদে নিয়ে গিয়ে আমার ফাতেহা বিলিয়ো।' অর্থাৎ আমার পিণ্ডি চটকিয়ো।

তখন মৌলানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দু'লহমা সবুর করুন, পেট আপনার থেকেই ভরে যাবে।'

মৌলানা পর্যন্ত রেগে টং। পুরুষ্টু পাঁঠার মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পাদ্রী সাহেবরা গাঁয়ে ঢুকে ক্ষুধাতুর চাষাকে এই রকম উপদেশ দেয় বটে। 'স্বর্গরাজ্য ফর্গরাজ্য' কি সব বলে। কিন্তু আবদুর রহমান খালি পেটে উপদেশটা দিয়েছে বলে মৌলানা দাড়িতে হাত রেখে অভিসম্পাত দিতে দিতে থেমে গেলেন। আমি বললুম, 'বিদ্রোহে কতলোক গুলি খেয়ে মরল, তোমার জন্য—'

ততক্ষণে আবদুর রহমান বেরিয়ে গিয়েছে। একেই বলে কৃতজ্ঞতা। যে আবদুর রহমানকে পাঁচ মিনিট আগে সুলেমানের তখ্‌তে বসাবার জন্য লাজারুসে সিংহাসন অর্ডার দেব দেব করছিলুম সেই আবদুর রহমানকে তখন জাহান্নামে পাঠাবার জন্য টিকিট কাটবার বন্দোবস্ত করছি।

আবদুর রহমান নিশ্চয়ই ফলিত জ্যোতিষ জানে। দু' মিনিটের ভিতর ক্ষুধা গেল। পাঁচ মিনিট পরে পেটের ভিতর মহারাণীর রাজত্ব—বিলকুল ঠাণ্ডা। কিন্তু তারপর আরম্ভ হল বিপ্লব। সে কি অসম্ভব হাঁচড় পাঁচড় আর আইঢাই। খাটে শুয়ে পড়েছি, অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করছি আর গরমের চোটে কপাল দিয়ে ঘাম বেরচ্ছে। মৌলানারও একই অবস্থা। তিনিই প্রথম বললেন, 'বড্ড বেশী খাওয়া হয়ে গিয়েছে।'

প্রাণ যায় আর কি। আর বেশী খেলে দেখতে হত না। 'ও, আবদুর রহমান, এদিকে আয় বাবা।'

আবদুর রহমান এসে ববল, 'আমার কাছে সুলেমানী নুন আছে, তারই খানিকটা দেব ?'

এরকম গুণীর চন্নামেত্তো খেতে হয়, এর হাতের হজমী ডাঙ্গস হয়ে আমার পেটের বিপ্লব নিশ্চয়ই কাবু করে নিয়ে আসবে। বললুম, 'তাই দে, বাবা।' কিন্তু গিলতে গিয়ে দেখি, শ্রাদ্ধভোজনের পর আমাদের ব্রাহ্মণের গুলি গিলতে গিয়ে যে-অবস্থা হয়েছিল আমারও তাই। শুনেছি অত্যধিক সংযম করে মুনি-ঋষিরা উর্ধ্বরেতা হন, আমি অত্যধিক ভোজন করে উর্ধ্ব-ভোজা হয়ে গিয়েছি।

নুন খেয়ে আরাম বোধ করলুম। আবদুর রহমানকে আশীর্বাদ করে বললুম, "বাবা তুমি দারোগা হও।' ইচ্ছে করেই 'রাজা হও' বললুম না—কাবুলে রাজা হওয়ার কি সুখ সে তো চোখের সামনে স্পষ্ট দেখলুম।

উত্তেজনার শেষ নাই। আবদুর রহমানের পিছনে ঢুকল উর্দি পরা এক মূর্তি। ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের পিয়ন। দেখেই মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল। মৌলানাকে বললুম, 'তদারক করো তো ব্যাপারটা কি ?'

একখানা চিরকুট। তার মর্ম আগামী কল্য দশটার সময় যে প্লেন ভারতবর্ষ যাবে তাতে মৌলানা ও আমার জন্য দুটি সীট আছে। আনন্দের আতিশয্যে মৌলানা সোফার উপর শুয়ে পড়লেন। আমাদের এমনই দুরবস্থা যে, পিয়নকে বখশিশ দেবার কড়ি আমাদের গাঁটে নেই।

'ফেবার' না 'রাইট' হিসেবে জায়গা পেলুম তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হল না। আবদুর রহমান ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে—চুপ করে চলে গেল। মৌলানার আনন্দ ধরে না। বিবি সম্বন্ধে তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। বিয়ের অল্প কিছুদিন পরেই তিনি তাঁকে কাবুল নিয়ে এসেছিলেন বলে নূতন বউ বাড়ির আর পাঁচ

জনের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাননি। এখন অন্তঃসত্বা অবস্থায় তিনি কি করে দিন কাটাচ্ছেন সে কথা ভেবে ভেবে ভদ্রলোক দাড়ি পাকিয়ে ফেলেছিলেন।

আমিও কম খুশী হইনি। মা বাবা নিশ্চয়ই অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন। বাবা আবার 'দি স্টেটসমেন' থেকে আরম্ভ করে 'প্রিন্টেড এণ্ড পাবলিশ্‌ড্ বাই' পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কাগজ পড়েন। অ্যারোপ্লেনে করে ব্রিটিশ লিগেশনের জন্য ভারতীয় খবরের কাগজ আসত। তারই একখানা মৌলানা কি করে যোগাড় করেছিলেন এবং তাতে আফগান রাষ্ট্রবিপ্লব ও কাবুলের বর্ণনা পড়ে বুঝলুম খবরের কাগজের রিপোর্টারের কল্পনাশক্তি সত্যকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে। গাছে আর মাছে বানানো গল্প, পেশাওয়ারে বোতলের পাশে বসে লেখা। এ বর্ণনাটি বাবা পড়লেই হয়েছে আর কি। আমার খবরের আশায় ডাকঘরে থানা গাড়বেন।

মৌলানা চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছেন। মানুষ যখন ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন দেখে তখন কথা কয় কম।

ওদিকে এখনো কান্না থামেনি। পাশের বাড়ির দরজা খুললে এখনো মাঝে মাঝে কান্নার শব্দ আসে। আবদুর রহমান বলেছে, কর্নেলের বুড়ী মা কিছুতেই শান্ত হতে পারছেন না। ঐ তাঁর একমাত্র ছেলে ছিলেন।

মায়ে মায়ে তফাৎ নেই। বীরের মা যে রকম ডুকরে কাঁদছে ঠিক সেই রকমই শুনেছি দেশে, চাষা মরলে।

ঘুমিয়ে পড়ব পড়ব এমন সময় দেখি খাটের বাজুতে হাত রেখে নিচে বসে আবদুর রহমান। জিজ্ঞেস করলুম, 'কি বাচ্চা?'

আবদুর রহমান বলল, 'আমাকে সঙ্গে করে আপনার দেশে নিয়ে চলুন।'

'পাগল নাকি? তুই কোথায় বিদেশ যাবি? তোর বাপ মা, বউ?' কোনো কথা শোনে না, কোনো যুক্তি মানে না। 'অ্যারোপ্লেনে তোকে নেবে কেন? আর তারা রাজী হলেও বাচ্চার কড়া হুকুম রয়েছে কোনো আফগান যেন দেশত্যাগ না করে। তোকে নিলে বাচ্চা ইংরেজের গলা কেটে ফেলবে না? ওরে পাগল, আজ কাবুলের অনেক লোক রাজী আছে প্লেনে একটা সীটের জন্য লক্ষ টাকা দিতে।'

নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। বলে, আমি রাজী হলে সে সকলের হাতে পায়ে ধরে এক কোণে একটু জায়গা করে নেবে।

কী মুশকিল। বললুম, 'তুই মৌলানাকে ডাক। তিনি তোকে সব কিছু বুঝিয়ে দেবেন।' আবদুর রহমান যায় না। শেষটায় বলল, 'উনি আমার কে?'

তারপর ফের অনুনয়বিনয় করে। তবে কি তার খেদমতে বড্ড বেশী ত্রুটি গলদ, না আমার বাপ মা তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে চটে যাবেন? আমার বিয়ের 'শাদিয়ানাতে' বন্দুক ছুঁড়বে কে?

আবদুর রহমান পানশির আর বরফ এই দুই বস্তু ছাড়া আর কোনো জিনিস গুছিয়ে বলতে পারে না। তার উপর সে আমার কাছ থেকে কোনো দিন কোনো জিনিস, কোনো অনুগ্রহ চায়নি। আজ চাইতে গিয়ে সে যেসব অনুনয়বিনয়, কাকুতিমিনতি করল সেগুলো গুছিয়ে বললে তো ঠিক ঠিক বলা হবে না। ওদিকে তার এক একটা কথা, এক একটা অভিমান আমার মনের উপর এমনি দাগ কেটে যাচ্ছিল যে, আমিও আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। আর বলবই বা কি ছাই। সমস্ত জিনিসটা এমনি অসম্ভব, এমনি অবিশ্বাস্য যে, তার বিরুদ্ধে আমি যুক্তি চালাবো কোথায়? ভূতকে কি পিস্তলের গুলি দিয়ে মারা যায়?

আমি দুঃখে বেদনায় ক্লান্ত হয়ে চুপ করে গেলে আবদুর রহমান ভাবে সে বুঝি আমাকে শায়েস্তা করে এনেছে। তখন দ্বিগুণ উৎসাহে আরও আবোল-তাবোল বকে। কথার খেই হারিয়ে ফেলে এক কথা পঞ্চাশ বার বলে। আমার মা বাপকে এমনি খেদমত করবে যে, তাঁরা তাকে গ্রহণ না করে থাকতে পারবেন না। আমি যদি তখন বলতুম যে, আমার মা গরিব কাবলীওলাকেও দোর থেকে ফেরান না, তা হলে আর রক্ষে ছিল না।

আমারই বরাত। কি কুক্ষণে তাকে একদিন গুরুদেবের 'কাবুলীওয়ালা' গল্পটা ফার্সীতে তর্জমা করে শুনিয়েছিলুম, সে আজ সেই গল্প থেকে নজির তুলতে আরম্ভ করল। মিনি যখন অচেনা কাবুলীওয়ালাকে ভালবাসতে পারল, তখন আমার ভাইপো ভাইঝিরাই তাকে ভালবাসবে না কেন?

'সব হবে, কিন্তু তুমি যাবে কি করে?'

'সে আমি দেখে নেব।'

ছোট্ট শিশু মায়ের কাছে যে রকম অসম্ভব জিনিস চায়। কোনো কথা শুনতে চায় না, কোনো ওজর আপত্তিতে কান দেয় না।

এত দীর্ঘকাল ধরে আবদুর রহমান আমার সঙ্গে কখনো কথা কাটাকাটি করেনি। আমি শেষটায় নিরুপায় হয়ে বললুম, 'তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার কি রকম কষ্ট হচ্ছে তুমি জানো, তুমি সেটা আর বাড়িয়ো না। তোমাকে আমার শেষ আদেশ, তুমি এখানে থাকবে এবং যে মুহূর্তে পানশির যাবার সুযোগ পাবে, সেই মুহূর্তেই বাড়ি চলে যাবে।'

আবদুর রহমান চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'তবে কি হুজুর আর কাবুল ফিরে আসবেন না ?'

আমি কি উত্তর দিয়েছিলুম, সে কথা দয়া করে আর শুধাবেন না।

বিয়াল্লিশ

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে পড়ল, আবদুর রহমান। সঙ্গে সঙ্গে সে এসে ঘরে ঢুকল। রুটি, মমলেট, পনির, চা। অন্যদিন খাবার দিয়ে চলে যেত, আজ সামনে দাঁড়িয়ে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে রইল। কী মুশকিল।

মৌলানা এসে বললেন, 'চিরকুটে লেখা আছে, মাথাপিছু দশ পৌণ্ড লগেজ নিয়ে যেতে দেবে। কি রাখি, কি নিয়ে যাই ?'

আমি বললুম, 'যা রেখে যাবে তা আর কোনোদিন ফিরে পাবে না। আমি আবদুর রহমানকে বলেছি পানশির চলে যেতে। বাড়ি পাহারা দেবার জন্য কেউ থাকবে না, কাজেই সব কিছু লুট হবে।'

'কারো বাড়িতে সব কিছু সমঝিয়ে দিয়ে গেলে হয় না ?'

আমি বললুম, 'এ পরিস্থিতিটা একদিন হতে পারে জেনে আমি ভিতরে ভিতরে খবর নিয়েছিলুম। শুনলুম, যখন চতুর্দিকে লুট-তরাজের ভয়, তখন কাউকে মালের জিম্মাদারি নিতে অনুরোধ করা এ দেশের রেওয়াজ নয়। কারণ কেউ যদি জিম্মাদারি নিতে রাজীও হয়, তখন তার বাড়িতে ডবল মালের আশায় লুটের ডবল সম্ভাবনা। মালপত্র যখন সদর রাস্তা দিয়ে যাবে, তখন ডাকাতেরা বেশ করে চিনে নেবে মালগুলো কোন্ বাড়িতে গিয়ে উঠল।'

বলে তো দিলুম মৌলানাকে সব কিছু প্রাঞ্জল ভাষায় কিন্তু ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন চারিদিকে তাকালুম, তখন মনে যে প্রশ্ন উঠল তার কোনো উত্তর নেই। নিয়ে যাব কি, আর রেখে যাব কি ?

ঐ তো আমার দু'ভলুম রাশান অভিধান। এরা এসেছে মস্কো থেকে ট্রেনে করে তাশকন্দ, সেখান থেকে মোটরে করে আমুদরিয়া, তারপর খেয়া পেরিয়ে, খচ্চরের পিঠে চেপে সমস্ত উত্তর আফগানিস্থান পিছনে ফেলে, হিন্দুকুশের চড়াই-ওতরাই ভেঙে এসে পৌঁচেছে কাবুল। ওজন পৌণ্ড ছয়েক হবে।

আমি সাহিত্য সৃষ্টি করি না, কাজেই পাণ্ডুলিপির বালাই নেই—মৌলানার

থেকে সেদিক দিয়ে আমার কপাল ভালো—কিন্তু শান্তিনিকেতনে গুরুদেবের ক্লাসে বলাকা, গোরা, শেলি, কীটস সম্বন্ধে যে গাদা গাদা নোট নিয়েছিলুম এবং মূর্খের মত এখানে নিয়ে এসেছিলুম, বরফবর্ষণের দীর্ঘ অবসরে সেগুলোকে যদি কোনো কাজে লাগানো যায় সেই ভরসায়, তার কি হবে ? ওজন তো কিছু কম নয়।

আর সব অভিধান, ব্যাকরণ, মিনুদির দেওয়া 'পূরবী', বিনোদের দেওয়া ছবি, বন্ধুবান্ধবের ফটোগ্রাফ, আর এক বন্ধুর জন্য কাবুলে কেনা দুখানা বোখারা কার্পেট ? ওজন তিন লাশ।

কাপড়চোপড় ? দেরেশি-পাগল কাবুলের লৌকিকতা রক্ষার জন্য স্মোকিঙ, টেল, মর্ণিংস্যুট (কাবুলের সরকারী ভাষায় 'বঁ জুর দেরেশি' !)। এগুলোর জন্য আমার সিকি পয়সার দরদ নেই কিন্তু যদি জর্মনী যাবার সুযোগ ঘটে, তবে আবার নূতন করে বানাবার পয়সা পাব কোথায় ?

ভুলেই গিয়েছিলুম। এক জোড়া চীনা 'ভাজ'। পাতিনেবুর মত রং আর চোখ বন্ধ করে হাত বুলোলে মনে হয় যেন পাতিনেবুরই গায়ে হাত বুলোচ্ছি, একটু জোরে চাপ দিলে বুঝি নখ ভিতরে ঢুকে যাবে।

কত ছোটখাটো টুকিটাকি। পৃথিবীর আর কারো কাছে এদের কোনো দাম নেই, কিন্তু আমার কাছে এদের প্রত্যেকটি আলাউদ্দীনের প্রদীপ।

সোক্রাতেসকে একদিন তাঁর শিষ্যের পাল শহরের সবচেয়ে সেরা দোকান দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। সে-দোকানে দুনিয়ার যত সব দামী দামী প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় জিনিস, অদ্ভুত অদ্ভুত বিলাসসম্ভার, মিশর বাবিলনের কলা-নিদর্শন, পাপিরসের বাণ্ডিল, আলকেমির সরঞ্জাম সব কিছুই ছিল। সোক্রাতেসের চোখের পলক পড়ে না। এটা দেখছেন, সেটা নাড়ছেন আর চোখ দুটো ছানাবড়ার সাইজ পেরিয়ে শেষটায় সসারের আকার ধারণ করেছে। শিষ্যেরা মহাখুশী—গুরু যে এত কৃচ্ছ্রসাধন আর ত্যাগের উপদেশ কপচান সে শুধু কোনো সত্যিকার ভালো জিনিস দেখেননি বলে—এইবার দেখা যাক, গুরু কি বলেন। স্বয়ং প্লাতো গুরুর বিহ্বল ভাব দেখে অস্বস্তি অনুভব করছেন।

দেখা শেষ হলে সোক্রাতেস করুণকণ্ঠে বলেন, 'হায়, হায় ! দুনিয়া কত চিত্র বিচিত্র জিনিসে ভর্তি যার একটারও আমার প্রয়োজন নেই।'

আমার ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি হৃদয়ঙ্গম করলুম, সোক্রাতেসে আমাতে মাত্র একটি সামান্য তফাত—এ ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসেরই আমার প্রয়োজন। ব্যস—ঐ একটি মাত্র পার্থক্য। ভার্বি জিতেছে ৫৩৭৮৬ নম্বরের টিকিট। আমি

কিনেছিলুম ৫৩৭৮৫ নম্বরের টিকিট। তফাতটা এমন কি হল?

মুসলমানের ছেলে, নিমতলা যাব না, যাবো একদিন গোবরা—অবশ্য যদি এই কাবুলী-গর্দিশ কাটিয়ে উঠতে পারি। সেদিন কিছু সঙ্গে নিয়ে যাব না, সেকথাও জানি; কিন্তু তারই জন্য কি আজ সব কিছু কাবুলে ফেলে দেশে যেতে হবে? মক্স করলে সব জিনিসই রপ্ত হয়, এই কি খুদাতালার মতলব?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কুষ্টিয়ার লালন ফকির বলেছেন

"মরার আগে ম'লে শমন-জ্বালা ঘুচে যায়।
জানগে সে মরা কেমন, মুরশিদ ধরে জানতে হয়।"

আবার আরো কে একজন, দাদূ না কি, তিনিও তো বলেছেন,

"দাদূ, মেরা বৈরী মৈ মুওয়। মুঝৈ ন্
মারে কোই।"

("হে দাদূ, আমার বৈরী 'আমি' মরে গিয়েছে, আমাকে কেউ মারতে পারে না")।

কী মুশকিল। সর গুণীরই এক রা। শেয়ালকে কেন বৃথা দোষ দেওয়া। কবীরও তো বলেছের,

"তজো অভিমানা সীখো জ্ঞানা
সতগুরু সঙ্গত তরতা হৈ
কহৈঁ কবীর কোই বিরল হংস
জীবত হী জো মরতা হৈ।।"

("অভিমান ত্যাগ করে জ্ঞান শেখো, সৎগুরুর সঙ্গ নিলেই ত্রাণ। কবীর বলেন, 'জীবনেই মৃত্যুকে লাভ করেছেন সে রকম হংস-সাধক বিরল'")।

কিন্তু কবীরের বচনে বাঁচাওতা রয়ে গিয়েছে। গোবরার গোরস্তানে যাবার পূর্বেই মৃতের ন্যায় সবকিছুর মায়া কাটাতে পারেন এমন পরমহংস যখন 'বিরল' তখন সে কস্ত করার দায় তো আমার উপর নয়।

ডোম শেষ পর্যন্ত কোন্ বাঁশ বেছে নিয়েছিল আমাদের প্রবাদে তার হদিস মেলে না। বিবেচনা করি, সেটা নিতান্ত কাঁচা এবং গিঁটে ভর্তি—না হলে প্রবাদটার কোনো মানে হয় না। এ-ডোম তাই শেষ পর্যন্ত কি দিয়ে দশ পৌণ্ডের পুঁটুলি বেঁধেছিল, সেকথা ফাঁস করে দিয়ে আপন আহাম্মুখির শেষ প্রমাণ আপনাদের হাতে তুলে দেবে না।

কিন্তু সেটা পুরানো ধুতিতে বাঁধা বেডের পুঁটুলিই ছিল—'লগেজ' বা

সুটকেসের ভিতরে গোছানো মাল অন্য জিনিস—কারণ দশ পৌণ্ড মালের জন্য পাঁচ পৌণ্ডী সুটকেস ব্যবহার করলে মালের পাঁচ পৌণ্ড গিয়ে রইবে হাতে সুটকেসটা। সুকুমার রায়ের কাক যে রকম হিসেবে করতো 'সাত দুগুণে চোদ্দর নামে চার, হাতে রইল পেন্সিল।'

অবশ্য জামা-কাপড় পরে নিলুম একগাদা—একপ্রস্ত না। কর্তারাও উপদেশ পাঠিয়েছিলেন যে, প্রচুর পরিমাণে গরম জামাকাপড় না পরা থাকলে উপরে গিয়ে শীতে কষ্ট পাব এবং মৌলানার বউয়ের পা খড় দিয়ে কি রকম পেঁচিয়ে বিলিতী সিরকার বোতল বানানো হয়েছিল আবদুর রহমানের সে-বর্ণনাও মনে ছিল।

মৌলানা তাঁর এক পাঞ্জাবী বন্ধুর সঙ্গে আগেই বেরিয়ে পড়েছিলেন।

আবদুর রহমান বসবার ঘরে প্রাণভরে আগুন জ্বালিয়েছে। আমি একটা চেয়ারে বসে। আবদুর রহমান আমার পায়ের কাছে।

আমি বললুম, 'আবদুর রহমান, তোমার উপর অনেকবার খামকা রাগ করেছি, মাফ করে দিয়ো।'

আবদুর রহমান আমার দু'হাত তুলে নিয়ে আপন চোখের উপর চেপে ধরল। ভেজা।

আমি বললুম, 'ছিঃ আবদুর রহমান, এ কি করছ? আর শোনো, যা রইল সব কিছু তোমার।'

আমি জানি আমার পাঠক মাত্রই অবিশ্বাসেরই হাসি হাসবেন, কিন্তু তবু আমি জোর করে বলব, আবদুর রহমান আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যে, তার চোখে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম লেখা রয়েছে,—

যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং?

রাস্তা দিয়ে চলেছি। পিছনে পুঁটুলি-হাতে আবদুর রহমান।

দু-একবার তার সঙ্গে কথা বলবার চেষ্টা করলুম। দেখলুম সে চুপ করে থাকাটাই পছন্দ করছে।

প্রথমেই ডানদিকে পড়ল রুশ রাজদূতাবাস। দেমিদফ পরিবারকে কখনো ভুলব না। বলশফের আত্মাকে নমস্কার জানালুম।

তারপর কাবুল নদী পেরিয়ে লব-ই-দরিয়া হয়ে আর্কের দিকে চললুম। বেশীর ভাগ দোকানপাট বন্ধ—তবু দূর থেকেই দেখতে পেলুম পাঞ্জাবীর দোকান খোলা। দোকানদার বারান্দায় দাঁড়িয়ে। জিজ্ঞেস করলুম, 'দেশে যাবেন না?' মাথা

নাড়িয়ে নীরবে জানালো 'না'। তারপর বিদায়ের সালাম জানিয়ে মাথা নিচু করে দোকানের ভিতরে চলে গেল। আমি জানতুম, কারবার ফেলে এদের কাবুল ছাড়ার উপায় নেই, সব কিছু তৎক্ষণাৎ লুট হয়ে যাবে। অথচ এর চিত্ত এমনি বিকল হয়ে গিয়েছে যে, শেষ মুহূর্তে আমার সঙ্গে ছুটি কথা বলবার মত মনের জোর এর আর নেই।

বিশ কদম পরে বাঁ দিকে দোস্ত মুহম্মদের বাসা। অবস্থা দেখে বুঝতে বেগ পেতে হল না যে, বাসা লুট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে তাঁর কণামাত্র শোক হওয়ার কথা নয়। এ-বাবতে তিনি সোক্রাতেসের ন্যায়—সোক্রাতেস যেমন তত্ত্বচিন্তায় বুঁদ হয়ে অন্য কোনো বস্তুর প্রয়োজন অনুভব করতেন না, দোস্ত মুহম্মদ ঠিক তেমনি রসের সন্ধানে, অদ্ভুতের খোঁজে, গ্রোটেস্কের (উদ্ভটের) পিছনে এমনি লেগে থাকতেন যে, অন্য কোনো বস্তুর অভাব তাঁর চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে পারত না। পতঞ্জলিও ঠিক এই কথাই বলেছেন। চিত্তবৃত্তিনিরোধের পন্থা বাৎলাতে গিয়ে তিনি ঈশ্বর এবং বীতরাগ মহাপুরুষদের সম্বন্ধে ধ্যান করতে উপদেশ দিয়েছেন কিন্তু সর্বশেষে বলেছেন, 'যথাভিমতধ্যানাদ্বা', 'যা খুশী তাই দিয়ে চিত্তচাঞ্চল্য ঠেকাবে।' অর্থাৎ ধ্যানটাই মুখ্য, ধ্যানের বিষয়বস্তু গৌণ। দোস্ত মুহম্মদের সাধনা রসের সাধনা।

আরো খানিকটে এগিয়ে বাঁ দিকে মেয়েদের ইস্কুল। বাচ্চার আক্রমণের কয়েক দিন পূর্বে এখানে কর্নেলের বউ তাঁর স্বামীর কথা ভেবে ডুকরে কেঁদেছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কিনা কে জানে। আমার পাশের বাড়ীর কর্নেলের মায়ের কান্না, ইস্কুলের কর্নেলবউয়ের কান্না, আরো কত কান্না মিশে গিয়ে অহরহ খুদাতালার তখ্‌তের দিকে চলেছে। কিন্তু কেন? কবি বলেছেন,

For men must work
And women must weep.

অর্থাৎ কোনো তর্ক নেই, যুক্তি নেই, ন্যায় অন্যায় নেই, মেয়েদের কর্ম হচ্ছে পুরুষের আকাট মূর্খতার জন্য চোখের জল ফেলে খেসারতি দেওয়া। কিন্তু আশ্চর্য, এ-বেদনাটা প্রকাশও করে আসছে পুরুষই, কবিরূপে। শুনেছি পাঁচ হাজার বৎসরের পুরোনো বাবিলনের প্রস্তরগাত্রে কবিতা পাওয়া গিয়েছে—কবি মা-জননীদের চোখের জলের উল্লেখ করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন।

ইস্কুলের পরেই একখানা ছোট বসতবাড়ি। আমান উল্লার বোনের বিয়ের সময় লক্ষ্ণৌ থেকে যেসব গানেওয়ালী নাচনেওয়ালীদের আনানো হয়েছিল তারা

উঠেছিল এই বাড়িতে। তাদের তত্ত্বতাবাশ করার জন্য আমরা কয়েকজন ভারতীয় তাদের কাছে গিয়েছিলুম। আমাদের সঙ্গে কথা কইতে পেয়ে সেই অনাত্মীয় নির্বাসনে তারা কী খুশীটাই না হয়েছিল। জানত, কাবুলে পান পাওয়া যায় না —আর পান না হলে মজলিস জমবে কি করে, ঠুংরি হয়ে যাবে ভজন—তাই তারা সঙ্গে এনেছিল বাস্-বোম্বাই পান। আমাদের সেই পান দিয়েছিল অকৃপণ হস্তে, দরাজ-দিলে। লক্ষ্ণৌয়ের পান, কাশীর জর্দা, সেদ্ধ-ছাঁকা খয়ের তিন মিলে আমার মুখের জড়তা এমনি কেটে দিয়েছিল যে, আমি তখন উর্দু ছেড়েছিলুম একদম লখ্‌নওয়ী কায়দায়—বিস্তর 'মেহেরবানী', 'গরীব-পরওরী', 'বন্দা-নওয়াজী'র প্রপঞ্চ-ফোঁড়ন দিয়ে।

কাবুলের নিজস্ব উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত নেই। ইরানের ঐতিহ্যও কাবুল স্বীকার করে না। কাবুলে যে দেড়জন কলাবত আছেন তাঁরা গান শিখেছেন যুক্তপ্রদেশে। বাঈজীদের মজলিসে তাই 'সম' দেনেওয়ালার অভাব হতে পারে এই ভয়ে গানের মজলিসে উপস্থিত থাকার জন্য ভারতীয়দের সাড়ম্বর নিমন্ত্রণ ও সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হয়েছিল। আমরা সামনে বসে বিস্তর মাথা নেড়েছিলুম আর ঘন ঘন 'শাবাশ, শাবাশ' চিৎকারে মজলিস গরম করে তুলেছিলুম।

বাড়ি ফিরে আহারাদির পর যখন শেষ পানটা পকেট থেকে বের করে খেয়ে জানলা দিয়ে পিক ফেললুম তখন আবদুর রহমান ভয়ে ভিরমি যায় আর কি। কাবুলে পানের পিক অজানা কিন্তু যক্ষ্মা অজানা বস্তু নয়।

তারপরই শিক্ষা-মন্ত্রীর দফতর। একসেলেন্সি ফয়েজ মুহম্মদ খানকে দোস্ত মুহম্মদ দু'চোখে দেখতে পারতেন না। আমার কিন্তু মন্দ লাগত না। অত্যন্ত অনাড়ম্বর এবং বড়ই নিরীহ প্রকৃতির লোক। আর পাঁচজনের তুলনায় তিনি লেখাপড়া কিছু কম জানতেন না, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী হতে হলে যতটা দরকার ততটা হয়ত তাঁর ঠিক ছিল না। বাচ্চা রাজা হয়ে আর তাবৎ মন্ত্রীদের উপর অত্যাচার চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে গুপ্তধন বের করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীকে নাকি, 'তুই যা, তুই তো কখনো ঘুষ খাসনি' বলে নিষ্কৃতি দিয়েছিল। অথচ শিক্ষা বিভাগে টু পাইস্ কামাবার যে উপায় ছিল না তা নয়। কাবুলে নাকি ঢেউ গোনার কাজ পেলেও—অবশ্য সে-কাজ সরকারী হওয়া চাই—দু'পয়সা মারা যায়।

লোকটিকে আমার ভালো লাগতো নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণে। এই বেলা সেটা বলে ফেলি, হাওয়াই-জাহাজ কারো জন্য দাঁড়ায় না, উড়তে পারলেই বাঁচে।

চাকরিতে উন্নতি করে মানুষ হয় বুদ্ধির জোরে, নয় ভগবানের কৃপায়।

বুদ্ধিমানকে ভগবানও যদি সাহায্য করেন তবে বোকাদের আর পৃথিবীতে বাঁচতে হত না। আমার প্রতি ভগবান সদয় ছিলেন বলেই বোধ করি শিক্ষামন্ত্রী প্রথম দিন থেকেই আমার দিকে নেকনজরে তাকিয়েছিলেন। তারপর এক বৎসর যেতে না যেতে অহেতুক একধাক্কায় মাইনে একশ' টাকা বাড়িয়ে সব ভারতীয় শিক্ষকদের উপর চড়িয়ে দিলেন।

পাঞ্জাবী শিক্ষকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ডেপুটেশন নিয়ে গিয়ে বললেন, 'সৈয়দ মুজতবা আলীর ডিগ্রী বিশ্বভারতীর, এবং বিশ্বভারতী রেকগনাইজড্ য়ুনিভার্সিটি নয়।'

খাঁটি কথা। সদাশয় ভারতীয় সরকারের নেকনজরে আমার ডিগ্রী এখনো ব্রাত্য। আপনারা কেউ আমাকে চাকরি দিলে বিপদগ্রস্ত হবেন।

শিক্ষামন্ত্রী নাকি বলেছিলেন—আমি বয়ানটা শুনেছি অন্য লোকের কাছ থেকে —সেকথা তাঁর অজানা নয়।

পাঞ্জাবীদের পাল থেকে হাওয়া কেড়ে নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন, 'আপনার সনদ-সার্টিফিকেটে রয়েছে পাঞ্জাব গবর্নরের দস্তখত। আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্থানেও গবর্নরের অভাব নেই। কিন্তু আগা মুজতবা আলীর কাগজে দস্তখত রয়েছে মশহুর শাইর রবীন্দ্রনাথের। তিনি পৃথিবীর সামনে সমস্ত প্রাচ্যদেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন (চশ্‌ম্ রওশন্ করদে অন্দ্)—।'

ভদ্রলোকের ভারি শখ ছিল গুরুদেবকে কাবুলে নিমন্ত্রণ করার। তাঁর শুধু ভয় ছিল যে, দু'শ' মাইলের মোটর ঝাঁকুনি খেয়ে কবি যদি অসুস্থ হয়ে পড়েন আর তাঁর কাব্যসৃষ্টিতে বাধা পড়ে তবে তাতে করে ক্ষতি হবে সমস্ত পৃথিবীর। কাবুল কবিকে দেখতে চায়, কিন্তু এমন দুর্ঘটনার নিমিত্তের ভাগী হতে যাবে কেন? আমি সাহস দিয়ে বলতুম, 'কবি ছ'ফুট তিন ইঞ্চি উঁচু, তাঁর দেহ সুগঠিত এবং হাড়ও মজবুত।'

শেষটায় তিনি আল্লা বলে ঝুলে পড়েছিলেন কিন্তু আমান উল্লা বিলেত যাওয়ায় সে গ্রীষ্মে কবিকে আর নিমন্ত্রণ করা গেল না। শীতে বাচ্চা এসে উপস্থিত।

যাক্‌গে এসব কথা।

বাঁদিকে মুইন-উস্-সুলতানের বাড়ি, খানিকটে এগিয়ে গিয়ে তাঁর টেনিস কোর্ট। আজ মুইন-উস্-সুলতানে ভাগ্যের হাতে টেনিস বল। কান্দাহার কাবুল তাকে নিয়ে লোফালুফি খেলছে।

এই তো মকতব-ই-হবীবিয়া। বাচ্চা আক্রমণের প্রথম ধাক্কায় মকতবটা দখল

করে টেবিল চেয়ার, বই ম্যাপ পুড়িয়ে ফেলেছিল। এ শিক্ষায়তন আবার কখন খুলবে কে জানে? এখানেই আমি পড়িয়েছি। শীতে পুকুর জমে গেলে ছেলেদের সঙ্গে তার উপর স্কেটিং করেছি। গাছতলায় বসে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে আঙুর কিনে খেয়েছি। মীর আসলমের কাছ থেকে কত তত্ত্বকথা শুনেছি।

রাহুকবলিত কাবুল ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় লোক চলাচল কম। মকতব-ই-হবীবিয়ার বন্ধদ্বার যেন সমস্ত আফগানিস্থানের প্রতীক। শিক্ষাদীক্ষা, শান্তিশৃঙ্খলা, সভ্যতাসংস্কৃতি বর্জন করে আফগানিস্থান তার দ্বার বন্ধ করে দিয়েছে।

শহর ছাড়িয়ে মাঠে নামলুম। হাওয়াই জাহাজের ঘাঁটি আর বেশী দূর নয়। পিছন ফিরে আরেকবার কাবুলের দিকে তাকালুম। এই নিরস নিরানন্দ বিপদসঙ্কুল পুরী ত্যাগ করতে কোনো সুস্থ মানুষের মনে কষ্ট হওয়ার কথা নয় কিন্তু বোধ হয় এই সব কারণেই যে কয়টি লোকের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জন্মেছিল তাঁদের প্রত্যেককে অসাধারণ আত্মজন বলে মনে হতে লাগল। এঁদের প্রত্যেকেই আমার হৃদয় এতটা দখল করে বসে আছেন যে, এঁদের সকলকে একসঙ্গে ত্যাগ করতে গিয়ে মনে হল আমার সত্তাকে যেন কেউ দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেছে। ফরাসীতে বলে 'পার্তির সে তাঁ প্য মুরীর', প্রত্যেক বিদায় গ্রহণে রয়েছে খণ্ড-মৃত্যু।

হাওয়াই জাহাজ এল। আমাদের বুঁচকিগুলো সাড়ম্বর ওজন করা হল। কারো পোঁটলা দশ পৌণ্ডের বেশী হয়ে যাওয়ায় তাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। অনেক ভেবেচিন্তে যে কয়টি সামান্য জিনিস নিয়ে মানুষ দেশত্যাগী হচ্ছে তার থেকে ফের জিনিস কমানো যে কত কঠিন সেটা সামনে দাঁড়িয়ে না দেখলে অনুমান করা অসম্ভব। একজন তো হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন।

ডোম যে কানা হয় তার শেষ প্রমাণও বিমান-ঘাঁটিতে পেলুম। এইটুকু ওজনের ভিতর আবার এক গুণী একখানা আয়না এনেছেন! লোকটির চেহারার দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, কই তেমন কিছু খাপসুরৎ অ্যাপলো তো নন। ঘরে আগুন লাগলে মানুষ নাকি ছুটে বেরবার সময় ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়েছে, এ কথা তাহলে মিথ্যা নয়!

ওরে আবদুর রহমান, তুই এটা এনেছিস কেন? দশ পৌণ্ডের পুঁটুলিটা এনেছে ঠিক কিন্তু বাঁ হাতে আমার টেনিস র‍্যাকেটখানা কেন? আবদুর রহমান কি একটা বিড়বিড় করল। বুঝলুম, সে ঐ র‍্যাকেটখানাকেই আমার সব চেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি বলে ধরে নিয়েছিল, তার কারণ ও-জিনিসটা আমি তাকে কখনও ছুঁতে দিতুম না। আবদুর রহমান আমাদের দেশের ড্রাইভারদের মত। তার

বিশ্বাস স্ক্রু মাত্রই এমনভাবে টাইট করতে হয় যে, সেটা যেন আর কখনো খোলা না যায়। 'অপটিমাম' শব্দটা আমি আবদুর রহমানকে বোঝাতে না পেরে শেষটায় কড়া হুকুম দিয়েছিলুম, র‍্যাকেটটা প্রেসে বাঁধা দূরে থাক, সে যেন ওটার ছায়াও না মাড়ায়।

আবদুর রহমান তাই ভেবেছে, সায়েব নিশ্চয়ই এটা সঙ্গে হিন্দুস্থানে যাবে।

দেখি স্যার ফ্রান্সিস। নিতান্ত সামনে, বয়সে বড়, তাই একটা ছোটাসে ছোটা নড্ করলুম। সায়েব এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'গুড মর্নিং, আই উইশ এ গুড জর্নি।'

আমি ধন্যবাদ জানালুম।

সায়েব বললেন, 'ভারতীয়দের সাহায্য করবার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। প্রয়োজন হলে আশা করি, ভারতবর্ষে সে কথাটি আপনি বলবেন।'

আমি বললুম, 'আমি নিশ্চয়ই সব কথা বলবো।'

সায়েব ভোঁতা, না ঘড়েল ডিপ্লোমেট ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বিদায় নেবার সময় আফগানিস্থানে যে চলে যাচ্ছে সে বলে 'ব্ আমানে খুদা' —'তোমাকে খোদার আমানতে রাখলুম', যে যাচ্ছে না সে বলে 'ব্ খুদা সপুর্দমৎ' —'তোমাকে খোদার হাতে সোপর্দ করলুম।'

আবদুর রহমান আমার হাতে চুমো খেল। আমি বললুম, 'ব্ আমানে খুদা, আবদুর রহমান', আবদুর রহমান মন্ত্রোচ্চারণের মত একটানা বলে যেতে লাগল 'ব্ খুদা সপুর্দমৎ, সায়েব, ব্ খুদা সপুর্দমৎ, সায়েব।'

হঠাৎ শুনি স্যার ফ্রান্সিস বলছেন, 'এ-দুর্দিনে যে টেনিস র‍্যাকেট সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় সে নিশ্চয়ই পাকা স্পোর্টসম্যান।'

লিগেশরের এক কর্মচারী বললেন, 'ওটা দশ পৌণ্ডের বাইরে পড়েছে বলে ফেলে দেওয়া হয়েছে।'

সাহেব বললেন, 'ওটা প্লেনে তুলে দাও।'

ঐ একটা গুণ না থাকলে ইংরেজকে কাক-চিলে তুলে নিয়ে যেত।

আবদুর রহমান এবার চেঁচিয়ে বলছে, 'ব্ খুদা সপুর্দমৎ, সায়েব, ব্ খুদা সপুর্দমৎ।' প্রপেলার ভীষণ শব্দ করছে।

আবদুর রহমানের তারস্বরে চীৎকার প্লেনের ভিতর থেকে শুনতে পাচ্ছি। হাওয়াই জাহাজ জিনিসটাকে আবদুর রহমান বড্ড ডরায়। তাই খোদাতালার

কাছে সে বার বার নিবেদন করছে যে, আমাকে সে তাঁরই হাতে সঁপে দিয়েছে।

প্লেন চলতে আরম্ভ করেছে। শেষ শব্দ শুনতে পেলুম, 'সপুর্দমৎ'। আফগানিস্থানে আমার প্রথম পরিচয়ের আফগান আবদুর রহমান; শেষ দিনে সেই আবদুর রহমান আমায় বিদায় দিল।

উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে, রাষ্ট্রবিপ্লবে এবং এই শেষ বিদায়কে যদি শ্মশান বলি তবে আবদুর রহমান শ্মশানেও আমাকে কাঁধ দিল। স্বয়ং চাণক্য যে ক'টা পরীক্ষার উল্লেখ করে আপন নির্ঘণ্ট শেষ করেছেন আবদুর রহমান সব ক'টাই উত্তীর্ণ হল। তাকে বান্ধব বলব না তো কাকে বান্ধব বলব?

বন্ধু আবদুর রহমান, জগদ্বন্ধু তোমার কল্যাণ করুন।

মৌলানা বললেন, 'জানালা দিয়ে বাইরে তাকাও' বলে আপন সীটটা আমায় ছেড়ে দিলেন।

তাকিয়ে দেখি দিকদিগন্ত বিস্তৃত শুভ্র বরফ। আর অ্যারফিল্ডের মাঝখানে, আবদুর রহমানই হবে, তার পাগড়ির ন্যাজ মাথার উপর তুলে দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে বিদায় জানাচ্ছে।

বহুদিন ধরে সাবান ছিল না বলে আবদুর রহমানের পাগড়ি ময়লা। কিন্তু আমার মনে হল চতুর্দিকের বরফের চেয়ে শুভ্রতর আবদুর রহমানের পাগড়ি আর শুভ্রতম আবদুর রহমানের হৃদয়।

পরিশিষ্ট

আমান উল্লা হৃতসিংহাসন উদ্ধার না করতে পেরে আফগানিস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ইতালির রাজা তাঁকে স্বরাজ্যে আশ্রয় দেন। মুইন-উস্‌-সুলতানে ইরানে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আমান উল্লার হয়ে যে সেনাপতি ইংরেজের সঙ্গে আফগান স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন তাঁর নাম নাদির শাহ। তিনি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে ছিলেন। পরে পেশাওয়ার এসে সেখানকার ভারতীয় বণিকদের অর্থ সাহায্যে এবং আপন শৌর্য-বীর্য দ্বারা কাবুল দখল করে বাদশাহ হন। বাচ্চাকে সঙ্গীন দিয়ে মারা হয়—পরে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো হয়।

এ সব আমি খবরের কাগজে পড়েছি।

দেশে এসে জানতে পেলুম, আমার আত্মীয় কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মরহুম মৌলবী আবদুল মতিন চৌধুরীর উষ্মা দর্শনে ভারত সরকার স্যার ফ্রান্সিসকে আদেশ (বা অনুরোধ) করেন আমাকে দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে দেবার জন্য।

আমি কাবুল ছাড়ার কয়েক দিন পরেই ব্রিটিশ লিগেশন বহু অসহায় ভারতীয়কে কাবুলে ফেলে ভারতবর্ষে চলে আসেন।

এই 'বীরত্বের' জন্য স্যার ফ্রান্সিস অল্পদিন পরেই খেতাব ও প্রমোশন পেয়ে ইরাক বদলি হন!

মৌলানা জিয়াউদ্দিন ভারতবর্ষে ফিরে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকের কর্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু গবেষণামূলক প্রবন্ধ লেখেন (ফার্সীতে লেখা ব্রজভাষার একখানা প্রাচীন ব্যাকরণ প্রকাশ তার অন্যতম) এবং গুরুদেবের অনেক কবিতা উত্তম ফার্সীতে অনুবাদ করেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় তিনি অল্পবয়সে মারা যান। তাঁর অকালমৃত্যু উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে শোকসভায় গুরুদেব আচার্যরূপে যা বলেন তার অনুলিপি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র রচনাবলীর চতুর্বিংশ খণ্ডে অনুলিপিটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। গুরুদেব রচিত 'মৌলানা জিয়াউদ্দিন' কবিতাটি এখানে বিশ্বভারতীর অনুমতি অনুসারে ছাপানোটা যুক্তিযুক্ত মনে করলুম;—

মৌলানা জিয়াউদ্দিন

কখনো কখনো কোনো অবসরে
নিকটে দাঁড়াতে এসে;

'এই যে' বলেই তাকাতেম মুখে
'বোসো' বলিতাম হেসে।
দু-চারটে হত সামান্য কথা
ঘরের প্রশ্ন কিছু,
গভীর হৃদয় নীরবে রহিত
হাসিতামাসার পিছু।
কত সে গভীর প্রেম সুনিবিড়
অকথিত কত বাণী,
চিরকাল-তরে গিয়েছ যখন
আজিকে সে-কথা জানি।
প্রতি দিবসের তুচ্ছ খেয়ালে
সামান্য যাওয়া-আসা,
সেটুকু হারালে কতখানি যায়
খুঁজে নাহি পাই ভাষা।
তব জীবনের বহু সাধনার
যে পণ্য-ভার ভরি
মধ্যদিনের বাতাসে ভাসালে
তোমার নবীন তরী
যেমনি তা হোক মনে জানি তার
এতটা মূল্য নাই
যার বিনিময়ে পাবে তব স্মৃতি
আপন নিত্য ঠাঁই—
সেই কথা স্মরি বার বার আজ
লাগে ধিক্কার প্রাণে—
অজানা জনের পরম মূল্য
নাই কি গো কোনো খানে।
এ অবহেলার বেদনা বোঝাতে
কোথা হতে খুঁজে আনি
ছুরির আঘাত যেমন সহজ
তেমন সহজ বাণী।

কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
    কারো অর্থের খ্যাতি—
কেহ-বা প্রজার সুহৃদ্‌ সহায়,
    কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি—
তুমি আপনার বন্ধুজনেরে
    মাধুর্যে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
    সকল খ্যাতির বাড়া।
ভরা আষাঢ়ের যে মালতীগুলি
    আনন্দ মহিমায়
আপনার দান নিঃশেষ করি
    ধুলায় মিলায়ে যায়—
আকাশে আকাশে বাতাসে তাহারা
    আমাদের চারি পাশে
তোমার বিরহ ছড়ায়ে চলেছে
    সৌরভ নিঃশ্বাসে।

(নবজাতক)

তামাম শুদ

দেশে বিদেশে দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

চাচা কাহিনী

দ্বিতীয় খণ্ড

কাফে-দে-জেনি

রাত বারোটায় প্যারিসে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে ভাবলুম যাই কোথায়? হোটেল? তাও কি হয়! খাস প্যারিসের বাসিন্দা ছাড়া আর তো কেউ কখনো তিনটের আগে শুতে যায় না। আমার এক রুশ বন্ধুকে প্যারিসে সকাল হওয়ার আগে কখনও বাড়ি ফিরতে দেখিনি। রাত তিনটে-চারটের সময় যদি বলতুম, "রবের, চল, বাড়ি যাই" সে বেড়ালছানার মত আমার কোটের আস্তিন আঁকড়ে ধরে বলত, 'এই অন্ধকারে? তার চেয়ে ঘণ্টাতিনেক সবুর করো, উজ্জ্বল দিবালোকে প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দিয়ে বাড়ি ফিরব। আমি কি নিশাচর, চৌর, না অভিসারিকা? অত সাহস আমার নেই।'

জানতুম মঁ পার্নাস বা আভেন্যু রশোস্‌য়ারের কোনো একটা কাফেতে তাকে পাবোই। না পেলেও ক্ষতি নেই, একটু কফি খেয়ে, এদিক-ওদিকে আঁখ মেরে 'নিশার প্যারিসের' হাতখানা চোখের পাতার উপর বুলিয়ে নিয়ে আধা-ঘুমো আধা-জাগা অবস্থায় হোটেলে ফিরে শুয়ে পড়ব।

জুনের রাত্রি। না-গরম, না-ঠাণ্ডা। প্লাস দ্য লা মাদ্‌লেন দিয়ে থিয়েটারের গানের শেষ রেশের নেশায় এগিয়ে চললুম। গুন্ গুন্ করছি :

'তাজা হাওয়া বয়—
খুঁজিয়া দেশের ভুঁই।
ও মোর বিদেশী যাদু
কোথায় রহিলি তুই?'*

ভাবছি রাধার চেয়ে কৃষ্ণের প্রেম ছিল ঢের বেশি ফিকে। অথচ ত্রিস্তানের প্রেম কি ইজল্‌দের চেয়ে কম ছিল? না, জর্মনরা অপেরা লিখতে পারে বটে, ইতালিয়েরা গাইতে পারে বটে ও ফরাসীরা রস চাখতে জানে বটে। বলেও, 'খাবার তৈরী করা তো রাঁধুনীর কর্ম, খাবেন গুণীরা। আমরা অপেরা লিখতে যাব কোন দুঃখে?'

---

* কবিতাটির এ ক'টি ছত্র ইলিয়টের 'ওয়েস্টল্যাণ্ড' কবিতায় আছে.—

'Frisch weht der Wind
Der Heimat zu
Mein iriches·Kind
Wo weilst Du?'

দেখি, হঠাৎ কখন এক অজানা রাস্তায় এসে পড়েছি। লোকজনের চলাচল কম। মোটরের ভেঁপু প্রায় বাজেই না। চঞ্চল দ্রুত জীবনস্পন্দন থেকে জনহীন রাস্তায় এসে কেমন যেন ক্লান্তি অনুভব করলুম। একটু জিরোলে হত। তার ভাবনা আর যেখানেই থাক প্যারিসে নেই। কলকাতায় যে রকম পদে পদে না হোক বাঁকে বাঁকে পানের দোকান, প্যারিসেও তাই। সর্বত্র কাফে। প্রথম যেটা চোখে পড়ল সেটাতেই ঢুকে পড়লুম।

মাঝারি রকমের ভিড়। নাচের জায়গা নয়। ক্যানেস্তারা ব্যাণ্ড বা রেডিওর বাদ্যি-বাজনা নেই দেখে সোয়াস্তি অনুভব করলুম। একটা টেবিলে জায়গা খালি ছিল; শুধু একজন খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা, কালো টুপীতে সোনালি হরফে 'ল্য মাতাঁ' লেখা—চোখ বন্ধ করে সিগারেটে দম দিচ্ছেন, সামনে অর্ধশূন্য কফির পেয়ালা। আমি একটু মোলায়েম সুরে বললুম, 'মসিয়ো যদি অনুমতি করেন—'। 'তবে এই টেবিলে কি অল্পক্ষণের জন্য বসতে পারি?' এই অংশটুকু কেউ আর বলে না। গোড়ার দিকটা শেষ না হতেই সবাই বলে, 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ!' কিন্তু ল্য মাতাঁর হরকরা দেখলুম সে দলের নন। আমার বাক্যের প্রথমার্ধ শেষ করে যখন 'বিলক্ষণ বিলক্ষণ' শোনবার প্রত্যাশায় থেমেছি, তিনি তখন চোখ মেলে মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমার অনুরোধ শব্দে শব্দে ধীরে ধীরে পুনরাবৃত্তি করলেন, 'মসিয়ো যদি অনুমতি করেন তবে?—তবে কি?' এ হেন অপ্রয়োজনীয় অবান্তর প্রশ্ন আমি হিল্লি-দিল্লি-কলোন্-বুলোন্ কোথাও শুনিনি। কি আর করি, বললুম, 'তবে এই টেবিলে অল্পক্ষণের জন্য বসি।' ল্য মাতাঁ বললেন, 'তাই বলুন। তা না হলে আপনি যে আমার গলাকাটার অনুমতি চাইছিলেন না কি করে জানব? যারা সকল্পন বাক্যের পূর্বার্ধ বলে উত্তরার্ধ নির্ণয় করে না, তারা ভাষার কোমর কাটে। মানুষের গলা কাটতে তাদের কতক্ষণ? বসুন।' বলে 'ল্য মাতাঁ' চোখ বন্ধ করে সিগারেটে আরেক-প্রস্ত দীর্ঘ দম নিলেন। অনেকক্ষণ পরে চোখ না মেলেই আস্তে আস্তে বললেন, যেন কোনো ভীষণ প্রাণ-হরণ উচাটন মন্ত্র জপে যাচ্ছেন, 'ভাষার উচ্ছৃঙ্খলতা, তাও আবার আমার সামনে।'

আমি বে-বাক অবাক! এ আবার কোন্ রায়বাঘা সাহিত্যরথী রে বাবা। কিন্তু রা কাড়তে হিম্মৎ হল না, পাছে ভাষা নিয়ে ভদ্রলোক আরেক দফা, এক-তরফা রফারফি করে ফেলেন। আধঘণ্টা-টাক কেটে যাওয়ার পর ল্য মাতাঁ মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে যেন ঘুম ভাঙালেন। ঠাণ্ডা কফিতে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,

'ফরাসী জানেন বলে মনে হচ্ছে।' কথাটা ঠিক প্রশ্ন নয়, তথ্য নিরূপণও নয়। আমি তাই বিনীতভাবে শুধু 'ওয়াঁও ওয়াঁও' গোছ একটা শব্দ বের করলুম। অত্যন্ত শান্তস্বরে ল্য মাতাঁ বললেন, 'ভাষা সৃষ্টি কি করে হল তার সমাধান-সাধনা নিষ্ফল। এ জ্ঞানটা প্যারিসের ফিলোলজিস্ট এসোসিয়েশনের ছিল বলেই তাদের পয়লা নম্বর আইন, তাদের কোনও বৈঠকে ভাষার সৃষ্টিতত্ব, গোড়াপত্তন নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না। তবু অনায়াসে এ কথা বলা যেতে পারে যে, সৃষ্টির আদিম প্রভাতে মানুষের ভাষা ছিল না, পশুপক্ষীর যেমন আজও নেই। আজও পশুপক্ষীরা কিচির-মিচির করে ভাব প্রকাশ করে। মানুষ কিন্তু 'ওয়াঁও, ওয়াঁও' করে না!'

লোকটার বেআদবী দেখে আমি থ' হয়ে গেলুম। ল্য মাতাঁ জিজ্ঞেস করলেন, 'ফের্না রুমোর নাম শুনেছেন ?' গোস্‌সা হয়ে বেশ উষ্মার সঙ্গে বললুম, 'শুনিনি।'

'শুনিনি।' ল্য মাতাঁ অতি বিজ্ঞের অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, 'জানেন না, অথচ কী গর্ব যে জানেন না। এই গর্ব যেদিন লজ্জা হয়ে সর্ব অস্তিত্বকে খর্ব করবে, সেদিন সে লজ্জার জ্বালা জুড়োবেন কোন পঙ্ক দিয়ে ? ও রেভোয়া !' বলে ল্য মাতাঁ গটগট করে বেরিয়ে গেলেন।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে না পেরে লোকটার কথা খানিকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলুম। তারপর আপন মনেই বললুম, 'দুত্তোর ছাই, মরুক গে।' একটা খবরের কাগজের সন্ধানে ওয়েটারকে ডেকে বললুম, 'কোনো একটা বিকেলের কাগজ, সকালেরটা বেরিয়ে থাকলে তাই ভালো।' ওয়েটার খানিকক্ষণ হাবার মত আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি বিদেশী, মসিয়ো, তাই জানেন না, আমাদের ক্লিয়াঁতেল-গাহকরা সবাই জিনিয়স। কাফের নাম 'কাফে দে জেনি', 'প্রতিভা কাফে'। এন্‌রা কেউ খবরের কাগজ পড়েন না। তবে সবাই মিলে একটা সাপ্তাহিক বের করেন—গ্রীক ভাষায়। তার একখণ্ড এনে দেব ?' আমি বললুম, 'থাক।' এসিরিয়ন কি ব্যাবিলনিয়ন যে বলেনি সেই অন্তত: এ পুরুষের ভাগ্যি।

ততক্ষণে দেখি আরেকটি ভদ্রলোক 'ল্য মাতাঁ'র শূন্য চেয়ারখানা চেপে বসেছেন। বেশ মিষ্টি মিষ্টি হেসে বললেন, 'আপনি বুঝি ফের্না রুমোর বন্ধু ?' আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'ফের্না রুমো কে ?' ভদ্রলোকটি আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কেন ? এই যার সঙ্গে কথা বলছিলেন—' হালে পানি পেলুম ; হাল মালুম হল। বললুম, 'না, এই প্রথম আলাপ।' 'ও, তাই বলুন। আমার নাম পল রনাঁ।

আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে খুশী হলুম।' 'বিলক্ষণ, বিলক্ষণ, আমার নাম ইরশাদ চৌধুরী।' শুধালুম, 'মসিয়ো কি গ্রীক খবরের কাগজ পড়েন?' রনাঁ উত্তর দিলেন, 'আপনি আমাদের কাগজটার কথা বলছেন তো? না, আমি গ্রীক জানিনে। কিন্তু ওয়েটারটা জানে; আঁরিকে ডাকব? সে আপনাকে তর্জমা করে শুনিয়ে দেবে। তবে তার ফরাসী বোঝাও এক কর্ম।'

গোলকধাঁধাটি আমার কাছে আরো পেঁচিয়ে যেতে লাগল। জিজ্ঞেস করলুম, 'মসিয়ো রুয়মো কি 'ল্য মাতাঁ'য় কাজ করেন?' রনাঁ বললেন, 'পেটের দায়ে। এক কাপ কফি মেরে সে তিন দিন কাটাতে পারে। কিন্তু চার দিনের দিন? বছর দশেক পূর্বে তার একটা কবিতা বিক্রি হয়েছিল। পয়সাটা পেলে ভালো করে এক পেট খাবে। হালে যে কবিতাটা 'ল্য মেরক্যুরে' পাঠিয়েছিল, তারা সেটার কোঠ ঠিক না করতে পেরে বিজ্ঞাপন ভেবে মলাটে ছাপিয়েছে। কিন্তু টাকার দুঃখ এইবার তার ঘুচল বলে। বাস্তাইয়ের জেলে ফাঁসুড়ের চাকরিটা খালি পড়েছে। রুয়মো দরখাস্ত করেছে। খুব সম্ভব পাবে। ফাঁসী দেওয়াতে ওয়াকিবহাল হয়ে যখন নূতন কবিতা ঝাড়বে তখন আর সব চ্যাংড়াদের ঘায়েল করে দেবে।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি কিছু লেখেন?'

'লেখাপড়াই ভুলে গিয়েছি, তা লিখব কি করে?'

'লেখাপড়া ভুলে গিয়েছেন মানে?'

'মানে অত্যন্ত সরল। আমি ছবি আঁকি। ছবি আঁকায় নিজেকে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতিতে লোপ করে দিতে হয়। কবিতা, গান, নাচ এক কথায় আর সব কিছু তখন শুধু অবান্তর নয়, জঞ্জাল। নদী যদি তরঙ্গের কলরোল তোলে তবে কি তাতে সুন্দরী ধরার প্রতিচ্ছবি ফোটে? ঝাড়া দশটি বছর লেগেছে, মোশয়, ভাষা ভুলতে। এখন ইস্তেক রাস্তার নামও পড়তে পারিনে, নাম সইও করতে পারিনে! বেঁচে গেছি। জীবনের প্রথম প্রভাতে মানুষ কি দেখেছিল চোখ মেলে?—যুগ যুগ সঞ্চিত সভ্যতার বর্বর কলুষ-কালিমা মুক্ত জ্যোতির্দৃষ্টি দিয়ে? তাই দেখি, তাই আঁকি!'

লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। বললুম, 'সৃষ্টির প্রথম প্রভাতে মানুষ তার অনুভূতির প্রকাশ কি 'ওয়াঁও ওয়াঁও' করে করে নি?' দেখলুম রনাঁ বড় মিষ্টি স্বভাবের লোক। বাধা পেয়ে বাঘা জিনিয়সের মত তেড়ে এলেন না। পুরুষ্টু গালে টোল লাগিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, 'রুয়মো বলেছে তো? ও তার স্বপ্ন; আর

স্বপ্ন মানেই তো ছবি। স্পর্শ নেই, গন্ধ নেই, শব্দ নেই ; এমন কি সে ছবিতে রঙও নেই, কম্পজিশন নেই। সে বড় নবীন ছবি, সে বড় প্রাচীন ছবি। সে তো আত্মদর্শন, ভূমা দর্শন!'

জিজ্ঞেস করলুম, 'সে ছবি বুঝবে কে? তাতে রস পাবে কে? আমাদের চোখের উপর যে হাজার হাজার বৎসরের সভ্যতার পলস্তরা।'

রনাঁ বড় খুশী হলেন। মাথা হেলিয়ে-দুলিয়ে বললেন, 'লাখ কথার এক কথা বললেন মসিয়ো। তাই বলি প্রাচ্য দেশীয়রা আমাদের চেয়ে ঢের বেশী অসভ্য, অর্থাৎ সভ্য। চিরকাল মুক্তির সন্ধান করেছে বলে তাদের চোখ মুক্ত। চলুন, আপনাকেই আমার ছবি দেখাব। জানালার পাশে বসেছিলেন, পর্দাটা সরিয়ে বললেন 'এই আলোতেই আমার ছবি দেখার প্রশস্ততম সময়।'

বৃথা আপত্তি করলুম না। বাইরে তখন ভোরের আলো ফুটছে।

রাস্তায় চলতে চলতে রনাঁ বললেন, 'আদিম প্রভাতের স্বষ্টি দেখতে হলে প্রদোষের অর্ধনিমীলিত চেতনার প্রয়োজন।'

তেতলার একটি ঘরে গিয়ে ঢুকলুম। ডাক দিলেন, 'নানেৎ।'

ঘরের চারদিকে তাকাবার পূর্বে নজর পড়ল নানেতের দিকে। শোফায় অর্ধশায়িতা কিশোরী না যুবতী ঠিক ঠাহর করতে পারলুম না। এক গাদা সোনালি চুল আর দুটি সুডৌল বাহু। রনাঁ আলাপ করিয়ে দিলেন ; 'মসিয়ো ইরশাদ ; নানেৎ—আমার মডেল, ফিয়াঁসে, বন্ধু। নানেৎ, জানালাগুলো খুলে দাও।'

চারিদিকে তাকিয়ে আমার কি মনে হয়েছিল আজ আর স্পষ্ট মনে নেই। ছাত থেকে মেঝে পর্যন্ত ছবি আর ছবি। আগাগোড়া যেন ক্যানভাসে মোড়া। শোফাতে, মেঝেতে, কৌচে, চেয়ারে সর্বত্র ছবি ছড়ানো। অদ্ভুত সামঞ্জস্যহীন অর্থবিহীন অতি নবীন না বহু প্রাচীন তালগোল পাকানো বস্তুপিণ্ড ; না জ্বরের বেঘোরে ঘোরপাকখাওয়া আধা-চেতনার বিভীষিকার স্বষ্টি? পাঁশুটে, তামাটে, ঘোলাটে ধোঁয়াটে এ কি?

হঠাৎ কানে গেল, রনাঁ ও নানেতে যেন আলাপ হচ্ছে।

'নানেৎ।'

'মন আমি (বন্ধু!)'

'দেখছ?'

'তুমি ছাড়া কি কেউ কখনোও এমন স্বষ্টির কল্পনা করতে পারত?'

'নানেৎ।'

'প্যারিস, পৃথিবী তোমাকে রাজার আসনে বসাবে।'

'না, বন্ধু, আমার আসন চিরকাল তোমার পায়ের কাছে। নানেৎ, মা শেরি (প্রিয়তমে)।'

'মন আমি।'

নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে এলুম। দেখি প্রভাতসূর্য ইফেল মিনারের কোমরে পৌঁচেছে। চোখোচোখি হতে যেন স্বপ্ন কেটে গেল।

'রবেরের মুখে তাই—

হামেশাই ;

'নিশার প্যারিসে' কভু. হাবা ওরে, বলি তোরে, কাফে ছেড়ে বাহিরিতে নাই।'

বিধবা-বিবাহ

আমাদের পুজো-সংখ্যা ইংরেজের ক্রিস্‌মাস্ স্পেশালের অনুকরণে জন্মলাভ করেছিল কি না সে-কথা পণ্ডিতেরা বলতে পারবেন, কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে ইংরিজি স্পেশালের চেয়ে অনেক বেশী তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাচ্ছে। ক্রিস্‌মাস্ সংখ্যাগুলোতে থাকে অসংখ্য ছেলেমানুষি গল্প আর এন্তার গাঁজা—বছরের আর এগারো মাস ইংরেজ হাঁড়িপানা মুখ ক'রে থাকে ব'লে ঐ একটা মাস সে মুখের সব লাগাম ছিঁড়ে ফেলে যা-খুশী-তাই বকে নেয়। আমাদের পূজো-সংখ্যায় এ-সব পাতলামি থাকে না : তাই ভেবে পাইনে সত্যি-মিথ্যেয় মেশানো এদেশের আজগুবি গল্পগুলো ঠাঁই পাবে কোথায়, কোন্ মোকায় ?

এতদিন ইংরেজের নকল করতে বাধো বাধো ঠেকত। ভয় হ'ত পাছে লোকে ভাবে 'খানবাহাদুরির' তালে আছি। এখন পুজোর গাঁজায় দম দিয়ে দু'চারখানা গুল ছাড়তে আর কোনো প্রকারের বাধা না থাকারই কথা। অবশ্য সত্যি-মিথ্যের মেকদার যাচাইয়ের জন্য পাঠক জিম্মাদার।

বরোদার ভূতপূর্ব মহারাজা তৃতীয় সয়াজী রাও-এর কথা এদেশের অনেকেই জানেন। ইনি বিলেত থেকে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, মৌলানা মুহম্মদ আলীকে এবং এদেশ থেকে রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুত আম্বেডকরকে বেছে নিয়ে বরোদার উন্নতির জন্য নিয়োগ করেন। এককালে 'প্রবাসী'তে এঁর সম্বন্ধে অনেক লেখা

বেরিয়েছিল। বরোদারাজ্যের দু'একজন বৃদ্ধের মুখে আমি শুনেছি, অরবিন্দ বাঙলাদেশে যে আন্দোলন আরম্ভ করেন তাতে নাকি সয়াজী রাও-এর গোপন সাহায্য ছিল।

ইনি আসলে রাখাল-ছেলে। বরোদার শেষ মহারাজা ইংরেজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে গদিচ্যুত হলে পর, ইনি তাঁর নিকটতম আত্মীয় বলে এঁকে দূর মহারাষ্ট্রের মাঠ থেকে ধরে এনে গুজরাতের বরোদারাজ্যের গদিতে বসানো হয়। তখন তাঁর বয়স ষোলর কাছাকাছি। বরোদার তখন এমনি দুরবস্থা যে দিবা-দ্বিপ্রহরে নেকড়ে বাঘ শহরের আশপাশ থেকে মানুষের বাচ্চা ধ'রে নিয়ে যেত —সরকারী চাকুরেদের বছর তিনকের মাইনে বাকি থাকতো ব'লে দেশটা চলতো ঘুষের উপর, আর তাবৎ বরোদা স্টেটের ঋণ নাকি ছিল ত্রিশ কোটি টাকার মত।

সয়াজী রাও প্রায় বাষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। সারদা এ্যাক্ট পাস হবার বহু পূর্বেই তিনি নিজে জোর ক'রে আইন বানিয়ে আপন রাজ্যে বালবিবাহ বন্ধ করেন, খয়রাতি বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালান, হিন্দু লগ্নচ্ছেদের (ডিভোর্স) আইন চালু করেন, গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী খোলার বন্দোবস্ত করেন ও মরার সময় স্টেটের জন্য ত্রিশ কোটি টাকা রেখে যান। বরোদা শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় কলকাতাকে হার মানায়, সে পাল্লা দেয় বোম্বাই বাঙালোরের সঙ্গে।

এই মহারাজাই দিল্লীর দরবারে ইংরেজ রাজার দিকে পিছন ফিরে, ছড়ি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, গটগট ক'রে বেরিয়ে এসেছিলেন ব'লে তাঁর গদি যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অরবিন্দের ব্যাপারে ইংরেজ তাঁর উপর এমনিতেই চটা ছিল তার উপর এই কাণ্ড—এরকম একটা অজুহাত ইংরেজ খুঁজছিলও বটে। এ-ব্যাপার সম্বন্ধে স্বয়ং সয়াজী রাও লিখেছেন, "ইংরেজ আমাকে গদিচ্যুত করতে চেয়েছিল 'বাই গিভিং দি ডগ্ এ ব্যাড্ নেম্'।" তিনি দরবারে হিজ ম্যাজেস্টিকে কতটা অসৌজন্য দেখিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত, কিন্তু ফাঁড়াটা কাটাবার জন্য তিনি যে লাখ পনরো ঘুষ দিয়েছিলেন সে-সম্বন্ধে সব মুনিই একমত। ব্রিটিশ প্রেসেরও চাপ নাকি ভালো ক'রে তেল ঢাললে ঢিলে হয়ে যায়।

এসব কথা থেকে সাধারণ লোকের ধারণা করা কিছুমাত্র অন্যায় নয় যে সয়াজী রাও খাণ্ডার বিশেষ ছিলেন। তা তিনি ছিলেনও, কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তাঁর রসবোধ ছিল অসাধারণ—শুধু রাজারাজড়াদের ভিতরেই নয় জনসাধারণের পাঁচজন বিদগ্ধ লোককে হিসেবে নিলেও।

সার ভি. টি. কৃষ্ণমাচারীর নাম অনেকেই শুনেছেন। ইনি কিছুদিন পূর্বেও জয়পুরের দেওয়ান (প্রধান মন্ত্রী) ছিলেন ও উপস্থিত কোথায় যেন আরো ডাঙর নোকরি করেন। ইনি যখন বরোদার দেওয়ানরূপে আসেন তখন তিনি উত্তর ভারতে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এবং আর কিছু পারুন আর নাই পারুন, একথা সত্যি, বক্তৃতা দিতে গেলে তাঁর টন্‌সিল্ আর জিভে প্যাঁচ খেয়ে যেত। এখনো সে উৎপাতটা সম্পূর্ণ লোপ পায়নি।

শুনেছি তিনি যখন বরোদায় এলেন তখন 'সয়াজী বিহার ক্লাব' তাঁকে একখানা যগ্যির দাওয়াত দিলে। স্বয়ং মহারাজ উপস্থিত। শহরের কুতুবমিনাররা সব বোম্বাই বোম্বাই লেকচর ঝাড়লেন, 'ভি. টি'র মত মানুষ হয় না, এক এ্যাডাম্ হয়েছিলেন আর তারপর ইনি, মধ্যিখানে স্রেফ সাহারা' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুতুবরা 'ভি. টি'কে সপ্তম-স্বর্গে চড়িয়ে দিয়ে যখন থামলেন তখন,—

কৃষ্ণমাচারী-পানে সয়াজী রাও হাসিয়া করে আঁখিপাত।
চোখের পর চোখ রাখিয়া মূক কহিল ওস্তাদ জি,
ভাষণ ঝাড়ো এবে উম্‌দা ভাষণ, ভাষণ এরে বলে ছি।'

'ভি. টি'র শত্রুরা বলে তাঁর পা নাকি তখন কাঁপতে শুরু করেছিল। অসম্ভব নয়, তবে একথা ঠিক, তিনি অতি কষ্টে, নিতান্ত যে ধন্যবাদ না-দিলেই নয়, তাই বলে ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়েছিলেন।

সর্বশেষে মহারাজার পালা। বুড়া বলতেন খাসা ইংরেজি। অতি সরল এবং অত্যন্ত চোস্ত—সর্বপ্রকার অপ্রয়োজনীয় অলঙ্কার বিবর্জিত।

সামান্য দু-একটা লৌকিকতা শেষ করে সয়াজী রাও বললেন, 'দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরে বরোদা রাজ্য চালনা উপলক্ষে আমি বহু মহাজনের সংস্রবে এসেছি এবং তাঁদের সকলের কাছ থেকেই আমি কিছু-না-কিছু শিখে আমার জীবন সমৃদ্ধিশালী করেছি। এই দিওয়ানের কাছ থেকে শিখলুম বাকসংযম।'

শক্তিশেল খেয়ে লক্ষ্মণ কি করেছিলেন রামায়ণে নিশ্চয়ই তার সালঙ্কার বর্ণনা আছে—পাঠক সেটি পড়ে নেবেন।

ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি সয়াজী রাও-এর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। পাভলোভা এদেশে আসার বিশ বৎসর পূর্বে তিনি ভরতনাট্যম্ উত্তর ভারতে চালু করবার জন্য একটা আস্ত 'ট্রুপ' নিয়ে বিস্তর জায়গায় নাচ দেখিয়েছিলেন। উত্তর ভারত তখনও তৈরী হয়নি বলে দক্ষিণ-কন্যাদের সে-নৃত্যের কথা আজ সবাই ভুলে

গিয়েছে।

বরোদার 'ওরিয়েণ্টাল ইনস্টিটিউট' দেশ-বিদেশে যে খ্যাতি অর্জন করেছে তার সঙ্গে ভারতীয় অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনা হয় না। এস্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও বলবার প্রলোভন সম্বরণ করতে পারলুম না যে, প্রতিষ্ঠানটির অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য। ইনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পুত্র।

সয়াজী রাও-এর অনুরোধেই শিল্পী নন্দলাল বসু বরোদার 'কীর্তি মন্দিরের' চারখানি বিরাট প্রাচীর চিত্র এঁকে দিয়েছেন। নন্দলাল এত বৃহৎ কাজ আর কোথাও করেননি।

নীচের কিম্বদন্তীটি পড়ে পাছে কেউ ভাবেন সয়াজী রাও ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন না, তাই তাঁর বহু কীর্তি থেকে এই সামান্য দু-একটি উদাহরণ দিতে বাধ্য হলুম।

গল্পটি আমাকে বলেছিলেন পুব বাঙলার এক মৌলবী সায়েব—খাস বাঙাল ভাষায় বিস্তর আরবী ফারসী শব্দের বগ্‌হার দিয়ে। সে ভাষা অনুকরণ করা আমার অসাধ্য। গ্রামোফোন রেকর্ড পর্যন্ত তার হুবহু নকল দিতে পারে না।

নস্যিতে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মত ব্রহ্মটান দিয়ে বললেন—'এই বারোদা শহরে কত আজব রকমের বেশুমার চিড়িয়া ওড়াউড়ি করছে তার মধ্যিখানে সয়াজী রাও কেন যে চিড়িয়াখানা বানিয়েছেন বলা মুশকিল। তিনি নিজে তো সিঙি, অমুক ব্যাটা গাধা, অমুক শালা শূয়োর, অমুক হারামজাদা বিচ্ছু, আর আমি নিজে তো একটা আস্ত মর্কট, না হলে এদেশে আসবো কেন?—এসব মজুদ থাকতে চিড়িয়াখানা বানাবার মতলব বোধ করি জানোয়ারগুলোকে ভয় দেখাবার জন্য, যদি বড্ড বেশী তেড়িমেড়ি করে তবে খাঁচা থেকে বের করে বড় বড় নোকরি তাদের দিয়ে দেওয়া হবে।

বাইরের জানোয়ারগুলোর জ্বালায় অস্থির হলে আমি গামেশাই চিড়িয়াখানায় যাই। খুদখেয়ালি অর্থাৎ আত্মচিন্তার জন্য জায়গাটি খুব ভালো। তা সেকথা যাক্।

সয়াজী রাও বহু জানোয়ার এনেছেন বহু দেশ ঘুরে। পৃথিবীটা তিনি ক'বার প্রদক্ষিণ করেছেন, তার হিসেব তিনি নিজেই ভুলে গিয়েছেন। একবার বিলেত যাবার সময় তাঁর পরিচয় হল হাবশী দেশের রাজা হাইলে সেলাসিসের সঙ্গে।

আমাদের দেশের লোক সাদা চামড়ার ভক্ত, যে যত কালো সাদা চামড়ার প্রতি তার মোহ তত বেশী, ইয়োরোপে নাকি কালো চামড়ার আদর ঠিক সেই অনুপাতে।

একমাত্র হাবশীরাই শুনেছি আপন চামড়ার কদর বোঝে। তাই সায়েবদের দিকে তারা তাকায় অসীম করুণা নিয়ে—আহা, বেচারীদের ও-রকম ধবলকুষ্ঠ হয় কেন ?

সয়াজী রাও-এর রঙ কালো। হাবশী রাজা প্রথম দর্শনেই বুঝে ফেললেন, আমাদের মহারাজার খানদান অতিশয় শরীফ ; কোনো রকমের বদ্‌-জাত ধলা খুন তার কুলজি-ঠিকুজিতে কভি-ভী দাখিল হতে পারেনি। এ খুনের জন্য আমীর-ওমরাহ, নোকর-খিদ্‌মৎগার আপন খুন বহাতে হামেহাল হরবকত হাজির।

হাবশী-রাজ সয়াজী রাও-এর দরাজদিলের নিশানও ঝট্‌পট্‌ পেয়ে গেলেন। জাহাজেই রাজার জন্মদিন পড়েছিল—সয়াজী রাও তাঁকে একখানা খাসা কাশ্মীরী শাল ভেট দিলেন। হাবশী সে-শাল পেয়ে খুশীর তোড়ে বে-এক্তেয়ার। জাহাজময় ঘুরে-ফিরে সবাইকে সে-শাল দেখালেন, লালদরিয়ার গরমিকে একদম পরোয়া না করে সেই লাল শাল গায়ে দিয়ে উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করলেন। চোরচোট্টার ভয়ে শেষতক্‌ তিনি শালখানা কাপ্তান সায়েবের হাতে জিম্মা দিলেন।

হাবশী-রাজও কিছু নিকৃষ্ট মনুষ্য নন। সয়াজী রাও-এর দিল-তোড় মহব্বতের বদলে তিনি কি সওগাত দেবেন সে বাবতে বহুৎ আন্দিশা করেও তিনি কোনো ফৈসালা করে উঠতে পারলেন না। তাঁর রাজত্বে আছেই বা কি ? দুশ্চিন্তায় হাবশী রাজার কালো মুখ আরো কালো হয়ে গেল।'

আমি বললুম, 'অসম্ভব ! আমি মিশরে থাকার সময় বিস্তর হাবশী দেখেছি। তারা খানদানী নয়—তাদের মুখই আরো কালো করা যায় না, খুদ হাবশীরাজের কথা বাদ দিন।'

মৌলবী সাহেব রাগ করে বললেন, 'ঝকমারি ! হাজার দফা ঝকমারি তোমাদের মত বদরসিককে গল্প বলা। পঞ্চম জর্জের রঙ তো ফর্সা তবে কি ভয় পেলে তাঁর রঙ আরো ফর্সা হয় না ?'

আমি 'আলবৎ আলবৎ' বলে মাপ চাইলুম।

মৌলবী সাহেব বললেন, 'শেষটায় হাবশীরাজ মহারাজের সেক্রেটারির সঙ্গে ভাব জমিয়ে বহুৎ সওয়াল-জবাব করলেন আর মনে মনে একটা ভেট ঠিক করে নিলেন।

সে বৎসর গরম পড়েছিল বেহদ্‌। লু চলেছিল জাহান্নামের হাওয়া নিয়ে, আর আকাশ থেকে ঝরেছিল দোজখের আগুন। 'সয়াজী সরোবরের' বেবাক নিলুফরী পানি খুদাতালা বেহেশ্‌ত বাসিন্দাদের জন্য দুনিয়ার মাথট হিসেবে তুলে নিয়েছিলেন, আর বরোদার জৈনরা পাখীদের জন্য গাছে গাছে জল রেখেছিল

হাজারো রুপিয়া খর্চা করে। শুকনো গরমের জুলুমে আমার দাড়ি গোঁপ পর্যন্ত যখন পট পট করে ফেটে যাচ্ছিল এমন সময় শহরময় খবর রটলো, হাবশী বাদশাহ হাইলে সেলাসিস মহারাজা সয়াজী রাওকে এক জোড়া সিংহ-সিংহী তোফা পাঠিয়েছেন,—তাঁর মুল্লুকের সব চেয়ে বড় জানোয়ার। 'হিজ হাইনেস সয়াজী রাও মহারাজ সেনা-খাস-খেল বাহাদুর, ফরজন্দ-ই-দৌলত-ই-ইন্‌কলিসিয়া, শমশের জঙ্গ বাহাদুরের কদমের ধুলো হবার কিস্মৎ এদের নেই, তবু যদি মহারাজ মেহেরবাণী করে এদের গ্রহণ করেন, তবে হাবশী বাদশাহ বহুৎ, বহুৎ খুশ হবেন।'

সেই গরমের মাঝখানে খবরটা রটল আগুনের মত। আর গুজোব রটল ধুঁয়োর মত, তার চেয়েও তাড়াতাড়ি। কেউ বলে, 'ওরকম জোড়া-সিংগি লণ্ডন শহরের চিড়িয়াখানাতেও নেই', কেউ বলে, 'হাবশী বাদশা খাস ফরমান দিয়ে মানুষের মাংস খাইয়ে খাইয়ে এদের তাগড়া করিয়েছেন', কেউ বলে, 'এদের গর্জনের চোটে জাহাজের তাবৎ লস্কর-সারেঙ বদ্ধ কালা হয়ে গিয়েছে।' আরো কত আজগুবি কথা যে রটল তার ঠিক-ঠিকানা নেই।

সয়াজী রাও যে খুশ হয়েছিলেন সে সংবাদটাও শহরে রটল। চিড়িয়াখানার ম্যানেজারের উপর হুকুম হল হাবশী সিংগির জন্য খাস হাবেলি তৈরী করবার। কামাররা সব লেগে গেল খাঁচা বানাতে—দিনভর দমাদ্দম লোহা পেটার শব্দ শুনি, আর শহরের ছোঁড়ারা তখন থেকেই খাঁচার চতুর্দিকে ঝামেলা লাগিয়ে মেহমানদের তসবির-সুরৎ নিয়ে খুশ-গল্প জুড়ে দিয়েছে।

ম্যানেজার বোম্বাই গেলেন সিংগিদের আদাব-তসলিমাত করে বরোদা নিয়ে আসার জন্য। সেখান থেকে তারে খবর এল মেহমানরা কোন গাড়িতে বরোদা পৌঁছবেন। সেদিন শহরের ছ'আনা লোক স্টেশনে হাজিরা দিল—হুজুরদের পয়লা নজরে দেখবার জন্য। হাবেলিতে যখন তাদের ঢোকানো হল, তখন শহরের আর বড় কেউ বাদ নেই। সয়াজী মহারাজ শুনলেও গোসা করবেন না বলে বলছি, খুদ তাঁকে দেখবার জন্যও কখনো এরকমধারা ভিড় হয়নি।

আমিও ছিলুম। আর যা দেখলুম তার সামনে দাঁড়াবার মত আর কোনো চীজ আমি কখনো দেখিনি। আমার বিশ্বাস এ-জোড়া সিংগি দেখার পর আর কেউ খুদাতালায় অবিশ্বাস করবে না। তোমরা কি সব বলো না, 'নেচার' 'নেচার' —সব কিছু নেচার বানিয়েছে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'আমি তো কখনো বলিনি।'

মৌলবী সাহেব ট্যারচা হাসি হেসে বললেন, 'সিংগি দুটোর সামনে কাউকে

আমি বলতেও শুনিনি। তোমাদের ঐ নেচার কোন কোন জিনিস পয়দা করেছেন জানিনে কিন্তু এরকম সিংগি বানানো তাঁর বাপেরও মুরদের বাইরে।

কী চলন, কী বৈঠন, ক্যা পশম, ক্যা গর্দন! পায়ের নখ থেকে দুমের লোম পর্যন্ত সব কুছ গড়া হয়েছে, স্রেফ এক চীজ দিয়ে—তাকৎ! খুদার কেরামতি বুঝবে কে, তাই তাজ্জব মেনে বার বার তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'এ রকম মাতব্বরকে তুমি এ-দুনিয়ার রাজা না করে মানুষের হাতে সব কিছু ছেড়ে দিলে কেন?'

সিংগি জোড়াকে দেখবার জন্য অহমদাবাদ, আনন্দ, ভরোচ, সুরট এমন কি বোম্বাই থেকে লোক আসতে লাগল। ফুল ফুটলে কেউ লক্ষ্য করে, কেউ করে না, চাঁদ উঠলে কেউ খুশী হয়, কেউ তাকায় না, কিন্তু এ-জোড়া সিংগি দেখে মনে মনে এদের পায়ে তসলিম দেয়নি, এ রকম লোক আমি কখনো দেখিনি।

তবে আমি নিজে এদের দেখেছি সব চেয়ে বেশী। কোঁচড় ভরে ছোলাভাজা নিয়ে সামনের গাছতলায় বসে আমি দিনের পর দিন কাটিয়ে দিয়েছি এই রাজা-রাণীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। তাঁদের ভাষা বুঝিনি এ কথা সত্য, কিন্তু একটা হক বাৎ আমি তাঁদের ঘোঁতঘোঁতানি থেকে সাফ সাফ বুঝে নিয়েছিলুম, সেটা হচ্ছে এই—হিন্দুস্থান মুল্‌কটা হুজুরদের বিলকুল পছন্দ হয়নি।

তাই যেদিন ফজরের নমাজ পড়ার পর শুনতে পেলুম সিংগিটা মারা গিয়েছে তখন আশ্চর্য হলুম না বটে কিন্তু পাগলের মত ছুটে গেলুম চিড়িয়াখানায় আর পাঁচজনেরই মত। ভোরের আলো তখনো ভালো করে ফোটেনি, দেখি এর-ই মাঝে জলসা জমে গিয়েছে। সবাই মাটিতে বসে গালে হাত দিয়ে খাঁচাটার দিকে তাকিয়ে আছে, যেন এক হাট লোকের সক্কলেরই বড় ব্যাটা মারা গিয়েছে।

আর সিংহরাজ শুয়ে আছেন পুবদিকে মুখ করে। আহাহা, কী জৌলুস কী বাহার! দেখে চোখ ফেরাতে পারলুম না। জ্যান্ত অবস্থায় চলাফেরার দরুনই হোক অথবা অন্য যে কোনো কারণেই হোক তার সম্পূর্ণ শরীরের পরিমাণটা যেন আমার চোখে ঠিক ধরা দেয় নি, আজ স্পষ্ট দেখতে পেলুম কতখানি জায়গা নিয়ে হুজুর শেষ-শয্যা পেতেছেন। মনে মনে বললুম, আলবৎ আলবৎ। এই শেষশয্যা দেখেই কবি ফিরদৌসী তাঁর শাহনামা কাব্যে সোহরাবের মৃত্যুশয্যার বর্ণনা করেছেন।

আর সিংগিনী! সে বোধ হয় তখনো ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। সিংগির চতুর্দিকে চক্কর লাগাচ্ছে তার গা শুঁকছে আর আমাদের দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছে যেন কোনো মহারাণী ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে প্রধানমন্ত্রীকে সওয়াল করছেন।

বিহানের পয়লা সোনালি রোদ এসে পড়ল সিংহের কেশরে। শাহান-শাহ বাদশার সোনার তাজে যেন খুদাতালা আপন হাতে গলা-সোনা ঢেলে দিলেন। যে তসবিরে চোখ ভরে নিয়ে আমি বাড়ি ফিরলুম।

বরোদা শহর শোকে যেন নুয়ে পড়ল। যেখানে যাও, ঐ এক কথা, আমাদের সিংহ গত হয়েছেন।

সেদিন স্কুল কলেজ বসলো না, ছেলে-ছোকরারা খাঁচার সামনে বসে আছে,—চুপ করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে কারো মুখে কথাটি নেই। আপিস-আদালত পর্যন্ত সেদিন নিমকাম করলো।

সিংগির লাশ বের করতে গিয়ে ম্যানেজারের জিভ বেরিয়ে গেল। সিংগিনী খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে; খাবার লোভ দিয়ে যে তাকে পাশের খাঁচায় নিয়ে এ-খাঁচা থেকে লাশ বের করা হবে তারো উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত কি কৌশলে মুশকিল ফৈসালা হল জানিনে, আমি দরজায় খিল দিয়ে শুয়ে পড়েছিলুম।

তারপর আরম্ভ হল সিংগিনীর গর্জন আর দাবড়ানো। সমস্ত দিন খাঁচার ভিতর মতিচ্ছন্নের মত চক্কর খায় আর মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে খাঁচার দেয়ালে দেয় ধাক্কা। এরকম খাঁচা ভাঙবার মতলব আগে কখনো সিংহ সিংহী কারো ভিতরেই দেখা যায়নি। এখন সিংগিনী খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে কিন্তু বেড়ে গেছে খাঁচাটাকে ভাঙবার চেষ্টা। সেই দুর্বল শরীর নিয়ে কখনো সমস্ত তাগদ দিয়ে খাঁচায় দেয় ধাক্কা, কখনো শিকগুলোকে থামচায়, আর কখনো লাফ দিয়ে তেড়ে এসে মারে জোর গোত্তা। সে কী নিদারুণ দৃশ্য!

সয়াজী রাও খবর পেয়ে হুকুম দিলেন, 'বাঢ়িয়া, উম্‌দা হাবশী সিংহ যোগাড় করার জন্য আদিস আব্বাবার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনা করো, কিন্তু সাবধান হাবশীরাজ যেন খবর না পান তাঁর দেওয়া দিংহ মারা গিয়েছে। আর ততদিনের জন্য কাঠিয়াওয়াড থেকে একটা দিশী সিংহ আনবার ব্যবস্থা করো। সেও যেন উম্‌দাসে উম্‌দা হয়, রুপেয়া কা কুছ পরোয়া নহী।'

সয়াজী রাও বাদশার দয়ার শরীর, তাঁর লোমে লোমে মেহেরবাণী। খুদাতালা তাঁর জিন্দেগী দরাজ করুন, হরেক মুশকিল আসান করুন—বরোদার সিংহই বুঝতে পারে হাবশী সিংগিনীর দর্দ।

এক মাস বাদে বর এলেন কাঠিয়াওয়াড় থেকে। এ-এক মাস আমি চিড়িয়াখানায় যাইনি। পাঁচজনের মুখে শুনলুম, সিংগিনীর দিকে তাকানো যায় না—তার চোখমুখ দিয়ে আগুনের হল্কা বেরচ্ছে।'

মৌলবী সায়েব গল্প বন্ধ করে জানালার দিকে কান পেতে বললেন, 'আজান পড়লো। তাড়াতাড়ি শেষ করি।

ডুল্‌হাকে যখন খাঁচায় পোরা হবে তখন 'চার আঁখে' মিলবার তসবির দেখার জন্য আমি আগেভাগেই খাঁচার সামনে গিয়ে হাজির হলুম। সিংগিনীর চেহারা দেখে আমার চোখে জল এল। অসম্ভব রোগা দুর্বলা হয়ে গিয়েছে, কিন্তু তেজ কমেনি এক রত্তিও।

কাঠিয়াওয়াড়ের দামাদ এলেন হাতী-টানা গাড়িতে করে। তিনিও কিছু কম না। কিন্তু হাবশী সিংগির যে তসবির আমার মনের ভিতর আঁকা ছিল তাঁর তুলনায় বে-তাগদ, বে-জৌলুস, বে-রৌশন। সিংহ হিসেবে খাবসুরৎ, কিন্তু ডুল্‌হা হিসাবে না-পাস্।

খাঁচার দরজা দিয়ে দামাদ ঢুকলেন আস্তে আস্তে। সিংগিনী এক কোণে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে এমন এক অদ্ভুত চেহারা নিয়ে যে আমি তার কোনো মানেই করতে পারলুম না।

তারপর যা ঘটলো তার জন্যে আমরা কেউ তৈরী ছিলুম না। হঠাৎ সিংগিনী এক হনুমানী লম্ফ দিয়ে, খাঁচা ইস-পার উস-পার হয়ে পড়লো এসে সিংগির ঘাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তিন কিম্বা চার-খানা বিরাশি শিক্কার থাবড়া! কঠিয়াওয়াড়ি দামাদ ফৌত! বিলকুল ঠাণ্ডা!'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'সে কি কথা?'

মৌলবী সায়েব বললেন, 'এক লহমায় কাণ্ডটা ঘটলো; কেউ দেখলো, কেউ না।'

আমি বললুম, 'একটা লড়াই পর্যন্ত দিলে না?'

মৌলবী সায়েব বললেন, 'না।'

আমি বললুম, 'তারপর?'

মৌলবী সায়েব বললেন, 'তারপর আর কিছু না। আমি এখন চললুম, গল্পে মেতে গেলে আমার আর কোনো হুঁশ থাকে না।'

দরজার কাছে গিয়ে মৌলবী সায়েব থামলেন। বললেন, 'হুঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছি।

'খবরটা সয়াজী রাও-এর কাছে পৌঁছে দিতে কেউই সাহস পান না। শেষটায় তাঁর খাস পেয়ারা শহর-কাজী আর ধর্মাধিকারী নাড্‌কর্ণিকে ধরা হল। তাঁরা যখন খবরটা দিলেন তখন মহারাজ নাকি একদম কোনো রকমেরই চোটপাট

করলেন না। উল্টে নাকি মুচকি হাসি হেসে বললেন,

'আমি যখন বিধবা-বিবাহের জন্য একটা নয়া আন্দোলন আরম্ভ করতে চেয়েছিলুম তখন তোমরাই না গর্ব করে বলেছিলে, এদেশের খানদানী বিধবা—তা সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—নূতন বিয়ে করতে চায় না? হাবশী সিংগিনী এদেরও হার মানালে যে!' '

রাক্ষসী

আরাম-আয়েশ ফুর্তি-ফার্তির কথা বলতে গেলেই ইংরেজকে ফরাসী শব্দ ফরাসী ব্যঞ্জনা ব্যবহার করতে হয়। 'জোয়া দ্য ভিভ্‌র' (শুদ্ধমাত্র বেঁচে থাকার আনন্দ), 'বঁ ভিভ্‌র' (আরামে আয়েশে জীবন কাটানো),'গুরমে' (পোষাকি খুশখানেওলা), 'কনেস্যর' (সমঝদার, রসিকজন) এসব কথার ইংরিজি নেই। ভারতবর্ষে হয়ত এককালে ছিল, হয়ত কেন, নিশ্চয়ই ছিল,—মৃৎশকটিকা মালতীমাধব নাট্যে আরাম আয়েশের যে চৌকশ বর্ণনা পাওয়া যায় তার কুল্লে মাল তো আর গুল-মারা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না—আজ নেই এবং তার কারণ বের করার জন্যও ঘেরণ্ড সংহিতা ঘাঁটতে হয় না। রোগশোক অভাবঅনটনের মধ্যিখানে 'গুরমে' হওয়ার সুযোগ শতকে গোটেক পায় কিনা সন্দেহ—তাই খুশ-খানা, খুশ-পিনা বাবদের বেবাক ভারতীয় কথাগুলো ভাষা থেকে লোপ পেয়ে গিয়েছে, নতুন বোল-তানের প্রশ্নই ওঠে না।

তবু এই 'বঁ ভিভ্‌রের' কায়দাটা এখনো কিছু জানে পশ্চিম ভারতের পার্সী সম্প্রদায়। খায়দায়, হৈ-হুল্লোড় করে, মাত্রা মেনে ফষ্টিনষ্টি ইয়ার্কি-দোস্তি চালায় এবং তার জন্য দরকার হলে 'ঋণং কৃত্বা' নীতি মানতেও তাদের আপত্তি নেই। 'তাজ' হোটেলে বসে মাসের মাইনে এক রাত্তিরে ফুঁকে-দেনে-ওলা বিস্তর পার্সী বোম্বাইয়ে আছে আর গোলাপী নেশায় একটুখানি বে-এক্তেয়ার হয়ে কোনো পার্সী ছোকরা যদি ল্যাম্প-পোস্টটাকে জড়িয়ে ধরে 'ভাই, এ্যাদ্দিন কোথায় ছিলি' বলে ঝপাঝপ গণ্ডাদশেক চুমো খেয়ে ফেলে তাহলে তার বউ হয় স্ন্যাপশট তোলে, নয় 'চ, চ, বাইরাম, তোর নেশা চড়েছে' বলে ধাক্কাধাক্কি দিয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। পরদিন ক্লাবে বসে বউ 'পাগলা বাইরামের' কীর্তি-কাহিনীতে বেশ একটুখানি নুন-লঙ্কা লাগিয়ে মজলিস গরম করে তোলে, আর বাইরামের বাপ গল্প শুনে মিটমিটিয়ে

হাসে, ব্যাটার ‘এলেম’ হচ্ছে দেখে আপন ঠাকুর্দার স্মরণে খুশী হয়ে দু’ফোঁটা চোখের জলও ফেলে।

গাওনা বাজনায় ভারী শখ। একদল বেটোফেন ভাগনার নিয়ে মেতে আছে, আরেকদল বরোদার ওস্তাদ ফৈয়াজ খানের সাকরেদী করে, আর ‘লাল্লা লাল্লা লা’ গান গেয়ে নাকি বহু পার্সী বাচ্চা মায়ের গর্ভ থেকে নেমে এসেছে।

অন্য কোনো সম্প্রদায় সম্বন্ধে এ-সব কথা বলতে আমি সাহস পেতুম না, কিন্তু পার্সীদের ঈষৎ রসবোধ আছে, তা সে সূক্ষ্মই হোক্, আর স্থূলই হোক্। আলাপ জমাতেও ভারী ওস্তাদ। বিদেশীকে খাতির করে ঘরে নিয়ে যায়, বাড়ির আর পাঁচজনকে নতুন চিড়িয়া দেখাবে বলে; তাকে কাঠ বানিয়ে সবাই মিলে তার চতুর্দিকে চর্কিবাজির নাচন তুলবে বলে।

তাই বরোদা পৌঁছবার তিন দিনের ভিতরই রুস্তম দাদাভাই ওয়াডিয়া গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে আলাপচারী করলেন, বাড়ি নিয়ে গিয়ে বুড়ো বাপ, বউ, তিন ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরের দিনই পার্সী সম্প্রদায়ের ধান্‌সাক্ (আমাদের লুচিমণ্ডা) খাবার নেমন্তন্ন পেলুম। এবং সেদিনই খানা শেষে বললেন, ‘আসছে রববার সন্ধ্যেয় বোমানজী নারিমানের দু’ছেলের নওজোত। আপনার নেমন্তন্ন রয়েছে। আসবেন তো?’

আমি তো অবাক। এ দুনিয়ায় পার্সী বলতে আমি মাত্র এই ওয়াডিয়া পরিবারকেই চিনি। বোমানজী নারিমান লোকটি কে, এবং আমাকে নেমন্তন্ন করতে যাবেই বা কেন? আমি বললুম, ‘নারিমানকে তো চিনিনে।’

ওয়াডিয়া বললেন, ‘চিনে আপনার চারখানা হাত গজাবে নাকি (পার্সীরা ইয়ার্কি না করে কথা কইতে পারে না)? খাওয়ায় ভালো—সেইটে হ’ল আসল কথা। এই নিন আপনার কার্ড—ও দিয়েও আপনার চারখানা হাত গজাবে না। আপনি ভাববেন না আমি নারিমানের দোরে ধন্না দিয়ে এ কার্ড বের করেছি। আপনার সঙ্গে আমাদের জমে গিয়েছে নারিমান সেটা নিজের থেকেই জানতে পেরে কার্ডটা পাঠিয়ে দিয়েছে। না পাঠালে অবিশ্যি আমি একটুখানি নল চালাতুম, —আপনার মতো গুণীকে বাদ দিয়ে—’

আমি বাধা দিয়ে বললুম, ‘আমি গুণী!’

ওয়াডিয়া বললেন, ‘বাঁধা ছালার দাম পঁচিশ লাখ। দু’দিন বাদে সব শালা (পার্সীরা এই শব্দটি প্রায় সব কথার পিছনেই লাগায়) আপনাকে চিনে নেবে, কিছু ভয় নেই। তদ্দিন দু’পেট খেয়ে নিন। নারিমানের ছেলেদের নওজোতের

পরে আসছে সোরাবজীর মেয়ের বিয়ে, তার পর আসছে—'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'নওজোত পরবটা কি ?'

বললেন, 'এলেই দেখতে পাবেন। হিন্দুদের যেমন পৈতে হয়, পার্সীদের তেমনি 'নওজোত'। শুধু 'কস্তি' অর্থাৎ পৈতেটা বাঁধতে হয় কোমরে, আর সঙ্গে পরতে হয় একটি ছোট্ট ফতুয়া—তার নাম 'সদরা'। এই 'কস্তি'-'সদরা' দু'য়ে মিলে হল পার্সীদের দ্বিজত্বপ্রাপ্তি।'

ওয়াডিয়ার বউ রৌশন বললেন, 'যত সব সিলি স্যুপারস্‌টিশন্‌স্।'

রুস্তম বললেন, 'লঙ লিভ সচ্ স্যুপারস্‌টিশন্‌স্। এদেরই দৌলতে দু'মুঠো খেয়ে নিই। শালা বোমানজীর পেটে বোমা মারলেও সে এক পেট খাওয়ায় না। তার বাপ শালা (সবাই শালা !) বিয়ে করেছিলো বিলেতে, শ্যাম্পেনটা কেকটা ফাঁকি দেবার জন্য।'

পার্সীদের পাল্লায় পড়লে বুঝতেন। রববার বিকেল বেলা রুস্তম বউ, বেটাবাচ্চা নিয়ে গাড়ি করে আমার বাড়িতে উপস্থিত—পাছে আমি ফাঁকি দিই।

গাড়িতে বসে বললেন, 'পার্সীদের কি নাম দিয়েছে আর সব গুজরাতিরা জানেন ? 'কাগডা' অর্থাৎ ক্রো। তার প্রথম কারণ, আমরা কালো কোট টুপি পরি, দ্বিতীয় কারণ পাঁচটা পার্সী একত্র হলেই কাকের মত কিচির-মিচির করি, তৃতীয় কারণ কাকের মত খাদ্যাখাদ্য বিচার করিনে—জানেন তো আর সব গুজরাতিরা শাক-খেকো—, চতুর্থ কারণ আমাদের নাকটা কাকের মতো বাঁকানো আর শেষ কারণ মরে গেলে কাকে আমাদের মাংস খায়।' তার পর হো-হো করে খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বললেন, 'গুজরাতিদের রসবোধ নেই, সবাই জানে, কিন্তু এ রসিকতাটা মোক্ষম।'

আমি বললুম, 'সব হিন্দুই একবার স্মোক্ করে, সিগারেট খাওয়ার অভ্যাস থাক আর নাই থাক, সেটা জানেন ?'

বললেন, 'কি রকম ?'

'তাদের তো পোড়ানো হয়, দেন্ দে স্মোক্।'

রৌশন বললেন, 'তবু ভালো, শকুনির ছেঁড়াছেঁড়ির চেয়ে স্মোক্ করা ঢের ভালো।'

আমি বললুম, 'কেন ? চারটে শকুনি যদি এক পেট খেতে পায় তাতে আপত্তিটা আর কি ? এই আপনাদের বোমানজী যদি জ্যান্ত অবস্থায় কাউকে

খাওয়াতে না চায় তবে না হয় মরে গিয়েই খাওয়াল।'

রৌশন বললেন, 'আপনি জানেন না তাই বলছেন। বোম্বায়ে টাওয়ার অব সায়লেন্সের আশ-পাশের কোনো বাড়িতে কখনো বাসা বাঁধলে জানতেন। একটা শকুনি হয়ত একটা মরা বাচ্চার মাথাটা নিয়ে উড়ে যাচ্ছে আপনার বাড়ির উপর দিয়ে, আরেক শকুনির সঙ্গে লাগলো তখন তার লড়াই। ছিটকে পড়ল মুণ্ডুটা আপনার পায়ের কাছে, কিংবা মাথার উপরে। ভেবে দেখুন তো অবস্থাটা। তিন বছরের বাচ্চার মুণ্ডু, গলাটা ছিঁড়েছে শকুনে—'

আমি বললুম, 'থাক্, থাক্।' কিন্তু আশ্চর্য, ওয়াডিয়ার বাচ্চা দুটো শিউরে উঠলো না কিংবা মাকে এ সব বীভৎস বর্ণনা দিতে বারণ করল না। অনুমান করলুম, এরা ছেলেবেলা থেকেই এ-বিষয়ে অভ্যস্ত।

নওজোত অনুষ্ঠান হচ্ছিল একটা প্ল্যাটফর্মের উপর। সাদা জাজিমে মোড়া। দুটি আট-ন' বছরের বাচ্চা দাঁড়িয়ে, আর চারজন 'দস্তুর' (পুরোহিত) আবেস্তা, পহ্লবী ভাষায় গড়গড় করে মন্ত্র উচ্চারণ করে যাচ্ছেন। এককালে যজ্ঞোপবীত দেবার সময় পুরোহিত ছেলেটাকে মন্ত্রোচ্চারণ দিয়ে বোঝাতেন যজ্ঞোপবীতের দায়িত্ব কি, আজ যে সে উপবীত ধারণ করতে যাচ্ছে তার অর্থ ;—মায়ের কোল আর খেলাধুলো তার জন্য শেষ হল, সে আজ সমাজে প্রবেশ করতে যাচ্ছে। এখন ক'টা ছেলে এ সব বোঝে তা জানিনে, কিন্তু এটা স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, 'নওজোত'ও উপনয়নের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে,—যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হচ্ছে তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হচ্ছে।

ফিস ফিস করে কথা বলতে মানা নেই। আমি রুস্তমকে আমার গবেষণামূলক তত্ত্ব-চিন্তাটি অতিশয় গাম্ভীর্য সহকারে নিবেদন করাতে তিনি বললেন, 'আপনার তাতে কি, আমারই বা তাতে কি ? রান্নাটা ভালো হলেই হলো।'

বুঝলুম, 'ইতর জনের জন্য মিষ্টান্ন'—প্রবাদটি সর্বদেশে প্রযোজ্য।

নওজোত শেষ হয়েছে আর সঙ্গে সঙ্গে নামল ঝমাঝ্ঝম বৃষ্টি। অকালে এ রকম বৃষ্টির জন্য কেউ তৈরী ছিলেন না। নিমন্ত্রিত রবাহুত সবাই ছুটে গিয়ে উঠলেন বাড়ির বারান্দায়। তারপর বৃষ্টির ঝাপটা খেয়ে, একদল ড্রইং-রুমে, আরেক দল ডাইনিং-রুমে, আত্মীয় কুটুমরা বেড্-রুমে ঢুকলেন। আমাকে রুস্তম নিয়ে গেলেন ছোট্ট একটা কুঠুরিতে, বোধ হয় বাচ্চা দুটোর পড়ার ঘর।

আমরা জনা-বারো সেই কুঠুরিতে কাঁঠাল-বোঝাই হয়ে বসলুম। সকলের শেষে এসে ঢুকলেন এক বুড়ো পার্সী দু'বগলে দু'বোতল মদ নিয়ে। আমরা কয়েক

জন হিন্দু মুসলমান নিরামিষ ছিলুম, আমাদের জন্য এল আইসক্রীম, লেমনেড।

বুড়ো একটা বোতল ছেড়ে দিলেন মজলিসের জন্য। অন্য বোতলটা নিজে টানতে লাগলেন নির্জলা। বিলেতে পালাপরবে, ঘরেবাইরে সর্বত্রই মদ খাওয়া হয়, তাই এন্তার মদ খাওয়া দেখেছি কিন্তু দশ মিনিট যেতে না যেতেই বুঝলুম, এ বুড়ো তালেবর ব্যক্তি। শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে পেশাদারী ব্রাহ্মণের পাইকারি বহ্বান্ন ভক্ষণের মত এঁর পাইকারি পান দ্রষ্টব্য বস্তু।

মদ খেলে কেউ হয়ে যায় ঝগড়াটে, কেউ বা আরম্ভ করে বদ রসিকতা, কেউ করে খিস্তি, আর কেউ হয়ে যায় যীশুখ্রীষ্ট,—দুনিয়ার তাবৎ দুঃখকষ্ট সে তখন আপন স্কন্ধে তুলে নিতে চায়, আর সবাইকে গায়ে পড়ে টাকা ধার দেয়; পরের দিন অবশ্য চাকরের উপর চালায় চোট-পাট, ভাবে (পার্সী হলে) ঐ শালাই মোকা পেয়ে টাকাটা লোপাট মেরেছে।

আমি গিয়েছিলুম এক কোণে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসব বলে। বোতলটি আধঘণ্টার ভিতর শেষ করে বুড়ো এসে বসলেন আমারই পাশে। আমি একটু সঙ্কুচিত হয়ে স্থান করে দিলুম। বুড়ো শুধোলেন, 'আপনি এ-শহরে নূতন এসেছেন?' আমি কীর্তিটা অস্বীকার করলুম না। বললেন, 'তাই ভাবছেন আমি মাতাল?'

বুঝলুম ইনি যীশুখ্রীষ্ট টাইপ নন, ইনি হচ্ছেন মেরি ম্যাগডলীন টাইপ,—অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত। বললুম, 'কই আপনি তো দিব্য আর পাঁচজনের মত কথা কইছেন।'

বললেন, 'এক বোতলে আমার কিছু হয় না, পাঁচ বোতলেও কিছু হয় না, দশ বোতলেও না—যদিও অতটা কখনো খেয়ে দেখিনি।'

সত্যি, লোকটার গলা সাদা, চোখের রঙ থেকেও বিশেষ কিছু অনুমান করা যায় না—বুড়োবয়সের ঘোলাচোখে রঙের ফেরফার সহজে ধরা পড়ে না। পাকা বাঁশে তেল লাগালেও একই রঙ।

বললুম, 'তাহলে না খেলেই পারেন।'

বললেন, 'খাই না তো, হঠাৎ ও-রকম অকালে বৃষ্টি না নামলে।'

মদ খাওয়ার নানা অজুহাত বাজারে চালু আছে। এটা নতুন। বৃষ্টির জলের সঙ্গে নামল বটে কিন্তু ধোপে টিকবে না। বললুম 'হুঁ।'

'আপনিও খেতেন।'

'? ? ? ?'

'সে অবস্থায় পড়লে।'

আমি শুধালুম, 'কোন্ অবস্থায়?' তারপর বললুম, 'কিন্তু আপনি আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন কেন? বিশেষতঃ আপনার ধর্মে যখন ও জিনিস বারণ নয়।'

'আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি কারণ আর সবাই জানে—'

আমি বললুম, 'তাহ'লে বলুন।'

বললেন, 'রুস্তম বলছিল, আপনি নাকি পুব-ভারতের লোক, পার্সীদের আচার-ব্যবহার পালা-পরব সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। টাওয়ার অব সায়লেন্স কাকে বলে জানেন?'

আবার 'মৌন শিখর'! বললুম, 'আজই প্রথম শুনেছি।'

বললেন, 'কুয়োর মত গোল করে গড়া হয়। আর দেয়ালের ভিতরের দিকে বড় বড় শেলফের মত কুলুঙ্গি বা 'নিশ্' কাটা থাকে। সেগুলোর উপর মড়াকে বিবস্ত্র করে শুইয়ে দেওয়া হয়। বোম্বাই-টোম্বাই অঞ্চলে বিস্তর শকুনি ওত পেতে বসে থাকে, তিন মিনিটের ভিতর হাড্ডিগুলো ছাড়া সব কিছু সাফ করে দেয়। কিন্তু ভিতরে গিয়ে এ-সব দেখবার হুকুম নেই। একমাত্র 'শববাহক'ই ভিতরে যায়। এই যে নওজোতের সময় 'দস্তুর'দের দেখলেন তেমনি পার্সীদের ভিতরে বিশেষ 'শববাহক' সম্প্রদায় আছে। টাওয়ার অব সায়লেন্সের ভিতর যা কিছু করার তারাই সব করে। এমন কি 'দস্তুর'দেরও ভিতরে যাওয়া বারণ।

'আমার জন্ম মধুগাঁয়ে, সেখানেই প্রায় সমস্ত জীবন কাটিয়েছি। মধুগাঁও সি-পিতে। আপনি কখনো যাননি? তাহ'লে বুঝতেন গ্রীষ্মকালে সেখানে কি রকম গরম পড়ে। আর সে গরম একদম শুকনো—বোন্-ড্রাই। দেয়ালের কেলেণ্ডার বেঁকে যায়, বইয়ের মলাট বাঁকতে বাঁকতে কেতাব থেকে খসে পড়ে, টেবিলটা পর্যন্ত পিঠ বাঁকিয়ে বেরালটার মত লড়াইমুখো হয়ে ওঠে। এমন কি মানুষেরও রস-কষ শুকিয়ে যায়। হাতাহাতির ভয়ে গরমের দিনে একে অন্যে কথাবার্তা পর্যন্ত হয় নিক্তি-মেপে।

'সেই গরমে মারা গেল এক আশি বছরের হাড্ডি-সার বুড়ী। আমার ছেলেবেলায় তিনি ছিলেন যুবতী—বকা ছোঁড়ারা তখনই তাঁর নাম দিয়েছিল 'ঝরাপাতা', 'কুকুরের জিভ'। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকোতে শুকোতে শেষ পর্যন্ত রইল চামড়ায় জড়ানো খান কয়েক হাড্ডি। আর স্বভাব ছিল এমনি খিটখিটে যে আমরা পারতপক্ষে তার বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যেতুম না।

বিশ্বাস করবেন না, বেটি বারান্দায় বসত এক গাদা নুড়ি নিয়ে। কেউ ভুলেও তার বাড়ির সামনে দাঁড়ালে বুড়ী সেই নুড়ী ছুঁড়তে আরম্ভ করত তাগ করে। —আর সে কী মোক্ষম তাগ! 'প্র্যাক্‌টিস মেক্‌স্ পার্ফেক্ট' রচনায় এক ছোঁড়া বুড়ীর উদাহরণ নিয়ে আমার কাছ থেকে ফুলমার্ক পোয়ছিল।

'বুড়ীর ত্রি-সংসারে কেউ ছিল না, প্রকাণ্ড একটা কুকুর ছাড়া। কিন্তু কুকুরটার উপর তো আর বুড়ীর শেষ ক্রিয়ার ভার ছেড়ে দেওয়া যায় না। ভারটা পড়লো আমাদের ঘাড়েই। মহাবিপদে পড়ল মধুগাঁয়ের পার্সী সম্প্রদায়।

'এককালে মধুগাঁয়ে বিস্তর পার্সী বসবাস করতো বলে তারা শহরের মাইল খানেক দূরে ভাল টাওয়ার অব সায়লেন্স বানিয়েছিল। আপন 'শববাহক'ও জন-আষ্টেক ছিল। কিন্তু সে হল সত্তর-আশি বৎসরের কথা। ইতিমধ্যে পার্সী সংখ্যা ক্রমে ক্রমে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে মাত্র দশ বারোটি পরিবারে। তাই মৃত্যুর হার এসে দাঁড়িয়েছে বছরে এক কিংবা তার চেয়েও কম। টাওয়ার অব সায়লেন্সের শকুনগুলো পর্যন্ত পালিয়েছে না খেয়ে মর-মর হয়ে। মানুষের বুদ্ধি শকুনের চেয়ে বেশী তাই 'শববাহকে'র দল শকুনগুলোর বহুপূর্বেই মধুগাঁও ছেড়ে চলে গিয়েছিল।

'তাই সমস্যা হল বুড়ীকে বয়ে নিয়ে যাবে কে? এসব ব্যাপারে পার্সীরা বামুনদের চেয়ে তিনকাঠি বেশী গোঁড়া। 'শববাহক' না হলে তো চলবে না—বরঞ্চ পার্সী সম্প্রদায় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ করে তিন দিন কাটিয়ে দেবে তবু 'শববাহক' ভিন্ন কেউ মড়া ছুঁতে পারবে না।

'টেলিগ্রাম করা হল এক আঁটা—চতুর্দিকের পার্সীদের কাছে, পার্সী-ধর্ম লোপ পায়, পার্সী-ঐতিহ্য গেল গেল, তোমরা সব আছো কি করতে, চারটে 'শববাহক' না পেলে মধুগাঁও উচ্ছন্ন যাবে, সৃষ্টি লোপ পাবে।

'শববাহকেরা শেষটায় এল। এক ছোকরা 'দস্তুর' তখনো মিসিং লিঙ্কের ন্যাজের মত খসি-খসি করে মধুগাঁয়ের পশ্চাদ্দেশে ঝুলছিল, সে মন্তর-ফন্তরগুলো সেরে দিলে—হোলি জিসসই জানেন তার কতটা শুদ্ধ কতটা ভুল।

'সেই মার্চ মাসের আগুনের ভিতর দিয়ে চারটে শববাহক, 'দস্তুর'জী আর আমারই মত আরো দুই মূর্খ গেলুম টাওয়ার অব সায়লেন্সে। গেটের কাছে শববাহক ছাড়া আর সবাইকে দাঁড়াতে হল। একটা গাছ পর্যন্ত নেই যার ছাওয়ায় একটু কম গরম হই। সান্ত্বনা এইটুকু যে শববাহকেরা রেকর্ড টাইমের ভিতর বেরিয়ে এল। গেটে তালা মেরে আমরা সবাই ধুঁকতে ধুঁকতে শহরে ফিরে এলুম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলুম আর যদি কখনো ঐ হতভাগা টাওয়ারে যেতে হয় তবে যাব,

শেষবারের মত, শববাহকদের কাঁধে চেপে।

'কিন্তু খুদার কেরামতির কে ভেদ করবে বলো? তিন মাস যেতে না যেতে মরলেন আমার বিধবা পিসি—বাবা বিদেশে, মা বহুকাল পূর্বেই গত হয়েছেন। বাড়িতে সোমত্থ আর কেউ নেই। আমি পাগলের মত শববাহকের সন্ধানে দুনিয়ার চেনা অচেনা সবাইকে তার করলুম। মে মাসের অসহ্য গরম পড়েছে আকাশ ভেঙে—মধুগাঁয়ে যে ক'ফোঁটা বিষ্টি হয় সে জুলাই মাসে, তার পূর্বে ও মুল্লুকে কখনো মেঘ করেনি, বৃষ্টি ঝরেনি। ধরণী যে ঠাণ্ডা হবেন তার কোনো আশা-ভরসা নেই জুলাই মাস পর্যন্ত। 'দস্তুর'টিও ইতিমধ্যে ন্যাজটার মত খসে পড়েছেন, তারই বা সন্ধান পাই কোথায়?

'ভাগ্যিস্ আমি ইস্কুল মাস্টার। আমার ছেলেরা ছুটলো এদিক ওদিককার শহরে। তারা সব হিন্দু, দু'একটি মুসলমান—কিন্তু গুরুর দায় বুঝতে পেরে কেউ সাইকেলে চড়ে, কেউ লোকাল ধরে এমনি লাগা লাগলো যে মনে হল তারা বুঝি কুয়েশচেন পেপার লীক হওয়ার সন্ধান পেয়েছে। ভগবান তাদের মঙ্গল করুন, সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়ে গেল।

'ছেলেদের বললুম, 'বাবারা আমায় বাঁচালে। কিন্তু আর না। তোমাদের আর সঙ্গে আসতে হবে না। আর শোনো, এই গরমে যদি টাওয়ার যেতে আসতে আমি মরি তাহলে আমাকে পুড়িয়ে ফেলো, না হয় গোর দিয়ো।'

আমি বললুম, 'সে কি কথা?'

আমার কথা যেন আদপেই শুনতে পাননি সেই রকম ভাবে বলে যেতে লাগলেন, 'যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কড়াইয়ে গরম তেল ফুটছে আর আমি তারই ভিতর সাঁতার কেটে কেটে টাওয়ারের দিকে চলেছি। এক পা ফেলি আর ভাবি এ-দুনিয়ায় এই শেষ পা ফেলা, পরের কদমেই দেখব জাহান্নমের বুকিং আপিসের সামনে 'কিউয়ে' পৌঁছে গিয়েছি— স্বর্গে যাওয়ার হলে ভগবান এই কড়াই-ভাজার প্র্যাকটিস কপালে লিখবেন কেন?

'টাওয়ার অব সায়লেন্সের সামনে এসে বসে পড়েছি। 'দস্তুর'জীর শেষ মন্ত্রোচ্চারণ আমার কানে এসে পৌঁচচ্ছে যেন কোন দূরদূরান্ত থেকে। বোঝা-না-বোঝার মাঝখানে দিয়ে যেন কিছু দেখছি, কিছু শুনছি, শাববাহকেরা ক্লান্ত শ্লথ গতিতে মড়া নিয়ে টাওয়ারের ভিতর ঢুকল।

'তার পর মুহূর্তেই আমার সমস্ত চৈতন্য ফিরে এল, টাওয়ারের ভিতর থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো তীব্র তীক্ষ্ণ চীৎকার শুনে। সে চীৎকারে ছিল মাত্র

একটা জিনিস—ভয়। যারা চীৎকার করলো তারাই যে শুধু ভয় পেয়েছে তা নয়, সে চীৎকার যেন স্পষ্ট ভাষায় বললো, আর কারো নিস্তার নেই।

'সঙ্গে সঙ্গে চারজন শববাহকের দুজন পাগলের মত হাত পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে এদিক ওদিক টাল খেয়ে খেয়ে ছুটে বেরিয়ে এল গেট দিয়ে। একজন আমাদের দিকে তাকিয়েই একমুখ ফেনা বমি করে পড়ল 'দস্তুর'জীর পায়ের কাছে, আরেকজন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই রকম টাল খেয়ে খেয়ে যে কোন দিকে চলল সে জানে না, 'দস্তুর'জীও একবার তার দিকে তাকান আরেকবার তাকান ভিরমি-যাওয়া লোকটার দিকে। টাওয়ারের ভিতর থেকে আর কোনো শব্দ আসছে না, কিন্তু যে পাগলটা ছুটে চলেছে সে চীৎকার করে করে যেন গলা ফাটিয়ে দিচ্ছে—সে কী অমানুষিক বীভৎস কণ্ঠস্বরের বিকৃত পরিবর্তন।

'দস্তুরজী আর আমি এমনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছি যে আমাদের মাথায় কর্তব্যাকর্তব্য কিছুই খেলছে না, পা দুটো যেন মাটিতে শেকড় গেড়ে বসে গিয়েছে। হতভম্ব হয়ে গিয়েছি বললে অল্পই বলা হল, কারণ অদ্ভুত এক ভীতি আমাকে তখন অসাড় করে ফেলেছে।

'কতক্ষণ এ রকম ধারা কাটলো আমার মনে নেই। আস্তে আস্তে মাথা সাফ হতে লাগল, কিন্তু ভয় তখনো কাটেনি। দস্তুর'জী বললেন, 'আর দুটো শববাহকের কি হল? তারা বেরুচ্ছে না কেন?' আমার মনেও সেই প্রশ্ন, উত্তর দেব কি?

'দস্তুরজী আমার দুজনেরই ভিতরে যাওয়া বারণ। দস্তুরজীর কর্তব্য বোধ হয়েছে না কি, কে জানে, বললেন 'চলুন, ভিতরে যাই।'

'আমার এখনো মনে হয়, 'দস্তুর'জী তখন সম্পূর্ণ সম্বিতে ছিলেন না; আমি জানি আমি নিশ্চয়ই ছিলুম না। তাঁর পিছনে পিছনে কোন্ সাহসে ভর করে গেলুম বলতে পারব না। আমি এ-বিষয়ে বহু বৎসর ধরে আপন মনে তোলপাড় করেছি। খুব সম্ভব যুগ যুগ ধরে 'দস্তুর'জীদের হুকুম তামিল করে করে আমরা সাধারণ গৃহী বিপদকালে মন্ত্রমুগ্ধের মত এখনো তাঁদের অনুসরণ করি।

'ভিতরে ঢুকে বাঁ দিকে মোড় নিয়েই দেখি—'

ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে গেলেন; আমি বললুম, 'কি, কি?'

আমার দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে বললেন, 'এই যেরকম আমি আপনার দিকে তাকালুম, ঠিক সেই রকম তাকিয়ে আছে টাওয়ারের দেয়ালের একটা খোপের ভিতর পা ছাড়িয়ে বসে, ঘাড় আমাদের দিকে ফিরিয়ে সেই হাড্ডি-

সার বুড়ী—যাকে আমরা তিন মাস আগে এই টাওয়ারে রেখে গিয়েছিলুম। গায়ের চামড়া আরো শুকিয়ে গিয়েছে, আর,—আর, চোখের কোটর দুটো ফাঁকা, কালো দুই গর্ত। আমি অজ্ঞান হয়ে পড়লুম।'

হুঙ্কার দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কেউ আমাকে একটা বোতল দেবে না নাকি রে?'

অথবা ঐ রকম কিছু একটা; আমি স্পষ্ট শুনতে পাইনি। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। কি করে যে এ রকম ব্যাপার সম্ভবপর হতে পারে সে কথা জিজ্ঞেস করবার মত হিম্মৎ বুকে বেঁধে উঠতে পারছিনে, পাছে আরো ভয়ঙ্কর কোনো এক বিভীষিকা তিনি আমার চোখের সামনে তুলে ধরেন।

হঠাৎ যেন আমার প্রতি ভদ্রলোকের দয়া হল। আমার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ভয় পাবেন না। আপনাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলছি।

'যখন জ্ঞান ফিরে পেলুম তখন দেখি আমার উপর কে যেন বালতি বালতি জল ঢালছে। তারপর বুঝলুম বৃষ্টি নেমেছে। আমার চতুর্দিকে স্কুলের ছেলেরা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

'সেই যে শববাহক পাগলের মত ছুটে গিয়েছিল তাকে ও রকম অবস্থায় একা দেখতে পেয়ে ছেলেরা আমাদের সন্ধানে এখানে এসে পৌঁচেছে।

'যে দুজন শববাহক ভিতরে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তারা আর কখনো জ্ঞান ফিরে পায় নি। যে বাইরে এসে ভিরমি গিয়েছিল সে সুস্থ হল বটে কিন্তু তার মাথা এখনো সম্পূর্ণ ঠিক হয়নি—আর যে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এসেছিল তাকে এখনো পাগলা গারদে বেঁধে রাখা হয়েছে। একমাত্র 'দস্তুর'জীই এই বিভীষিকা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন।

'অথচ ব্যাপারটা পরে পরিষ্কার বোঝা গেল। বুড়ী ছিল হাড্ডি-সার, গায়ে একরত্তি চর্বি ছিল না, যেটুকু মাংস ছিল তা না থাকারই শামিল। তিন মাসের গরমে বুড়ী শুঁটকি হয়ে এমনি এক অদ্ভুত ধরনে বেঁকে গিয়েছিল যেন পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে উঠে বসেছে—শুধু চোখ দুটো একদম উপে গিয়েছে। সর্বশরীরের কোথাও এতটুকু আঁচড় নেই—আপনাকে আগেই বলেছি মধুগাও থেকে সব শকুন বহুদিন পূর্বেই পালিয়ে গিয়েছিল।

'এক সাধুর কৃপায় আমি সুস্থ হয়ে উঠলুম। কিন্তু অকালে বৃষ্টি নামলে আমাকে এখনো বোতল বোতল মদ খেয়ে ছবিটা মগজ থেকে মুছে ফেলতে হয়।'

পাদটীকা

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায়। পাঠান-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল। অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা ছেলেভাইপোকে টোলে না পাঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন। চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়-জয়কার পড়ে গেল—সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন।

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থা, যাঁরা কোনোগতিকে সংস্কৃত বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই-স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন। এঁদের আপন আপন বিষয়ে অর্থাৎ কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পাণ্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশী কিন্তু সম্মান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম। শুনেছি কোনো কোনো ইস্কুলে পণ্ডিতের মাইনে চাপরাসীর চেয়েও কম ছিল।

আমাদের পণ্ডিতমশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নেই কিন্তু এ কথা মনে আছে যে পণ্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনো পরান্ন ভক্ষণ করেননি—পালপরব শ্রাদ্ধনিমন্ত্রণে পাত পাড়ার তো কথাই ওঠে না।

বাঙলা ভাষার প্রতি পণ্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল, অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা—ঘৃণা বললেও হয়ত বাড়িয়ে বলা হয় না। বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত বস্তু আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজী হতেন—অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত, সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না। আমি একদিন বাঙলা রচনায় 'দোলা-লাগা', 'পাখী-জাগা' উদ্ধৃত করেছিলুম বলে তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন। ক্রিকেট ভাল খেলা—সে দিন কাজে লেগে গিয়েছিল। এবং তার পরমুহূর্তেই বি পূর্বক, আ পূর্বক, ঘ্রা ধাতু ক উত্তর দিয়ে সংস্কৃত ব্যাঘ্রকে ঘায়েল করতে পেরেছিলুম বলে তিনি আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, 'এই দণ্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুষ্পাঠীতে যা। সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে।'

কিন্তু পণ্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশী, এবং

টেবিলের উপর পা দু'খানা তুলে দিয়ে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশী। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেডমাস্টারকে একদম পরোয়া না করে। কারণ হেডমাস্টার তাঁর কাছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পড়েছিলেন এবং তিনি যে লেখাপড়ায় সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্তীমূর্খ ছিলেন সে কথাটি পণ্ডিতমশাই বারম্বার অহরহ সর্বত্র উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করতেন। আমরা সে কাহিনী শুনে বিমলানন্দ উপভোগ করতুম, আর পণ্ডিত-মশাইকে খুশী করবার পন্থা বাড়ন্ত হলে ঐ বিষয়টি নূতন করে উত্থাপনা করতুম।

আমাকে পণ্ডিতমশাই একটু বেশী স্নেহ করতেন। তার কারণ বিদ্যাসাগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই ; ঐ 'দোলা-লাগা, পাখী-জাগা'ই আমার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে একমাত্র গোমাংস ভক্ষণ। পণ্ডিতমশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন তার প্রমাণ তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানা প্রকার কটুকাটব্য বর্ষণ করে। 'অনার্য', 'শাখা-মৃগ', 'দ্রাবিড়-সম্ভূত' কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সাধারণতঃ সম্বোধন করতেন না ; তা ছাড়া এমন সব অশ্লীল কথা বলতেন যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি। তবে এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে পণ্ডিতমশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে যেতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভালাভের আশা বা ভয় না করে। এবং তাঁর অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত বিদগ্ধরূপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনো মনস্থির করতে পারিনি যে সেগুলো শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি, কোনটা বেশী হয়েছে।

পণ্ডিতমহাশয়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু-জোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাঁচানো থাকত—অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয়, চাদর। ক্লাশে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন, আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমাদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বিসহস্র বারের মত স্মরণ করিয়ে দিতে দিতে পা দু'খানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তারপর যে কোনো একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিতান্ত যে-দিন কোনো অজুহাতই পেতেন না—ধর্মসাক্ষী সে-কসুর আমাদের নয়—সেদিন দু'চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে—কিন্তু বেশ জোর গলায়—আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন, 'কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মত নিষ্ফল

নয় কি ?' তারপর কখনো আপন গতায়ু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড়বিড় করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টানা-পাখার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি ঋগ্বেদে আছে, যমপত্নী যমী যখন যমের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনো প্রকারে সান্ত্বনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস, পণ্ডিতমশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য অহরহ ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এরকম দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান—একথা অস্বীকার করার জো নেই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে কিন্তু আজো যখন তাঁর কথা ব্যাকরণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তাঁর যে ছবিটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেটি তাঁর জাগ্রত অবস্থার নয়; সে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা-তোলা, মাথা একদিকে ঝুলে-পড়া, টিকিতে দোলা-লাগা কাষ্ঠাসন শরশয্যায় শায়িত ভারতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদেব। কিন্তু ছিঃ, আবার 'দোলা-লাগা' সমাস ব্যবহার করে পণ্ডিতমশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন ?

সে-সময়ে আসামের চীফ-কমিশনার ছিলেন এন. ডি. বীটসন্ বেল্। সায়েবটির মাথায় একটু ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে তাঁর নাম, আসলে 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'। 'এন. ডি'তে হয় 'নন্দদুলাল' আর বীটসন্ বেল্ অর্থ 'বাজায় ঘণ্টা'—দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘণ্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমাদের শহরে।

ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্মলোচন। সে-ই একদিন খবর দিল লাট সাহেব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে—পদ্মর ভগ্নিপতি লাটের টুর ক্লার্ক না কি, সে তাঁর কাছ থেকে পাকা খবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল আগমন অবিমিশ্র আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। একদিক দিয়ে যেমন বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ কসুর বিন-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায় খিটখিটে মাস্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাস্টারমশায়ের মেজাজ যখন সকলের প্রাণ ভাজা ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন সময় খবর পাওয়া গেল, শুক্রুরবার দিন হুজুর আসবেন।

ইস্কুল শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাস্টার ইস্কুলের সর্বত্র চর্কিবাজীর মতন তুর্কীনাচন নাচছেন। যে দিকে তাকাই সে দিকেই হেডমাস্টার—নিশ্চয়ই তাঁর অনেকগুলো যমজ ভাই আছেন, আর ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব ক'জনকে রিকুইজিশন করে নিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বলল, 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়।'

'কেন কি হয়েছে?'

'দেখেই আয় না ছাই।'

পদ্ম আর যা করে করুক কখনো বাসি খবর বিলোয় না। হেডমাস্টারের চড়ের ভয় না মেনে কমন-রুমের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখি, অবাক কাণ্ড। আমাদের পণ্ডিতমশাই একটা লম্বা-হাতা আন্‌কোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদবাকি মাস্টাররা কলরব করে সে-গেঞ্জিটার প্রশংসা করছেন। নানা মুনি নানা গুণ কীর্তন করছেন; কেউ বলছেন পণ্ডিতমশাই কি বিচক্ষণ লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছেন (গাঁজা, পণ্ডিতমশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তিও ছিল না), কেউ বলছেন আহা, যা মানিয়েছে (হাতী, পণ্ডিতমশাইকে সার্কাসের সঙের মত দেখাচ্ছিল), কেউ বললেন, যা ফিট করেছে (মরে যাই, গেঞ্জির আবার ফিট-অফিট কি?)। শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের ইয়ার মৌলবী সায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভশচায, এ রকম উম্‌দা গেঞ্জি স্রেফ দু'খানা তৈরী হয়েছিল, তার-ই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ, আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানী দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর কারো কপালে এ রকম গেঞ্জি নেই।'

চাপরাসী নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন।'

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেণ্ড পিরিয়ডে বাঙলা। পণ্ডিতমশাই আসতেই আমরা সবাই ত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে শাস্ত্রে সেলাই-করা কাপড় পরা বারণ বলে পণ্ডিতমশাই পাঞ্জাবী শার্ট পরেন না, কিন্তু লাট সায়েব আসছেন, শুধু গায়ে ইস্কুলে আসা চলবে না তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই-করা কাপড়ের পাপ থেকে

পণ্ডিতমশাই এই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন।

গেঞ্জি দেখে আমরা এতই মুগ্ধ যে পণ্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ সব কিছুর জন্যই আমরা তখন তৈরী কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিন মাফিক কিছুই করলেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন।

পদ্মলোচনের ডর ভয় কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পণ্ডিতমশাই, গেঞ্জিটা কদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য. পণ্ডিত-মশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কণ্ঠে বললেন, 'পাঁচ সিকে।'

আধ মিনিট যেতে না যেতেই পণ্ডিতমশাই দু'হাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব অসম্ভব জায়গায় কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাত দিয়ে চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনো মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মত এখানে ওখানে খ্যাঁস খ্যাঁস করে খামচান।

একে তো জীবন-ভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নূতন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালে সে যে-রকম আকাশের দিকে দু' পা তুলে তড়পায় শেষটায় পণ্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনো করুণ কণ্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব, এ কী গব্ব-যন্তণা', কখনো এক হাত দিয়ে আরেক হাত চেপে ধরে, দাঁত কিড়িমিড়ি খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন—লাট সায়েবের সামনে তো সর্ব্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, 'পণ্ডিতমশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাট সায়েব এলে আমি জানালা দিয়ে দেখতে পাব। তখন না হয় ফের পরে নেবেন।'

বললেন, 'ওরে জড়ভরত, গব্ব-যন্তণাটা খুলছি নে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য।'

আমি হাত জোড় করে বললুম, 'একদিনে অভ্যেস হবে না পণ্ডিতমশাই, ওটা আপনি খুলে ফেলুন।'

আসলে পণ্ডিতমশাইয়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই; শুধু আমাদের কারো কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসেছিলেন। তবু সন্দেহ-ভরা চোখে বললেন, 'তুই তো একটা আস্ত মর্কট—শেষটায় আমাকে

ডোবাবি না তো ? তুই যদি হুশিয়ার না করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন ?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে, কসম খেলুম ॥

পণ্ডিতমশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তাঁর টিকিটি কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশী ঘৃণা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তারপর লুপ্ত-দেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গ খামচালেন। বুক পিঠ ততক্ষণে লাল লাল আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোনো বিপদ ঘটল না। পণ্ডিতমশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরণ করলেন, আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম, ধাম, কোন্ দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা, তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময়মত ওয়ার্নিং দিলুম। পণ্ডিতমশাই আবার তাঁর 'গব্ব-যন্তণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন।

লাট এলেন, সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটর, ইনসপেকটর, হেডমাস্টার, নিত্যানন্দ—আর লাট সায়েবের এডিসি ফেডিসি না কি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পান্‌ডিট্' বলে সায়েব হাত বাড়ালেন। রাজসম্মান পেয়ে পণ্ডিতমশারে সব যন্ত্রণা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সায়েবকে সেলাম করলেন—এই অনাদৃত পণ্ডিত শ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেয়েও যে কি রকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে-সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নেই।

হেডমাস্টার পণ্ডিতমশায়ের কৃত-তদ্ধিতের বাই জানতেন; তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্ত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন দশেক একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ'। লাট সায়েব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট এ টাইম, প্লীজ'। লাট সায়েব আমাদের বলল 'প্লীজ', এ কী কাণ্ড! তখন আবার আর কেউ রা কাড়ে না। হেডমাস্টার শুধালেন 'বিহঙ্গ', আমরা চুপ,—তখনো প্লীজের ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁঠা যতেটা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয় দেশে নাম করে ফেললে—আমরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাট সায়েব ততক্ষণ হেডমাস্টারের সঙ্গে 'পণ্ডিত' শব্দের মূল নিয়ে ইংরেজিতে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাস্টার কি বলেছিলেন জানিনে তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পণ্ডিতদের ধর্মে জড়শীলতার প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, যার সব কিছু পণ্ড

হয়ে গিয়েছে সেই পণ্ডিত।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের পণ্ডিতদের সর্বনাশ, সর্বস্ব পণ্ডের ইতিহাস হয়ত রবীন্দ্রনাথ জানতেন না,—না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়ত একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাট সায়েব চলে গিয়েছেন, যাবার পূর্বে পণ্ডিতমশায়ের দিকে একখানা মোলায়েম নড্ করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে ফেটে যাবার উপক্রম। আনন্দের আতিশয্যে নূতন গেঞ্জির চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা দু'তিনবার স্মরণ করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড্ হল।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাঙলা ক্লাস বসেছে। পণ্ডিতমশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমুচ্ছেন, না শুধু চোখবন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনো গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারো দিকে না তাকিয়েই পণ্ডিতমশাই হঠাৎ ভরা মেঘের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাঁহার কণ্ঠ তিনি নীলকণ্ঠ—যোগারূঢ়ার্থে শিব। শাখাতে যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ, অর্থাৎ বাঁদর—ক্লাসরূঢ়ার্থে আমি উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে।'

পণ্ডিতমশাই শুধালেন, 'লাট সায়েবের সঙ্গে কে কে এসেছিল বল তো রে।'

আমি সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাসী নিত্যানন্দকেও বাদ দিলুম না।

বললেন, 'হল না। আর কে ছিল?'

বললুম, 'ঐ যে বললুম, একগাদা, এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা তো ক্লাসে ঢোকেননি।'

পণ্ডিতমশাই ভরা মেঘের গুরু গুরু ডাক আরো গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূঢ়? আমি কালা না তোর মত অলম্বুষ?

আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আর তো কেউ ছিল না পণ্ডিতমশাই; জিজ্ঞেস করুন না পদ্মলোচনকে, সে তো সবাইকে চেনে।'

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, 'ওঃ, উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ—রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন? লাট সায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষণ শক্তি নিয়ে—'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'হাঁ, হাঁ, দেখেছি। ও তো এক সেকেণ্ডের তরে

ক্লাসে ঢুকেছিল।'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'মর্কট এবং সারমেয় কদাচ একগৃহে অবস্থান করে না। সে কথা যাক। কুকুরটার কি বৈশিষ্ট্য ছিল বল তো।'

ভাগ্যিস মনে পড়ল। বললুম, 'আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল।'

'হুঁ' বলে পণ্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন।

অনেকক্ষণ পর বললেন, 'শোন। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরিতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকোর মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছে। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমাকে অনেক সেলাম-টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিম্বর উল্লার শালা; লাট সায়েবের আরদালি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানি করে একটু স্থান দিই।'

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকোয় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফ্‌ট্ দিতেন।

পণ্ডিতমশায় বললেন, 'লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা হল। লাট সায়েবের সব খবর জানে, তোর মত কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সাহেবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে-খবরটা ও বেশ গুছিয়ে বলল।'

তারপর পণ্ডিতমশাই ফের অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমরা আটজনা।'

তারপর হঠাৎ কথা ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মদনমোহন কি রকম আঁক শেখায় রে?'

মদনমোহনবাবু আমাদের অঙ্কের মাস্টার—পণ্ডিতমশায়ের ছাত্র। বললুম, 'ভালই পড়ান?'

পণ্ডিতমশাই বললেন, 'বেশ বেশ। তবে শোন। মিম্বর উল্লার শালা বলল, লাট সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচা হয়। এইবার দেখি, তুই কি রকম আঁক শিখেছিস। বল তো দেখি, যদি একটা কুকুরের পেছনে মাসে পঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয় তবে ফি

ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয় ?'

আমি ভয় করেছিলুম পণ্ডিতমশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম বোধকরে তাড়াতাড়ি বললুম, 'আজ্ঞে, পঁচিশ টাকা।' পণ্ডিতমশাই বললেন, 'সাধু, সাধু!'

তারপর বললেন, 'উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাহ্মণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আটজন, আমাদের সকলের জীবন ধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাহ্মণ পরিবার লাট সায়েবের কুকুরের ক'টা ঠ্যাঙের সমান ?'

আমি হতবাক্।

'বল না।'

আমি মাথা নীচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পণ্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে বললেন, 'উত্তর দে।'

মূর্খের মত একবার পণ্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি সে মুখ লজ্জা, তিক্ততা, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে—কেউ বাদ যায়নি—পণ্ডিতমশাই আত্ম-অবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমাদের সাক্ষী রেখে।

পণ্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্ধতা ভেঙে কতক্ষণ পরে ক্লাস শেষের ঘণ্টা বেজেছিল আমার হিসেব নেই।

এই নিস্তব্ধতার নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাবে না।

'নিস্তব্ধতা হিরন্ময়' 'Silence is golden' যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলি পাই।

পুনশ্চ

অভিজ্ঞতাটা হয়েছিল প্যারিসে। কিন্তু এ রকম ধারা ব্যাপার বার্লিন, ভিয়েনা, লণ্ডন, প্রাগ যে-কোনো জায়গায় ঘটতে পারত।

প্যারিসে আমার পরিচিত যে কয়টি লোক ছিলেন তাঁরা সবাই গ্রীষ্মের অন্তিম নিঃশ্বাসের দিনগুলো গ্রামাঞ্চল অথবা সমুদ্র-তীরে কাটাতে চলে গিয়েছেন। বড্ড একা পড়েছি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরি আর গিমে ম্যুজিয়মে সমস্ত সময় কাটানো যায় না—প্যারিসের ফুর্তিফার্তি রঙ্গরস করা হয়ে গিয়েছে, তার পুনরাবৃত্তিতে আর কোনো নূতন তত্ত্ব নেই। এসব কথা ভাবছি আর প্লাস দ্য লা মাদলেনের জনতরঙ্গে গা ভাসিয়ে দিয়ে সমুখপানে এগিয়ে চলেছি এমন সময় শুনি, 'বঁ সোয়ার মসিয়ো ল্য দকৃতর।' তাকিয়ে দেখি ফ্রান্সের লক্ষ লক্ষ সুন্দরী যুবতীদের একজন। চেনা চেনা মনে হল কিন্তু চেষ্টা করেও নামটা স্মরণ করতে পারলুম না। অনেকখানি অভিমান মাখিয়ে সুন্দরী অনুযোগ করলেন, 'চিনতেই পারলেন না, অথচ প্যারিসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পূর্বেও আপনি আমাকে চিনতেন।' ঠাস করে মাস্টারমশায় চড় মারলে ছেলেবেলা যে-রকম মণ্টোনিগ্রোর রাজধানীর নাম আচম্বিতে মনে পড়ে যেত ঠিক সেই রকম এক ঝলকে মনে পড়ে গেল, দেশ থেকে মার্সেই হয়ে প্যারিস আসার সময় ট্রেনে এঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। হ্যাট পূর্বেই তুলেছিলুম, এবারে বাও করে বললুম, 'হাজার অনুশোচনা, মনস্তাপ এবং ক্ষমা-ভিক্ষা, মাদমোয়াজেল শাতিন্নো।' কায়দাকানুন বাবদে প্যারিস লক্ষ্ণৌ-এ বিস্তর মিল আছে। বিপাকে যদি প্যারিসের এটিকেট সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হন তবে নির্ভয়ে লক্ষ্ণৌ চালাবেন। পস্তাতে হবে না। ইতর ব্যাপারে 'যাহা অল্প তাহাই মিষ্ট' হতে পারে, কিন্তু ভদ্রতার ব্যাপারে 'আধিক্যে দোষ নেই।'

মাদমোয়াজেল ক্ষমাশীলা। 'আঁশাতে (enchanted),' বলে তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি দস্তানা পরা হাত ঠোঁটের কাছে ধরলুম—শাস্ত্রে বলে চুমো খাবে, কিন্তু অল্প পরিচয়ে 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং' সূত্রই প্রযোজ্য। মাদমোয়াজেল বললেন, 'মা-হারা শিশুর মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন যে?' আমি বললুম, 'ললাটস্য লিখন', তিনি বললেন, 'চলুন, আমার সঙ্গে সিনেমায়।'

খেয়েছে! একে তো সিনেমা জিনিসটার প্রতি আমার বিতৃষ্ণা, তার উপর ঈষৎ অনটনে দিন কাটাচ্ছি। একেবারে যে দরিয়ায় পড়েছি তা নয়, কিন্তু এটুখানি ইয়ে—অর্থাৎ কি না হ্রদ'ও জলে গা ভাসাতে হলে যে গামছার প্রয়োজন মা-গঙ্গাই জানেন তার অভাব কিছুদিন ধরে যাচ্ছে। আনিটা সিকিটা করব আর ফুর্তিও হবে এমন হিসিবি ব্যসনে আমি বিশ্বাস করিনে। তাই আমার গড়িমসি ভাব দেখে মাদমোয়াজেল বললেন, 'আমার কাছে দু'খানা টিকিট আছে—'পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ' বইখানার প্রশংসা শুনেছি।' আর এড়াবার পথ রইল না।

মাদমোয়াজেল বললেন, 'এখনো তো ঘণ্টাখানেক বাকি। চলুন একটা কাফেতে।'

'চলুন।'

ক্লের বিবি যে পানীয়ের ফরমাইস দিলেন তার নাম আমি কখনো শুনিনি, ওয়েটারটা পর্যন্ত প্রথমটায় বুঝতে পারে নি। আনতেও অনেক দেরি হল। সে পানীয় এলেনও অদ্ভুত কায়দায়। প্রকাণ্ড গম্বুজের মত গেলাসের তলাতে আধ ইঞ্চিটাক ফিকে হলদে, খোদায় মালুম কী চীজ। আমি কফির অর্ডার দিলুম।

ক্লের দশ মিনিটেই সেই খোদায়-মালুম-কি শেষ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চলুন, বড্ড গরম, এখানে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।' তখন ওয়েটার এসে আমাকেই বলল চল্লিশ ফ্রাঁ।' অর্থাৎ চার টাকার কাছাকাছি। বলে কি? ওই তিন ফোঁটা—যাকগে। ক্লের তখন ব্যাগ থেকে রুমাল বের করছিলেন; ব্যাগ বন্ধ করতে করতে বললেন, 'আপনিই দেবেন, সে কি?' আমি বললুম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়, আনন্দের কথা, হেঁ, হেঁ।'[২]

বেরিয়ে এসে ক্লের প্যারিসের পোড়া পেট্রলভরা বাতাসে লম্বা দম নিয়ে বললেন, 'বাঁচলুম। কিন্তু এখনো তো অনেক সময় বাকি। কোথায় যাই বলুন তো?'

দেশে থাকতে আমি ম্যালেরিয়ায় ভুগতুম। সব সময় সব কথা শুনতে পাইনে।

ক্লের বললেন, 'ঠিক, ঠিক, মনে পড়েছে। সিনেমার কাছেই খোলা হাওয়ায় একটা রেস্তোরাঁ আছে। আপনার ডিনার হয়ে যায়নি তো?'

বাঙালীর বদ অভ্যাস আমারও আছে। ডিনার দেরিতে খাই। তবু ফাঁড়া কাটাবার জন্য বললুম, 'আমি ডিনার বড একটা—'

বাধা দিয়ে ক্লের বললেন, 'আমিও ঠিক তাই। মাত্র এক কোর্স খাই। সুপ না, পুডিং না। রাত্রে বেশী খাওয়া ভারী খারাপ। অগস্টের প্যারিস ভয়ঙ্কর জায়গা।'

ততক্ষণে ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছে। প্যারিসের ট্যাক্সিওলারা ফুটপাথে মেয়েদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে গাহক কি না ঠিক ঠিক বুঝতে পারে।

জীবনে এই প্রথম বুঝতে পারলুম রবীন্দ্রনাথ কত বেদনা পেয়ে লিখেছিলেন:

'মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ।'

নিশ্চয়ই ট্যাক্সি চড়ে গিয়েছিলেন, মিটার খারাপ ছিল এবং ভাড়াও আপন ট্যাঁক থেকে দিতে হয়েছিল। না হলে গানটার কোনো মানেই হয় না। পায়ে হেঁটে গেলে দু' মাইল চলতে যা খর্চা, দু'লক্ষ মাইল চলতেও তাই।

বাহারে রেস্তোরাঁ। কুঞ্জে কুঞ্জে টেবিল। টেবিলে টেবিলে ঘন সবুজ প্রদীপ। বাদ্যিবাজনা, শ্যাম্পেন, সুন্দরী, হীরের আংটি আর উজির-নাজির-কোটাল। আমার পরনে গ্রে ব্যাগ আর ব্লু ব্লেজার। মহা অস্বস্তি অনুভব করলুম।

ক্লের ওয়েটারকে বললেন, 'কিছু না, শুদ্ধু 'অর দ্য ভর্'।'

'অর দ্য ভর্' এল। বিরাট বারকোষে ডজন খানেক ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য খোপে-খোপে সাজানো। সামোন মাছ, রাশান স্যালাদ, টুকরো টুকরো ফ্রাঙ্কফুর্টার, টোস্ট-সওয়ার-কাভিয়ার, ইয়োগুৎ (দই), চিংড়ি, স্টাফ্ট অলিভ, সিরকার পেঁয়াজ—এক কথায় আমাদের দেশের সাড়ে বত্রিশ ভাজা। তবে দাম হয়ত সাড়ে বত্রিশ শ' গুণেরও বেশী হতে পারে।

একেই বলে 'এক কোর্স খাওয়া!' কোথায় যেন পড়েছি মোতি-লালজী সাদাসিদে কুটির বানাতে গিয়ে লাখ টাকার বেশী খর্চা করেছিলেন। তালিমটা নিশ্চয়ই প্যারিসের 'এক কোর্স খাওয়া' থেকে পেয়েছিলেন।

ওয়েটার শুধাল, 'পানীয়?'

ক্লের ঘাড় বাঁদিকে কাত করে বললেন, 'নো', তারপর ডান দিকে কাত করে বললেন, 'উয়ি', ফের বাঁদিকে 'নো', ফের ডান দিকে 'উয়ি'—

আমার 'দোলাতে দোলে মন', ফাঁসি না কালাপানি?

কালাপানি নয়, শেষ দোলা ডান দিকে নড়ল, অর্থাৎ লাল পানি।

ক্লের দু' ফোঁটা ইংরাজিও জানেন। যে পানীয় অর্ডার দিলেন তার গুণকীর্তন করতে গিয়ে আমাকে বুঝিয়ে বললেন,—'ইৎ ইজ নৎ এ ড্রীন্ক বাৎ এ ড্রীম (স্বপ্ন) মসিয়ো, এ জিনিস ফ্রান্সের গৌরব, রসিকজনের মোক্ষ, পাপীতাপীর জর্দন-জল।'

নিশ্চয়ই। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এক বাউলকে উদ্ধৃত করে বলেছেন, 'যেজন ডুবলো, সখী, তার কি আছে বাকি গো?'

তারপর সেই এক কোর্স খাওয়া শেষ হতে না হতেই ওয়েটার এসে আমাদের বলল হঠাৎ এক চালান তাজা শুক্তি এসে পৌঁচেছে। সমস্ত রেস্তোরাঁয় আমরাই যে সবচেয়ে দামী দামী ফিন্সি খাদ্য খাবার জন্য এসেছি, এ তত্ত্বটা সে কি করে বুঝতে পেরেছিল, জানি নে। মৃদঙ্গের তাল পেলে নাচিয়ে বুড়াকে ঠেকানো যায় না, এ সত্যও আমি জানি, কাজেই ক্লের যখন ফরাসী শুক্তির উচ্ছ্বাসে গেয়ে তার এক ডজন অর্ডার দিলেন, তখন আমি এইটুকু আশা আঁকড়ে ধরলুম যে, যদি কোনো শুক্তির ভেতর থেকে মুক্তো বেরোয় তবে তাই দিয়ে বিল শোধ করব।

ক্লের ঢেকুর তোলেন নি। না জানি কত যুগ ধরে তপস্যা করার ফলে ফরাসী জাতি এক ডজন শুক্তি বিনা ঢেকুরে খেতে শিখেছে। ফরাসী সভ্যতাকে বারম্বার নমস্কার।

প্রায় শেষ কপর্দক দিয়ে বিল শোধ করলুম।

সে রাত্রে সিনেমায়ও গিয়েছিলুম। পাঁচ সিকের সিটে বসে 'অল কোয়াটের' বন্দুক কামানের শব্দের মাঝখানেও ক্লেরের ঘুমের শব্দ শুনতে পেয়েছিলুম। 'নাক ডাকা'টা বললুম না, গ্রাম্য শোনায় আর ফরাসী সভ্যতার দায় যতক্ষণ সে জাগ্রত জাগ্রত আছে।

রাত এগারোটায় সিনেমা শেষে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালুম, তখন ক্লের বললেন, 'কোথায় যাই বলুন তো, আমার সর্বাঙ্গ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।'

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'নৎর্ দামের গির্জেয়। সেই একমাত্র জায়গা যেখানে পয়সা খর্চা না করেও বসা যায়', কিন্তু চেপে গেলুম। বললুম, 'আমাকে এই বেলা মাফ করতে হচ্ছে মাদমোয়াজেল শাতিন্নো। কাল আমার মেলা কাজ, তাড়াতাড়ি না শুলে সকালে উঠতে পারব না।'

ক্লের কি বললেন আমি শুনতে পাই নি। ভদ্রতার শেষরক্ষা করতে পারলুম না বলে একটু দুঃখ হল। ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে দশমীর বিসর্জনের মত দেবীপূজার শেষ অঙ্গ। এত খর্চার পর সব কিছু 'এটুকু বাধায় গেল ঠেকি ?' চাবুক কেনার পয়সা ছিল না বলে দামী ঘোড়াটাকে শুধু দানাপানিই খাওয়ালুম, জিনটা পর্যন্ত লাগানো গেল না!

বাস-ভাড়া দিয়ে দেখি আমার কাছে আছে তিনটে কফি, একখানা সেনউইচ, আর পাঁচটি সিগারেটের দাম।

আমার কপাল—বাসের টায়ার ফাটল। আধ মাইল পথ হাঁটতে হবে।

প্যারিসের হোটেলগুলো বেশীর ভাগ সংযমী মহল্লায় অবস্থিত। সংযমীর বর্ণনায় গীতা বলেছেন সর্বভূতের পক্ষে যাহা নিশা সংযমী তাহাতে জাগ্রত থাকেন। তারপর সংযমী সেই নিশাতে কি করেন তার বর্ণনা গীতাতে নেই। আমার ডাইনে বাঁয়ে যে জনতরঙ্গ বয়ে চলেছে, তাদের চেহারা দেখে তো মনে হল না তাঁরা পরমার্থের সন্ধানে চলেছেন। তবে হয়ত এরা অমৃতের সন্তান— অমৃতের সন্ধানে বেরিয়েছেন আর অমৃতের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক ঋষি বলেছেন, 'অমৃতাস্তি সুরালয়েষু' অথবা 'বণিতাধরপল্লবেষু'।

ভারতবর্ষের হিন্দু মূর্খ, সে কাশী যায়, মুসলমান মূর্খ, সে মক্কা যায়। ইয়োরোপীয় সংযমী মাত্রই অমৃতের সন্ধানে প্যারিস যায়।

প্যারিসে নিশাভাগে নারীবর্জিতাবস্থায় চলনে পদে পদে বনিতাধরপল্লব থেকে আপনার কর্ণকুহরে অমৃত প্রবেশ করবে 'বঁ সোয়ার মসিয়ো—আপনার সন্ধ্যা শুভ হোক'। আপনি যদি সে ডাকে সাড়া দেন তবে—তবে কি হয় না হয় সে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমার নেই, প্রয়োজনও নেই, এমিল জোলার মল্লিনাথও আমি হতে চাই নে। শরৎ চাটুয্যে যা লিখেছেন, তা আমার এখনও হজম হয় নি।

হোটেল আর বেশী দূরে নয়—মহল্লাটা ঈষৎ নির্জন হয়ে আসছে। হঠাৎ একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিলুম, তাই আপন অজানাতে একটা 'বঁ সোয়ারের' উত্তর দিয়েই বুঝতে পারলুম ভুল করে ফেলেছি। এক সন্ধ্যায় দুই সুন্দরী সামলানো আমার কর্ম নয়। আমার পূর্বপুরুষগণ একসঙ্গে চার সুন্দরী সামলাতে পারতেন। হায়, আমার অধঃপাত কতই গগনচুম্বী থেকে কতই অতলস্পর্শী।

না:, এঁর বেশভূষা দেখে মনে তো হচ্ছে না ইনি 'বসন্তসেনার' সহোদরা, যদিও 'দরিদ্র চারু দত্ত' আমি নিশ্চয়ই বটি। এ রকম নিখুঁত সুন্দরী রাস্তায় বেরুবে কেন? তবে হাঁ, তুলসীদাস বলেছেন, সংসার কি অদ্ভুত রীতিতে চলে দেখ, শুঁড়ি দোকানে বসে বসে মদ বিক্রয় করে, সেখানে ভিড়েরও অন্ত নেই, আর বেচারী দুধওলাকে ঘরে ঘরে ফেরি দিয়ে দিয়ে দুধ বিক্রয় করতে হয়।' কিন্তু এ নীতি তো হেথায় খাটে না।

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না; কিন্তু আপনাকে ঠিক প্লেস করতে পারছি নে।'

সুন্দরী স্মিত হাস্য করলেন, বীণার পয়লা পিড়িঙের মত একটা ধ্বনিও বেরুল। সে-হাসি এতই লাজুক আর মিঠা যে তক্‌খুনি চিনতে পারলুম যে এঁকে আমি চিনি নে। এরকম হাসি অতি বড় অরসিকও একবার দেখলে ভুলতে পারে না।

কি করি, এ যে আবার আমার সঙ্গে সঙ্গে হাঁটতে আরম্ভ করেছে। এ-সুহাসিনী রসের হাটের বসন্তসেনা নিশ্চয়ই নয়, তবে এরকম গায়ে পড়ে আলাপ করল কেন? আর ভালো মন্দ কোনো কিছু বলছেই না কেন? এ কি রহস্য। নাঃ, কালই প্যারিস ছাড়ব। ক্রসওয়ার্ড আমি কাগজেই পছন্দ করি, জীবনে নয়।

হঠাৎ হোঁচট খেয়ে বেচারী পড়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি তাকে তুলে

ধরলুম। শুধালুম, 'কি হয়েছে।' বলল, 'রাস্তার দোষ নয়, আমি বড্ড ক্লান্ত!'

আমি জানি আমার পাঠকরা আমাকে আর ক্ষমা করবেন না, বলবেন, 'ওরে হস্তীমূর্খ এক সন্ধ্যায় দু' দু'বার ইত্যাদি।' তবু স্বীকার করছি আমি আবার সেই আহাম্মুখিই করলুম। কিন্তু এবার সোজাসুজি, প্যারিস-লক্ষ্মৌকে তিন-তালাক দিয়ে। বললুম, 'আমার কাছে তিনটে কফি, একটা স্যানউইচ আর পাঁচটি সিগরেটের দাম। কোনো কাফেতে গিয়ে একটু জিরোবেন?'

বলল, 'আমি শুধু কফি খাব।'

কাফেতে বসিয়ে বললুম, 'কফি স্যানউইচ খেয়ে বাড়ি যান।'

কিছু বলল না, আপত্তিও জানালো না।

কাফেতে কড়া আলোতে মেয়েটির চেহারা দেখে মনে হল এর দুর্বলতা না খেতে পেয়ে।

প্রেম অন্ধ কিন্তু প্যারিস তো প্রেমিক নয়। তবে সে এ-সুন্দরীকে উপোস করতে দিচ্ছে কেন? কিন্তু সে রহস্য সমাধানের জন্য একে প্রশ্ন করা বর্বরতা তো বটেই, তাই নিয়ে আপন মনে তোলপাড় করা অনুচিত। পৃথিবীর অনাহার ঘোচাবার দাওয়াই যখন আমার হাতে নেই তখন রোগের কারণ জেনে কি হবে?

হঠাৎ মেয়েটি বলল, 'তুমি ভুল বুঝেছ, আমি বে—'

আমি বললুম, 'চুপ, আমি কিছু শুনতে চাইনে।'

বলল, 'তাই vous (আপনি) না বলে tu (তুমি) বললুম। তবে নূতন নেবেছি। কাল রাত্রে প্রথম। কিন্তু কেউ আমার কাছে ঘেঁষল না সাহস করে, আমার চেহারা তো ওরকম নয় আমি জানি। আমিও কাউকে সাহস করে 'বঁ সোয়ার' বলে নিমন্ত্রণ করতে পারিনি।'

মানুষের দম্ভের সীমা নেই। স্থির করেছিলুম, কোনো প্রশ্ন শুধাব না তবু নিজের কথা জানতে ইচ্ছে করল। বললুম, 'আজ আমাকেই কেন 'বঁ সোয়ার' বললেন?'

'বোধ হয় বিদেশী,—না, কি জানি কেন। ঠিক বলতে পারব না।'

আমি বললুম, 'থাক্, আমি সত্যি কিছু শুনতে চাইনে।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'কিন্তু আজ রাত্রে যে করেই হোক আমাকে খদ্দের যোগাড় করতেই হবে। আজ সকালেই ল্যাণ্ডলেডি আমাকে বাড়ি থেকে তাড়াতে চেয়েছিল।'

রাত ঘনিয়ে আসছে, আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হল, 'আপনি বাড়ি যান আর নাই যান, আমার সঙ্গে বসে থাকলে তো আপনার—। জানেন তো, পুরুষের সঙ্গে বসে আছেন দেখলে কেউ আপনার কাছে আসবে না। রাতও অনেক হয়েছে। এখন মাতালের সংখ্যা বেড়েই চলবে।'

কেঁপে ওঠেনি, কিন্তু তার মুখখানি একটু বিকৃত হল।

কোনো কথা কয় না। বড় বিপদে পড়লুম, বললুম, 'আমি তা হলে উঠি?' বলল, 'কেন? আমার সঙ্গে বসতে চাও না?'

আমি তাড়াতাড়ি মাপ চেয়ে বললুম, 'না, না, তা নয়। আপনাকে সত্যি বলছি। কিন্তু আমার সঙ্গে বসে থাকলে আপনার সময় যে বৃথায় যাবে।'

বলল, 'তুমি আমাকে কফি খাওয়ালে।'

কাতর হয়ে বললুম, 'প্লীজ, জিনিসটা ওরকম ধারা নেবেন না।'

'তা হলে তুমি আমাকে কফি খাওয়ালে কেন?'

আমি বললুম, 'প্লীজ, প্লীজ, এসব কথা বাদ দিন।'

বলল, 'কেউ তো খাওয়ায় না। না, তুমি বসো। তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার সত্যি ভালো লাগছে।'

এই দুঃখ-বেদনার মাঝখানেও এর সাহচর্য, সৌন্দর্য যে আমাকে টানছিল সে-কথা অস্বীকার করে আপন দাম বাড়াতে চাইনে।

বলল, 'আর জানো, তুমি চলে গেলেই আমাকে 'বঁ সোয়ারের' পাত্র খুঁজতে বেরুতে হবে। আমি আর সাহস পাচ্ছি নে।'

হায় অরক্ষণীয়া, তুমি কি করে জানলে প্যারিস কত রূঢ় কত নিষ্ঠুর।

বললুম, 'আজ তা হলে থাক্ না। আপনাকে বাড়ি পৌছে দি। কোথায় থাকেন বলুন তো?'

'কাছেই, লাভনীর হোটেলের পাশের গলিতে।'

খুশী হয়ে বললুম, 'তা হলে চলুন, আমি লাভনীরেই থাকি।'

রাস্তায় চলতে চলতে সে আমার বাহু চেপে ধরল। হাতের আঙুল কোনো ভাষায় কথা বলে না বলেই সে অনেক কথা বলতে পারে। তার কিছুটা বুঝলুম, কিছুটা বুঝেও বুঝতে চাইলুম না। হঠাৎ মেয়েটার কেমন যেন মুখ খুলে গেল। বোধ হয় সেরাত্রে 'বঁ সোয়ার' বলার বিভীষিকা থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে বলে। বলতে লাগল, পয়সা রোজকারের কত চেষ্টা সে করেছে, কত চাকরী সে পেয়েছে, তারপর যারা চাকরি দিয়েছে তারা কি চেয়েছে, কি রকম জোর করেছে, সে

পালিয়েছে, আরো কত কি ?

আর কি অদ্ভুত সুন্দর ফরাসী ভাষা। থাকতে না পেরে বাধা দিয়ে বললুম, 'আপনি এত সুন্দর ফরাসী বলেন।'

ভারী খুশী হয়ে গর্ব করে বলল, 'বাঃ। দোদে পরিবারের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব ছিল যে।'

তাই বলো। আলফঁস দোদের মত ক'টা লোক ফরাসী লিখতে পেরেছে।

হোটেলে পৌঁছতে পৌঁছতে সে অনেক কথা বলে ফেলল।

হোটেল পেরিয়ে মেয়েটির বাড়ি যেতে হয়। দরজার সামনে সে দাঁড়াল। আমি বললুম, 'চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দি।' বলল, 'না।' আমি বললুম 'সে কি ?' উত্তর না পেয়ে বললুম, 'তা হলে বন্ ন্যুই,—শুভরাত্রি—তুমি এইটুকু একাই যেতে পারবে।'

শেকহ্যাণ্ড করার জন্য তার হাত ধরেছিলুম। সে হাত ছাড়ল না। মাথা নীচু করে বলল, 'তুমি আমাকে তোমার ঘরে নিয়ে চলো।'

আমাকে বোকা বলুন, মেয়েটিকে ফন্দিবাজ বলুন, যা আপনাদের খুশী, কিন্তু আমার ধর্মসাক্ষী আমি তাকে খারাপ বলে কিছুতেই স্বীকার করে নিতে পারলুম না। বললুম, 'আমার সামর্থ্য নেই যে তোমাকে সত্যিকার সাহায্য করতে পারি, কিন্তু তোমাকে ভগবান যে সৌন্দর্য দিয়েছেন তাকে বাঁচাতে পারলে যে-কোনো লোক ধন্য হবে।' 'ভগবান' শব্দটা প্যারিসের পথে বড় বেখাপ্পা শোনালো।

মেয়েটি মাথা নীচু করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললুম, 'কি হবে বৃথা উপদেশ দিয়ে। তুমি বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।'

আমার দিকে মুখ তুলে তাকাল। ডাগর ডাগর দু' চোখ আমাকে কি বলল সে কথা আজও ভুলিনি। আমার দিকে ও-রকম করে আর কেউ কখনো তাকায় নি।

তারপর আস্তে আস্তে সে আপন বাড়ির দিকে রওয়ানা হল।

আমি মুগ্ধ হয়ে অপলক দৃষ্টিতে দেখলুম, তার সমস্ত দেহটি আপন অসীম সৌন্দর্য বহন করে চলেছে রাজরাণীর মত সোজা হয়ে, আর মাথাটি ঝুঁকে পড়েছে বেদনা আর ক্লান্তির ভারে।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙতেই মনে হল, ভুল করেছি। মানুষ সাহায্য করতে

চাইলে সর্বাবস্থায়ই সাহায্য করতে পারে। নিজের প্রতি ধিক্কার জন্মাল, এত সোজা কথাটা কাল রাত্রে বুঝতে পারলুম না কেন।

তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে মেয়েটির—কি মূর্খ আমি নামটি পর্যন্ত জিজ্ঞেস করিনি—সন্ধানে বেরুতে যাবার মুখে হোটেলের পোর্টার আমাকে একটি ছোট পুলিন্দা দিল।

খুলতেই একখানা চিঠি পেলুম ;

'বন্ধু, তোমার কথাই মেনে নিলুম। আজ পাঁচটার ট্রেনে আমি গ্রামে চললুম। সেখানেও আমার কেউ নেই। তবু উপবাসে মরা প্যারিসের চেয়ে সেখানেই সহজ হবে। বিনা টিকিটেই যাচ্ছি।

তোমাকে দেবার মত আমার কিছু নেই, এই সুয়েটারটি ছাড়া। ভগবানেরই দয়া, তোমার গায়ে এটা হবে।

জ্যুলি।'

বেঁচে থাকো সর্দিকাশি'

ভয়ঙ্কর সর্দি হয়েছে। নাক দিয়ে না জল বেরচ্ছে তা সামলানো রুমালের কর্ম নয়। ডবল সাইজ বিছানার চাদর নিয়ে আগুনের কাছে বসেছি। হাঁচছি আর নাক ঝাড়ছি, নাক ঝাড়ছি, আর হাঁচছি। বিছানার চাদরের অর্ধেকখানা হয়ে এসেছে, এখন বেছে বেছে শুকনো জায়গা বের করতে হচ্ছে। শীতের দেশ, দোর জানালা বন্ধ, কিচ্ছু খোলার উপায় নেই। জানালা খুললে মনে হয় গৌরীশঙ্করের চূড়োটি যেন হিমালয় ত্যাগ করে আমার ঘরে নাক গলাবার তালে আছেন।

জানি, একই রুমালে বার বার নাক ঝাড়লে সর্দি বেড়েই চলে, কিন্তু উপায় কি ? দেশে হলে রকে বসে বাইরে গলা বাড়িয়ে দিয়ে সশব্দে নাক ঝাড়তুম, এ নোংরামির হাত থেকে রক্ষা তো পেতুমই, নাকটাও কাপড়ের ঘষায় ছড়ে যেত না।

হঠাৎ মনে পড়ল পরশু দিন এক ডাক্তারের সঙ্গে অপেরাতে আলাপ হয়েছে। ডাকসাঁইটে ডাক্তার—ম্যুনিক শহরে নাম করতে পারাটা চাট্টিখানা কথা নয়। যদিও জানি ডাক্তার করবে কচু, কারণ জর্মন ভাষাতেই প্রবাদ আছে, 'ওষুধ খেলে সর্দি সারে সাত দিনে, না খেলে এক সপ্তায়'।

তবু গেলুম তাঁর বাড়ি। আমার চেহারা দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা কি। আমি শুধালুম, 'সর্দির ওষুধ আছে? আপনার প্রথম এবং খুব সম্ভব শেষ ভারতীয় রোগীর একটা করে দিন। আমার এক নাক দিয়ে বেরচ্ছে রাইন, অন্য নাক দিয়ে ওডার।'

ডাক্তার যদিও জর্মন তবু হাত দু'খানি আকাশের দিকে তুলে ধরলেন ফরাসিস্ কায়দায়। বললেন, 'অবাক করলেন, স্যর! সর্দির ওষুধ নেই? কত চান? সর্দির ওষুধ হয় হাজারো রকমের।'

বলে আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে খুললেন লাল কেল্লার সদর দরজা পরিমাণ এক আলমারি। চৌকো, গোল, কোমর-মোটা, পেট-ভারী বাহান্ন রকমের বোতল-শিশিতে ভর্তি। নানা রঙের লেবেল আর সেগুলোর উপর লেখা রয়েছে বিকট বিকট সব লাতিন নাম।

এবারে খানদানী ভিয়েনীজ কায়দায় কোমরে দু'ভাঁজ হয়ে, বাও করে বাঁ হাত পেটের উপর রেখে ডান হাত দিয়ে তলোয়ার চালানোর কায়দায় দেরাজের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি দেখিয়ে বললেন, 'বেছে নিন, মহারাজ (কথাটা জর্মন ভাষায় চালু আছে); সব সর্দির দাওয়াই।'

আমি সন্দিগ্ধ নয়নে তাঁর দিকে তাকালুম। ডাক্তার মুখব্যাদন করে পরিতোষের ঈষৎ হাস্য দিয়ে গালের দুটি টোল খোলতাই করে দিয়েছেন—হা-টা লেগে গিয়েছে দু'কানের ডগায়।

একটা ওষুধের কটমটে লাতিন নাম অতি কষ্টে উচ্চারণ করে বললুম, 'এর মানে তো জানিনে।'

সদয় হাসি হেসে বললেন, 'আমিও জানিনে, তবে এটুকু জানি, ঠাকুরমা মার্কা কচু-ঘেঁচু মেশানো দিশী দাওয়াই মাত্রেরই লম্বা লম্বা লাতিন নাম হয়।'

আমি শুধালুম, 'খেলে সর্দি সারে?'

বললেন, 'গলায় একটু আরাম বোধ হয়, নাকের সুড়সুড়িটা হয়ত একটু আধটু কমে। আমি কখনো পরখ করে দেখিনি। সব পেটেণ্ট ওষুধ—নমুনা হিসেবে বিন পয়সায় পাওয়া। তবে সর্দি সারে না, এ কথা জানি।'

আমি শুধালুম, 'তবে যে বললেন, সর্দির ওষুধ আছে?'

বললেন, 'এখনো বলছি আছে কিন্তু সর্দি সারে সে কথা তো বলিনি।'

বুঝলুম, জর্মনি কাণ্ট হেগেলের দেশ। বললুম, 'অ'।

ফিস্‌ফিস্ করে ডাক্তার বললেন, 'আরেকটা তত্ত্বকথা এই বেলা শিখে নিন। যে

ব্যামোর দেখবেন সাতান্ন রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন সে ব্যামো ওষুধে সারে না।'

ততক্ষণে আবার আমি হাঁচ্ছো হাঁচ্ছো আরম্ভ করে দিয়েছি। নাকচোখ দিয়ে এবার আর রাইন-ওডার না, এবারে পদ্মা-মেঘনা। ডাক্তার ডজন দুই কাগজের রুমোল আর একটা ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেট আমার দিকে এগিয়ে দিলেন।

ধাক্কাটা সামলে উঠে প্রাণভরে জর্মন সর্দিকে অভিসম্পাত দিলুম।

দেখি, ডাক্তার আমার দিকে তাকিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছেন।

আমার মুখে হয়ত একটু বিরক্তি ফুটে উঠেছিল। বললেন, 'সর্দি-কাশির গুণও আছে।'

আমি বললুম, 'কচু, হাতি, ঘণ্টা!'

বললেন, 'তর্জমা করে বলুন।'

আমি বললুম, 'কচুর লাতিন নাম জানিনে; 'হাতী' হল 'এলেফাণ্ট' আর 'ঘণ্টা' মানে 'গ্লকে'।'

'মানে?'

'আর বুঝে দরকার নেই; এগুলো কটুবাক্য।'

আকাশপানে হানি যুগলভুরু বললেন, 'অদ্ভুত ভাষা! হাতী আর ঘণ্টা গালাগাল হয় কি করে! একটা গল্প শুনবেন? সঙ্গে গরম ব্রাণ্ডি?'

আমি বললুম, 'প্রথমটাই চলুক। মিক্স্ করা ভালো নয়।'

ডাক্তার বললেন, 'আমি ডাক্তারি শিখেছি বার্লিনে। বছর তিনেক প্র্যাকটিস করার পর একদিন গিয়েছি স্টেশনে, বন্ধুকে বিদেয় দিতে। ফেরার সময় স্টেশন-রেস্তোরাঁয় ঢুকেছি একটা ব্রাণ্ডি খাব বলে।

'ঢুকেই থমকে দাঁড়ালুম। দেখি, এক কোণে এক অপরূপ সুন্দরী। অত্যন্ত সাদাসিধে বেশভূষা,—গরীব বললেও চলে—আর তাই বোধ হয় সৌন্দর্যটা পেয়েছে তার চরম খোলতাই। নর্থ সী দেখেছেন? তবে বুঝতেন হব-হব সন্ধ্যায় তার জল কি রকম নীল হয়—তারই মত সুন্দরীর চোখ। দক্ষিণ ইটালিতে কখনো গিয়েছেন? না? তবে বুঝতেন সেখানে সোনালি রোদে রূপালি প্রজাপতির কি রাগিণী। তারই মত তাঁর ব্লণ্ড চুল। ডানয়ুব নদী দেখেছেন? না। তা হলে আমার সব বর্ণনাই বৃথা।'

আমি বললুম, 'বলে যান রসগ্রহণে আমার কণামাত্র অসুবিধে হচ্ছে না।'

'না, থাক। ওরকম বেয়ারিং পোস্টের বর্ণনা দিতে আমার মন মানে না। আমরা ডাক্তার-বদ্যি মানুষ, ভাষা বাবদে মুখ্যু-সুখ্যু। অনেক মেহন্নত করে যে

একটি মাত্র বর্ণনা কব্জায় এনেছি সেইটেও যদি না বোঝেন তবে আমার শোকটা কোথায় রাখি বলুন তো।'

কাতর হয়ে বললুম, 'নিরাশ করবেন না।'

'তবে চলুক ত্রিলেগেড্ রেস্। ডানয়ুব নদীর শান্ত-প্রশান্ত ভাবখানা তাঁর মুখের উপর। অথচ জানেন, ডানয়ুব অগভীর নদী নয়। আর ডানয়ুবের উৎপত্তিস্থল দেখেছেন? না। তাহলে বুঝতেন সেখানে তন্বঙ্গী ডানয়ুব যে রকম লাজুক মেয়ের মত এঁকে বেঁকে আপন শরীর ঢাকতে ব্যস্ত, এ-মেয়ের মুখে তেমনি ছড়ানো রয়েছে লজ্জার কেমন যেন একটা আঁকুবাঁকু ভাব।

'এই লজ্জা ভাবটার উপরই আমি বিশেষ করে জোর দিতে চাই। কারণ আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, লজ্জা-শরম বলতে আমরা যা কিছু বুঝি সে সব মধ্যযুগের পুরনো গল্প থেকে। বেয়াত্রিচে দান্তেকে দেখে লাজুক হাসি হেসেছিলেন —আমরা তাই নিয়ে কল্পনার জাল বুনি, আজকের দিনে এসব তো আর বার্লিন শহরে পাওয়া যায় না। মধ্যযুগের নাইটদের শিভালরি গেছে আর যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে মেয়েদের মুখ থেকে সব লজ্জা সব ব্রীড়া।

'কিন্তু আপনাদের দেশে নিশ্চয়ই এখনো এই মধুর জিনিসটি দেখতে পাওয়া যায়, আর তার চেয়েও নিশ্চয়, আপনার দেশের লোক এখনো অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে।

'তাই আপনি বিশ্বাস করবেন, কিন্তু আমি নিজে এখনো করতে পারিনি, কি করে আমার তখন মনে হল, এ-মেয়েকে না পেলে আমার চলবে না।

'হাসলেন না যে? তার থেকেই বুঝলুম, আপনি ওকীবহাল, আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পেরেছেন; কিন্তু জর্মনরা আমার এ-অবস্থার কথা শুনে হাসে। আর হাসবে নাই বা কেন? চেনা নেই, শোনা নেই, বিদ্যাবুদ্ধিতে মেয়েটা হয়ত অফিসবয়ের চেয়েও আকাট, হয়ত মাতালদের আড্ডায় বিয়ার বিক্রি করে পয়সা কামায়, কিম্বা এও তো হতে পারে যে তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে। এ-সব কোনো কিছুর তত্ত্ব-তাবাশ না করে এক ঝটকায় মনস্থির করে ফেলা, এ-মেয়ে না হলে আমার চলবে না! আমি কি খামখেয়ালির চেঙ্গিসখান না হাজারো প্রেমের ডন্ জুয়ান্?

'ভাবছি আর মাথার চুল ছিঁড়ছি—কোন্ অজুহাতে কোন্ অছিলায় এঁর সঙ্গে আলাপ করা যায়।

'কিছুতেই কোনো হদীস পাচ্ছিনে, আমাদের মাঝখানে তিনখানা মাত্র ছোট্ট

টেবিলের যে উত্তাল সমুদ্র সেটা পেরিয়ে ওঁর কাছে পৌঁছই কি প্রকারে। প্রবাদ আছে, প্রেমে পড়লে বোকা নাকি বুদ্ধিমান হয়ে যায়—প্রিয়াকে পাওয়ার জন্য তখন তার ফন্দি-ফিকির আর আবিষ্কার কৌশল দেখে পাঁচজনের তাক লেগে যায় আর বুদ্ধিমান নাকি প্রেমে পড়লে হয়ে যায় একদম গবেট—এমন সব কাণ্ড তখন করে বসে যে দশজন তাজ্জব না মেনে যায় না, এ লোকটা এসব পাগলামি করছে কি করে।

'এ জীবনে সেই সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করলুম যে আমি বুদ্ধিমান, কারণ পূর্ণ একঘণ্টা ধরে ভেবে ভেবেও আমি সামান্যতম কৌশল আবিষ্কার করতে পারলুম না, আলাপ করি কোন্ কায়দায়। কিন্তু এহেন হৃদয়াভিরাম তত্ত্ব আবিষ্কার করেও মন কিছুমাত্র উল্লসিত হল না। তখন বরঞ্চ বোকা বনতে পারলেই হয়ত কোনো একটা কৌশল বেরিয়ে যেত।

'ফ্রলাইন উঠে দাঁড়ালেন। কি আর করি। পিছু নিলুম। তিনি গিয়ে উঠলেন ম্যুনিকের গাড়িতে। আমিও ছুটে গিয়ে টিকিট কাটলুম ম্যুনিকের। কিন্তু এসে দেখি সে কামরার আটটা সীটই ভর্তি হয়ে গিয়েছে। আরো প্রমাণ হয়ে গেল, আমি বুদ্ধিমান, কারণ এ কথা সবাই জানে, বুদ্ধিমানকে ভগবান সাহায্য করলে এ-পৃথিবীতে বোকাদের আর বাঁচতে হত না। আমি ভগবানের কাছ থেকে কোনো সাহায্য পেলুম না।'

আমি বললুম, 'ভগবানকে দোষ দিচ্ছেন কেন? এ তো কন্দর্প ঠাকুরের ডিপার্টমেণ্ট।'

বললেন, 'তাতেই বা কি লাভ? তিনি তো অন্ধ। মেয়েটাকে বানিয়ে দিয়েছেন তাঁরই মত অন্ধ। এই যে আমি একটা এত বড় অ্যাপলো, আমার দিকে একেবারের তরে ফিরেও তাকালো না। ওঁকে ডেকে হবে —'

আমি বললুম, 'কচু, হাতী, ঘণ্টা।'

এবার ডাক্তার বাঙলা কটুকাটব্যের কদর বুঝলেন। বললেন, 'আহা-হা-হা।' তারপর জর্মন উচ্চারণে বললেন, 'কশু, হাটী, গণ্টা! খাসা গালাগাল।'

আমি বললুম, 'কামরাতে আটজনের সীট ছিল তো বয়েই গেল। প্রবাসে নিয়ম নাস্তি। আপনি কোনো গতিকে ধাক্কাধাক্কি করে—'

বললেন,'তাজ্জব করালেন। এ কি আপনার ইণ্ডিয়ান ট্রেন, না সাইবেরিয়াগামী প্রিজনার-ভ্যান! চেকার পত্রপাঠ কামরা থেকে বের করে দেবে না?

'দাঁড়িয়ে রইলুম বাইরের করিডরে ঠায়। দেখি, মেয়েটি যদি খানা-কামরায়

যায়। স্টেশনে তো খেয়েছে শুধু কফি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটলো, কত লোক কত কামরা থেকে উঠলো নামলো কিন্তু আমার স্বর্গপুরী থেকে কোনো—(কটুবাক্য) নামলো না। সব ব্যাটা নিশ্চয়ই যাচ্ছে ম্যুনিক। আর কোথাও যেতে পারে না? ম্যুনিক কি পরীস্থান না ম্যুনিকের ফুট-পাথ সোনা দিয়ে গড়া? অবাক করলে এই ইডিয়টগুলো।

'প্রেমে পড়লে নাকি ক্ষুধাতৃষ্ণা লোপ পায়। একবেলার জন্য হয়ত পায়। আমি লঞ্চ খাইনি, ওদিকে ডিনারের সময় হয়ে গিয়েছে—আমার পেটের ভিতর হুলুধ্বনি জেগে উঠেছে। এমন সময় মা-মেরির করুণা হল। মেয়েটি চলল খানা-কামরার দিকে। আমিও চললুম ঠিক পিছনে পিছনে। আহা, যদি একটা হোঁচট খেয়ে আমার উপর পড়ে যায়। দুত্তোর, তারও উপায় নেই—উঁচু হিলের জুতো হলে গাড়ির কাঁপুনিতে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে—এ পরেছে ক্রেপ-সোল্।

'ঠিক পিছনে পিছনে গিয়ে খানা-কামরায় ঢুকলুম। ওয়েটারটা ভাবলে স্বামী-স্ত্রী। না হলে তরুণ-তরুণী মুখ গুমসো করে খানা-কামরায় ঢুকবে কেন? বসালো নিয়ে একই টেবিলে—মুখোমুখি। হে মা-মেরি, নত্র দাম্ গির্জেয় তোমার জন্য আমি একশ'টা মোমবাতি মানত করলুম। দয়া করো, মা, একটা কিছু ফিকির বাৎলাও আলাপ করবার।

'বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান, কোনো সন্দেহ নেই আমি বুদ্ধিমান। কোনো ফিকিরই জুটলো না, অথচ মেয়েটি বসে আছে আমার থেকে দু'হাত দূরে এবং মুখোমুখি। দু'হাত না হয়ে দু'লক্ষ যোজনও হতে পারত—কোনো ফারাক হ'ত না।

'জানালা দিয়ে এক ঝটকা কয়লার গুঁড়া এসে টেবিলের উপর পড়ল। মেয়েটি ভুরু কুঁচকে সেদিকে তাকাতেই আমি ঝটিতি জানালা বন্ধ করতে গিয়ে করে ফেললুম আরেক কাণ্ড। ঠাস করে জানালাটা বুড়ো আঙুলের উপর পড়ে সেটাকে দিল থেৎলে। ফিনকি দিয়ে রক্ত।

'মা-মেরির অসীম দয়া কাণ্ডটা যে ঘটলো। মেয়েটি তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বলল, 'দাঁড়ান আমি ব্যাণ্ডেজ নিয়ে আসছি।'

'আমি নিজে ডাক্তার, বিবেচনা করুন অবস্থাটা। রুমাল দিয়ে চেপে ধরলুম আঙুলটাকে। মেয়েটি ছুটে নিয়ে এল কামরা থেকে ফার্স্ট এডের ব্যাণ্ডেজ। তারপর আঙুলটার তদারকি করল শাস্ত্র-সম্মত ডাক্তারি পদ্ধতিতে। বুঝলুম মেডিকেল কলেজে পড়ে। ঝানু ডাক্তার ফার্স্ট এডের ব্যাণ্ডেজ

বয়ে বেড়ায় না আর আনাড়ি লোক এরকম ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পারে না।

'আমি তো, 'না, না', 'আপনি কেন মিছে মিছে,' 'ধন্যবাদ, ধন্যবাদ', 'উঃ, বড্ড লাগছে,' 'এতেই হবে,' 'ব্যস্ ব্যস্' করেই যাচ্ছি আর সেই লিলির মত সাদা হাতের পরশ পাচ্ছি। সে কি রকম মখমলের হাত জানেন ? বলছি ; আপনি কখনো রাইনল্যাণ্ড গিয়েছেন ? না ? থাক, ভুলেই গিয়েছিলুম, প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনাকে কোনো বর্ণনা দেব না।

'প্রথম পরশে সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়, বলে না ? বড় খাঁটি কথা। আমি ডাক্তার মানুষ, আমার হাতে কোনো প্রকারের স্পর্শকাতরতা থাকার কথা নয় তবু আমার যে কী অবস্থাটা হয়েছিল আপনাকে সেটা বোঝাই কি করে ? মেয়েটি বোধ হয় টের পেয়েছিল, কারণ একবার চকিতের তরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বন্ধ করে আমার দিকে মাথা তুলে তাকিয়েছিল।

'তাতে ছিল বিস্ময়, প্রশ্ন এবং হয়ত বা একটুখানি, অতি সামান্য খুশীর ঝিলিমিলি। তবে কি আমার হাতের স্পর্শ—? কোন্ সাহসে এ-বিশ্বাস মনের কোণে ঠাঁই দিই বলুন।'

আমি গুন্ গুন্ করে বললুম,

'জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম হায় রে'।'

ডাক্তার বললেন, 'খাসা মেলডি তো। মানেটাও বলুন।'

বললুম, 'আফ্‌টার ইউ। আপনি গল্পটা শেষ করুন।'

বললেন, 'গল্প নয়, স্যর ; জীবনমরণের কথা হচ্ছে।'

আমি শুধালুম, 'কেন, সেপ্টিকের ভয় ছিল নাকি ?'

রাগের ভাব করে বললেন, 'ইয়োরোপে এসে আপনার কি সব রসকষ শুকিয়ে গিয়েছে ? আমাকে হেনেছে প্রেমের বাণ আর আপনি বলছেন অ্যান্টি-সেপ্টিক্ আন।'

আমি বললুম, 'অপরাধ নেবেন না।'

বললেন, 'তার পর আমি সুযোগ পেয়ে আরম্ভ করলুম নানা রকমের কথা কইতে। গোল গোল। আমি যে পরিচয় করার জন্য জান-কবুল সেটা ঢেকে চেপে। সঙ্গে সঙ্গে কখনো নুনটা এগিয়ে দি, কখনো ক্রুয়েটটা সরিয়ে নি, কখনো বা বলি, 'মাছটা খাসা ভেজেছে, আপনি একটা খান না ; ওহে খানসামা, এদিকে—, ইত্যাদি।

'করে করে সুন্দরীর মনটা একটু মোলায়েম করতে পেরেছি বলে মনে একটু ক্ষীণ আশার সঞ্চার হল।'

'মেয়েটি লাজুক বটে কিন্তু ভারী ভদ্র। আমার ভ্যাজর ভ্যাজর কান পেতে শুনলো, দু'একবার ব্লাশ্ করলো, সে যা গোলাপি—আপনি কখনো, না, থাক।

'কিন্তু খেল মাত্র একটি অমলেট আর দু'স্লাইস রুটি। নিশ্চয়ই গরীব। ক্ষীণ আশাটার গায়ে একটু গত্তি লাগল।' এমন সময় ডাক্তারের অ্যাসিস্টান্ট এসে জানালো রুগী এসেছে। ডাক্তার বললেন, 'এখখুনি আসছি।'

ফিরে এসে কোনো ভূমিকা না দিয়েই বললেন, 'ম্যুনিকে নাবলুম এক বস্ত্রে। এমন ভান করে কেটে পড়লুম যাতে মেয়েটি মনে করে আমি ভ্যান থেকে মাল নামাতে গেলুম। যখন 'গুড্ বাই' বলে হাত বাড়ালুম তখন সে একবার আমার দিকে তাকিয়েছিল। প্রেমে পড়লে নাকি মানুষের পাখা গজায়—হবেও বা, কিন্তু এ-কথা নিশ্চয় জানি মানুষ তখন চোখে মুখে এমন সব নূতন ভাষা পড়তে পারে যার জন্য কোনো শব্দরূপ ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হয় না। তবে সে পড়াতে ভুল থাকে বিস্তর, কাকতালীয় এন্তার।

'আমি দেখলুম, লেখা রয়েছে 'বিষাদ' কিন্তু পড়লুম, 'এই কি শেষ'?'

আমিও অবাক হয়ে শুধালুম, 'বার্লিন থেকে ম্যুনিক অবধি হামলা করে স্টেশনে খেই ছেড়ে দিলেন?'

ডাক্তারদের বাঁকা হাসি হেসে বললেন, 'আদপেই না। কিন্তু কি আর দরকার পিছু নিয়ে? মেডিকেল কলেজে পড়ে, ওতেই ব্যস্।

'সেদিনই গেলুম মেডিকেল কলেজের রেস্তোরাঁয়। লঞ্চ খেতে নিশ্চয়ই আসবে। এবারে মেয়েটি আর লজ্জা দিয়ে মনের ভাব ঢাকতে পারল না। আমাকে দেখা মাত্র আপন অজানাতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মুখে যে খুশী ছড়িয়ে পড়ল তা দেখে আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না, ভগবান মাঝে মাঝে বুদ্ধিমানকেও সাহায্য করেন।

'ততক্ষণে মেয়েটি তার আপন-হারা আচরণটাকে সামলে নিয়েছে—লজ্জা এসে আবার সমস্ত মুখ ঢেকে ফেলেছে।'

ডাক্তার খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, 'এখানেই যদি শেষ করা যেত তবে মন্দ হত না কিন্তু সর্দি-কাশির তো তা হলে কোনো হিল্লে হয় না। তাই কমিয়ে-সমিয়ে তাড়াতাড়ি শেষ করে দি।'

আমি বললুম, কমাবেন না। তালটা একটু দ্রুত করে দিন। আমাদের

দেশের ওস্তাদরা প্রথম খানিকটে গান করেন বিলম্বিত একতালে, শেষ করেন দ্রুত তেতালে।

ডাক্তার বললেন, 'দুঃখিনী মেয়ে। বাপ-মা নেই। এক খাণ্ডার পিসির বাড়িতে মানুষ হয়েছে। দু'মুঠো খেতে দেয় পরতে দেয়, ব্যস্। কলেজের ফীজটি পর্যন্ত বেচারী যোগাড় করে মাস্টারী করে।

'তাতে আমার কিছু বলার নেই কিন্তু আমার ঘোরতর আপত্তি এভাকে বুড়ী এমনি নজরবন্দ করে রেখেছে যে চকিতা হরিণীর মত সমস্তক্ষণ সে শুধু ডাইনে বাঁয়ে তাকায়, ঐ ঝি পিসি দেখে ফেললে, সে পরপুরুষের সঙ্গে কথা কইছে। আমি তো বিদ্রোহ করে বললুম,'এ কি বুখারার হারেম, না তুর্কী পাশার জেনানা? এ অত্যাচার আমি কিছুতেই সইব না।' এভা শুধু আমার হাত ধরে বলে, 'প্লীজ, প্লীজ, তুমি একটু বরদাস্ত করে নাও; আমি তোমাকে হারাতে চাইনে।' এর বেশী সে ককৃখনো কিছু বলেনি।

'এই মোকামে পৌঁছতে আমার লেগেছিল ঝাড়া একটি মাস। বিবেচনা করুন। সাত দিন লেগেছিল প্রেম নিবেদন করতে। পনরো দিন লেগেছিল হাতখানি ছুঁতে। তারো এক সপ্তাহ পরে সে আমায় বললে কেন সে এমন ভয়ে ভয়ে ডাইনে বাঁয়ে তাকায়।

'থিয়েটার সিনেমা মাথায় থাকুন, আমার সঙ্গে রাস্তায় পর্যন্ত বেরতে রাজী হয় না—পাছে পিসি দেখে ফেলে। আমি একদিন থাকতে না পেরে বললুম, তোমার পিসির কি কুইনটুপ্লেট আছে নাকি যে তারা ম্যুনিকের সব স্ট্র্যাটেজিক পয়েণ্টে দাঁড়িয়ে তোমার উপর নজর রাখছে?' উত্তরে শুধু কাতর স্বরে বলে, 'প্লীজ, প্লীজ।'

'যা-কিছু আলাপ-পরিচয়, ঘনিষ্ঠতা-আত্মীয়তা সব ঐ কলেজ-রেস্তোরাঁয় বসে। সেখানে ভিড় সার্ডিন্-টিনের ভিতর মাছের মত। চেয়ারে চেয়ারে ঠাসাঠাসি কিন্তু তার হাতে যে হাতখানা রাখব তারও উপায় নেই। কেউ যদি দেখে ফেলে।'

আমি বললুম,

'সমুখে রয়েছে সুধা পারাবার
নাগাল না পায় তবু আঁখি তার
কেমনে সরাব কুহেলিকার এই বাধা রে।'

ডাক্তার বললেন, 'মানে বলুন।'

আমি বললুম, 'আপ যাইয়ে, পরে বলবো।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই ভিড়ের মাঝখানে, কিম্বা করিডরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে

আলাপচারি। করিডরে কথা কওয়া যায় প্রাণ খুলে, কিন্তু তবু আমি রেস্তোরাঁর ভিড়ই পছন্দ করতুম বেশী কারণ সেখানে দৈবাৎ, ক্বচিৎ কখনো এভা তার ছোট্ট জুতোটি দিয়ে আমার পায়ের উপর দিত চাপ।

'তার মাধুর্য আপনাকে কি করে বোঝাই? এভাকে পরে নিবিড়তর করে চিনেছি কিন্তু সেই পায়ের চাপ যে আমাকে কত কথা বলেছে, কত আশ্বাস দিয়েছে সেটা কি করে বোঝাই?

'হয়ত তার চেনা কোনো এক ছোকরা স্টুডেণ্ট এসে হাসিমুখে তাকে দুটি কথা বললে। অত্যন্ত হার্মলেস; আমি কিন্তু হিংসেয় জরজর! টেবিলের উপর রাখা আমার হাত দুটো কাঁপতে আরম্ভ করছে, আমি আর নিজেকে সামলাতে পারছিনে—

'এমন সময় সেই পায়ের মৃদু চাপ।

সব সংশয়ের অবসান, সব দুঃখ অন্তর্ধান।'

ডাক্তার বললেন, 'তাই আমার দুঃখ আর বেদনার অবধি রইল না। এই বিরাট ম্যুনিক শহরে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিভৃতে মনের ভার নামাচ্ছে, নিষ্ঠুর সংসারে লড়বার শক্তি একে অন্যের সঙ্গসুখ স্পর্শসুখ থেকে আহরণ করে নিচ্ছে, আর আমি তারই মাঝখানে এমন কিছুই করে উঠতে পারছিনে যাতে করে এভাকে অন্তত একবারের মত কাছে টেনে আনতে পারি।

'শেষটায় আর সইতে না পেরে একদিন এভাকে কিছু না বলে ফিরে গেলুম বার্লিন। সেখান থেকে লিখে জানালুম, 'ও রকম কাছে থেকে না পাওয়ার দুঃখ আমার পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে—আমার নার্ভস্ একদম গেছে। তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসা আমার কিছুতেই হয়ে উঠত না—তোমার মুখের কাতর ছবি আমার চলে আসার সব শক্তি নষ্ট করে ফেলত'।'

আমি বললুম, 'আপনি তো দারুণ লোক, মশাই। তবে, হাঁ, আপনাদের নীটশেই বলেছেন, 'কড়া না হলে প্রেম মেলে না'।'

ডাক্তার বললেন, 'ঠিক উল্টো। কড়া হতে পারলে আমি ম্যুনিক থেকে পালাতুম না। পলায়ন জিনিসটা কি বীরের লক্ষণ? তা সে কথা থাক।

'উত্তর পেলুম সঙ্গে সঙ্গেই। সে চিঠিটি আমি এতবার পড়েছি যে তার ফুলস্টপ, কমা পর্যন্ত আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। এবং তার চেয়েও বড় কথা, সে চিঠিটির বক্তব্য আমার কাছে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ঠেকলো।

'আপনাদের দেশে অবিশ্বাস্য বলে কোনো জিনিস নেই—ভিখিরিকে মাথায়

তুলে নিয়ে আপনাদের দেশে হাতী হামেশাই রাজা বানায়। কিন্তু জর্মনিতে তো সে রকম ঐতিহ্য নেই। চিঠিতে লেখা ছিল :—

'বেশী লিখব না—আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাই স্থির করেছি তোমার ইচ্ছামত তোমায় আমায় একবার নিভৃতে দেখা হবে। তার পর বিদায়! যত দিন পিসি আছেন ততদিন আমি আর কোনো পন্থা খুঁজে পাচ্ছিনে। তুমি আসছে বুধবার দিন আমাদের বাড়ির সামনে ফুটপাতে অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে আসব।' '

ডাক্তার বললেন, 'বিশ্বাস হয় আপনার; যে মেয়ে পিসির ভয়ে আমার সঙ্গে কলেজ রেস্তোরাঁর বাইরে পর্যন্ত যেতে রাজী হত না, সে আমাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আপন ঘরে?'

আমি বললুম, 'পীরিতি-সায়রে ডোবার পূর্বে যে রাধা সাপের ছবিমাত্র দেখেই অজ্ঞান হতেন সেই রাধাই অভিসারে যাওয়ার সময় আপন হাত দিয়ে পথের পাশের সাপের ফণা চেপে ধরেছেন পাছে সাপের মাথার মণির আলোকে কেউ তাঁকে দেখে ফেলে'।

ডাক্তার বললেন, 'তাই বটে। তবে কি না আমি রাধার প্রেমকাহিনী কখনো পড়িনি। সে কথা থাক।

'আমি ম্যুনিক পৌঁছলুম, বুধবার দিন সন্ধ্যের দিকে। কয়লার গুঁড়োয় সর্বাঙ্গ ঢেকে গিয়েছিল বলে ঢুকলুম একটা পাবলিক বাথে স্নান করতে। টাবে বসে সর্ব-শরীর ডলাই-মলাই করে আর গরম জলে সেদ্ধ চিংড়িটার মত লাল হয়ে যখন বেরলুম তখন আর হাতে বেশী সময় নেই। অথচ গরম টাব থেকে ও রকম হুট করে ঠাণ্ডায় বেরলে যে সঙ্গে সঙ্গে ঝপ্ করে সর্দি হয় সে কথাও জানি। চানটা না করলেও যে হত সে তত্ত্বটা বুঝতে পারলুম রাস্তায় বেরিয়ে কিন্তু তখন আর আফসোস করে কোনো ফায়দা নেই। সেই ডিসেম্বরের শীতে চললুম এভার বাড়ির দিকে—মা-মেরির উপর ভরসা করে, যে এ যাত্রায় সর্দিটা নাও হতে পারে।'

আমি বললুম, 'আমরা বাঙলায় বলি, 'দুগ্‌গা বলে ঝুলে পড়লুম'।'

ডাক্তার বললেন, 'সাড়ে এগারোটার সময় গিয়ে দাঁড়ালুম এভার বাড়ির সামনের রাস্তায়। টেম্পারেচার তখন শূন্যেরও নীচে—আপনাদের পাগলা ফারন্‌হাইটের হিসেবে বত্রিশের ঢের নীচে। রাস্তায় এক ফুট বরফ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, আর আমার চতুর্দিকে যে হিম ঘনাতে লাগলো তার সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলতে পারি আমাকে যেন কেউ একটা বিরাট ফ্রিজিডেরের ভিতর তালাবন্ধ করে

রেখে দিল।

'তিন মিনিট যেতে না যেতে নামল মুষলধারে—বৃষ্টি নয়—সর্দি। সঙ্গে সঙ্গে ডাইনামাইট ফাটার হাঁচি—হাঁচ্চো, হাঁচ্চো, হাঁচ্চো। আপনার আজকের সর্দি তার তুলনায় নস্যি, অর্থাৎ নস্যির খোঁচায় নামানো আড়াই ফোঁটা জল। হাঁচি আর জল, জল আর হাঁচি।

'কি করি, কি করি ভাবছি, এমন সময় এভা এসে নিঃশব্দে আমার হাত ধরলো—বরফের গুঁড়োর উপর পায়ের শব্দ শোনা যায় না। তার উপর সে পরেছে সেই ক্রেপ-সোলের জুতো—বেচারীর মাত্র ঐ এক জোড়াই সম্বল।

'কোনো কথা না বলে আমাকে নিয়ে চলল তার সঙ্গে। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে, করিডরের খানিকটে পেরিয়েই তার কামরা। নিঃশব্দে আমাকে সেখানে ঢুকিয়ে দরজায় খিল দিয়ে মাথা নীচু করে আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

'এভার গোলাপি মুখ ডাচ্ পনিরের মত হলদে, টুকটুকে লাল ঠোঁট দুটি ব্লু-ডানয়ুবের মত ঘন বেগুনি-লীল—ভয়ে, উত্তেজনায়।

'আর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হল আবার আমার সেই ডাইনামাইট ফাটানো হাঁচ্চো, হাঁচ্চো।

'এভা আমাকে ধরে নিয়ে আমার মাথা গুঁজে দিল বিছানায়। মাথার উপর চাপালো বালিশ আর সব ক'খানা লেপ-কম্বল। বুঝতে পারলুম কেন; পাশের ঘরে পিসি যদি শুনতে পান তবেই হয়েছে। আমি প্রাণপণ হাঁচি চাপবার চেষ্টা করছি আর লেপ-কম্বলের ভিতর বম্-শেল্ ফাটাচ্ছি।

'কতক্ষণ এ রকম কেটেছিল বলতে পারব না। হাঁচির শব্দ কিছুতেই থামছে না। এভা শুধু কম্বল চাপাচ্ছে, আমার দম বন্ধ হবার উপক্রম কিন্তু নিবিড় পুলকে বার বার আমার সর্বশরীর শিহরিত হচ্ছে—এভার হাতের চাপ পেয়ে।

'এমন সময় দরজায় ধাক্কা আর নারীকণ্ঠের তীব্র চিৎকার, 'দরজা খোল'।

'পিসি!

'আর লুকিয়ে থেকে লাভ নেই। আমি লেপের ভিতর থেকে বেরলুম। এভা ভয়ে ভিরমি গিয়েছে, খাটের উপর নেতিয়ে পড়েছে।

আমি দরজা খুলে দিলুম। সাক্ষাৎ শকুনির মত বীভৎস এক বুড়ী ঘরে ঢুকে আমার দিকে না তাকিয়েই এভাকে বললো, 'কাল সকালেই তুই এ-বাড়ি ছাড়বি'।

'সঙ্গে সঙ্গে আর কি সব বকুনি দিয়েছিল, 'ঘেন্না', 'কেলেঙ্কারি', 'শোবার ঘরে পরপুরুষ', 'রাস্তার মেয়ের ব্যাভার', এই সব, সে আমার আর মনে নেই। বুড়ী

আমার দিকে তাকায় না, গালের উপর গাল চড়ছে যেন ছ'গজী পিয়ানোর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত অবধি কেউ আঙুল চালাচ্ছে।

'আমি আর থাকতে পারলুম না। বুড়ীর দুই বাহু দু' হাত দিয়ে চেপে ধরে বললুম,

'আমার নাম পেটার সেল্‌বাখ্‌। বার্লিনে ডাক্তারি করি। ভদ্রঘরের ছেলে। আপনার ভাইঝিকে বিয়ে করতে চাই'।'

ডাক্তার বললেন, 'মা-মেরি সাক্ষী, আমি এভাবে বিয়ে করার প্রস্তাব এত দিন করিনি পাছে সে 'না' বলে বসে। আমি অপেক্ষা করছিলুম পরিচয়টা ঘনাবার জন্য। বিয়ের প্রস্তাবটা আমার মুখ দিয়ে যে তখন কি করে বেরিয়ে গেল আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

'পিসি আমার দিকে হাবার মত তাকালো—এক বিঘৎ চওড়া হা করে। পাকা দু'মিনিট তার লেগেছিল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপর ফুটে উঠল মুখের উপর খুশীর পয়লা ঝলক। সেটা দেখতে আরো বীভৎস মুখের। কুঁচকানো, এবড়ো-থেবড়ো গাল, ভাঙা-চোরা নাক-মুখ-ঠোঁট যেন আরো বিকৃত হয়ে গেল।

'আমাকে জড়িয়ে ধরে কি যেন বলল ঠিক বুঝতে পারলুম না। তারপর হঠাৎ আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছুটল করিডরের দিকে। চিৎকার করে কাকে যেন ডাকছে।

'এভা তখনো অচৈতন্য।

'বুড়ী ফিরে এল বুড়োকে নিয়ে। বুড়ো ব্যাপারটা বুঝে নিয়েছে চট করে। তার চেহারার খুশীর পিছনে দেখলুম সেই ভীত ভাব—এভার মুখে যেটা অষ্টপ্রহর লেপা থাকে। বুঝলুম, পিসির দাপটে এ বাড়ির সকলেরই কণ্ঠশ্বাস।

'মনে হল বুড়ো খুশী হয়েছে এভা যে এ বাড়ির অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে তার জন্য। হায়, তার তো নিষ্কৃতি নেই।'

ডাক্তার বললেন, 'সেই দুপুর রাতে ওয়াইন এল, শ্যাম্পেন এল। হোটেল থেকে সসেজ্‌ কট্‌লেট্‌ এল। হৈহৈ রৈরৈ। এভা সম্বিতে ফিরেছে। বুড়ো শ্যাম্পেন টানছে জলের মত। বুড়ী এক গেলাসেই টং। আমাকে জড়িয়ে ধরে শুধু কাঁদে আর এভার বাপের কথা স্মরণ করে বলে, ভাই বেঁচে থাকলে আজ সে কী খুশীটাই না হ'ত।

'আর এভা? আমাকে একবার শুধু কানে কানে বলল, 'জীবনে এই প্রথম শ্যাম্পেন খাচ্ছি। তুমি আমার উপর একটু নজর রেখো।'

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় আস্তে আস্তে দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন এক সুন্দরী—হাঁ, সুন্দরী বটে।

এক লহমায় আমি নর্থ সীর ঘন নীল জল, দক্ষিণ ইটালির সোনালি রোদে রূপালি প্রজাপতি, ডানয়ুবের শান্ত-প্রশান্ত ছবি, সেই ডানয়ুবেরই লজ্জাশীল দেহচ্ছন্দ, রাইনল্যাণ্ডের শ্যামালিয়া মোহনীয়া ইন্দ্রজাল সব কিছুই দেখতে পেলুম।

আর সে কী লাজুক হাসি হেসে আমার দিকে তিনি হাত বাড়ালেন।

আমি মাথা নীচু করে ফরাসিস্ কায়দায় তাঁর চম্পক করাঙ্গুলিপ্রান্তে ওষ্ঠ স্পর্শ করে মনে মনে বললুম,

'বেঁচে থাকো সর্দি-কাশি
চিরজীবী হয়ে তুমি।'

পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা

পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাই হবে সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কখনো কোনো সন্দেহ ছিল না এবং এ কথাও নিঃসন্দেহে জানি যে যদিও এখনকার মত বাঙলার দাবী মেনে নেওয়া হয়েছে তবু উর্দুওয়ালারা আবার সুযোগ পেলেই মাথা খাড়া করে উঠতে পারেন। আমরা যে এতদিন এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিনি তার প্রধান কারণ বাঙলা-উর্দু-দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক রং ধরে নিয়ে দলাদলির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল; সে অবস্থায় সুস্থ মনে, শান্ত-চিত্তে বিচার করার প্রবৃত্তি কোনো পক্ষেরই ছিল না। আবহাওয়া এখন ফের অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে; এইবেলা উভয় পক্ষের যুক্তিগুলো ভালো করে তলিয়ে দেখে নিলে ভবিষ্যতের অনেক তিক্ততা এবং অর্থহীন দ্বন্দ্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

উর্দুওলাদের প্রথম ও প্রধান যুক্তি এই: পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান অভিন্ন রাষ্ট্র। সেই রাষ্ট্রের কেন্দ্রে যে-ভাষা প্রচলিত পূর্ব-পাকিস্তানে যদি সে-ভাষা প্রচলিত না থাকে তবে রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

উত্তরে আমরা বলি, পূর্ব-পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণকে বাঙলা ভুলিয়ে উর্দু শিখিয়ে যদি কেন্দ্রের সঙ্গে এক করে দেওয়া সম্ভবপর হত তাহলে যে এ বন্দোবস্ত উত্তম হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন, এ কাজ কি সোজা? উত্তরে আমরা বলি একাজ অসম্ভব।

কেন অসম্ভব এ প্রশ্ন যদি শোধান তবে তার উত্তর দু'রকমের হতে পারে। প্রথম রকমের উত্তর দেওয়া যায় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়ে। আমরা যদি একথা সপ্রমাণ করতে পারি যে পৃথিবীর ইতিহাসে কস্মিনকালেও এহেন কাণ্ড ঘটেনি এবং যতবার চেষ্টা করা হয়েছে ততবারই সে-চেষ্টা নিষ্ফল হয়েছে তবে হয়ত অনেকেই স্বীকার করে নেবেন যে, অসম্ভব কর্ম সমাধান করার চেষ্টা করে মূর্খ, বলদকে দোয়াবার চেষ্টা সেই করে যার বুদ্ধি বলদেরই ন্যায়।

ইয়োরোপ আমেরিকা থেকে উদাহরণ দেব না। উর্দুওলারা এসব জায়গার উদাহরণ মেনে নিতে স্বভাবতই গড়িমসি করবেন। তাই উদাহরণ নেব এমন সব দেশ থেকে যে সব দেশকে সাধারণতঃ 'পাক' অর্থাৎ 'পবিত্র' অর্থাৎ ইসলামী বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়। এসব দেশের ইতিহাস ও বর্তমান পরিস্থিতি উর্দুওলাদের জানার কথা, না জানলে জানা উচিত।

আরব ও ইরানের (পারস্যের) মানচিত্রের দিকে তাকালেই দেখতে পাবেন যে এ দু'দেশের মাঝখানে কোনো তৃতীয় দেশ নেই। অর্থাৎ আরবদেশের পূর্ব সীমান্তে যেখানে আরবী ভাষা এসে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখান থেকেই ফার্সী ভাষা আরম্ভ হয়েছে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ও যেখানে আরবী ভাষা শেষ হয়েছে সেখান থেকেই তুর্কী ভাষা আরম্ভ হয়েছে।

সকলেই জানেন খলিফা আবু বকরের আমলে মুসলিম আরবেরা অমুসলিম ইরান দখল করে। ফলে সমস্ত ইরানের লোক আগুন-পূজা ছেড়ে দিয়ে মুসলিম হয়। মুসলিম শিক্ষাদীক্ষা মুসলিম রাজনৈতিক অনুপ্রেরণার কেন্দ্রভূমি তখন মদীনা। কেন্দ্রের ভাষা আরবী এবং সে ভাষাতে কুরান নাজিল অর্থাৎ অবতীর্ণ হয়েছেন, হজরতের বাণী হদীসরূপে সেই ভাষায়ই পরিস্ফুট হয়েছে। কাজেই আমরা অনায়াসে ধরে নিতে পারি যে কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় করার বাসনায় ইরানে আরবী ভাষা প্রবর্তিত করার ব্যাপক চেষ্টা করা হয়েছিল। আমরা জানি বহু ইরানবাসী ইসলাম গ্রহণ করে, আরবী শিখে, মুসলিম জগতে নাম রেখে গিয়েছেন। আরো জানি পরবর্তী যুগে অর্থাৎ আব্বাসীদের আমলে আরবী রাষ্ট্রকেন্দ্র ইরানের আরো কাছে চলে এসেছিল। ইরাকের বাগদাদ ইরানের অত্যন্ত কাছে ও আব্বাসী যুগে বহু ইরানী বাগদাদে বসবাস করে উচ্চাঙ্গের আরবী শিখতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমস্ত ইরানদেশ তখন আরব গবর্ণর, রাজকর্মচারী, ব্যবসাদার, পাইকবরকন্দাজে ভর্তি হয়ে গিয়েছিল। ইরানের সর্বত্র তখন আরবী মক্তব-মাদ্রাসার ছড়াছড়ি, আরবীশিক্ষিত মৌলবী-মৌলনায় ইরান তখন গমগম করত।

তবে কেন তিনশত বৎসর যেতে না যেতে ফার্সীভাষা মাথা খাড়া করে উঠল ? দশম শতাব্দীর শেষভাগে দেখতে পাই, ফার্সীভাষার নবজাগরণের চাঞ্চল্য সমস্ত ইরানভূমিকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। গল্প শুনি, ফিরদৌসীকে নাকি ফরমাইশ দেওয়া হয়েছিল ইরানের প্রাকমুসলিম সভ্যতার প্রশস্তি গেয়ে যেন কাব্য রচনা করা হয়, এবং ততোধিক গুরুত্বব্যঞ্জক (মুহিম্) ফরমাইশ, সে কাব্য যেন দেশজ ফার্সী কথায় রচিত হয়, তাতে যেন আরবী শব্দ বিলকুল ঢুকতে না পারে। গল্পটি কতদূর সত্য বলা কঠিন। কারণ ফিরদৌসীর মহাকাব্যে অনেক আরবী কথা আছে কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে আরবী ভাষা যে-কোনো কারণেই হোক দেশের আপামর জনসাধারণকে তৃপ্ত করতে পারে নি বলেই ফার্সীর অভ্যুত্থান হল।

তারপর একদিন ফার্সী ইরানের রাষ্ট্রভাষা হয়ে গেল।

উর্দু ওলারা হয়ত উত্তরে বলবেন যে ইরান শীয়া হয়ে গেল বলেই সুন্নী আরবের সঙ্গে কলহ করে ফার্সী চালাল। এ-উত্তরে আছে লোকঠকানোর মতলব। কারণ ঐতিহাসিক মাত্রই জানেন ফিরদৌসীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন গজনীর স্থলতান মাহমুদ এবং তিনি ছিলেন এতই কট্টর স্থন্নী যে তিনি সিন্ধুদেশের হাজার হাজার করামিতাকে (ইসমাইলী শীয়া) কতল-ই-আমে অর্থাৎ পাইকারী হননে—ফীনারিজহান্নম বা পরলোকে পাঠিয়েছিলেন। কাজেই বোঝা গেল যে এই আরবীবিরোধী ফার্সী আন্দোলনের পশ্চাতে শীয়া-স্থন্নী দুই সম্প্রদায়ই ছিলেন।

না হয় ইরান শীয়াই হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তুর্কীর বেলা কি? তুর্কীর আপামর জনসাধারণ স্থন্নী এবং শুধু যে স্থন্নী তাই নয় হানিফী স্থন্নীও বটে। ইরাণেরই মত একদিন তুর্কীতেও আরবী চালাবার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে-চেষ্টা সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত তুর্কী-ভাষাই তুর্কের রাষ্ট্রভাষা হল। উর্দু ওলাদের স্মরণ থাকতে পারে যে কয়েক বৎসর পূর্বে তুর্কী ও ইরান উভয় দেশে জোর জাতীয়তাবাদের ফলে চেষ্টা হয় তুর্কী ও ফার্সী থেকে বেবাক আরবী শব্দ তাড়িয়ে দেওয়ায়। আমরা এ ধরণের উগ্রচণ্ডা জাতীয়তাবাদ ও ভাষা 'বিশুদ্ধিকরণ' বাইয়ের পক্ষপাতী নই; তবুও যে ঘটনাটির কথা উর্দু ওলাদের স্মরণ করিয়ে দিলুম তার একমাত্র কারণ, কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র যতই মূল্যবান হোক না কেন তার জন্য মানুষ সব সময় সব কিছু বিসর্জন দিতে রাজী হয় না। (এস্থলে ঈষৎ অবান্তর হলেও একটি কথা বলে রাখা ভালো,—পাছে উর্দু ওলারা আমাদের নীতি ঠিক বুঝতে না পারেন—আমরা ভাষা 'শুদ্ধিকরণে' বিশ্বাস করি না বলেই বাঙলা থেকে সংস্কৃত শব্দ তাড়াতে চাইনে। তাহলে সেই পাগলামীর পুনরাবৃত্তি করা হবে মাত্র; আজকের দিনে কে না বুঝতে পারে ফোর্ট উইলিয়ামি পণ্ডিতরা বাংলা থেকে আরবী ফার্সী শব্দ বর্জন করে কি আহাম্মুখিই না করেছিলেন।)

উর্দু ওলারা হয়ত প্রশ্ন শুধাবেন, তাহলে মিশরে আরবী চলল কি করে? মুসলমান বিজয়ের পূর্বে মিশরের ভাষা তো আরবী ছিল না। তার উত্তর এই যে মিশর জয়ের পর লক্ষ লক্ষ আরব মিশরে বসবাস আরম্ভ করে ও কালক্রমে দেশের আদিম অধিবাসী ও বিদেশীতে মিলে গিয়ে যে ভাষা গড়ে ওঠে তারি নাম মিশরী আরবী। সংমিশ্রণ একটি কথা দিয়েই সপ্রমাণ করা যায়; যদিও আরবীতে 'জিম' হরফের উচ্চারণ বাঙলার 'জ'-এর মত, তবু মিশরীরা উচ্চারণ করে 'গ'য়ের মত। 'জবল' কে বলে 'গবল', 'নজীব'কে বলে 'নগীব', অল্পশিক্ষিত লোক 'ইজা জা' নসরুউল্লা' না ব'লে বলে 'ইজাগা'—ইত্যাদি। অন্য দিক দিয়ে মিশরী ফল্লাহিন

(চাষা) ও আরবী বেদুইনের মধ্যে দেহের গঠন, চামড়ার রঙ ইত্যাদিতে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

এতগুলো উদাহরণ দেবার পরও যদি কেউ সন্তুষ্ট না হন তবে তার সামনে একটি ঘরোয়া উদাহরণ পেশ করি। পাঠান মোগল (এমন কি ইংরেজ রাজত্বের প্রথম দিকে) যুগে এদেশে শুধু কেন্দ্রে নয়, সুবাগুলোতে পর্যন্ত ফার্সী ছিল রাষ্ট্র ভাষা। তবু কেন সে ভাষা দেশজ হিন্দী বাঙলা প্রভৃতি ভাষাকে মেরে ফেলে নিজে অজরামর হয়ে কায়েমি খুঁটি গাড়তে পারল না? উর্দু ওলারা হয়ত বলবেন, "ইংরেজ ফার্সী উচ্ছেদ করে দিল তাই।'

কিন্তু সে উচ্ছেদের ব্যবস্থা তো পাঠান-মোগলরাই করে গিয়েছিলেন। পাঠান আমলের বিখ্যাত কাবি আমির খুসরৌ ফার্সীতে উচ্চাঙ্গের কাব্য রচনা করে গিয়েছিলেন অথচ দূরদৃষ্টি ছিল বলে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে শেষ পর্যন্ত ফার্সী এদেশে চলবে না, দেশজ ভাষা পুনরায় আপন আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এ তত্ত্বটা ভালো করে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ফার্সী ও তখনকার দেশজ ভাষা হিন্দী মিশিয়ে কবিতা রচনার এক্‌সপেরিমেণ্ট করে গিয়েছিলেন। নিচের উদাহরণটি উর্দু ওয়ালাদের জানবার কথা:

"হিন্দুবাচ্চেরা ব্ নিগর্ আজব্ হুস্ন্ ধরত হৈ।
দর্ ওয়ক্‌তে সুখন গুফ্‌তন্ মুহ ফুল ঝরত হৈ॥
গুফ্‌তম্ বিয়া কে বর্ লবেতো বোসে বাগীরম্
গুফ্‌ৎ আরে রাম ধরম নষ্ট করত হৈ॥"

হিন্দু তরুণ কি অপূর্ব সৌন্দর্য্যই না ধারণ করে। যখন কথা বলে তখন মুখ হতে ফুল ঝরে॥ বললুম, আয় তোর ঠোঁটে একটি চুমো খাব—বললে, আরে রাম! ধর্ম নষ্ট করত হায়॥

এই এক্‌সপেরিমেণ্টের ফলেই দেখতে পাই শাহজহানের আমলে উর্দু ভাষা সৃষ্ট হয়েছে ও অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখতে পাই ফার্সী আস্তে আস্তে হটে গিয়ে উর্দুর জন্য জায়গা করে দিচ্ছেন। আজকের দিনে পরিস্থিতিটা কি? ফার্সীর লীলাভূমি দিল্লী লক্ষ্ণৌয়ে এখন সাহিত্য সৃষ্ট হয় উর্দু ভাষাতে, ফার্সী সেখানে আরবী এবং সংস্কৃতের মত 'মৃত ভাষা' বা 'ডেড ল্যান্‌গুইজ্'।

হয়ত উর্দু ওলারা বলবেন, উর্দুতে প্রচুর আরবী, ফার্সী শব্দ থাকায় তিনি পদে উঠে গেছেন। এর উত্তর বলি, ফার্সী যে রকম বিস্তর আরবী শব্দ গ্রহণ করেও ফার্সীই থেকে গিয়েছে উর্দুও সেই রকম বিস্তর আরবী ফার্সী শব্দ গ্রহণ করা সত্ত্বেও

উর্দুই থেকে গিয়েছে, সে এই দেশের দেশজ ভাষা। বিদেশী শব্দের প্রাধান্য অপ্রাচুর্য নিয়ে ভাষার বর্ণ, গোত্রের বিচার হয় না। পূর্ববঙ্গের আলিম-ফাজিলগণ যখন অকাতরে আরবী ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করে বাংলায় 'ওয়াজ' বা 'পাবলিক-লেকচর' দেন তখন সে ভাষা আরবী, ফার্সী বা উর্দু নামে পরিচিত হয় না, সে ভাষা বাংলাই থেকে যায়।

ঘোড়াটি আমার ভালোবাসিত গো শুনিতে আমার গান
এখন হইতে সে ঘোড়াশালেতে বাঁধা রবে দিনমান।
জিনি তরঙ্গ সুন্দরী মোর তাতার বাসিনী সাকী
লীলাচঞ্চলা রঙ্গ নিপুণা শিবিরে এসেছি রাখি।
ঘোড়ার আমার জুটিবে সোয়ার ইয়ার পাইবে সাকী
শুধু মা আমার এ বুড়া বয়সে কাঁদিয়া মুদিবে আঁখি।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

শব্দের প্রাচুর্য অপ্রাচুর্য ভেদে যদি ভাষার বংশ বিচার করতে হয় তা হলে বলতে হবে এই কবিতার চতুর্থ ছত্র সংস্কৃত, পঞ্চম ছত্র আরবী-ফার্সী ও গোটা কবিতাটা খোদায় মালুম কি। কিন্তু উপস্থিত এ আলোচনা মুলতুবি থাক—উর্দু কি হিসাবে 'পাক' ও বাংলা 'না-পাক' সে আলোচনা পরে হবে।

এ প্রসঙ্গে উর্দুওলাদের কাছে আমাদের শেষ প্রশ্ন; ত্রয়োদশ শতকে মুসলমান কর্তৃক বঙ্গবিজয় থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত ফার্সী উর্দু এদেশে চালু ছিল। শাহজহানের আমল থেকে আজ পর্যন্ত বেশুমার মৌলবী-মৌলনা, আলিম-ফাজিল দেওবন্দ রামপুর থেকে উর্দু শিখে এসে এদেশে উর্দুতে ওয়াজ ঝেড়েছেন, উর্দুতে 'গুফ্‌তগু' করেছেন; মনে পড়েছে ছেলেবেলায় দেখেছি উদ্ধত অর্বাচীন তরুণ যখনই তর্কে মোল্লাদের কাবু করেছে তখনই তাঁরা হঠাৎ উর্দুতে কথা বলতে আরম্ভ করে (আজ জানি সে উর্দু কত ন্যক্কারজনক ভুলে পরিপূর্ণ থাকত) আপন যুক্তির অভাব অথবা দুর্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করেছেন এবং চাষাভূষার কাছে মুখ বাঁচিয়েছেন। সে কথা থাক, কারণ এমন মৌলবী-মৌলানার সংস্পর্শেও এসেছি যাঁদের সঙ্গে তর্কে হেরেও আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু আসল প্রশ্ন এইসব আলিম-ফাজিলগণ বাংলাদেশের শিক্ষা ও কৃষ্টি নির্মাণের সম্পূর্ণ ভার হাতে পেয়েও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও এদেশের আপামর জনসাধারণকে 'নাপাক' বাঙলা ভুলিয়ে ফার্সী বা উর্দু চালাতে সক্ষম হলেন না কেন? ইংরেজী স্কুল তখন ছিল না, সংস্কৃত টোল তখন

অনাদৃত, আরবী-ফার্সী-উর্দু শিখলে তখন উম্‌দা উম্‌দা নোকরি মিলত, বাদশাহ-সুবাদারের মজলিসে শিরোপা মিলত, মনসব মিলত, আর আরবী ফার্সীর জরিয়ায় বেহেস্তের দ্বার তো খুলতই। ইহলোক পরলোক উভয় লোকের প্রলোভন সত্ত্বেও বাঙালী মুসলমান নাপাক বাঙলায় কেন কথাবার্তা বলল, জারীমর্সিয়া রচনা করল, ভাটিয়ালি-পীরমুর্শিদী, আউলবাউল, সাঁইদরবেশী গান গাইল, কেচ্ছা-সাহিত্য তৈরী করল, রাধার চোখের পানি নিয়ে 'বিদাত' কবিতা পর্যন্ত লিখল? এবং একথাও তো জানি যে মৌলবী-মৌলানারা এসব লোক-সাহিত্যের প্রতি উদাসীন ছিলেন না, তাঁরা বার বার ফতোয়া দিয়েছেন যে এসব সাহিত্য 'বিদাত', 'নাজাইজ', 'কুফ্‌র', 'শির্‌ক'। তৎসত্ত্বেও এগুলো এখনো খেয়াঘাটে, বাথানে, চাষার বাড়ীতে পড়া হয়, এসব বই এখনো ছাপা হয়, হাটবারে বটতলায় বিক্রয় হয়।

শুধু তাই? পাঠান বাদশাহরা পয়সা খরচ করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দিয়ে মহাভারত, রামায়ণ বাঙলায় অনুবাদ করালেন। বাদশাহদের দরবারে বিস্তর আলিম-ফাজিল ছিলেন। তাঁরা তখন নিশ্চয়ই এই 'ফুজুল', 'বিদাত', 'ওয়াহিয়াত', 'ইসরাফের' বিরুদ্ধে তারস্বরে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত তো তত্ত্বকথা এই যে আজ পর্যন্ত এদেশে পরাগলখান, ছুটিখানের নাম রয়ে গিয়েছে বাঙলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক হিসাবে।

কিন্তু আমাদের আসল প্রশ্নটা যেন ধামাচাপা পড়ে না যায়। উর্দুওলাদের কাছে আমার সবিনয় প্রশ্ন: বাঙলাদেশের কৃষ্টিজগতে প্রায় ছয়শত বৎসর একাধিপত্য করেও তাঁরা যখন উর্দু চালাতে পারেন নি তখন বর্তমান যুগের নানা কৃষ্টিগত দ্বন্দ্ব, বহু নিদারুণ দারিদ্র্য, ক্রমবর্ধমান বাংলাসাহিত্য ও ভাষার সঙ্গে বিজড়িত মুসলমান-হিন্দুকে তাদের মাতৃভাষা ভুলিয়ে উর্দু চালানো কি সম্ভবপর?

আরব ইরান পাশাপাশি দেশ, এক দেশ থেকে আরেক দেশ গমনাগমনে কোনো অসুবিধা ছিল না, উর্দুর তুলনায় আরবী বহু পূতপবিত্র ভাষা ও সে ভাষা ইসলামের তাবত দৌলত ধারণ করে; তৎসত্ত্বেও যখন ইরানে আরবী চলল না তখন যে পুর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-পাকিস্তান বহু শত ক্রোশ দূরে,—মাঝখানে আবার এমন রাষ্ট্র যার সঙ্গে এখনো পুরা সমঝাওতা হয়নি—যে পশ্চিম-পাকিস্তানেও আবার পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত সেই পুর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তান একজোট হবেই বা কি করে আর একে অন্যকে উর্দু শেখাবেই বা কি

প্রকারে? এ তো দু'পাঁচজন মাস্টারের কথা নয়, আমাদের দরকার হবে হাজার হাজার লোকের। আর হাজার হাজার নবাগতকে পোষবার ক্ষমতা যদি পূর্ব-পাকিস্তানের থাকতই তবে পূর্ব-পাঞ্জাব থেকে বিতাড়িত হতভাগ্য মুসলমানদের কি পূর্ব-পাকিস্তান এতদিনে আমন্ত্রণ করে চোখের জল মুছিয়ে দিত না, মুখে অন্ন তুলে ধরত না?

হয়ত উর্দুওলারা বলবেন যে, সমস্ত দেশকে উর্দু শেখানো তাঁদের মতলব নয়; তাঁদের মতলব প্রাইমারী স্কুলে অর্থাৎ গ্রাম্য পাঠশালায় বাংলা শেখানো এবং হাইস্কুল ও কলেজ য়ুনিভার্সিটিতে উর্দু চালানো।

তাই যদি হয় তবে ফল হবে এই যে হাইস্কুল-কলেজে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত গুণী-জ্ঞানীরা কেতাব লিখবেন উর্দুতে। তাতে ইসলামের প্রাচীন ইতিহাস থাকবে, সে ঐতিহ্যের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে পাকিস্তানের নবীন রাষ্ট্র কি করে গড়ে তুলতে হবে তার কায়দাকানুনের বয়ান থাকবে, আল্লা রসুলের বাণী সেসব কেতাবে নূতন করে প্রচারিত হবে এবং এ-সব তাবত দৌলতের ভোগী হবেন উর্দু জাননেওলারা। অথচ পূর্ব-পাকিস্তানের শতকরা ৮০।৯০ জন চাষা-মজুর; তাদের শিক্ষা সমাপ্তি যে পাঠশালা পাশের সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে যাবে সে কথাও নিশ্চয় জানি এবং তারা এ সব কেতাব পড়তে পারবে না। এই শতকরা আশিজনের উপর যে নবীন রাষ্ট্র নির্মিত হবে তার আদর্শ নূতন, আকাঙ্ক্ষা নূতন এবং সে আদর্শে পৌঁছানোর জন্য যে সব বয়ান উর্দু ভাষাতে লেখা হবে তারা সে-সব পড়তে সক্ষম হবে না। অর্থাৎ শতকরা আশিজন কোনো কিছু না জেনেশুনে আদর্শ রাষ্ট্র গড়াতে উঠে পড়ে লেগে যাবে।

এ বড় মারাত্মক ব্যবস্থা, এ বড় অনৈসলামিক কুব্যবস্থা। প্রাচীন ঐতিহ্যপন্থী মৌলবী-মৌলানাকে যত দোষ দিতে চান দিন, কিন্তু এ-দোষ তাঁদের জানী দুশমনও দিতে পারবেন না যে তাঁরা ধনী এবং গরীবের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা করেছিলেন। ধনীর ছেলেকে তাঁরা যেমন আরবী-ফারসী-উর্দু শিখিয়েছিলেন, গরীবের ছেলেকেও ঠিক সেই কারিকুলামের ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। যদি পাকচক্রে পূর্ব-পাকিস্তানকে কোনো দিন উর্দু গ্রহণ করতেই হয় এবং স্বীকার করে নিতেও হয় যে আমাদের সাহিত্য এবং অন্যান্য সৃষ্টি উর্দুতেই হবে, তবে তাঁরা পাঠশালায়ও উর্দু চালাবেন। দেবভাষা ও গণভাষা বলে পৃথক পৃথক বস্তু স্বীকার করা ইসলাম ঐতিহ্য পরিপন্থী।

পাকিস্তান বড়লোকের জন্য নয়, গরীবের হক পাকিস্তানে বেশী।

ইংরেজও 'ভদ্রলোক' ও 'ছোটলোকে'র ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষাব্যবস্থা করে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। ইংরেজ কৃষি রিপোর্ট বের করত ইংরিজি ভাষায় এবং চাষাভুষাদের শেখাত বাঙলা! বোধ হয় ভাবত বাঙালী 'মাছিমারা' কেরানী যখন ইংরেজি না জেনেও ইংরেজি দলিলপত্র নকল করতে পারে তখন ইংরেজি অনভিজ্ঞ চাষাই বা ইংরেজিতে লেখা কৃষি রিপোর্ট, আবহাওয়ার খবরাখবর পড়তে পারবে না কেন? এই পাগলামি নিয়ে যে আমরা কত ঠাট্টা-মস্করা করেছি সেকথা হয়ত উর্দুওলারা ভুলে গিয়েছেন কিন্তু আমরা ভুলিনি। তাই শুধাই, এবার কি আমাদের পালা? এখন আমরা কৃষি-রিপোর্ট, বাজার দর, আবহাওয়ার খবরাখবর বের করব উর্দুতে আর চাষীদের শেখাব বাঙলা! খবর শুনে ইংরেজ লণ্ডনে বসে যে অট্টহাসি ছাড়বে আমরা সিলেটে বসে তার শব্দ শুনতে পাব।

উর্দুওলারা বলবেন, 'ক্ষেপেছ? আমার উর্দু কৃষি রিপোর্ট বাঙলাতে অনুবাদ করে চাষার বাড়ীতে পাঠাব।'

উত্তরে আমরা শুধাই সে অনুবাদটি করবেন কে? কৃষি রিপোর্টের অনুবাদ করা তো পাঠশালা-পাসের বাঙলা বিদ্যে দিয়ে হয় না। অতএব বাঙলা শেখানোর জন্য হাইস্কুলে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙলা পড়াতে হবে। অর্থাৎ আমাদের সকলকে স্কুল কলেজে বাংলা উর্দু দুই-ই বেশ ভালো করে শিখতে হবে (কৃষি রিপোর্ট ছাড়া উর্দুতে লেখা অন্যান্য সৎসাহিত্যও তো বাঙলাতে তর্জমা করতে হবে); ফলে দুই কুলই যাবে, যেমন ইংরেজ আমলে গিয়েছিল—না শিখেছিলুম বাঙলা লিখতে, না পেরেছিলুম ইংরাজি ঝাড়তে।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানীতে যে উচ্চশিক্ষার এত ছড়াছড়ি, সেখানেও দশ হাজারের মধ্যে একটি ছেলে পাওয়া যায় না যে দুটো ভাষায় সড়গড় লিখতে পারে। আরব, মিশরের আলিম-ফাজিলগণও এক আরবী ছাড়া দ্বিতীয় ভাষা জানেন না।

না হয় সব কিছুই হল কিন্তু তবু মনে হয়, এ বড় অদ্ভুত পরিস্থিতি—যে রিপোর্ট পড়নেওলার শতকরা ৯৯ জন জানে বাঙলা সে রিপোর্টের মূল লেখা হবে উর্দুতে! ব্যবস্থাটা কতদূর বদখত বেতালা তার একটা উপমা দিলে আমার বক্তব্য খোলসা হবে: যেহেতু পূর্ব-পাকিস্তানে উপস্থিত শ'খানেক 'রুটি-খানেওয়ালা পাঞ্জাবী আছেন অতএব তাবৎ দেশে ধানচাষ বন্ধ করে গম ফলাও! তা সে আল-বাঁধা, জলে-টৈ-টম্বুর ধানক্ষেতে গম ফলুক আর নাই ফলুক!

উর্দুওলারা তবু বলবেন, 'সব না হয় মানলুম, কিন্তু একথা তো তোমরা

অস্বীকার করতে পারবে না যে কেন্দ্রের ভাষা যে উর্দু সে সম্বন্ধে পাকাপাকি ফৈসালা হয়ে গিয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তানের লোক যদি উর্দু না শেখে তবে করাচীর কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁরা গাঁক্‌গাঁক্ করে বক্তৃতা ঝাড়বেনই কি বা প্রকারে, এবং আমাদের ছেলেছোকরারা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে ডাঙর ডাঙর নোকরিই বা করবে কি প্রকারে?'

বক্তৃতা দেওয়া সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা যত ছেলেবেলা থেকে যত উত্তম উর্দুই শিখি না কেন, উর্দু যাঁদের মাতৃভাষা তাদের সঙ্গে আমরা কস্মিন্‌কালেও পাল্লা দিয়ে পেরে উঠব না। আমাদের উচ্চারণ নিয়ে উর্দুভাষীগণ হাসিঠাট্টা করবেই এবং সকলেই জানেন উচ্চারণের মস্করা-ভেংচানি করে মানুষকে সভাস্থলে যত ঘায়েল করা যায় অন্য কিছুতেই ততটা সুবিধে হয় না। অবশ্য যাদের গুরদা-কলিজা লোহার তৈরী তাঁরা এ সব নীচ ফন্দি-ফিকিরে ঘায়েল হবেন না কিন্তু বেশীর ভাগ লোকই আপন উচ্চারণের কমজোরী বেশ সচেতন থাকবেন, বিশেষতঃ যখন সকলই জানেন যে প্রথম বহু বৎসর ধরে উত্তম উচ্চারণ শেখবার জন্য ভালো শিক্ষক আমরা যোগাড় করতে পারব না, এবং একথাও বিলক্ষণ জানি যে একবার খারাপ উচ্চারণ দিয়ে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ করলে অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সে সে জখমী উচ্চারণ আর মেরামত করা যায় না। দৃষ্টান্তের জন্য বেশী দূর যেতে হবে না। পূর্ববঙ্গের উর্দু ভাষাভাষী মৌলবী সাহেবদের উচ্চারণের প্রতি একটু মনোযোগ দিলেই তাঁদের উচ্চারণের দৈন্য ধরা পড়ে। সে উচ্চারণ দিয়ে পূর্ব বাঙলায় 'ওয়াজ' দেওয়া চলে কিন্তু যাঁদের মাতৃভাষা উর্দু তাঁদের মজলিসে মুখ খোলা যায় না। এমন কি দেওবন্দ রামপুর ফের্তা কোনো কোনো মৌলবী সাহেবকে উচ্চারণ বাবতে শরমিন্দা হতে দেখেছি, অথচ বহুক্ষেত্রে নিশ্চয় জানি যে এঁদের শাস্ত্রজ্ঞান দেওবন্দ-রামপুরের মৌলানাদের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। কিন্তু এঁরা নিরুপায়, ছেলেবেলা ভুল উচ্চারণ শিখেছিলেন, এখনো তার খেসারতি ঢালছেন।

কিন্তু কি প্রয়োজন জান পানি করে ছেলেবেলা থেকে উর্দু উচ্চারণে পয়লানম্বরী হওয়ার? অন্য পন্থা কি নেই?

আছে। গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূমি সুইজারল্যাণ্ডে চারটি ভাষা প্রচলিত। তাঁদের পার্লামেন্টে সকলেই আপন আপন মাতৃভাষায় বক্তৃতা দেন। সে সব বক্তৃতা অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়। উর্দুওলারা প্রশ্ন শুধাবেন এসব বক্তৃতা অনুবাদ করে কারা?

সেই তত্ত্বটা এইবেলা ভালো করে বুঝে নেওয়া দরকার। এই ধরুন, আপনার মাতৃভাষা বাঙলা, আপনি উর্দুও জানেন। কিন্তু উর্দুতে বক্তৃতা দিতে গেলে আপনি হিমশিম খেয়ে যান। অথচ অল্প উর্দু জানা সত্ত্বেও যদি আপনাকে কোনো উর্দু বক্তৃতা বাংলায় তর্জমা করতে হয় তবে আপনি সেটা অনায়াসে করে দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ যখন ফ্রান্স, জর্মনী, হলাণ্ড প্রভৃতি দেশে সফর করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তখন তিনি দুনিয়ার বাহান্নটা ভাষায় বক্তৃতা দেন নি। বক্তৃতা দিয়েছিলেন হামেশাই ইংরাজিতে। এবং অনুবাদকেরা আপন আপন মাতৃভাষায় সে-সব বক্তৃতা অনুবাদ করেছিলেন।

মার্শাল বুলগানিন, আইসেনহাওয়ার, চার্চিল, মাও-সে-তুঙ, চিয়াং-কাই-শেক যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলাপ আলোচনা করেন—আর চার্চিল তো মামুলি কথা বলতে গেলেও ওজস্বিনী বক্তৃতা ঝাড়েন—তখন সকলেই আপন আপন মাতৃভাষাতেই কথা বলেন। দোভাষী তর্জুমানরা সে সব আলাপ আলোচনার অনুবাদ করেন।

এত বড় যে ইউনাইটেড নেশন্‌স্ অরগেনাইজেশন (উনো), যেখানে দুনিয়ার প্রায় তাবৎ ভাষাই শুনতে পাওয়া যায় ; সেও চলে তর্জুমানদের 'মধ্যস্ততায়'।

পাঠক হয়ত বলবেন অনূদিত হলে মূল বক্তৃতার ভাষার কারচুপি অলঙ্কারের ঝলমলানি, গলা ওঠানো-নাবানোর- লম্পঝম্ফ মাঠে মারা গিয়ে বক্তৃতা রসকষহীন সাদামাঠা হয়ে বেরোয়, ওজস্বিনী বক্তৃতা তখন একঘেয়ে রচনা পাঠের মত শোনায়। সে কথা ঠিক—যদিও প্রোফেশনাল এবং বিচক্ষণ তর্জুমান মূলের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ জৌলুস রাখতে সমর্থ হন—কিন্তু যখন সব বক্তারই বক্তৃতা অনূদিত হয়ে সাদামাঠা হয়ে গেল তখন সকলেই সমান লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন।

গুণীরা বলেন, আলাপ-আলোচনা যেখানে ঝগড়া-কাজিয়ায় পরিবর্তিত হওয়ায় সম্ভাবনাথাকে সেখানে কদাচ বিপক্ষের মাতৃভাষায় কথা বলবে না ; তুমি একখানা কথা বলতে না বলতে সে দশখানা বলে ফেলবে। বিচক্ষণ লোক মাত্রই ষ্টেশনে লক্ষ্য করে থাকবেন যে হুঁশিয়ার-বাঙালী বিহারী মুটের সঙ্গে কদাচ উর্দুতে কথা বলে না। আর মুটে যদি তেমনি ঘুঘু হয় তবে সেও বাংলা জানা থাকলেও, আপন উর্দু চালায়। তবু তো বিহারী মুটেকে কিছুটা ভাল উর্দু জানা থাকলে ঘায়েল করা যায়, কিন্তু করাচীতে যে-সব উর্দুভাষীদের মোকাবেলা করতে হবে তাঁদের উর্দুজ্ঞান পয়লানম্বরী হবে নিশ্চয়ই। প্রেমালাপের কথা স্বতন্ত্র, সেখানে

কোনো ভাষারই প্রয়োজন হয় না, টোটিফুটি উর্দু বললেও আপত্তি নেই। তুলসী দাস কহেন,—

> 'জো বালক কহে তোতরি বাতা
> সুনত মুদিত নেন পিতু আরু মাতা—

'বালক যখন আধা-আধা কথা বলে তখন পিতামাতা মুদ্রিত নয়নে (গদগদ হয়ে) সে কথা শোনেন'। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের সদস্যগণ শুদ্ধমাত্র রসালাপ করার জন্য করাচী যাবেন না। স্বার্থের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলে, দরকার বোধ করলে তাঁদের তো বাকবিতণ্ডাও করতে হবে।

কেন্দ্রের ডাঙর ডাঙর নোকরীর বেলাও এই যুক্তি প্রযোজ্য। আমরা যত উত্তম উর্দুই শিখি না কেন প্রতিযোগিতাত্মক পরীক্ষায় উর্দু-মাতৃভাষীর সঙ্গে কখনোই টক্কর দিতে পারব না। অথচ আমরা যদি আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় পরীক্ষা দিই, এবং উর্দু-মাতৃভাষীরা তাঁদের মাতৃভাষায় পরীক্ষা দেন তবে পরীক্ষায় নিরপেক্ষতা রক্ষা করা হবে। তখন প্রশ্ন উঠবে বাঙালী ছেলেরা উর্দু না জেনে কেন্দ্রে নোকরী করবে কি করে? উত্তরে বলি, সিন্ধি বেলুচি-ছেলে যে প্রকারে কেন্দ্রে কাজ করবে ঠিক সেই প্রকারে—তাদের মাতৃভাষাও তো উর্দু নয়। পাঠানেরা পশতুর জন্য যে রকম নড়াচড়া আরম্ভ করেছেন তাঁদের ঐ একই অবস্থা হবে। অথবা বলব উর্দু মাতৃভাষীরা যে কৌশলে বাঙলা দেশে নোকরী করবেন ঠিক সেই কৌশলে। এ সম্বন্ধে বাকী বক্তব্যটুকু অন্য প্রসঙ্গে বলা হবে।

উর্দুওলারা এর পরও শুধাতে পারেন, "আমরা যদি উর্দু না শিখি তবে কেন্দ্র থেকে যে সব হুকুম, ফরমান, আইন কানুন আসবে সেগুলো পড়ব কি করে?"

উত্তরে বলি, "তার জন্যে ঢাকাতে তর্জুমানদের ব্যবস্থা করতে হবে।"

একথা শুনে উর্দুওলারা আনন্দে লাফ দিয়ে উঠবেন। বলবেন, "তবেই তো হ'ল। তর্জুমানদের যখন উর্দু শেখাতেই হবে তখন তামাম দেশকে উর্দু শেখালেই পারো।"

এ বড় অদ্ভুত যুক্তি। উদাহরণ না দিলে কথাটা খোলসা হবে না বলে নিবেদন করি, "আরব, ফ্রান্স, জর্মনী, স্পেন, রুশিয়া, চীন ইত্যাদি দেশে পাকিস্তানের লোক রাজদূত হয়ে যাবে। তাই বলে কি পাকিস্তানের লোককে আমরা দুনিয়ার তাবৎ ভাষা শেখাই?"

একটা গল্প মনে পড়ল। স্বয়ং কবিগুরু সেটি ছন্দে বেঁধেছেন; তাই যতদূর

সম্ভব তাঁর ভাষাতেই বলি—

কহিলা হবু, "শুনগো গোবু রায়
কালিকে আমি ভেবেছি সারারাত্র
মলিন ধূলা লাগিবে কেন পায়
ধরণী মাঝে চরণ ফেলা মাত্র ?
শীঘ্র এর করিবে প্রতিকার
নহিলে কারো রক্ষা নাহি আর ।"

মন্ত্রী তখন,

অশ্রুজলে ভাষায়ে পাকা দাড়ি
কহিলা গোবু হবুর পাদপদ্মে
যদি না ধূলা লাগিবে তব পায়ে
পায়ের ধূলা পাইব কি উপায়ে ।'

সেয়ানা উত্তর । কিন্তু রাজা মন্ত্রীর চেয়েও ঘড়েল তাই বললেন,—

"—কথাটা বটে সত্য,
কিন্তু আগে বিদায় করো ধূলি
ভাবিয়ো পরে পদধূলির তত্ত্ব !

তখন নানা তরকিব নানা কৌশলে রাজার পা দুখানাকে ধূলা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা হ'ল । সাড়ে সতেরো লক্ষ ঝাঁটা দিয়ে তামাম দুনিয়া সাফ করার প্রথম চেষ্টাতে যখন কোনো ফল হ'ল না তখন 'একুশ লাখ ভিস্তি' দিয়ে জল ঢালার ব্যবস্থা করা হ'ল । তাতেও যখন কিছু হ'ল না তখন ;

কহিল, "মহী মাদুর দিয়া ঢাকো ;
ফরাশ পাতি করিব ধূলা বন্ধ ।"
কহিল কেহ, "রাজারে ঘরে রাখো
কোথাও যেন না থাকে কোনো রন্ধ্র ।"

রাজার কপাল ভালো বলতে হবে, কেউ যে তাঁর পা দুখানা কাটার ব্যবস্থা করলেন না । শেষটায় সমস্বরে,

কহিল সবে, "চামারে তবে ডাকি
চর্ম দিয়া মুড়িয়া দাও পৃথ্বী ।"
তখন ধীরে চামার কুলপতি
কহিল এসে ঈষৎ হেসে বৃদ্ধ,

“বলিতে পারি করিলে অনুমতি
সহজে যাহে মানস হবে সিদ্ধ।
নিজের দুটী চরণ ঢাকো, তবে
ধরণী আর ঢাকিতে নাহি হবে।”

এত সোজা সমাধান ? তাই তো বটে ! এই করেই হ'ল জুতা আবিষ্কার।

তিনকুড়ি কেন্দ্রীয় সদস্য, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে শ'দুই চাকুরে, আরো শ'দুই তর্জুমানের উর্দু জানার প্রয়োজন [হিসেবটা অত্যন্ত দরাজ হাতে করা গেল] ; তার জন্য চারকোটি লোককে উর্দু কপচাতে হবে !

না হয় পাঁচশ' নয়, সাতশ' নয়, পাঁচ হাজার লোকেরই উর্দু বলার প্রয়োজন হবে। তবে তাদের পায়েই উর্দুর জুতা পরিয়ে দিই ; এই ভলভলে কাদার দেশে চারকোটি লোককে জুতো পরাই কোন হস্তী-বুদ্ধির তাড়নায় ?

রবীন্দ্রনাথের গল্পটি এইখানেই শেষ নয়; আমাদের কথাও এখানে ফুরোয় না। আমরা যখন এই জটিল সমস্যার সরল সমাধান বাৎলে দি তখন,

কহিলা রাজা, “এত কি হবে সিধে,
ভাবিয়া ম'ল সকল দেশসুদ্ধ।”

মন্ত্রী কহে,

“বেটারে শূলে বিঁধে
কারার মাঝে করিয়া রাখ রুদ্ধ।”

চামারের মত সরল সমাধান যারা করতে যায় তাদের জন্য শূলের হুকুম জারী হয়। তাদের তখন নামকরণ হয় “এনিমিজ অব্ দি স্টেট্,” “আজাঁ প্রভোকাতর” !!

ইতিহাস দিয়ে যদি বা সপ্রমাণ করা যায় যে পূর্বপাকিস্তানের মত বিশাল দেশের বিপুল সংখ্যক লোককে কখনো তাদের মাতৃভাষা ভুলিয়ে অন্য ভাষা শেখানো সম্ভবপর হয় নি, ইরান তুর্কী প্রভৃতি দেশে এ প্রকারের চেষ্টা সর্বদাই নিষ্ফল হয়েছে, তবু এক রকমের লোক যাঁরা আপন স্বাধিকার প্রমত্ততায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ‘নাথিঙ্ ইজ্ ইমপসিবল্’ বুলি কপচান, এ সম্প্রদায়ের লোক যদি দেশের দণ্ডধর না হতেন তবে আমাদের ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজই আর পাঁচজনকে সত্যনিরূপণ করাতে সমর্থ হত। তাই প্রশ্ন, এসব দণ্ডধরদের সামনে অন্য কোন্ যুক্তি পেশ করা যায়, কি কৌশলে বোঝানো যায় যে পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে উর্দু চালানো সম্পূর্ণ অসম্ভব।

ফার্সীতে বলে 'জান-মাল', বাংলায় বলি 'ধন-প্রাণ' মানুষ এই দুই বস্তু বড় ভালোবাসে; ইতিহাস যা বলে বলুক, এই দুই বস্তু যদি মানুষের হাত এবং দেহ ছাড়ার উপক্রম করে তবে দণ্ডধরেরা পর্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েন; হাতের পাখী এবং প্রাণপক্ষী বাঁচাবার জন্য তখন ঝোপের 'ইমপসিব্‌ল্‌' চিড়িয়ার তালাশী বন্ধ হয়ে যায়।

তাই প্রথম প্রশ্ন, ঝোপের উর্দু চিড়িয়া ধরতে হলে যে ফাঁদ কেনার প্রয়োজন তার খর্চার বহরটা কি?

ধরা যাক্ আমরা পূর্ব-পাকিস্তানের পাঠশালা, স্কুল, কলেজ সর্বত্র উর্দু চালাতে চাই। পূর্ব-পাকিস্তানে ক'হাজার পাঠশালা, ক'জন গুরুমহাশয়, দ্বিতীয় শিক্ষক, স্কুলমাস্টার, কলেজ প্রফেসার আছেন জানি না কিন্তু একথা নিশ্চয় জানি যে কেবলমাত্র পাঠশালাতেই যদি আজ আমরা উর্দু চালাবার চেষ্টা করি তবে আমাদের হাজার হাজার উর্দু শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। সে সব শিক্ষকরা আসবেন বিহার এবং যুক্তপ্রদেশ থেকে। তাঁরা আঠারো কুড়ি টাকার মাইনেতে পূর্ব-বাঙলার গাঁয়ে পরিবার পোষণ করতে পারবেন না। আমাদের পাঠশালার পণ্ডিত মশাইদের কিছু কিছু জমি-জমা আছে, কেউ কেউ হালও ধরে থাকেন, এবং তৎসত্ত্বেও তাঁরা যে কি দারিদ্র্যের ভেতর দিয়ে জীবনযাপন করেন সে নিদারুণ কাহিনী বর্ণনা করার মত শৈলী এবং ভাষা আমার কলমে নেই। লেখাপড়া শিখেছেন বলে গ্রামের আর পাঁচজনের তুলনায় এঁদের সূক্ষ্মানুভূতি, স্পর্শকাতরতা এবং আত্মসম্মান জ্ঞান হয় বেশী। মহাজনের রূঢ়বাক্য, জমিদারের রক্তচক্ষু এঁদের হৃদয়-মনে আঘাত দেয় বেশী এবং উচ্চশিক্ষা কি বস্তু তার সন্ধান তাঁরা কিছুটা রাখেন বলে মেধাবী পুত্রকে অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা না দিতে পারাটা এঁদের জীবনের সব চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি। 'ইত্তিহাদ', 'আজাদ' মাঝে মাঝে এঁদের হস্তগত হয় বলে এঁরা জানেন যে যক্ষ্মারোগী স্বাস্থ্যনিবাসে বহুস্থলে রোগমুক্ত হয়, হয়ত তার সবিস্তর বর্ণনাও কোনো রবিবাসরীয়তে তাঁরা পড়েছেন এবং তারপর যখন পুত্র অথবা কন্যা যক্ষ্মারোগে চোখের সামনে তিলে তিলে মরে তখন তাঁরা কি করেন, কি ভাবেন, আমাদের জানা নেই। বাইবেলি ভাষায় বলতে ইচ্ছে হয়, 'ধন্য যাহারা অজ্ঞ, কারণ তাহাদের দুঃখ কম'। পণ্ডিতের তুলনায় গাঁয়ের আর পাঁচজন যখন জানে না 'স্বাস্থ্যনিবাস' সাপ না ব্যাঙ না কি, তখন তারা যক্ষ্মা-রোগকে কিস্মতের গর্দিশ বলেই নিজকে সান্ত্বনা দিতে পারে।

সুদূর যুক্তপ্রদেশ, বিহার থেকে যাঁরা উর্দু শেখাবার জন্য বাঙলার জলেভেজা,

কাদাভরা, পানাঢাকা, জ্বরেমারা পাড়াগাঁয়ে সপরিবার আসবেন তাঁরা মাইনে চাইবেন কত? আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে ফালতো জমিজমা আর নেই যে চাকরি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের লা-খেরাজ বা ব-খেরাজ ভূসম্পত্তি দিয়ে দেব আর তাঁরা সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে চন্দ্ রোজের মুসাফিরী কোনো সুরতে গুজার করে নেবেন। তাই তাঁদের মাইনে অন্ততঃপক্ষে কত হওয়া উচিত, আপনারা এবং আর পাঁচজন গাঁও-বুড়ারা মাথা মিলিয়ে ধরে দিন। আমরা মেনে নেব।

যত কমই ধরুন না কেন তার দশমাংশ দেবার মত তাগদও পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রীর নেই (শুধু পূর্ব-পাকিস্তান কেন, এরকম পাগলা প্ল্যান চালাতে চাইলে ইংলেণ্ড ফ্রান্সেরও নেই)। জমির সার, হালের বলদ, কলকব্জা কেনা সব কিছুর জন্য পয়সা খরচা বন্ধ করে এই কি এডুকেশনাল এক্সপেরিমেণ্ট করার মোকা!

এতক্ষণ 'ধনের' কথা হচ্ছিল, এখন প্রাণের কথাটা তুলি।

বিহার, যুক্তপ্রদেশ থেকে শিক্ষক আনিয়ে তো আমাদের পাঠশালাগুলো ভর্তি করা হ'ল। আটার অভাবে তাঁরা মাসহারা পেয়েও অর্ধাহারী রইলেন। তা থাকুন, কিন্তু যে সব হাজার হাজার পাঠশালার বাঙলা শিক্ষককে পদচ্যুত করে বিদেশীদের জায়গা করা হ'ল তাঁরা যাবেন কোথায়? কোনো দোষ করেন নি, 'এনিমিজ অব্ দি স্টেট' এঁরা নন, এঁদের বরখাস্ত করা হবে কোন হক্কের জোরে, কোন ইসলামি কায়দায়?

পাকিস্তান সফল করেছেন কারা? গ্রামে গ্রামে পাকিস্তানের প্রোপাগাণ্ডা ছড়াল কে, সিলেটের প্লেবিসিটের সময় কুর্তা বিক্রয় করে নৌকা ভাড়া করল কারা, পোলোয় করে মরণাপন্ন ভোটারকে বয়ে নিয়ে গেল কার বেটা বাচ্চারা?

এরাই লড়েছে পাকিস্তান-বিরোধীদের সঙ্গে। এরা কুর্সীনশীন, মোটর-সওয়ার পলিটিশিয়ান নয়। এরা লড়তে জানে। দরকার হলে এরা দলে দলে ঢাকার দিকে ধাওয়া করবে, সঙ্গে যাবে তাদের বাধ্য চাষা-মজুর। তাদের সংখ্যা কি হবে অনুমান করতে পারছি নে, কিন্তু শুনেছি এক ঢাকা সহরের বাঙলাভাষী মুষ্টিমেয় ছাত্র সম্প্রদায়ের হাতেই বাঙলা-উর্দু বাবদে কোনো কোনো দণ্ডধর কর্তাব্যক্তি লাঞ্ছিত অপমানিত হয়েছেন। ছাত্ররা সহরবাসী কিন্তু এরা 'গ্রাম্য'; এরা প্রাণের ভয় দেখাতে জানে। 'ধন' তো আগেই গিয়েছিল বিদেশ থেকে শিক্ষক আনিয়ে, তখন আরম্ভ হবে 'প্রাণের' উপর হামলা।

খুদা পনাহ্। আমরা এ অবস্থার কল্পনাও করতে পারিনে। আমাদের বিশ্বাস, কর্তাব্যক্তিরা তার বহু পূর্বেই 'কিতাবুম্মুবীন' দেখে 'সিরাতুল মুস্তকীমের' সন্ধান

পাবেন ;—'ওয়া আম্মাস্‌সইলা ফলা তনহর', অর্থাৎ 'সাইল (প্রার্থী) দের প্রত্যাখ্যান কোরো না।'[১] এস্থলে 'সাইল' শব্দ আরবী অর্থে নিতে হবে, উর্দু অর্থে নয়, এবং তাহলে কথাটা আমাদের গরীব গুরুমহাশয়দের বেলাই ঠিক ঠিক খাটে।

হিটলার কুরানের এ আদেশ মানেন নি। যে র়্যোম ও তাঁর সাঙ্গপাঙ্গের কর্মতৎপরতার দরুন তিনি জার্মানীতে তাঁর 'তৃতীয় রাষ্ট্র' গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন, দেড় বৎসর যেতে না খেতে তিনি র়্যোম এবং তাঁর প্রধান সহকর্মীদের গুলি করে মেরেছিলেন। আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের কর্তাব্যক্তি কুতুবমিনাররা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন—এবং ইসলামে গণতন্ত্রের অর্থ 'হক্' ও 'সবর'-এর উপর নির্ভর করা (ওয়া তওাসাও বিল্ হক্কি, ও তওাসাও বিস্-সবর্)।

এতো গেল পাঠশালার কথা। হয় তো উর্দুওলারা বলবেন যে তাঁরা পাঠশালায় বাঙলাই চালবেন কিন্তু স্কুল-কলেজে পড়াবেন উর্দু। দু'রকম শিক্ষা-ব্যবস্থার অধর্ম ও কুফল আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি ; আপাতত শুধু এইটুকু দ্রষ্টব্য যে স্কুল-কলেজে তাবৎ বিষয়বস্তু উর্দুর মাধ্যমিকে পড়াতে হলে উপস্থিত যে সব শিক্ষকরা এসব বিষয় পড়াচ্ছেন তাঁদের সকলকে বরখাস্ত করতে হবে এবং তাঁদের স্থলে যুক্তপ্রদেশ ও বিহার থেকে হাজার হাজার শিক্ষক আনাতে হবে।

কাজেই প্রথম প্রশ্ন, এসব মাস্টাররা কি অন্ন-হারা হওয়ার দুর্দৈবটা চোখ বুজে সয়ে নেবেন? প্রত্যেক অনুন্নত দেশের বেকার সমস্যার প্রধান অংশ সমাধান করে শিক্ষাবিভাগ, কারণ তার হাতে বিস্তর চাকরি। পূর্ব-পাকিস্তান সে সমস্যার সমাধান দূরে থাক, পূর্ব-পাকিস্তানী বাঙালী শিক্ষকদের বরখাস্ত করে এবং বাইরের থেকে লোক ডেকে সৃষ্টি করবেন বৃহৎ বেকার সমস্যা।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক এবং কলেজে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, কৃষি-বিদ্যা, পূর্ত-খনিজ-বৈদ্য-শাস্ত্র পড়াবার জন্য উর্দু-ভাষী শিক্ষক পাওয়া যাবে তো? ভুললে চলবে না যে পূর্ব-পাকিস্তান যদি উর্দু গ্রহণ করে তবে সিন্ধুপ্রদেশ

---

[১] এই পদের উপর মৌলানা ইউসুফ আলীর টীকা : Then there are the people who come with Petitions,—who have to ask for something. They may be genuine beggars asking for financial help, or ignorant people asking for knowledge, or timid people ask ing for some lead or encouragement. The common attitude is to scorn them or repulse them. The scorn may be shown even when alms or assistance is given to them. Such an attitude is wrong……Every petition should be examined and judged on its merits. (সূরা ৯৩ ; ১০)

এবং বেলুচিস্তানেও ঠিক আমাদের কারদারই উর্দু-মাস্টার, প্রফেসরের চাহিদা ভয়ঙ্কর বেড়ে যাবে। ফলে বখন আমরা ঢাকার স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের যে মাইনা দিচ্ছি সে মাইনের চেয়ে দ্বিগুণ অথবা তিনগুন দিতে হবে এই সব বহিরাগতদের। অত টাকা কোথায়? এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস উর্দুর মাধ্যমিকে উপরে লিখিত তাবৎ বিষয় পড়াবার মত শিক্ষক বিহার, যুক্তপ্রদেশে পাঞ্জাবে প্রয়োজনের দশমাংশও নেই।

তৃতীয় প্রশ্ন, তাবৎ পাঠ্যপুস্তক উর্দুতে লেখবার জন্য গ্রন্থকার কোথায়? প্রয়োজনীয় শিক্ষকের দশমাংশ যখন বাজারে নেই তখন লেখকের দশমাংশও যে পাব না সে তথ্যও অবিসংবাদিত সত্য। কিছু বই লাহোর থেকে আসবে সত্য, কিন্তু বাংলার ভূগোল, ইতিহাস, কৃষিবিদ্যা তো লাহোরে লেখা হবে না এবং পূর্ব-পাকিস্তানে এসব বিষয় লেখার লোক নেই। এবং যে ব্যবস্থাই গ্রহণ করি না কেন, আমাদের পাঠ্য-পুস্তক লেখকদের রুটি বহু বৎসরের জন্য নির্ঘাত মারা যাবে।

চতুর্থ প্রশ্ন, উর্দু ছাপাখানা, কম্পজিটর, প্রুফ-রীডার কোথায়? বাংলা প্রেস, প্রুফ-রীডাররা বেকার হয়ে যাবে কোথায়?

এবং সর্বশেষ দ্রষ্টব্য: পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশের স্কুল-কলেজে এখনো উর্দু শিক্ষার মাধ্যমিক হয় নি। বিবেচনা করি, আস্তে আস্তে হবে। কিন্তু পাঞ্জাবীদের পক্ষে এ কর্ম অপেক্ষাকৃত সরল হবে কারণ উর্দু তাঁদের মাতৃভাষা। দরকার হলে কেঁদেককিয়ে তারা উর্দুতে আপন আপন বিষয় পড়াতে পারবেন কিন্তু বাঙালী মাস্টার-প্রফেসারের পক্ষে উর্দু শিখে আপন কর্তব্য সমাধান করতে বহু বহু বৎসর লাগবে। ততদিন আমরা ত্রি-লেগেড্ রেস রাণ করি?—বিশেষ করে যখন কিনা পূর্ব-পাকিস্তানকে শক্তিশালী রাষ্ট্রাংশ করার জন্য আমাদের কর্তব্য (ফর্জ্ বললে ভালো হয়) উর্ধ্বশ্বাসে, তড়িৎগতিতে সম্মুখপানে ধাবমান হওয়া।

উর্দুওলারা যদি বলেন, "না, আমরা ইস্কুল-কলেজে উর্দু দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে শেখাব, আজ যে রকম ফারসী, আরবী, সংস্কৃত অপ্‌শনাল্ সেকেণ্ড্ ল্যানগুইজ হিসেবে শেখাচ্ছি", তাহলে এ প্রস্তাবে যে আমাদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি নেই শুধু তাই নয়, আমরা সর্বান্তঃকরণে সায় দিই। প্রসঙ্গান্তরে সে আলোচনা হবে।

এ বিষয়ে আরেকটি কথা এই বেলা বলে নেওয়া ভাল। সাধারণতঃ ওদিকে কেউ বড় একটা নজর দেন না। আমাদের প্রশ্ন, সব বিষয় পড়াবার জন্য যদি আমরা উর্দু শিক্ষক পেয়েও যাই, উর্দু শিক্ষয়িত্রী পাব কি? না পেলে আমাদের

স্ত্রীলোকদের শিক্ষার কি ব্যবস্থা হবে উর্দুওলারা ভেবে দেখবেন কি? আমাদের কাছে পাকাপাকি খবর নেই, কিন্তু শুনতে পাই বাঙলা শিক্ষয়িত্রীর অভাবেই আমরা যথেষ্ট কাহিল হয়ে পড়েছি। (এস্থানে উল্লেখ করি শ্রীহট্ট সহরের মহিলা মুসলিম লীগ তথা অন্যান্য মহিলারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য গত নভেম্বর মাস থেকে একটানা আন্দোলন করে যাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, 'পাকিস্তান নবজাত শিশুর ন্যায় নবজাত রাষ্ট্র। মাতৃভাষারূপ মাতৃস্তন্য ব্যতীত অন্য যে কোনো খাদ্য তার পক্ষে গুরুপাক হবে'।)

উর্দুওলারা কেউ কেউ বলে থাকেন,—"অতশত বুঝি না, আমরা চাই, বাংলা ভাষার আজ যে পদ পূর্ব-পাকিস্তানে আছে ঠিক সেই রকমই থাক, এবং ইংরিজির আসনটি উর্দু গ্রহণ করুক।" তার অর্থ এই যে উর্দু উচ্চশিক্ষার মাধ্যমিক মিডিয়ম অব্ ইনস্ট্রাক্‌শন্) হোক।

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা শিক্ষার মাধ্যমিক করলে যে কি প্রাণঘাতী বিষময় ফল জন্মায় তার সবিস্তর আলোচনা না করে উপায় নেই।

প্রথমতঃ পৃথিবীর কোন্ শিক্ষিত সভ্য দেশ মাতৃভাষা ছাড়া অন্য মাধ্যমে শিক্ষা দিচ্ছে? ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, ইতালি, চীন, জাপান, রুশ, মিশর, ইরাক, তুর্কী, ইরান এমন কোন্ দেশ আছে যেখানকার লোক আপন মাতৃভাষাকে অবমাননা করে আপন দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে? আরবী পূত পবিত্র, ঐশ্বর্যশালিনী, ওজস্বিনী ভাষা, কিন্তু কই, তুর্কী, ইরান, চীন, জাভার কোটি কোটি লোকে তো আরবীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে না, বিদ্যাভ্যাস শাস্ত্রচর্চা করে না। তবে বাংলার বেলা এ ব্যত্যয় কেন? বাংলা-ভাষাভাষী লোকসংখ্যা তো নগণ্য নয়। সংখ্যা দিয়ে যদি ভাষার গুরুত্ব নির্ণয় করি এবং সে নির্ণয়করণ কিছু অন্যায় নয়—তবে দেখতে পাই চীনা, ইংরিজি, হিন্দী-উর্দু, রুশ, জর্মন ও স্পেনিশের পরেই বাংলার স্থান। পৃথিবীতে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ছয় কোটি (পূর্ব-পাকিস্তানে প্রায় সোয়া চার কোটি) এবং তার তুলনায় ভুবনবিখ্যাত ফরাসী ভাষায় কথা বলে সাড়ে চার কোটি, ইতালিয়ানে চার কোটি, ফার্সীতে এক কোটি, তুর্কিতে সত্তর লক্ষ, এমন কি আরবীতেও মাত্র আড়াই কোটি। যে ভাষায় এত লোক সাহিত্য সৃষ্টি করবার জন্য সুযোগ অনুসন্ধান করছে তাদের এতদিন চেপে রেখেছিল মৌলবী-মৌলানাদের আরবী-ফারসী-উর্দু এবং পরবর্তী যুগে ইংরেজী। বাংলার সময় কি এখনো আসেনি, সুযোগ কি সে কোনো দিনই পাবে না?

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য মাধ্যমিকে শিক্ষাদানের দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে আছে এবং তার ফল কি সেকথাও ঐতিহাসিকদের অবিদিত নয়। ক্যাথলিক জগতে কেন্দ্র অর্থাৎ পোপের সঙ্গে যোগ রাখার প্রলোভনে (আজ পূর্ব-পাকিস্তান করাচীর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য যে রকম প্রলুব্ধ) একদা ইয়ারোপের সর্বত্র লাতিনের মাধ্যমিকে শিক্ষাদান পদ্ধতি জনসাধারণের মাতৃভাষার উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল। এবং সে পাথর সরাবার জন্য লুথারের মত সংস্কারক ও প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মের মত নবীন সংস্কারপদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছিল। পরবর্তী যুগে দেখতে পাই ফরাসী লাতিনের জায়গা দখল করেছে এবং তার চাপে দিশেহারা হয়ে ফ্রেডরিক দি গ্রেটের মত জর্মন সম্রাট মাতৃভাষা জর্মনকে অবহেলা করে ফরাসীতে কবিতা লিখেছেন এবং সে কবিতা মেরামত করবার জন্য ফরাসী গুণী ভলতেয়ারকে পৎসদামে নিমন্ত্রণ করেছেন। ঠিক সেই রকম রাশিয়ারও অনেক বৎসর লেগেছিল ফরাসীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে। আজ উর্দুওলারা বাঙলাকে যে রকম তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন ঠিক সেই রকম জর্মন ও রুশ আপন আপন মাতৃভাষাকে অবহেলা করে বহু বৎসর 'যশের মন্দিরে' প্রবেশ লাভ করতে পারেন নি।

এসব উদাহরণ থেকে এইটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, যতদিন পর্যন্ত মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমিক রূপে গ্রহণ না করা হয় ততদিন শিক্ষা সমাজের উচ্চস্তরের গুটি-কয়েক লোকের সংস্কৃতিবিলাসের উপকরণ হয় মাত্র এবং যেখানে পূর্বে শুধু অর্থের পার্থক্য মানুষে মানুষে বিভেদ আনত সেখানে 'উচ্চশিক্ষা' ও সংস্কৃতির পার্থক্য দুই শ্রেণীর বিরোধ কঠোরতর করে তোলে।

এ দেশে যে ইসলামি শিক্ষা কখনো ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি তার প্রধান কারণ বাঙলার মাধ্যমিকে কখনো শাস্ত্রচর্চা করা হয় নি। যে বস্তু মাতৃ-ভাষায় অতি সহজ, অত্যন্ত সরল, বিদেশী ভাষায় সেই বস্তুই অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন আরম্ভ হয় স্কুল থেকে পালানোর পালা এবং মধ্যবিত্ত ও ধনীর গৃহের চাপের ফলেই এই দুই শ্রেণীর ছেলে তখনো লেখাপড়া শেখে, কিন্তু অনুন্নত গরীব তখন ভাবে যে পরিবারে যখন কেউ কখনো লেখাপড়া শেখে নি তখন এ ছেলেই বা পারবে কেন, বাপ-দাদার মত এরো মাথায় গোবর ঠাসা।

মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য মাধ্যমিকে শিক্ষা দিলে যে দেশের কতদূর ক্ষতি হয় তার সামান্যতম জ্ঞান এখনো আমাদের হয় নি। সে শিক্ষাবিস্তারে যে তখন শুধু অজস্র অর্থব্যয় হয় তা নয়, সে শিক্ষা ছাত্রের বুদ্ধিবৃত্তিকে অবশ করে তোলে,

কল্পনাশক্তিকে পঙ্গু করে দেয় এবং সর্বপ্রকার সৃজনী-শক্তিকে কণ্ঠরোধ করে শিক্ষার আঁতুড় ঘরেই গোরস্তান বানিয়ে দেয়।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি—আমার অভিজ্ঞতা কলেজের অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকরূপে অর্জিত—যে পশ্চিমভারতের কার্ভে স্ত্রী-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা যদিও দু'এক দিক দিয়ে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে পশ্চাৎপদ তবু স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা যেমন তাদের বেশী তেমনি প্রকাশ ক্ষমতা, আত্মপরিচয় দানের নৈপুণ্য তাদের অনেক বেশী। তার একমাত্র কারণ কার্ভে স্ত্রী-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীরা আপন আপন মাতৃভাষার মাধ্যমিকে লেখা-পড়া করে আর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা লেখাপড়া শেখে ইংরেজির মাধ্যমিকে। কার্ভের মেয়েরা সেই কারণে আপন মাতৃভাষায় নিঃসঙ্কোচে অবাধ-গতিতে আপন বক্তব্য বলতে পারে, বোম্বাই, কলিকাতা, ঢাকার ছেলেরা না পারে বাঙলা লিখতে, না জানে ইংরেজি পড়তে।

এ-কাহিনীর শেষ নেই কিন্তু আমাকে প্রবন্ধ শেষ করতে হবে। তাই পাঠককে সবিনয় অনুরোধ করি তিনি যেন শিক্ষাবিভাগের কোনো পদস্থ ব্যক্তিকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। শ্রীহট্টের খ্যাতনামা আলিম মৌলানা সখাওতুল আম্বিয়া প্রমুখ গুণীগণ আমার সম্মুখে বহুবার স্বীকার করেছেন যে মাদ্রাসাতে যদি বাঙলাভাষা সর্বপ্রকার বিষয় শিক্ষার মাধ্যমিক হত তবে আমাদের আরবী-ফার্সীর চর্চা এতদূর পশ্চাৎপদ হত না। এবং কৌতুকের বিষয় এই যে, যে-উর্দুওলারা বাংলাকে এত ইনকার-নফরৎ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন তাঁদেরও অনেকেই কঠিন বিষয়বস্তু যখন উর্দুতে বোঝাতে গিয়ে হিমসিম্ খেয়ে যান তখন নোয়াখালি, সিলেটের গ্রাম্য উপভাষারই শরণাপন্ন হন।

এত সরল জিনিস উর্দুওলাদের কি করে বোঝাই? কি করে বোঝাই যে পারস্যের লোক যখন ফার্সীর মাধ্যমিকে আরবী (এবং অন্যান্য তাবৎ বিষয়) শেখে, তুর্কীর লোক যখন তুর্কী ভাষার মাধ্যমিকে আরবী শেখে তখন বাঙলার লোক আরবী (এবং অন্যান্য তাবৎ বিষয়) শিখবে উর্দুর মাধ্যমিকে কোন আজগুবী কাণ্ডজ্ঞানহীনতার তাড়নায়?

এ প্রসঙ্গের উপসংহারে শেষ কথা নিবেদন করি, মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমিক না করলে সে ভাষা কখনো সমৃদ্ধিশালী হবার সুযোগ পায় না।

স্বরাজ এলো পাকিস্তান হ'ল কিন্তু হায়, গোস্বামী খাসলৎ (মনোবৃত্তি ও আচার-ব্যবহার) যাবার কোনো লক্ষণ তো দেখতে পাচ্ছিনে। এতদিন কল্পপুষ্প

ইংরেজীর গোলামী, এখন স্বেচ্ছায় বরণ করে নিচ্ছি উর্দুর গোলামী। খতম আল্লাহু অলা কুলুবিহিম ইত্যাদি। খুদাতালা তাদের বুকের উপর সীল এঁটে দিয়েছেন। (কুরান থেকে এ অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করার কোনো প্রয়োজন হ'ত না, যদি কোনো কোনো 'মৌলানা' বাঙলা ভাষার সমর্থকদের 'কাফির' হয়ে যাওয়ার ফতোয়া না দিতেন)।

এইবার দেখা যাক্, বাঙলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, সরকারী ও সাংস্কৃতিক ভাষারূপে গ্রহণ করতে উর্দুওলাদের আপত্তিটা কি ?

তাঁদের প্রধান আপত্তি, বাঙলা 'হেঁদুয়ানি' ভাষা। বাঙলা ভাষায় আছে হিন্দু ঐতিহ্য, হিন্দু কৃষ্টির রূপ। পূর্ব-পাকিস্তানী যদি সে ভাষা তার রাষ্ট্র ও কৃষ্টির জন্য গ্রহণ করে তবে সে হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে যাবে।

উত্তরে নিবেদন, বাঙলা ভাষা হিন্দু ঐতিহ্য ধারণ করে সত্য, কিন্তু এইটেই শেষ কথা নয়। বাঙলা ভাষার জন্ম হয়েছে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে।

বুদ্ধদেব যে রকম একদিন বৈদিক ধর্ম ও তার বাহন সংস্কৃতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তৎকালীন দেশজ ভাষায় (পরে পালি নামে পরিচিত) আপন ধর্মপ্রচার করেন, ঠিক সেই রকম বাঙলা ভাষার লিখিত রূপ আরম্ভ হয় বৌদ্ধ চর্যাপদ দিয়ে। পরবর্তী যুগে বাঙলা সাহিত্য রূপ নেয় বৈষ্ণব পদাবলীর ভেতর দিয়ে। আজ পদাবলী সাহিত্যকে হিন্দু ধর্মের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয় কিন্তু যে যুগে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারিত সে যুগে তাকে বিদ্রোহের অস্ত্রধারণ করেই বেরুতে হয়েছিল। তাই শ্রীচৈতন্য প্রচলিত ধর্ম সংস্কৃতে লেখা হয় নি, লেখা হয়েছিল বাংলায়। সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণমহাভারতের যে অনুবাদ বাংলায় প্রকাশিত হয় তার পেছনে ছিলেন মুসলমান নবাবগোষ্ঠী। কেচ্ছা-সাহিত্যের সম্মান আমরা দি—হিন্দুরা দেন না—এবং সে সাহিত্য হিন্দু ঐতিহ্যে গড়া নয়। এর পর ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে বাংলা গদ্যের পত্তন হয় তার অনুপ্রেরণা খৃষ্টান সভ্যতা থেকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ নিজকে হিন্দু বলে স্বীকার করেন কি না, সে কথা অবান্তর—তাঁর অবদান যে উপনিষদ-সংস্কৃতি ও ইয়োরোপীয় প্রভাবের ফলে গঠিত সে কথা অনস্বীকার্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রচলিত নূতন ধারাকে বৈদিক কিম্বা সনাতন বলা ভুল, সে ধারা গণ উপাসনার উৎস থেকে প্রবাহিত হয়েছে এবং সে উৎসকে গোঁড়া হিন্দুরা কখনো শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নি। স্বামী বিবেকানন্দের 'জাতীয়তাবাদের' মূল বেদ উপনিষদ নয়।

উর্দুওলারা বলবেন, 'এসব খাঁটি হিন্দু না হতে পারে, কিন্তু আর যাই হোক না কেন, ইসলামি নয়।'

আমরা বলি, 'ইসলামি নয় সত্য, কিন্তু এর ভেতরে যে ইন্‌কিলাব্‌ মনোবৃত্তি আছে সেটি যেন চোখের আড়ালে না যায়। এই বিদ্রোহ ভাব বাংলায় ছিল বলে কাজী নজ্‌রুল ইস্‌লাম একদিন আপন 'বিদ্রোহী' দিয়ে রবীন্দ্রনাথের তথাকথিত 'মরমিয়াপনার' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পেরেছিলেন। পূর্ব-পাকিস্তানে যে নবীন কৃষ্টি গঠিত হবে সেটা এই বিদ্রোহ দিয়েই আপন বিজয়-অভিযান আরম্ভ করবে।

এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর নয় বলে আরেকটি কথা বলি : উত্তর ভারতের তাবৎ সংস্কৃত ভাবাপন্ন ভাষার মধ্যে (হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী ইত্যাদি) বাংলাই সবচেয়ে অসংস্কৃত। হিন্দী, মারাঠী পড়বার বা বলবার সময় সংস্কৃত শব্দ খাঁটি সংস্কৃত উচ্চারণে পড়া এবং বলা হয়—'পরীক্ষা' পড়া হয় 'পরীক্‌ষা', 'আত্মা' পড়া হয় 'আৎমা'—কিন্তু বাংলায় সংস্কৃত শব্দ, এমন কি সংস্কৃত ভাষা উচ্চারণ করার সময়ও, উচ্চারণ করা হয় বাঙলা পদ্ধতিতে। এ বিষয়ে বাঙালী হিন্দু পর্যন্ত উর্দুভাষী মুসলমানের চেয়ে এককাঠি বাড়া। উর্দুভাষী মুসলমান তার ভাষার সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ করে খাঁটি সংস্কৃত কায়দায়, বাঙালী হিন্দু উচ্চারণ করে 'অনার্য' কায়দায়।

না হয় স্বীকার করেই নিলুম, বাঙলা 'হেঁদুয়ানী' ভাষা কিন্তু প্রশ্ন, এই ভাষা এতদিন ধরে ব্যবহার করে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলমান কি 'না-পাক', 'হিঁদু' হয়ে গিয়েছে? পাকিস্তান-স্বপ্ন সফল করাতে কি পূর্ব পাকিস্তানের 'না-পাক' মুসলমানদের কোনো কৃতিত্ব নেই? পাকিস্তান-স্বপ্ন কি সফল হল লাহোর, লক্ষ্ণৌর কৃপায়? পূর্ব-পাকিস্তানে যারা লড়ল তারা কি সবাই উর্দুর পাবন্দ আলিম-ফাজিল, মৌলানা-মৌলবীর দল? না তো। লড়ল তো তারাই যারা উর্দু জানে না, এবং বাঙলার জন্য আজ যারা পুনরায় লড়তে তৈরী আছে। এই সব লড়নেওলারা এত দিনকার ইংরেজ আধিপত্য এবং হিন্দু প্রভাবের ফলেও যখন হিন্দুভাবাপন্ন হয়ে যায়নি, তখন পাকিস্তান হওয়ার পর বাঙলাকে রাষ্ট্রভাষা করলেই তারা রাতারাতি ইসলামি জোশ হারিয়ে পাকিস্তানের শত্রু বনে যাবে? এ তো বড় তাজ্জব কথা! বাঙলা ভাষার এত তাগদ?

দ্বিতীয় বক্তব্য আমরা ইতিহাস নিয়ে আরম্ভ করি। পূর্বেই বলেছি, ফিরদৌসীর আমলে ইরানের সর্বত্র আরবী প্রচলিত ছিল—ইরানের রাষ্ট্রভাষা ছিল আরবী। তখনকার দিনে যেটুকু ফরাসী প্রচলিত ছিল সে ছিল 'কাফির', অগ্নি-উপাসক, জরথুস্ত্রীদের ভাষা। সে ভাষায় একেশ্বরবাদের নামগন্ধ তো ছিলই না,

তাতে ছিল দ্বৈতবাদের প্রচার, এক কথায় সে ভাষা ছিল ন'সিকে ইসলাম-বিরোধী, 'কাফিরী'। তবু কেন সে ভাষা চর্চা করা হল, এবং সে চর্চা করলেন কারা ? কাফিরী জরথুস্ত্রীরা করেনি, করেছিলেন আরবীজাননেওলা মুসলমানেরাই। কেন ?

তুর্কীতেও তাই। কেন ?

এ দুটো খাঁটি ইসলামি দেশের উদাহরণ ; এবার স্বদেশে সেই দৃষ্টান্তই খোঁজা যাক্। পাঠান-মোগল যুগে এ দেশে ফার্সী ব-হাল তবিয়তে রাষ্ট্র-ভাষার রাজসিংহাসনে বসে দিশী ভাষাগুলোর উপর রাজত্ব করত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সেই ফার্সীর সঙ্গে দেশজ হিন্দী মিলিয়ে উর্দু ভাষা কেন নির্মাণ করা হল ? কিন্তু সেটা আসল প্রশ্ন নয়, আসল প্রশ্ন যে-হিন্দীকে নিয়ে উর্দু বানানো হল সে ভাষা কি 'পাক' ছিল ?

আমরা জানি সে ভাষায় তখন তুলসীদাসের রামায়ণ সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—এখনো তাই। সেই পুস্তকের আওতায় সমস্ত হিন্দী সাহিত্য গড়ে উঠেছে এবং তাতে আছে ইসলামদ্রোহী কট্টর মতবাদ। বাল্মীকির রামায়ণে যে ব্যক্তি মানুষ, রাজা এবং বীর, তিনি তুলসীর রামায়ণে খুদ ভগবানের আসন তসরূপ করে বসে আছেন। ইসলামে মানুষকে আল্লার আসনে তোলা সবচেয়ে মারাত্মক কুফ্র্।

আজকের বাংলা ভাষা সেদিনকার হিন্দীর তুলনায় বহুগুণে পাক। আজ বাঙলা সাহিত্যে যে ঈশ্বর গানে কবিতায় নন্দিত হচ্ছেন তিনি সুফীর মরমের আল্লা, হক্। তাঁর সন্ধান 'গীতাঞ্জলিতে'—সে পুস্তক তামাম পৃথিবীতে সম্মান লাভ করেছে।

এবার যে দৃষ্টান্ত পেশ করব সেটি সভয়ে এবং ঈষৎ অনিচ্ছায়। দৃষ্টান্তটি কুরাণের ভাষা নিয়ে এবং এ জিনিস নিয়ে নাড়াচাড়া করার হক্ আলিম ফাজিলদের। কিন্তু শ্রদ্ধেয় গোলাম মোস্তফা সায়েব যখন রসুলুল্লার জীবনী থেকে নজির তুলে পূর্ব-বঙ্গবাসী মুসলমানকে 'পাঞ্জাবী প্রভুত্ব' বরদাস্ত করতে উপদেশ দিয়েছিলেন, ('মক্কা হইতে মোহাজেরগণ যখন দলে দলে মদিনায় পৌছিতে লাগিলেন, তখন মদিনার আনসারগণ মক্কাবাসীদিগকে সাদরে গ্রহণ করিতেন) আজ তাহারা—পাঞ্জাবীরা—আমাদের দুয়ারে অতিথি। আমাদের কি উচিত নয় তাহাদের প্রতি একটু (!) সহানুভূতি দেখানো ?'—(বিস্ময়বোধক চিহ্ন আমার) তখন আমিই বা এমন কি দোষ করলুম ?

আরবী ভাষায় কুরান শরীফ যখন অবতীর্ণ হলেন তখন সে ভাষার কি রূপ ছিল ? সে-ভাষা কি 'পাক' পবিত্র ছিল, না পৌত্তলিকতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত

ছিল ? আমরা জানি লাত, উজ্জা, মনাত প্রভৃতি দেব-দেবীর প্রশস্তিতে সে ভাষা পরিপূর্ণ ছিল এবং একেশ্বরবাদ বা অন্য কোনো সত্যধর্মের (খ্রীষ্ট অথবা ইহুদি) কণা মাত্র ঐতিহ্য সে ভাষায় ছিল না।

পক্ষান্তরে আরব দেশে বিস্তর ইহুদি ও খৃষ্টান ছিলেন। (হজরতের বহুপূর্বেই হিব্রুভাষা তওরিত 'তোরা' এবং 'ওল্ড টেস্টামেণ্ট') বুকে ধরে পবিত্র ভাষারূপে গণ্য হয়েছিল, এবং হিব্রুর উপভাষা আরামেইকের মাধ্যমে মহাপুরুষ ইসা ইঞ্জিল ('এভানজেলিয়াম' অথবা বাইবেলের 'নিউ টেস্টামেণ্ট') প্রচার করেছিলেন। কুরাণ অবতীর্ণ হবার প্রাক্কালে হিব্রুভাষা একেশ্বরবাদের চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছে, এবং বাইবেল ভক্ত মাত্রই জানেন সেই একেশ্বরবাদ, মৃত্যুর পরের বিচার, এর ফলস্বরূপ স্বর্গ অথবা নরক ইত্যাদি ইসলামের মূল বিশ্বাস (নবুওত ব্যতীত) প্রচারের ফলে হিব্রুভাষা সেমিতি ধর্মজগতে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল।

তবু কেন সে ভাষায় অবতীর্ণ না হয়ে কুরাণ শরীফ পৌত্তলিকের ভাষায় নাজিল হলেন।

এ পরম বিস্ময়ের বস্তু এবং শুধু আমরাই যে আজ বিস্মিত হচ্ছি তা নয়, স্বয়ং মহাপুরুষের আমলেও এ বিস্ময় বহুমুখে সপ্রকাশ হয়েছিল।

কিন্তু সে বিস্ময়ের সমাধান স্বয়ং আল্লাতাল্লা কুরাণ শরীফে করে দিয়েছেন। পাছে বাঙলা অনুবাদে কোনো ভুল হয়ে যায় তাই মৌলানা আব্দুল্লা য়ুসুফ আলীর কুরাণ-অনুবাদ থেকে শব্দে শব্দে তুলে দিচ্ছি। আল্লা বলেন,

"Had We sent this as
A Quran (in a language)
Other than Arabic, they would
Have said : 'Why are not
It's verses explained in detail ?
What ! (a Book) not in Arabic
And (a Messenger) an Arab ?"

অর্থাৎ "আমরা যদি আরবী ভিন্ন অন্য কোনো ভাষায় কুরাণ পাঠাতুম তাহলে তারা বলত 'এর বাক্যগুলো ভালো করে বুঝিয়ে বলা হল না কেন ? সে কি ! (বই) আরবীতে নয় অথচ (পয়গম্বর) আরব !"

খুদাতালা স্পষ্ট ভাষায় বলছেন, আরব পয়গম্বর যে আরবী ভাষায় কুরাণ অবতরণের আধার হবেন সেই তো স্বাভাবিক, এবং অন্য যে-কোনো ভাষায় সে

কুরাণ পাঠানো হলে মক্কার লোক নিশ্চয়ই বলত, 'আমরা তো এর অর্থ বুঝতে পারছি নে।'

কুরাণের এই অঙ্গুলীনির্দেশ মত চললেই বুঝতে পারব ভাষার কৌলীন্য অকৌলীন্য অত্যন্ত অবান্তর প্রশ্ন, আসল উদ্দেশ্য ধর্মপুস্তক যেন আপামর জনসাধারণ বুঝতে পারে। বার বার কতবার কুরাণে বলা হয়েছে, 'এ-বই খোলা বই', 'এ-বই আরবীতে অবতীর্ণ হল' যাতে করে সর্বসাধারণের জন্য এ-বই সরল দিগ্‌দর্শক হতে পারে।

'সর্বসাধারণ সনাতন ধর্মের বাণী মাতৃভাষায় বুঝুক' এই মাহাত্ম্য যে কত গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং গুরুত্বব্যঞ্জক সে কথা আমরা এখনো সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করতে পারি নি।

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস পূর্বাচার্যগণ এ বাণী হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং সক্ষম হয়েছিলেন বলেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ধর্মজ্ঞান যদি মুষ্টিমেয় পণ্ডিতের বিদ্যাচর্চার বিলাসবস্তু না হয়ে আপামর জনসাধারণের নিত্য অবলম্বনীয় সখারূপে সপ্রকাশ হ'তে চায় তবে সে ধর্মশিক্ষা মাতৃভাষাতেই দিতে হবে। কোনো বিদেশী ভাষা দ্বারা জনসাধারণকে ব্যাপকভাবে ধর্ম শিক্ষা দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, মাতৃভাষার সাহায্যে নিতেই হবে, তা সে-মাতৃভাষা পূতপবিত্রই হোক্ আর ওছা নাপাকই হোক। এ তত্ত্বটা ইরানের মনীষীরা অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই একদা ইরানে আরবীয় বহুল প্রচার থাকা সত্ত্বেও 'নাপাক' ফার্সী ভাষাকে ধর্মশিক্ষার বাহনরূপে ব্যবহার করেছিলেন। ভারতীয় মনীষীরা ঠিক সেই কারণেই এদেশে বিদেশী ফার্সী প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও 'না-পাক' হিন্দীর সঙ্গে আরবী ফার্সী মিলিয়ে উর্দু নির্মাণ করেছিলেন।

বাঙলা দেশের মৌলবী-মওলানারা সস্তায় কিস্তিমাত করতে চেয়েছিলেন বলেই দেশজ বাঙলাকে ধর্মশিক্ষার বাহন রূপে স্বীকার করেন নি—উর্দু দিয়ে ফাঁকতালে কাজ সারিয়ে নেবার চেষ্টাতেই ছিলেন। তাই পূর্ব-পাকিস্তানকে আজ এই খেসারত দিতে হচ্ছে যে, 'নিজ বাসভূমে, পরবাসী হওয়ার' মত নিজ মাতৃভাষায় যে কোনো কিছুরই চর্চা করতে পারে নি। যুক্তপ্রদেশ তথা পাঞ্জাবের মৌলবী-মওলানাগণ যে রকম মাতৃভাষা উর্দুর সাহায্যে শাস্ত্রচর্চা করেছিলেন, বাঙালী আলিমগণও যদি বাঙলায় সে-রকম শাস্ত্রচর্চা করে রাখতেন তাহলে সেই সূত্রপাতের খেই ধরে আজ বাঙালী মুসলমান নানা সাহিত্য নির্মাণ করে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারত। এবং যখন দেখি, যে-বাঙালী আলিমগণ বাঙলায় শাস্ত্রচর্চা না করে

বাঙলাদেশের আপামর জনসাধারণকে অজ্ঞ রাখলেন তাঁরাই বাঙালী তরুণকে তার ধর্মশাস্ত্রের অজ্ঞতা নিয়ে তাচ্ছিল্য অবহেলা করেন তখন বিস্ময়ে বাক্যস্ফূরণ হয় না। আপন কর্তব্যচ্যুতি ঢাকবার এই কি সরলতম পন্থা? এবং, তাঁরা এ-কথাটাও বুঝলেন না যে, বাঙালী হিন্দু যে রকম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙলাতে অনুবাদ ও প্রচার করার জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি দেয়, তাঁরাও বাঙলায় ইসলামি শাস্ত্রের চর্চা করলে বাঙালী মুসলমানের কাছ থেকে সে রকম শ্রদ্ধাঞ্জলি পেতেন।

আবার বলি, এখনো সময় আছে। উর্দু বাঙলার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তাঁরা সরল বাঙলা (লিসানু-মুবীন) গ্রহণ করবেন, না আবার উর্দু দিয়ে ফোকটে কাজ সারবার তালে থাকবেন?

ধর্মজগতে পোপকে একদা এই দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর খাস-পেয়ারা লাতিন সর্বদেশের সর্বমাতৃভাষাকে পদদলিত করে—

> পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি,—
> ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ী

—করবে, না তিনি লুথারের প্রস্তাবমত মাতৃভাষায় শাস্ত্রচর্চা করতে দেবেন? পোপ সত্যপথ দেখতে পান নি, তিনি ভুল করেছিলেন। ফলে খ্রীষ্টজগত দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল।

আজ যদি জোর করে পোপের ভ্রান্তাদর্শ অনুসরণ করে উর্দুওলারা পূর্ব-পাকিস্তানের স্কন্ধে উর্দু চাপান তবে লুথারের মত লোক পূর্ব-পাকিস্তানে খাড়া হতে পারে। যাঁরা অখণ্ড পাকিস্তান চান তাঁরা এই কথাটি ভেবে দেখবেন।

ভাষার 'পাকী' 'না-পাকী' সম্বন্ধে আমার শেষ দ্বিধাটি এইবার নিবেদন করি আমরা যে এত তর্কাতর্কি করছি, কিন্তু নিজের মনকে কি একবারও জিজ্ঞেস করেছি 'পাকিস্তান' শব্দটির জন্ম কোথায়, সে জাতে 'পাক', না 'নাপাক'? 'পাক' কথাটা তো আরবী নয়, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি 'প' (অথবা 'পে') অক্ষরটি আরবী নয়, 'প' অক্ষরটি ফার্সী অর্থাৎ প্রাচীন ইরানি, অর্থাৎ অগ্নি-উপাসক কাফিরদের শব্দ, এবং এই জেন্দা-আবেস্তার শব্দটির সঙ্গে যুক্ত আছে সংস্কৃত 'পক্ক' শব্দ ('পাক্' শব্দটি সংস্কৃত নয়, কিন্তু আবেস্তা ও সংস্কৃত যমজ-ভাষা) এবং 'স্তান' কথাটি যে সংস্কৃত 'স্থানের সঙ্গ সংশ্লিষ্ট সে কথাও সকলেই জানেন। দুটি শব্দই আরবী নয়, প্রাচীন ইরানি, এবং প্রাচীন ইরানি বাঙলা অপেক্ষা কোনো দিক দিয়ে 'পাক' নয়। ভাষার দিক দিয়ে যদি সত্যই সম্পূর্ণ "পাক্" নাম দিতে হয় তবে তো পাকিস্তানকে 'বয়তুল মুকদ্দসের' ওজনে 'মুমলকতুল মুকদ্দস' জাতীয় কোনো নাম দিতে হয়।

তাই বলি 'পাক' 'না-পাকের' প্রশ্ন শুধানো ইসলাম-ঐতিহ্য পরিপন্থী। কোনো মানুষকে না-পাক বলে যেমন তাকে কলমা থেকে বঞ্চিত করা যায় না, কোনো ভাষাকে ঠিক তেমনি 'না-পাক' নাম দিয়ে ইসলামি শিক্ষা-ঐতিহ্যের বাহক হওয়া থেকে বঞ্চিত করা যায় না। 'ছুৎ বাই' ইসলামি মার্গ নয়।

কেন্দ্রের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন, কেন্দ্রের চাকরি, কেন্দ্রীয় পরিষদে বক্তৃতাদান ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা কতদূর প্রতিবন্ধক হবে-না-হবে সে বিষয়ে আলোচনা অন্য প্রসঙ্গে প্রবন্ধের গোড়ার দিকে করা হয়ে গিয়েছে। বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা সম্বন্ধে আর যে সব ছোটখাটো আপত্তি আছে তার অন্যতম ব্যবসাবাণিজ্য।

উর্দু ওলারা বলেন, "ইংরিজি তাড়িয়ে দিলুম, উর্দু শিখলুম না, তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা করব কি করে?"

এর উত্তর এতই সরল যে দেওয়াটা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন। ইংলণ্ডের শতকরা ৯৯ জন ফরাসী জানে না, ফ্রান্সের ৯৯.৯ ইংরিজি জানে না, তৎসত্ত্বেও ব্যবসা চলে। তার চেয়েও সরল উদাহরণ আছে। মারোয়াড়ীরা প্রায় একশ' বৎসর ধরে বাঙলাদেশ শুষে খাচ্ছে, আমাদের কফনের কাপড় বিক্রি করে তারা মারোয়াড়ে তিনতলা বাড়ী বানায় কিন্তু সমস্ত মারোয়াড় দেশ বাঙলা পড়াবার জন্য একটা স্কুল নেই, কোনোকালে ছিলও না। এসব তো হল খুচরা ব্যবসায়ের কথা। প্রদেশে প্রদেশে, দেশে দেশে ব্যবসায়ের যোগাযোগ হয় বড় বড় কারবারী-দের মধ্যস্থতায়। দমস্কসে যে জর্মন ভদ্রলোক সীমেন শুকার্টের কলকব্জা বিক্রয় করতেন তিনি তড়তড় করে আরবী বলতে পারতেন—তাই বলে গোটা জার্মানির পাঠশালা স্কুলে তো আরবী পড়ানো হয় না।

পূর্ব-পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম-পাকিস্তানের যে বড় বড় ব্যবসা হবে, সে হবে করাচীর সঙ্গে। করাচীর ভাষা সিন্ধী—কারবারী মহলে চলে ইংরেজি, সিন্ধী এবং কিঞ্চিৎ গুজরাতী। ব্যবসায়ের জন্য ভাষা শিখতে হলে তো আমাদের সিন্ধী শিখতে হয়।

ব্যবসা যে করে ভাষার মাথা-ব্যথা তার। শিক্ষা বিভাগ এবং দেশের দায়িত্ব এইটুকু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্স বিভাগে তার জন্য সামান্যতম বন্দোবস্ত করে দেওয়া। সেটুকু কেন, তার চেয়ে ঢের বেশী উর্দু আমরা পূর্ব-পাকিস্তানে শেখাব। সে কথা পরে হবে।

এ জাতীয় খুঁটিনাটি আরো অনেক সমস্যা আছে কিন্তু তা হলে মূল বক্তব্যে

কখনই পৌঁছানো যাবে না।

উর্দু-বাঙলা দ্বন্দ্বের শেষ সমাধান করতে হলে বিচার-বিবেচনা আবশ্যক যে পূর্ব-পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ কি ?—আশা করি একথা কেউ বলবেন না যে একমাত্র উর্দুর সেবা করার জন্যই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পাকিস্তান তথা পূর্ব-পাকিস্তানের আদর্শ কি সে সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মত দেবার কোন অর্থ হয় না। নানা গুণী যে নানা মত দিতেছেন তার মাঝখানে একটি সত্য কথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছেন··· সে হচ্ছে এই যে, পাকিস্তানকে সর্বপ্রথম সমৃদ্ধবান রাষ্ট্র করতে হবে।

তাহলেই প্রশ্ন উঠবে সমৃদ্ধশালী হতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি সুপ্তাবস্থায় আছে কোনখানে ?

পাকিস্তান তথা ভারত ইউনিয়নের স্বাধীনতা যে সফল হল তার প্রধান কারণ গণ-আন্দোলন। যত দিন কংগ্রেস বলতে 'স্টেটসমেনের' ভাষায় 'ভদ্রলোগ ক্লাস', যত দিন লীগ বলতে রামপুর ভূপাল খানবাহাদুর, খানসায়েবেদের বোঝাত ততদিন ইংরেজ 'স্বরাজ' এবং পাকিস্তানের' থোড়াই পরোয়া করেছে। কিন্তু যেদিন দেখা গেল যে লীগের পশ্চাতে জনসাধারণ এসে দাঁড়িয়েছে, অর্থাৎ লীগ আন্দোলন গণ-আন্দোলনের রূপ ধারণ করেছে সেদিন আর পাকিস্তানের দাবী কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারল না। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জনসাধারণের শক্তি প্রয়োগে।

জনসাধারণের সেই শক্তি সেদিন বিদ্রোহের রূপ ধারণ করেছিল। আজ সে শক্তি সুষুপ্ত, এবং সেই শক্তি যদি পাকিস্তান গঠনে নিয়োজিত না হয় তবে পাকিস্তান কখনই পূর্ণাবয়ব, প্রাণবন্ত রাষ্ট্ররূপে দুনিয়ার মজলিসে আসন নিতে পারবে না। মার্কস্‌বাদের মূল সিদ্ধান্ত ঠিক কিনা সে আলোচনা এস্থলে সম্পূর্ণ অবান্তর, ইসলামের সঙ্গে যাঁদের সামান্যতম পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন, ইসলাম কোনো বিশেষ বর্ণ, জাতি বা শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠত্বের আশীর্বাদ দিয়ে অজরামর করে তুলতে সম্পূর্ণ নারাজ।

যাঁরা ধর্মকে—তা সে ইসলামই হোক্ আর হিন্দু ধর্মই হোক্—রাজনীতি থেকে বাদ দিয়ে রাষ্ট্র চালাতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে আমার এস্থানে দু'একটি বক্তব্য আছে। ধর্মে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, ধর্ম যে এ দুনিয়ায় এখনো প্রচণ্ড শক্তির আধার সেকথা অস্বীকার করলে আমরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতি পদে অপ্রত্যাশিত সঙ্কটের সম্মুখে উপস্থিত হব। এই যে আমরা বার বার শুনতে পাই ইয়োরোপ নাস্তিক, ইয়োরোপীয় রাজনীতি ধর্মকে উপেক্ষা করে চলে সে-কথাটা

কতদূর সত্য ? ফ্রান্স-জর্মনিতে এখনো ক্রীশ্চান পার্টিগুলো কতটা শক্তি ধারণ করে সে কথা সব চেয়ে বেশী জানেন কম্যুনিস্টরা। ক্রীশ্চান ডেমোক্রেট, ক্যাথলিক সেণ্টার এদের অবহেলা করে কোনো ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন চালানো এখনো ফ্রান্স, জর্মনি, ইতালিতে অসম্ভব। এই তো সেদিন রাজনীতিক্ষেত্রে এখনো পোপের কত ক্ষমতা সেটা ধরা পড়ল ইতালির গণভোটে। পোপ এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ যেদিন সশরীরে কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে আসরে নামলেন সেদিন কম্রেড তল্লাত্তি প্রমাদ গুণলেন। শেষরক্ষার জন্য ধর্মহীন তল্লাত্তিকে পর্যন্ত বলতে হল, ভবিষ্যৎ ইতালিয় কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে ধর্মপ্রতিষ্ঠানরের সম্পত্তি, বিষয়আশয়ে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করা হবে না, এযাবৎ তাঁরা যে সব সুখ-সুবিধা উপভোগ করে আসছেন তার সব কটাই তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে উপভোগ করতে পারেন। কিন্তু এ শ্মশান-চিকিৎসায়ও ফল হল না, তল্লাত্তির নির্মম পরাজয়ের কথা সকলেই জানেন। পোপ এই ভোট-মারে নেবে ভালো করেছিলেন কি মন্দ করেছিলেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর, আমাদের শুধু এইটুকুই দেখানো উদ্দেশ্য যে ধর্ম এখনো বহু শক্তি ধারণ করে।

মৃত্যুর পর বেহেশৎ বা মোক্ষ দান করাই ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। বিশেষতঃ ইসলাম সংসারের সর্বস্ব ত্যাগ করে গুহা-গহ্বরে বসে নাসিকাগ্রে মনোনিবেশ করার ঘোরতর বিরুদ্ধ মতবাদ প্রচার করে। আল্লাতা'লা কুরান-শরীফে বারম্বার বলেছেন যে এই সংসারে তিনি নানারকম জিনিস মানুষকে দিয়েছেন তার আনন্দ বর্ধনের জন্য। তাই মুসলিম মাত্রই প্রার্থনা করে, 'হে আমাদের প্রভু, ইহলোকে আমাদের শুভ হোক, পরলোকে আমাদের শুভ হোক।' এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ইহলোকের মঙ্গল অতীব কাম্য, তাই প্রশ্ন ওঠে পার্থিব বস্তু কোন্ পদ্ধতিতে উপভোগ করব যাতে করে অমঙ্গল না হয় ?

তাই বিশেষ করে ইসলামই পার্থিব বস্তুর ভাগবাঁটোয়ারা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। কুরান শরীফ বারম্বার ধনবণ্টন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন, এবং সে-বিষয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেন।

মহাপুরুষ মুহম্মদের (দঃ) সঙ্গে মক্কাবাসীদের দ্বন্দ্ব হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ পার্থিব বস্তুর নবীন বণ্টনপদ্ধতি নিয়ে। 'সাইল' অর্থ ভিখারী নয়, 'সাইল' বলতে আজকাল আমরা ইংরিজিতে 'হ্যাভ্ নট্' বাক্যে যা বুঝি তাই। 'সাইলকে বিমুখ করো না' এই আদেশ মক্কার ধনপতিগণ গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত হয় নি, অথচ এই নবীন পদ্ধতি দুঃস্থ নিপীড়িত বিত্তহীনদের প্রাণে নতুন আশার বাণী এনে

দিয়েছিল। ফলে দেখতে পাই মহাপুরুষের প্রথম শিষ্যদের ভেতর বিত্তহীন ও দাসের সংখ্যা বেশী।

ইহকাল পরকালের মঙ্গল আদর্শ নিয়ে এই যে আন্দোলন সৃষ্ট হল তার বিজয় অভিযান পৃথিবীর ইতিহাসে আপন স্থান করে নিয়েছে—কিন্তু সে ইতিহাস আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু এইটুকু দেখতে চাই, মহাপুরুষের চতুর্দিকে যে বিরাট আন্দোলন ক্রমে ক্রমে জাগ্রত হল সে আন্দোলন গণ-আন্দোলন। মহাপুরুষ যে নবীন আন্দোলন সফল করে তুললেন সে এই জনগণের সাহায্যে।

আজ পাকিস্তান যে বিরাট আন্দোলনের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে আন্দোলন জনগণ দিয়েই গঠিত হবে। এ আন্দোলনে থাকবে নূতন ধনবণ্টন পদ্ধতি, নূতন ধনার্জন পন্থা, শিক্ষার প্রসার, গণতান্ত্রিক নির্বাচনপন্থা, স্বাস্থ্যের উন্নতি, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্য নির্মানপ্রচেষ্টা,—এক কথায় প্রাচীন শোষণনীতি সমূলে উৎপাটন করে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীণ সম্পূর্ণ বিকাশ।

কিন্তু যদি জনগণ এ আন্দোলনে অংশীদার না হয় তবে সমস্ত আন্দোলন ব্যর্থ হবে। জনসাধারণ যদি আন্দোলনের উদ্দেশ্য না বুঝতে পারে, এবং না বুঝতে পেরে আপন প্রচেষ্টা নিয়োগ করতে কুন্ঠিত হয়, অথবা প্রয়োজনমত স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত না হয় কিংবা ধনপতিদের উৎকোচে বশীভূত হয়, অথবা দু'চার আনা মজুরী বৃদ্ধিতেই যদি বৃহত্তর স্বার্থকে ত্যাগ করে তবে সম্পূর্ণ আন্দোলন নিষ্ফল হবে।

এবং এস্থলে আমার কণ্ঠে যত শক্তি আছে তাই দিয়ে আমি চিৎকার করে বলতে চাই, মাতৃভাষা বাঙলার সাহায্য বিনা জনসাধারণকে এই বিরাট আন্দোলনের বিস্তৃত শাখাপ্রশাখা সম্বন্ধে সচেতন এবং ওয়াকিব-হাল করা যাবে না, যাবে না, যাবে না।

উর্দুওলারা বলবেন,—উচ্চশিক্ষা উর্দুর মাধ্যমিকে দেব বটে কিন্তু শিক্ষিতেরা কেতাব লিখবেন বাঙলায়।

আমার বক্তব্য,—ঠিক ঐ জিনিসটেই হয় না, কখনো হয় নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখাই, ইংরেজ আমাদিগকে কখনো ইংরিজি বই লিখতে বাধ্য করে নি, তবুও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গত একশত বৎসর ধরে যত উত্তম উত্তম ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতন্ত্র, দর্শন সম্বন্ধে বই বেরিয়েছে তার শতকরা ৯৫খানা ইংরিজিতে কেন? জ্ঞানচর্চা করব এক ভাষায় আর তার ফল প্রকাশ করব অন্য ভাষায়,

এই বন্ধ্যা-প্রসব কখনো কস্মিন্‌কালেও হয় না। মানুষ যখন আপন মাতৃভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিষয় চিন্তা করতে শেখে তখনই সে মাতৃভাষায় লিখতে শেখে।

অর্থাৎ ইংরিজি আমলে যা হয়েছিল তারি পুনরাবৃত্তি হবে। একদল উর্দু শিক্ষিত লোক উর্দুতে লেখাপড়া শিখবেন, বড় বড় নোকরি করবেন, বহিরাগত উর্দুভাষীদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে এক নূতন অভিজাত সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, আর বাদবাকি আমরা চাষাভূষো পাঁচজন যে তিমিরে ছিলুম সেই তিমিরেই থাকব।

তাই পুনরায় স্মরণ করিয়ে দি, হজরতের চতুর্দিকে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল, এবং পরে যে রাষ্ট্র-সংগঠন অভিযান আরম্ভ হয়েছিল তার মাধ্যমিক ছিল আপামর জনসাধারণের ভাষা,—আরবী। বিদগ্ধ হিব্রুকে তখন সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল।

উর্দুওলারা বলবেন—বাঙলা জানলেই কি সব বাঙলা বই পড়া যায়? বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি বাঙলা চালাই, এবং ফলে যদি সকল রকমের বই-ই বাঙলাতে লেখা হয় তা হলেই কি আপামর জনসাধারণ সে সব বই পড়তে পারবে?

উত্তরে বলি, সকলে পারবে না, কিন্তু অসংখ্য লোক পারবে।

আমি যে শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বপ্ন দেখছি তাতে দেশের শতকরা নব্বুই জন মাইনর, ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়বে। এবং সে মাইনর, ম্যাট্রিকের শিক্ষাদান অনেক বেশী উন্নত পর্যায়ের হবে। ইংরিজি বা উর্দুর জন্য জান পানি করবে না বলে তারা অতি উত্তম বাঙলা শিখবে এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, মিশর, ইরানে যে রকম সাধারণ শিক্ষিত লোক মাতৃভাষায় লেখা দেশের শ্রেষ্ঠ পুস্তক পড়তে পারে এরাও ঠিক তেমনি দেশের উন্নততম জ্ঞানচর্চার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। দেশের তাবৎ লোকই যে উত্তম উত্তম পুস্তক পড়বে সেকথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়—কারণ সকলেই জানেন জ্ঞানতৃষ্ণা কোনো বিশেষ শ্রেণী বা সমাজের মধ্যে নিবদ্ধ নয়, এমন কি উচ্চশিক্ষা পাওয়া না-পাওয়ার উপরও সে জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, কত বি-এ, এম-এ, পরীক্ষা পাশের পর চেক্ বই ছাড়া অন্য কোনো বইয়ের সন্ধানে "সময় নষ্ট" করেন না, আর কত মাইনরের ছেলে গোগ্রাসে যা পায় তাই গেলে—কিন্তু মাতৃভাষা দেশের শিক্ষা-দীক্ষার বাহন হলে কোনো তত্ত্বানুসন্ধিৎসু অল্প চেষ্টাতেই দেশের সর্বোত্তম প্রচেষ্টার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারে। এর সত্যতা সপ্রমাণ হয় আরেকটি তথ্য থেকে—ইয়োরোপের বহু সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক-আবিষ্কর্তা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়ন না করেও যশস্বী সৃষ্টিকার হতে সমর্থ হয়েছেন।

তাই দেখতে হবে, মাতৃভাষার যে নির্ঝরিণী দিয়ে বিদ্যাভ্যাস আরম্ভ, সেই

নির্ঝরিণীই যেন বিশাল এবং বিশালতর হয়ে বিশ্ববিদ্যার অগাধ সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছয়। মাঝখানে ইংরিজি বা উর্দুর দশ হাত শুকনো জমি থাকলে চলবে না।

বিশেষ করে উর্দুওলা মৌলবী-মৌলানাদের এ কথাটি বোঝা উচিত। বাঙলাতে ধর্ম-চর্চা না করার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মুসলিম ধর্মের কুসংস্কারে নিমজ্জিত। ডান দিক থেকে বাঁ দিকে ছাপা বই দেখলেই সে ভয়ে ভক্তিতে বিমূঢ় হয়ে যায়—তা সে গুল-ই-বাকাওলির কেচ্ছাই হোক আর দেওয়ান-ই চিরকীন্‌ই হোক্। রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করবার জন্য তাকে শেখাতে হবে :

১। ইসলামের ইতিহাস*, এবং বিশেষ করে শেখাতে হবে এই তথ্যটা যে সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করা অসম্ভব। আব্বাসী ওম্মাই যুগের ভেতর দিয়ে মুসলিম সংস্কৃতি যে-রূপ নিয়েছে সে-রূপ পূর্ব-পাকিস্তানে আবার নেবে না। অথচ ইসলামের গণতন্ত্রের খুঁটি এবং ধনবণ্টনে সমতার নোঙ্গর জোর পাকড়ে ধরে থাকতে হবে।

২। শত শত বৎসরের জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা করে ইয়োরোপ যে শক্তি সঞ্চয় করেছে, মিশর দমস্ক আজ তাই শিখতে ব্যস্ত। প্রাচীন ঐতিহ্য যেরকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করে গ্রহণ করা যায় না, ইয়োরোপীয় কর্ম এবং চিন্তাপদ্ধতি ঠিক সেই রকম বিনা বিচারে গ্রহণ করা চলবে না।

৩। ইসলাম আরবের বাইরে যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তথাকার দেশজ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলাকে গ্রহণ করে নূতন সভ্যতা-সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে। ইরানের সুফীতত্ত্বের যশ কোন্ দেশে পৌঁছয়নি? তাজমহল এই করেই নির্মিত হয়েছে, উর্দুভাষা এই পদ্ধতিতেই গড়ে উঠল, খেয়াল গান এই করেই গাওয়া হল, মোগল ছবি এই করেই পৃথিবীকে মুগ্ধ করেছে। পূর্ব-পাকিস্তানের ভারতীয় ঐতিহ্য নগণ্য নয়, অবহেলনীয় নয়। পূর্ব-বঙ্গের বহু হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বনামধন্য হয়েছেন, তাঁদের বংশধরগণ যেদিন নবীন রাষ্ট্রে আসন গ্রহণ করে সভ্যতা-কৃষ্টি আন্দোলনে যোগ দেবেন সেদিনই উভয় সম্প্রদায়ের অর্থহীন তিক্ততার অবসান হবে। (এস্থলে অবান্তর হলেও বলি ঠিক, তেমনি ভারতীয় ইউনিয়নের

---

* পাকিস্তানকে theocratic রাষ্ট্র করার কথা উঠছে না। আমার ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস, ধর্মের নামে যে রাজনৈতিক ধাপ্পা, অর্থনৈতিক শোষণ চলে তার শেষ কোনোদিনই হবে না, যতদিন না দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ধর্মালোচনায় প্রবৃত্ত হন। ভারতীয় ইউনিয়ন সম্বন্ধেও এই নীতি প্রযোজ্য।

মুসলমানদের অবহেলা করেও সে রাষ্ট্র পরিপূর্ণতায় পৌছতে পারবে না।) এ কথা কিছুতেই ভুললে চলবে না যে মামুন, হারুনের সময় যখন আরবেরা জ্ঞান-গরিমায় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান ঠিক তখনই তারা প্রচুর অর্থব্যয় করে ‘চরক’ ‘সুশ্রুত’ ‘পঞ্চতন্ত্র’ আরবীতে অনুবাদ করেছিল, গজনীর মাহমুদের আমলে ঐতিহাসিক অল-বীরূনী কী বিপুল পরিশ্রম করে সংস্কৃত শিখে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ লিখেছিলেন।

আরবেরা সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়ে ভারতীয় সভ্যতার অনুসন্ধানে এদেশে এল, আর আজ পূর্ব-পাকিস্তানের লোক বাঙলা ভাষার গায়ে বৈষ্ণব নামাবলী দেখে ভড়কে যাচ্ছে! কিমাশ্চর্যমতঃপরম্?

কত গবেষণা, কত সৃজনীশক্তি, কত শাস্ত্রাশাস্ত্র বর্জন গ্রহণ, কত গ্রন্থ নির্মাণ, কত পুস্তিকা প্রচার, কত বড় বিরাট, সর্বব্যাপী, আপামর জনসাধারণ সংযুক্ত বিরাট অভিযানের সামনে দাঁড়িয়ে পূর্ব পাকিস্তান!

এর উৎসাহ অনুপ্রেরণা যোগাবে কে?

প্রধানতঃ সাহিত্যিকগণ। এবং আমি বিশেষ জোর দিয়ে জানাতে চাই, সে সাহিত্য-সৃষ্টি মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাতে হতে পারে না।

আবার ইতিহাস থেকে নজীর সংগ্রহ করি।

ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে আঠারো মাইলের ব্যবধান। প্রতি বৎসর হাজার হাজার ইংরেজ প্যারিসে বেড়াতে আসে। বায়রন শেলি উত্তম ফরাসী জানতেন কিন্তু কই, আজ পর্যন্ত তো একজন ইংরেজ ফরাসী সাহিত্যে নাম অর্জন করতে পারেন নি, আজ পর্যন্ত একজন ফরাসী ইংরিজি লিখে পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি। অথচ বাঙলা উর্দুতে যে পার্থক্য ফরাসী ইংরিজিতে পার্থক্য তার চেয়ে ঢের কম। ফ্রেডরিক দি গ্রেটের যুগে বার্লিন এবং ভিয়েনার শিক্ষিত লোক মাত্রই ফরাসী চর্চা করত (আমরা যতটা ইংরিজি করি তার চেয়ে ঢের বেশী), কিন্তু তবুও তো একজন জর্মন ভাষাভাষী ফরাসী লিখে নাম করতে পারেন নি, তুর্গেনিয়েফ, তলস্তয়ের আমলে রুশ অভিজাত মাত্রই ফরাসী গভর্ণেসের হাতে বড় হতেন, বাল্যকাল হতে ফরাসী লিখতেন (তলস্তয়ের রুশ পুস্তকে যে পরিমাণ পাতার পর পাতা সির্ফ ফরাসী লেখা আছে সে রকম ইংরিজি-ভর্তি বাঙলা বই আমাদের দেশে এখনো বেরোয় নি) কিন্তু তৎসত্ত্বেও একজন রুশ ফরাসীতে সার্থক সৃষ্টি কার্য করতে পারেন নি।

অত দূরে যাই কেন? সাত শত বৎসর ফার্সীর সাধনা করে ভারতবর্ষের

সাহিত্যিকেরা এমন একখানা বই লিখতে পারেন নি যে বই ইরানে সম্মান লাভ করেছে। যে গালিব আপন ফার্সীর দম্ভ করতেন তাঁর ফার্সী কবিতা ইরানে অনাদৃত, অপাংক্তেয়, অথচ মাতৃভাষায় লেখা তাঁর উর্দু কবিতা অজর অমর হয়ে থাকবে।

আরো কাছে আসি। মাইকেলের মত বহু ভাষায় সুপণ্ডিত দ্বিতীয় বাঙালী এ দেশে জন্মান নি। তাঁর পূর্বে বা পরে কোনো বাঙালী তাঁর মত ইংরিজি লিখতে পারেন নি, তবু দেখি আপ্রাণ চেষ্টা করে তিনিও ইংরিজি সাহিত্যের ইতিহাসে এতটুকু আঁচড় কেটে যেতে পারেন নি। অথচ অল্পায়াসে লেখা তাঁর 'মেঘনাদ' বাঙলা সাহিত্য থেকে কখনও বিলুপ্ত হবে না।

আরো কাছে, একদম ঘরের ভেতর চলে আসি। লালন ফকীরও বলেছেন, 'ঘরের কাছে পাইনে খবর, খুঁজতে গেলেম দিল্লী শহর।' পূর্ব-পাকিস্তানের আপন ঘরের মৌলবী-মৌলানারা যে শত শত বৎসর ধরে আরবী, ফারসী এবং উর্দুর চর্চা করলেন, এ সব সাহিত্যে তাঁদের অবদান কি? গালিব, হালী, ইকবালের কথা বাদ দিন, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে একজন দুসরা দরজার উর্দু কবি দেখাতে পারলেই আমরা সন্তুষ্ট হয়ে যাব।

মৌলবী-মৌলানাদের যে কাঠগড়ায় দাঁড় করালুম তাঁর জন্য তাঁরা যেন আমার উপর অসন্তুষ্ট না হন। নও-জোয়ানরা তাঁদের শ্রদ্ধা করুক আর নাই করুক, আমি তাঁদের অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি। উত্তর এবং পশ্চিম ভারতের ('হিন্দুস্তানের') বহু মৌলবী-মৌলানার সংস্রবে এসে আমার এ বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হয়েছে যে, পূর্ববঙ্গের আলিম সম্প্রদায় শাস্ত্রচর্চায় তাঁদের চেয়ে কোনো অংশে কম নন। যেখানে সম্পূর্ণ বিদেশী ভাষা নিয়ে কারবার—যেমন মনে করুন আরবী—সেখানে পূর্ববঙ্গের আলিম অনেক স্থলেই 'হিন্দুস্তানের' আলিমকে হার মানিয়েছেন কিন্তু উর্দুতে সাহিত্য সৃষ্টি তো সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। যে স্পর্শকাতরতা, সূক্ষ্মানুভূতি, হৃদয়াবেগ মাতৃভাষার ভেতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করে সে সব তাঁদের আছে কিন্তু উর্দু তাঁদের মাতৃভাষা নয় বলে তাঁদের সর্বপ্রচেষ্টা পঙ্গু, আড়ষ্ট ও রসবর্জিত হয়ে যে রূপ ধারণ করে তাকে সাহিত্য বলা চলে না। বিয়ের 'প্রীতি-উপহারেই' তার শেষ হদ্।

অথচ দেখি, অতি যৎসামান্য আরবী-ফার্সীর কল্যাণে কাজী নজ্রুল বাঙলা সাহিত্যে কী অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করলেন। মুসলমানও যে বাঙলাতে সফল সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে সে তথ্য একা কাজী সাহেবই সপ্রমাণ করে দিয়েছেন।

তাই পুনরায় বলি, মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতিরেকে কেউ কখনো, কোনো দেশে সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। আজ যদি আমাদের সাহিত্য প্রচেষ্টা উর্দু স্বর্ণমৃগের পশ্চাতে ধাবমান হয় তবে তার চরম অবসান হবে অনুর্বর মরুভূমিতে। সমস্ত উনবিংশ ও এ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য উর্ধ্বশ্বাসে প্রগতির দিকে ছুটে চলল; অর্থাভাবে, শিক্ষার অভাবে, দুঃখের তাড়নায় বাঙালী মুসলমান সে কাফেলাকে এগিয়ে যেতে দেখল কিন্তু সঙ্গী হতে পারল না। এখনো কি সময় হয় নি যে সে তার সৃজনশক্তির সদ্ব্যবহার করার সুযোগ পায়?

অথচ দেখি, অশিক্ষিত চাষা এবং অর্ধশিক্ষিত মুন্সীমোল্লা আপন সাহিত্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। পূর্ব-বঙ্গের লোকসাহিত্য যখন বিশ্বজনের সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করল তখন দেশেবিদেশে বহু রসিকজন তার যে প্রশংসা করলেন সে প্রশংসা অন্য কোনো দেশের লোকসাহিত্যের প্রতি উচ্ছ্বসিত হয় নি। ভাষার বাজারে বহু বৎসর ধরে এ অধম বড় বড় মহাজনদের তামাক সেজে ফাই-ফর্মাস খেটে দিয়ে তাঁদের আড়তের সন্ধান নিয়েছে, এবং সে হলপ খেয়ে বলতে প্রস্তুত, লোকসাহিত্যের ফরাসী, জর্মন, ইতালি, ইংরিজি আড়তের কোনোটিতেই পূর্ববঙ্গ লোকসাহিত্যের মত সরেস মাল নেই।

আমাদের ভাটিয়ালি মধু'র কাছে ভল্‌গার গান চিটেগুড়—হাসন রাজা, লালন ফকীর, সৈয়দ শাহনূরের মজলিসে এসে দাঁড়াতে পারেন এমন একজন গুণীও ইয়োরোপীয় লোক-সাহিত্য দেখাতে পারবে না।

অথচ কী আশ্চর্য, কি তিলিস্মাৎ, পূর্ব-বঙ্গের মুসলিম শিক্ষিত সম্প্রদায় কিছুই রচনা করতে পারলেন না! উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত পূর্ব-বঙ্গে শিক্ষিত বলতে বোঝাত উর্দুসেবীগণ, তারপরের দুঃখ-দৈন্যের ইতিহাস তো পূর্বেই নিবেদন করেছি। কাজেই যাঁরা শত শত বৎসর ফার্সী এবং উর্দুর সেবা করে কোনো সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি, অন্ততঃ তাঁদের মুখে এ কথা শোভা পায় না যে বাঙালী মুসলমান বাঙলা সাহিত্যের সেবা করে সে ভাষাকে আপন করে নিতে পারে নি।

কিন্তু কার দোষ বেশী, আর কার দোষ কম সে কথা নিয়ে এখানে আর আলোচনা করব না। এখানে শুধু এইটুকু নিবেদন করি: যে দেশের চাষী-মাঝি ভুবনবরেণ্য লোকসঙ্গীত রচনা করতে পারল সে দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সফল সাহিত্য রচনা করতে পারবে না সে কথা কি কখনো বিশ্বাস করা

যায় ? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে বাধো বাধো ঠেকে কিন্তু না বলে উপায় নেই, তাই অতি সবিনয় নিবেদন করছি, খুদাতা'লা এ অধমের জন্য বহু দেশে রুটি রেখেছিলেন। আরব, মিশর, আফগানিস্থান, ফ্রান্স, জর্মনি প্রভৃতি নানা দেশে নানা পণ্ডিত নানা সাহিত্যিকের সেবা করে এ অধমের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মেছে পূর্ব-বঙ্গে সাহিত্য সৃষ্টির যে উপাদান আছে এবং পূর্ব-বঙ্গবাসীর হৃদয়মনে যে সামান আছে তার বদৌলত একদিন সে অতি উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করবে।

সোয়া চার কোটি মানুষ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে। বহুশত বৎসর ধরে তাদের আতুর হিয়া প্রকাশের জন্য আকুলি-বিকুলি করেছে, কখনো ফার্সী, কখনো উর্দুর মরু পথে তাদের ফল্গুধারা উষ্ণবাষ্পে পরিণত হয়ে গিয়েছে, আজ সে সব হৃদয় শুধু মর্মবাণীরই সন্ধানে নয়, আজ নবরাষ্ট্র নির্মাণের প্রদোষে তারা ওজস্বিনী ভাষায় দেশের জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে চায়।

হাঙ্গেরীর জাতীয় সঙ্গীতে আছে :

দেশের দশের ডাক শোনো ঐ ওঠো ওঠো মাডিয়ার
এই বেলা যদি পারো তো পারিলে না হলে হ'ল না আর।

আমরা বলি ;

দেশের ভাষার ডাক শোনো ঐ হে তরুণ বাঙলার
এই বেলা যদি পারো তো পারিলে না হলে হ'ল না আর।

এই বিরাট সাহিত্য নির্মাণের সম্মুখে দাঁড়িয়ে পাকিস্তানী তরুণ যেন সাহস না হারায়। সে যেন না ভাবে যে উর্দু গ্রহণ করলে তার সব মুশকিল আসান হয়ে যেত। সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান বাবদে ইংরিজি ঢের বেশী মুশকিল আসান। উর্দুতে আছে অল্পবিস্তর মসলা-মসাইলের কেতাব, এন্তার দোয়া-দরুদের বই। তুমি যে রাষ্ট্র নির্মাণ করতে যাচ্ছ তার মালমসলা উর্দুতে যা পেতে সে জিনিস সৃষ্টি করতে তোমার পাঁচ বছরও লাগবে না। ইরান দেশ যে রকম একদিন ইরানি সভ্যতা নির্মাণ করে ফিরদৌসী, রুমী, হাফিজ, সাদী, খৈয়ামের জন্ম দিয়েছিল সেই রকম তুমিও সম্মুখে আদর্শ রাখবে পূর্ব-পাকিস্তানে এক নূতন সভ্যতা গড়বার। ইরান আরবী এবং ফার্সী দুই মিলিয়ে তার সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়েছিল, তুমি আরবী, বাঙলা, ফরাসী, সংস্কৃত, উর্দু, ইংরিজি মিলিয়ে ব্যাপকতর এবং মধুর সাহিত্য-সংস্কৃতি সৃষ্টি করবে।

অন্যান্য সম্প্রদায় যেন অযথা ভয় না পান। বৌদ্ধচর্যাপদের সূতিকাগৃহে যে শিশুর জন্ম, বৈষ্ণবের নামাবলী যে শিশুর অঙ্গে বিজড়িত, আরবী ফারসীর রুটি-

গোস্ত যে শিশু বিস্তর খেয়েছে, 'গীতাঞ্জলি'র একেশ্বরের বন্দনা গেয়ে গেয়ে যে শিশু যৌবনে পৌঁছল, সে যুবক ইসলামের ইতিহাস চর্চা করলে কোনো মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। রাধাকৃষ্ণন, দাশগুপ্ত যে সব দর্শনের কেতাব ইংরেজিতে লিখেছেন তাতে বিস্তর সংস্কৃত শব্দ আছে, মার্গোলিয়াত, মুইর ইসলাম সম্বন্ধে যে সব গ্রন্থ ইংরিজিতে লিখেছেন তাতেও বিস্তর আরবী শব্দ আছে, তাই বলে ইংরিজি ভাষার জাত যায় নি। ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যে যে পরিমাণ আরবী ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করেছেন সে পরিমাণ যদি পুনরায় কাজে লাগে তাহলে আপত্তি কি? 'আলালের ঘরের দুলাল'ও তো বাঙলা বই।

রামমোহন রায় বাঙলা ভাষায় যে চিন্তাধারা প্রবর্তন করেছিলেন তার বিরুদ্ধে সেযুগে গোঁড়া হিন্দুরা প্রবল আপত্তি তুলেছিলেন, রামকৃষ্ণদেবকে কেন্দ্র করে বাঙলা ভাষায় যে নবচেতনার উৎপত্তি হয়েছিল তখনকার বিদগ্ধ (প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ) সমাজ সেটাকে গ্রহণ করতে চান নি, এবং রবীন্দ্রনাথ সনাতন ঐতিহ্যপন্থী নন বলে তাঁকে পর্যন্ত সুরেশ সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল। আজ এ সব সংগ্রামের কথা লোকে ভুলে গিয়েছে, এবং বাঙলা সাহিত্যে এখন যদি মুসলিম সংস্কৃতির (এবং সেইটেই যে তার একমাত্র প্রচেষ্টা হবে তাও নয়) আলোচনা হয় তাহলে বিচক্ষণ লোক বিভীষিকা দেখবেন না।

আমার মত অজ্ঞ লোককে বহু হিন্দু-মুসলমান যখন বাঙলাতে মুসলিম সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করতে অনুরোধ জানিয়ে থাকতে পারেন তখন যোগ্যজন এ কর্মে নিয়োজিত হলে যে বহুলোক তাঁকে আশীর্বাদ করবেন তাতে আর কি সন্দেহ?

পূর্ব-পাকিস্তানে তা হলে উর্দুর স্থান কোথায়?

প্রথমতঃ বলে রাখা ভালো যে, বর্তমানে আমাদের দেশে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত আছে তার সঙ্গে আমাদের পরিকল্পনার শিক্ষাপদ্ধতির কোনো তুলনাই হতে পারে না। উপস্থিত দেখতে পাই, ইস্কুলে চার বৎসর এবং কলেজে চার বৎসর একুনে আট বৎসর পড়েও সাধারণ ছাত্র চলনসই আরবী বা সংস্কৃত শিখতে পারে না। কাজেই যখন বলি উর্দু অপ্‌শনাল ভাষা হিসেবে ম্যাট্রিকের শেষের চার শ্রেণীতে পড়ানো হবে তখন উর্দুওয়ালারা যেন না ভাবেন যে ছাত্রদের উর্দুজ্ঞান আমাদের গ্রাডুয়েটদের ফার্সী জ্ঞানেরই মত হবে। কলেজেও উর্দুর জন্য ব্যাপক বন্দোবস্ত থাকবে। একথা ভুললে চলবে না যে পাকিস্তানের কলেজে 'ভারতীয় মুসলিম সংস্কৃতি' নামক এক বিশেষ বিষয়বস্তু পড়ানো হবে। মোগল স্থপতি,

চিত্রকলা, সঙ্গীত যে রকম সকলেরই গর্বের বিষয় (কোনো ইংরেজ বা মার্কিন যখন তাজমহলের প্রশংসা করে তখন কোনো হিন্দু তো তাজমহল মুসলমানের সৃষ্টি বলে নিজকে সে দায় থেকে মুক্ত করেন না, রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়া সম্বন্ধে কথা উঠলে কোন বাঙালী মুসলমানকে 'রবীন্দ্রনাথ হিন্দু' বলে নতশির হতে তো দেখি নি ; অবনীন্দ্রনাথ মোগল শৈলীতে ছবি আঁকেন, তাঁর শিষ্য নন্দলাল অজন্তা শৈলীতে, তাই বলে একথা কারো মুখে শুনি নি যে নন্দলাল গুরুর চেয়ে বড় চিত্রকার) ঠিক তেমনি উর্দু ভাষা এবং সাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শ্লাঘার সম্পদ। যে সব ছাত্র ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব অথবা আরবী ফারসী সাহিত্য অধ্যয়ন করবে তাদের বাধ্য হয়ে উর্দুর প্রতি মনযোগ দিতে হবে। বেশীর ভাগ রাজনৈতিক এবং কেন্দ্রীয় পরিষদে জানেওয়ালা সদস্য এই সব বিষয়ের সঙ্গে ছাত্রজীবনে সংযুক্ত থাকবেন বলে উর্দুর সঙ্গে তাদের যথেষ্ট পরিচয় হবে। যাঁরা ভাষা ব্যাপারে অসাধারণ মেধাবী তাঁরা হয়ত করাচীতে উর্দু ভাষায় বক্তৃতা দেবেন কিন্তু অধিকাংশ সদস্যকে কেন বাংলাতেই বক্তৃতা দিতে হবে এবং সে জন্য যে 'অসুবিধা' হবে সেটা কি করে সরাতে হবে তার আলোচনা প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই সবিস্তর করেছি।

কেন্দ্রের চাকরি সম্বন্ধে বক্তব্য, যেদিন পূর্ব-পশ্চিম উভয় পাকিস্তান থেকে ইংরিজি অন্তর্ধান করবে সেদিন পাঞ্জাবী মুসলমান পূর্ব-পাকিস্তানে যে প্রকার চাকরি করবে, পূর্ব-পাকিস্তানের লোক ঠিক সেই প্রকারেই কেন্দ্রে চাকরি করবে। এবং একথা তো কেউ অস্বীকার করবেন না যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বদৌলতে আমরা আরবী ফারসীর ভেতর দিয়ে উর্দুর সঙ্গে যুক্ত আছি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরভেতর দিয়েও থাকব কিন্তু পাঞ্জাবী সিন্ধীর সে রকম বাঙলার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কোনো ঐতিহ্য নেই। কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমরা হারব কেন? কিন্তু এ বিষয়ে অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় করার প্রয়োজন নেই। উর্দুওলারাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, সকল অবস্থাতেই বাঙালীর জন্য করাচীতে ওয়টেজ থাকবে। অর্থাৎ স্বয়ং উর্দু-ওলারাই মেনে নিচ্ছেন যে আমরা প্রাণপণ উর্দু শিখলেও পশ্চিম পাকিস্তানী উর্দুভাষাভাষীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারব না। তাঁদের এই মেনে নেওয়াটা খুব সম্ভব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রসূত। আমরাও বলি, আমাদের আলিম-ফাজিলগণ যখন উর্দুতে যুক্তপ্রদেশের মৌলবী-গণকে পরাজিত করতে পারেন নি, তখন আমাদের মত 'তিফ্‌লে মক্তব্', 'কমসীনদের' দিয়ে কোন্ জঙ্গ-ই-জবান্ জয় সম্ভবপর ?

এ সম্পর্কে আরেকটি কথা বলে রাখা ভালো। পরাধীন এবং অনুন্নত দেশেই চাকরি নিয়ে মাথা-ফাটাফাটি খুন-রেজী। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা, কৃষি-খনিজ, দুগ্ধ-ঘৃত উৎপাদন করে যে-দেশ সমৃদ্ধশালী সে-দেশে চাকরি করে অল্প লোক, তাদের সম্মানও অনেক কম। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অঙ্গুলি নির্দেশ করি চাটগাঁয়ের দিকে। পাকিস্তান হয়েছে মাত্র এক বছর—এর মাঝেই শুনতে পাই চাটগাঁয়ের কোনো কোনো বড় সরকারী কর্মচারী নোকরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। দেশ সমৃদ্ধশালী হলে কটা লোক বিদেশ যায়, তাও আবার চাকরির সন্ধানেই? দেশের ভেতরেই দেখতে পাই, যে বৎসর খেত-খামার ভালো হয় সে বৎসরে শহরে বাসার চাকরের জন্য হাহাকার পড়ে যায়।

মুসলিম ঐতিহ্যও চাকরির প্রশংসা করে নি, প্রশংসা করেছে ব্যবসা-বাণিজ্যের। ইসলাম দেশদেশান্তরে বিস্তৃতিলাভ করেছে ধর্মপ্রচারকদের কর্মতৎপরতায় এবং সদাগরদের ধর্মানুরাগে। এখনো মধ্য আফ্রিকায় ক্রীশ্চান মিশনরিদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে হাতীর দাঁতের ব্যবসায়ী মুসলমান সদাগরেরা। ক্রীশ্চান মিশনরিরা সবাই মাইনে পায়, তারা চাকুরে। তাদের দুঃখের অন্ত নেই যে তারা সদাগরদের সঙ্গে পেরে উঠছে না।

পূর্ব-পাকিস্তানের আদর্শ কি সে সম্বন্ধে বিচার করার সময় উর্দুওলারা একটা ভয়ঙ্কর জুজুর ভয় দেখান। তাঁরা বলেন, পূর্ব-পাকিস্তান যদি উর্দু গ্রহণ না করে তবে সে পশ্চিম-পাকিস্তান তথা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তারি সুযোগে ভারতীয় ডোমিনিয়ন পূর্ব-পাকিস্তানটিকে বিনা নুন-লঙ্কায় কপাৎ করে গিলে ফেলবে।

ভারতীয় ইউনিয়নে এবং পাকিস্তানে লড়াই হবে কিনা, হলে কবে হবে এ আলোচনায় এত 'যদি' এবং 'কিন্তু' আছে যে সে আলোচনা যুক্তি-তর্কের বিষয়বস্তু না হয়ে ফলিত জ্যোতিষের ভবিষ্যদ্বাণীর জিনিস হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা ফলিত জ্যোতিষ জানিনে, উপস্থিত আমরা ধরে নিচ্ছি যে লড়াইটা লাগবে, কারণ সেটা ধরে না নিলে জুজুর ভয় ভাঙানো যাবে না। অন্ধকার ঘরে বাচ্চা ছেলেকে 'ভূত নেই' বললে তার ভয় যায় না, বরঞ্চ ভূত মেনে নিলেও আপত্তি নেই, যদি সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বালানো হয়। তাই আলোর সন্ধানই করা যাক।

কে মিত্র, কে শত্রু সে কি ভাষার উপরই নির্ভর করে? আমেরিকা, ফ্রান্স, রুশ, লড়ল জর্মন, ইতালির বিরুদ্ধে। আমেরিকা ফ্রান্স এবং রুশ তাই বলে কি একই ভাষায় কথাবার্তা কয়, না জর্মনি ইতালির ভাষাই বা এক? আজ বলছি

রুশের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক ফ্রান্সের একমাত্র ভরসা মার্কিন সাহায্য। আজ যদি উর্দুওয়ালাদের কায়দায় ফ্রান্সকে বলা হয়, 'তোমরা যদি ইংরেজি গ্রহণ না করো তবে তোমরা আমেরিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, এবং রুশ ফ্রান্সটিকে বিনা মাস্টার্ডে কপাৎ করে গিলে ফেলবে, তাহলে কি ফ্রান্সের লোক মাতৃভাষা বর্জন করে মাথায় গামছা বেঁধে ইংরেজি শিখতে লেগে যাবে ?

পক্ষান্তরে এক ভাষা হলেই তো হৃদ্যতা চরমে পৌঁছয় না। আমেরিকা যখন ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই লড়েছিল তখনো সে ইংরেজি বলত। আইরিশমেনের মাতৃভাষা ইংরেজি, তাই বলে সে কি ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে নি ? পশতুভাষী মুসলিম পাঠানের একদল লড়ল সুভাষচন্দ্রের ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে জাপানের হয়ে, আরেকদল লড়ল ইংরেজের ঝাণ্ডার নীচে দাঁড়িয়ে তাদের হয়ে।

তার চেয়েও ভালো উদাহরণ আছে আরব দেশে। আরবের লোক কথা বলে আরবী ভাষায়, তারা সকলেই এক এক গোষ্ঠীর লোক (একবর্ণ), তারা সকলেই মুসলিম অথচ আজ সে দেশ (১। ইরাক, (২) সিরিয়া, (৪) লেবানন, (৪) ফলস্তীন, (৫) ট্রান্স-জর্ডন, (৬) সউদী-আরব, (৭) য়েমেনে খণ্ডিত বিখণ্ডিত (এগুলো ছাড়া আরবী-ভাষাভাষী মিশর, টুনিস, আলজেরিয়া, মরক্কোও রয়েছে)।

এই সাত রাষ্ট্রের মধ্যে মন-কষাকষির অন্ত নেই। ইবনে সউদ এবং মক্কার শরীফের মধ্যে যে লড়াই হয়েছিল সে তো আমাদের সকলেরই স্পষ্ট মনে আছে। তার জের এখনো চলছে আমীর আব্দুল্লা এবং ইবনে সউদের শত্রুতার মধ্যে। আজ যে ফলস্তীন অসহায় হয়ে ইহুদির হাতে মার খাচ্ছে তার প্রধান কারণ এই যে ইবনে সউদ আর আব্দুল্লার মধ্যে ঠিক ঠিক মনের মিল হচ্ছে না। আরব লীগের সর্বপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে—অথচ সকলেই জানেন যে উপর্যুক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমঝাওতা হয়ে গেলে দশ দিনের ভেতর ইহুদিদের রাজ্যলিপ্সা 'ফি নারি জাহান্নামে' পাঠানো সম্ভবপর হবে।

পক্ষান্তরে সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি (চতুর্থটির লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম) ভাষা, বেলজিয়ামে দুইটি, চেকোস্লোভাকিয়ায় দুইটি, যুগোস্লোভাকিয়ায় গোটা চারেক, কানাডায় দুইটি ইত্যাদি ইত্যাদি। সুইজারল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত বিশেষ করে দ্রষ্টব্য। সে দেশের প্রধান দুই অংশ জর্মন এবং ফরাসি বলে। বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও একে অন্যের ভাষা সাধারণতঃ রপ্ত করতে পারে না (ভাষা শেখা বাবতে সুইসরা বড়ই কাহিল), অথচ ফ্রান্স এবং জর্মনিতে যখন লড়াই লাগে তখন ফ্রেঞ্চ সুইসরা একথা

কখনো বলে নি যে তারা ফ্রান্সের হয়ে লড়বে, জর্মন সুইস্‌রাও অনুরূপ ভয় দেখায় নি। গত যুদ্ধে দুজনে মিলে নিরপেক্ষ ছিল এবং হিটলার জানতেন যে সুইস্-জর্মন যদিও তাঁর জাতভাই, তবু তাদের কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না।

তাই বলি unity (ঐক্য) uniformity (সমতা) এক জিনিস নয়। সমতা হলেই ঐক্য হয় না। আর যারা সমতা চায় তাদের জেদ-বয়নাক্কার অন্ত নেই। আজ তারা বলবে ভাষায় সমতা চাই, পূর্ব-পাকিস্তান উর্দু নাও; কাল বলবে পোশাকের সমতা চাই, শেলওয়ার কুর্তা পাগড়ী পরো; পরশু বলবে খাদ্যের সমতা চাই, মাছ ভাত ছেড়ে গোস্ত রুটি ধরো, তার পরদিন বলবে নৌকা বদ্‌খদ্ জিনিস, তার বদলে গোরুর গাড়ী চালাও। তারপর যদি একদিন পূর্ব-পাকিস্তানী পাঞ্জাবীদের বলে, দৈর্ঘ্যের সমতা হলে আরো ভালো হয়, লড়াইয়ের জন্য য়ুনিফর্ম বানাতে তাহলে সুবিধে হবে, কিন্তু তোমরা বড্ড উঁচু, তোমাদের পায়ের অথবা মাথার দিকের ইঞ্চি তিনেক কেটে ফেলো, তাহলেই হয়েছে!

ঐক্য বা য়ুনিটি অন্য জিনিস। প্রত্যেকে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে যখন সংঘবদ্ধ হয়ে মানুষ একই স্বার্থ, একই আদর্শের দিকে ধাবমান হয় তখনই তাকে বলে ঐক্য। তুলনা দিতে গিয়ে গুণীরা বলেছেন, বীণার প্রত্যেক তারের আপন আপন ধ্বনি আছে—সব তার যখন আপন আপন বিশিষ্ট ধ্বনি সপ্রকাশ করে, একই সুরের ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে তখনই সৃষ্ট হয় উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত। সব কটা তারই যদি এক ধরনে বাঁধা হয় তবে বীণায় আর একতারায় কোনো তফাৎ থাকে না। সে যন্ত্র বিদগ্ধ সঙ্গীত প্রকাশ করতে অক্ষম।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে আপন আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে, কী প্রকারে এক আদর্শের রাখী বেঁধে সম্মিলিত করা যায় তার সাধনা করবেন রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ। উপস্থিত শুধু আমরা এইটুকু বলতে পারি, পূর্ব-পাকিস্তানের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তার ঘাড়ে উর্দু চাপানো হয় তবে স্বভাবতই উর্দু-ভাষাভাষী বহু নিষ্কর্মা শুধু ভাষার জোরে পূর্ব-পাকিস্তানকে শোষণ করার চেষ্টা করবে—এ জিনিস অত্যন্ত স্বাভাবিক, তার জন্য উর্দু-ভাষাভাষীকে দোষ দিয়ে লাভ নেই—এবং ফলে জনসাধারণ একদিন বিদ্রোহ করে পশ্চিম-পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। বর্ণের কৌলীন্য যেমন শোষণের কারণ হতে পারে, ভাষার কৌলীন্যও ঠিক সেই রকম শোষণপন্থা প্রশস্ততর করে দেয়।

তারি একটি মর্মন্তুদ দৃষ্টান্ত নিন: তুর্কী একদা তাবৎ আরবখণ্ডের উপর রাজত্ব

করত। তুর্কী সুলতান সর্ব আরবের খলিফাও ছিলেন বটে। তৎসত্ত্বেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সমস্ত আরব ভূখণ্ড খলিফার জিহাদ ফরমান উপেক্ষা করে নসারা ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়ে তুর্কীকে পর্যুদস্ত করল। আমাদের কাছে এ কত বড় বিস্ময়ের কথা,—খলিফার জিহাদ হুকুমের বিরুদ্ধে লড়া মানে তো কাফির হয়ে যাওয়া। যে আরবদের ভেতর দিয়ে ইসলাম প্রথম সপ্রকাশ হলেন তারা ধর্মবুদ্ধি হারালো?

তাই আমাদের সবিনয় নিবেদন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান যেন কোনো মহত্তর আদর্শের অনুপ্রেরণায় ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হয়। পূর্বেই নিবেদন করেছি, গুণীরা সে আদর্শের সন্ধান করবেন। আমার জ্ঞান-অভিজ্ঞতা অত্যল্প কিন্তু নানা দেশের গুণীদের মুখে শুনেছি, নানা সৎ গ্রন্থে পড়েছি, দীন ইসলাম বলেন, সে আদর্শ হবে রাষ্ট্রের দীনদুঃখীর সেবা করা। উভয় পাকিস্তান যদি এই আদর্শ সামনে ধরে যে তাদের রাষ্ট্রভিত্তি নির্মিত হবে চাষামজুরকে অন্ন দিয়ে, দুঃস্থকে সেবা করে, অজ্ঞকে জ্ঞানদান করে, এক কথায় 'সাইল'কে (অভাবে আতুরকে) 'গণী' (অভাবমুক্ত) করে, তাহলে আর ভয় নেই, ভাবনা নেই। উভয় প্রান্তে গণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যে ঐক্যসূত্রে সম্মিলিত হবে সে সূত্র ভিন্ন হওয়ার ভয় নেই।

সেই মহান আদর্শের দিকে উদ্দীপ্ত উদ্বুদ্ধ করতে পারে সতেজ সবল সাহিত্য। সে জাতীয় সাহিত্য মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষাতে কেউ কখনো নির্মাণ করতে পারে নি। জনগণের মাতৃভাষা উপেক্ষা করে গণরাষ্ট্র কখনই নির্মিত হতে পারে না।

উপসংহারে বক্তব্য: যুদ্ধ কাম্য বস্তু নয়। অন্যের বিনাশ বাসনা সর্বথা বর্জনীয়। পাকিস্তান বিনষ্ট হলে ভারতীয় ইউনিয়নের লাভ নেই, ভারতীয় ইউনিয়ন বিনষ্ট হলে পাকিস্তানের লাভ নেই। উভয় রাষ্ট্র সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে বিত্তমান হোক, এই আমাদের প্রধান কাম্য। ইয়োরোপের তাণ্ডবলীলা থেকে আমরা কি কোনো শিক্ষা গ্রহণ করব না?

শিক্ষাগ্রহণ করি আর নাই করি, কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার ভয় অহরহ বুকে পুষে সেই দৃষ্টিবিন্দু থেকে সর্ব সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করা মারাত্মক ভুল। বাড়ীতে আগুন লাগার ভয়ে অষ্টপ্রহর চালে জল ঢালা বুদ্ধিমানের কর্ম নয়।

আজ যদি আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় মাতৃভাষা বর্জন করি তবে কাল প্রাণ যাওয়ার ভয়ে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হব।

অপ্রকাশিত রচনা

রচনাবলীর এই অংশে সৈয়দ মুজতবা আলীর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা সংকলিত হল। এর মধ্যে আছে ছোটদের লেখা, কবিতা, রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ ও কিছু রাজনৈতিক প্রবন্ধ। যতদূর মনে হয় এগুলি কোন গ্রন্থে এ পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হয় নি। এই অংশের কবিতাগুলি শ্রীসুব্রত রুদ্রের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

প্রবাসীর চিঠি

শ্রীমান্ খসরু বাবাজীউ,

"সুবদ্ধি গোয়ালার কুবুদ্ধি হইল,
ভাঁড়েতে রাখিয়া দুধ পীরকে ফাঁকি দিল
মানিক পীর ভবনদী পার হইবার লা—"
আমার হ'ল তাই ;—
ছিলাম সুখে সিলেট জেলায় ঢুকল মাথায় পোকা
কাণ্ড দেখে বুঝল সবাই লোকটা গবেট বোকা।
বহুত দেশ তো দেখা হ'ল খেলাম মেলাই ঘোল
চোখের জলে ভাসি এখন, খুঁজি মায়ের কোল।
    চক্ষু বুজে বসে যখন ভাবি বরদায়
    —দেহখানা বদ্ধ ঘরে—দেশপানে মন ধায়
    মেলাই ছবি আঁকি, মনের পটে বুলাই তুলি
    দুঃখ কষ্ট এই ফিকিরে অনেক কিছুই ভুলি॥
মনে হ'ল আমি যেন পেরিয়ে বছর কুড়ি
ফিরে গেছি সিলেট আবার চড়ি খেয়াল-ঘুড়ী।
বড়দিনের ছুটির সময় নাইব নদীর জলে
বালুর চড়ায় বসে আছি, গামছা নিয়ে গলে।
লাল্লুমিয়ার দোকান থেকে খানিকটা নুন নিয়ে
ডান হাতে কুল, বাঁ হাতে নুন তাই মিলিয়ে দিয়ে
মরুসুধার সৃষ্টি যেন।   নাই কিছুরই তাড়া
পরীক্ষা বা অন্য বালাই সামনেও নেই খাড়া।
অলস চোখে দেখছি চেয়ে এপার ওপার যাওয়া
খেয়া নায়ের চিরন্তনী ঢিমে তেতাল বাওয়া।
মহাজনী নৌকা চলে গদাই লশ্‌করি
কমলানেবু বোঝাই করা ; লোভ করে ফস্ করি
গণ্ডা দুয়েক সরিয়ে নেব, কিন্তু চাচা, শোনো

চেষ্টা কভু কোরোনাকো লাভ তাতে নেই কোনো।
ব্যাটারা সব লক্ষ্মীছাড়া খায় না কেন গুলি,
কোনো বাঙাল নেইকো বসে চোখে দিয়ে ঠুলি।
যতই কেন বাড়াও না হাত মহা সন্তর্পণে
ব্যাটারা সব চালাক অতি বৈঠার ঘা অর্পণে।
থাক্ সে কথা, গামছা কাঁধে নাওয়ার বেলা যায়
আবার বলি বন্ধ ঘরে দেশ পানে মন ধায়।
খসরু-পূর্ব[১] বছর সাতেক, বসন্ত কি শীতে,
তোমার মাইজ্‌লা ফুফুর[২] বিয়া হৈল চৌকিতে।
চৌকি আছে নবীগঞ্জের গায়ের সঙ্গে মিশে
সেখান থেকে কই পাঠালেন তোমার মেজ পিসে।
বাপ রে সে কি বিরাট বপু উদর আণ্ডাময়
মুখে দিলে মাখন যেন—জঠর ঠাণ্ডা হয়।
তোমার মা তো সেই দেশেরই যেথায় শুনি লোক
মাছ না পেলে ব্যাঙ-ভাজাতে ভোলে মাছের শোক।
শুধালে কি পাবে খবর তুমি তাঁহার কাছে
নউজ বিল্লা[৩]; সত্যি খবর তোমার বাবার আছে।
তামাম জাহান খোদার কাছে সব কিছু নেয় মাগি,
আমার পেটের আঁকুপাঁকু কই মাছেরই লাগি॥
আরো একটা জিনিস খসরু সত্যি তোমায় ব'লি।
যার লাগিয়া তৈরী আমি জানটা দিতে ব'লি।
—ভাবনা শুধু জান্‌টা খাব কেমন করে
পেট আর জান্ তো একই দেহে, আছে একই ঘরে—
তোমার মায়ের দেশের জিনিস বড়ই চমৎকার
অর্ধ জগৎ ঘুরে আমি পাইনি জুড়ি তার—
চোঙ্গা-পিঠা,[৪] আহা চাচা বোলব তোমায় কী ?
যখন ভাবি ইচ্ছা হয় যে 'রেজিগ্‌নেশন' দি।
ধ'রে সোজা পয়লা গাড়ী 'দেওর আইলে'[৫] দি ছুট
চাক্‌রি-বাঁধন রাজার শাসন সব কিছু ঝুট্‌মুট্।
নামটা সত্যি হলে পরে খাতির পাব মেলা

খানা-পিনা ধুম-ধামেতে কাটবে সারা বেলা।
চোঙ্গা-পিঠার সঙ্গে মলাই দেবে তোয়াজ করে
নয়ত দেবে হরিণ-শিকার হয়ত আছে ঘরে।
করিমগঞ্জের হরিণ সে যে বড়ই খান্‌দানি
খোরাক তাদের আমলকি ফল, ঝরণা-মিঠা পানি।
মহীমিয়ার বাবা ছিলেন বাঘা শিকারী
নুন আর মরিচ সঙ্গে নিয়ে—হাতীর সোয়ারী—
পাহাড় ঘেঁষে চলে যেতেন গভীর বনের পাশ
হরিণ শিকার খেতেন স্রেফ্ ঝাড়া তিনটি মাস।
সঙ্গীবিহীন অন্ধ ঘরে আসন্ন সন্ধ্যায়
সুর্মা নদীর দেশের পানে উদাসী মন ধায়॥
চটছো হয়ত মনে মনে ভাবছ একি হ'ল
চাচার যে সব কাব্যি ছিল সব কিছু আজ ম'ল।
খাবার কথা কয় যে খালি আর কিছু নেই
তাও আছে; তোমার পাতে সন্তর্পণে দেই।
সিলেটের উত্তরেতে সোজা গিয়ে চলে
চৈত্র মাসে, মিঠা রোদে, উজায়ে সুরমা,
গেয়ে সারি, গান—
ধরিয়া পালের দড়ি করিবারে বারুণী'র স্নান
মেলা দৃশ্য দেখিয়াছি।
স্তূপীকৃত ধান মণ মণ
দুই পারে
তার পরে
কী রূপালি ঝিলিমিলি সোনালী ধানের
যেন যে হীরার মালা হাজার হাজার
—কাতার কাতার
হেমাঙ্গীর স্বর্ণবক্ষে।
দীর্ঘ শর্বরীর
শিশিরে করিয়া স্নান এলায়েছে দেহ
আতপ্ত কিশোর রৌদ্রে॥

অগভীর স্বচ্ছ জল
বালুর বুলায় দেহ।
সে জলে ডুবায়ে গা
দেখিয়াছি
তালহীন শব্দহীন মাছের নাচন,
জলের নিচেতে।
উপরেতে নাচে রবিকর
হীরার নূপুর পরে।
হঠাৎ
কেন না জানি—
তলা থেকে উর্ধ্বশ্বাসে ওঠে ছোট মাছ
কটিখানি কাঁপাইয়া নটরাজ দোলে
জলের উপরে মারে ঘা—
যেন কোন্ খেয়ালী বাদশা
টাকা নিয়ে খেলে ছিনিমিনি।
কখনো বা দেখিয়াছি
দ'য়ে মজে গিয়ে
একপ'ল ছোট মাছ চক্রাকার ঘুরপাক খেয়ে
—গরবা নাচের ছাঁদে—
ইচ্ছা অনিচ্ছায়
অলখ মাদলে মেতে অজানা সে কিসের নেশায়
ক্রমে ক্রমে উঠে উপরেতে ;—
মাছরাঙা স্টুকা ডাইভার
পার্ফেক্ট টাইমিঙ
পড়িল বিদ্যুৎ বেগে হ'ল বজ্রাঘাত।
হুডমুড করে
এ ওর ঘাডেতে পড়ে
মুহূর্তেই হ'ল অন্তর্ধান।
হয়ত বলিতে তুমি
তাতেই বা কী ?

এসবের বর্ণনার কি বা আছে বাকি ?
হক্ কথা
তবু যতবার
বসিয়া বিদেশে
চোখ বুজে মনে করি যেন আমি সুর্মা উজিয়ে
বরদার অবিচার অত্যাচার ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
চলিয়াছি
তখনই
বড় ব্যথা বাজে প্রাণে,
মনে হয় জানি ঠিক জানি আমার দেশের
স্নিগ্ধ শান্ত শ্যামল বনানী
পশ্চাতে তাহার নীলগিরি যবনিকা
তাহার উপরে লিখা
শুভ্রতার শিখা
রুপার ঝরনা
নীলের উপরে সে যে কি বিচিত্র মিনা।
পদমূলে
প্রস্তরে উপলে
কলকল উচ্চহাস্য
হাসিছে খাসিয়া নারী পাঁচশো সাতশো।
মধুরের ধ্যানে আমি বার বার ডুবে
যে রাগিনী দেখিয়াছি চতুর্দিকে যার স্বপ্রকাশ—
কাব্যে ছন্দে রূপ তার মূর্তি আর হ'ল না বিকাশ।
এ কি বিধাতার লীলা ?
রূপে গন্ধে রসে শ্বাসে পরিপূর্ণ এ রমণী হ'ল মূক শিলা
তাই কি শিলেট ?
কাব্যে তার মাথা হেঁট !
কিন্তু চাচা মাফ করো, আজ কাজ আছে মোর মেলা
কাব্য-সাগর যেদিক পানে যায়নি জীবন-ভেলা—
চড়ায় লেগে আটকে আছে জোয়ার নাহি আসে

পূব হাওয়াও দেয়নি ঠেলা নৌকা নাহি ভাসে।
আগাগোড়া ভুলে ভরা জগা-খিচুড়ি
বয়স হ'ল হিসেব করে দেখি যে দুই কুড়ি।
চহল্ সালে উম্‌রে আজীজম্ গুজশৎ[৬]
কালাপানির গারদ মাঝে ভালে হানি দণ্ড।[৭]
তাই বলি
সুবুদ্ধি গোয়ালার কুবুদ্ধি হইল
ভাঁড়েতে রাখিয়া দুধ পীরকে ফাঁকি দিল
মানিক পীর ভবনদী পার হইবার লা।
সেই পীরেরে স্মরণ করে তোমার ছোট চাচা॥

মৌচাক, কার্তিক ১৩৬০

---

১. খসরু-পূর্ব—খৃষ্টপূর্বের তুলনায়, অর্থাৎ খসরুর জন্মের বছর সাতেক পূর্বে।

২. মেজো পিসী।

৩. তওবা, তওবা।

৪. বাঁশের চোঙার ভিতর চাল ভরে সেই চোঙা আগুনে ঝল্‌সে তৈরী এক রকম পিঠে।

৫. 'দেওর আইল' অর্থাৎ 'দেবর এল', খসরুর মামার গ্রামের নাম।

৬. ইরানি কবি সাদীর বিখ্যাত ছত্র। 'আমার জীবনের প্রিয় চল্লিশ বৎসর গেল, কিন্তু এখনো ছেলেমানুষী গেল না।' খসরু তখন ফার্সী শিখছিল বলে ছত্রটি তোলা হয়েছে।

৭. হাত।

ক্রিকেট

হুজুগে মেতে ক্রিকেট খেলা দেখিতে যদি চাও
মাথাটি মোর খাও—
গাড়োল-পানা প্রশ্ন মেলা ঝেড়ো না খালি খালি
খেলাটা যদি না বোঝো তবে দিয়ো না হাততালি
এলোপাতাড়ি বেগার-মোকা ক্যাবলা হাবার মত।
রয়েছে শত শত।
কায়দা-কেতায় ওকীব-হাল খেলার সমঝদার
শুধিয়ো নাকো' ওদের মিছে প্রশ্ন বেশুমার।
শুধাও যদি মানা না শুনে, কি হবে ফল, বলি,
ট্যারচা-মুখো জবাব দিয়ে থামাবে চলাচলি।
যেমন ধরো, জানো না কিছু, শুধালে ভয়ে ভয়ে
যে গুণী পাশে আছে বসে—"দিন তো মোরে কয়ে,
কাঠের ঐ ডাণ্ডাগুলো, কি নাম হয় তার?"
পাশের যিনি হইবে মনে রাগত হন যেন
ঘ্যানরঘ্যান লাগিবে ভালো কেন!
বলেন তিনি মিনিট তিন থাকিয়া নিশ্চুপ
"উকেট কয়"। গলাতে যেন রয়েছে বিদ্রূপ।
হকচকিয়ে দিলে তো তুমি অনেক ধন্যবাদ;
খানিক পরে তবুও মনে হইল তব সাধ
এলেম নব হাসিল লাগি। কিন্তু তাতে ভয়
তেড়ে না যান এবার তিনি—গুণী তো নিশ্চয়—
থাকিয়া চুপ, ভাবিয়া খুব, গলাটি সাফ করে
চুলকে ঘাড় শুধালে মৃদু স্বরে
"উকেট কয়? বেশক্ কথা; লেকিন্ কন্ স্যার
ওসবগুলো হোথায় কেন কি হয় উপকার?"

কটমটিয়ে এবার গুণী তাকান তব পানে
বাসনা যেন প্রাণটি তব হানেন আঁখি-বাণে—
হুঙ্কারিয়া হাঁকেন শেষে, “ওগুলো কার তরে ?—
খেলাড়ি সব বসবে বসে ক্লান্ত হলে পরে।”

মৌচাক, বৈশাখ ১৩৬৭

বছর দুই পূর্বে আমি যখন ঢাকাতে আমার ছোট বোনের বাড়িতে গিয়ে উঠলুম, তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলা হচ্ছে। আমার ভগ্নী আস্‌মা ঘড়িঘড়ি রেডিয়ো খুলে লেটেস্ট স্কোর শুনে নিচ্ছিল। আমি দু' একটি প্রশ্ন শুধিয়েই বুঝে গেলুম আস্‌মা ক্রিকেটতত্ত্বে একদম অগা, অর্থাৎ আমার চেয়েও কম ক্রিকেট খেলা বোঝে। এ কবিতাটি তারই উদ্দেশে ; এবং যেহেতু 'কবিতাটি' ঢাকায় রচিত তাই ঢাকাই বিদেশী শব্দ একটু বেশী রয়েছে।

প্রদীপের তলাটাই অন্ধকার কেন ?

পিলসুজ 'পরে হেরো জ্বলে দীপশিখা,
চতুর্দিকে যে আঁধার ছিল পূর্বে লিখা
মুহূর্তেই মুছে ফেলে।
কিন্তু অতি অবহেলে
'মাভৈঃ' বলিয়া তারে ছেড়ে দেয় স্থান
যে আঁধার পায়ে ধরে মাগে পরিত্রাণ।

সন্দেশ, বৈশাখ ১৩৬৯

যথা—বেগার-মোকা/বেমক্কা, থামকা, যত্রতত্র।
ওকীবহাল/বিশেষজ্ঞ, Specialist
বেশুমার/অসংখ্য
বে/Without
শুমার/Number, আদমশুমারী তুলনীয়
এলেম হাসিল/নবজ্ঞান লাভ
বেশক/দ্বিধাহীন, অসংশয়
লেকিন্/কিন্তু

উচ্ছে ভাজা সন্দেশ

গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন যে, ইস্কুলের, এমন কি কলেজের গোড়ার দিকেও ছেলেমেয়েদের শেকসপীয়র পড়ানো উচিত নয়। কারণ শেকসপীয়রের ভাষা প্রাচীন দিনের। সে ভাষার অনেক শব্দ, অনেক ইডিয়ম আজকের দিনের ইংরেজিতে আর ব্যবহার করা হয় না। ছেলেমেয়েরা সেটা না বুঝতে পেরে সেগুলো আপন লেখাতে লাগিয়ে দিয়ে একটা খিচুড়ি ভাষা তৈরী করে বসে। উচিত : প্রথম আধুনিক ইংরেজিটা শিখে নেওয়া এবং তার পর শেকসপীয়র ইত্যাদি ক্লাসিকস্‌ পড়া। নিজের থেকেই ছেলেমেয়েরা অনুভব করবে কোন্‌টা প্রাচীন দিনের শব্দ, এখন আর চলে না।

আমার মনে হয় বাঙলার বেলায়ও এখন সেই অবস্থা। ধরে নিলুম, তোমার বয়স বারো-চোদ্দো। তুমি যদি বিস্তর বঙ্কিম পড়ো তবে বাঙলা লেখার সময় তুমি এমন ভাষা শিখবে যেটা আজকের দিনে পণ্ডিতী-পাণ্ডিতী, গুরুগম্ভীর মনে হবে। তাই আমার মনে হয়, এই বয়সে, রবীন্দ্রনাথের শেষদিকের লেখা বার বার পড়ে সেটা আয়ত্ত করে নেওয়া। আয়ত্ত করার অর্থ এ নয় যে তখন তুমি তাঁর মতো লিখতে পারছো। তা হলে তো আর কোনো ভাবনাই ছিল না। আমরা সবাই গণ্ডায় গণ্ডায় নোবেল পুরস্কার পেয়ে যেতুম। তার অর্থ, তুমি মোটামুটি জেনে গেছ, কি কি শব্দ কোন্‌ কোন্‌ ইডিয়ম ব্যবহার করলে কেউ বলতে পারবে না এগুলো প্রাচীন দিনের, এখন আর চলে না। এটা হয়ে যাওয়ার পর পড়বে রবীন্দ্রনাথের যৌবনকালের লেখা। বিশেষ করে তাঁর 'প্রাচীন সাহিত্য'। কিন্তু সেটা খুব সহজ নয়। আমি একটি ছত্র তুলে দিচ্ছি : 'একবার মনে করিয়া দেখিলেই হয় দ্রৌপদীর নাম যদি উর্মিলা হ'ত, তবে সেই পঞ্চবীর-পতিগর্বিতা ক্ষত্রনারীর দীপ্ত তেজ এই তরুণ কোমল নামটির দ্বারা পদে পদে খণ্ডিত হইত।' কঠিন বাঙলা। কিন্তু কী সুন্দর! কী মধুর!!

তারপর বঙ্কিম। বিদ্যাসাগর। কালীপ্রসন্নের মহাভারত। এবং সর্বশেষে 'আলালের ঘরে দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'। তারও পরে যদি নিতান্ত কোনো-কিছু না থাকে, বৃষ্টির দিন, বাড়ির থেকে বেরনো যাচ্ছে না, তবে পড়বে—বড় অনিচ্ছায় বলছি—সৈয়দ মুজতবা আলী। কিন্তু তিন সত্য দিয়ে বলছি, পয়সা খরচ করে না। ধার করে।

এ গল্পটা তো জানো? মার্কিন লেখক মারক টুয়েনের আপন লাইব্রেরিখানা নাকি সত্যিই দেখবার মত ছিল। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত বই, বই, শুধু বই। এমন কি কার্পেটের উপরও গাদা গাদা বই স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে থাকতো—পা ফেলা ভার। এক বন্ধু তাই মারক টুয়েনকে বললেন, 'বইগুলো নষ্ট হচ্ছে; গুটাকয়েক শেল্‌ফ যোগাড় করছো না কেন?'

মারক টুয়েন খানিকক্ষণ মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললেন, 'ভাই, বলছো ঠিকই—কিন্তু লাইব্রেরিটা যে-কায়দায় গড়ে তুলেছি, শেল্‌ফ তো আর সে-কায়দায় যোগাড় করতে পারিনে? শেল্‌ফ তো আর বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার চাওয়া যায় না।'

উপদেশ দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম। সেটা তেতো। উচ্ছে ভাজা। কিন্তু সন্দেশ দিয়ে শেষ করলুম তো!

ক্লাইন এর্না

ক্লাইন এর্না জরমনির ছোট্ট একটি মেয়ে। আমাদের যে-রকম গোপালভাঁড় দারুণ চালাক, এই মেয়েটি সে-রকম ভীষণ বোকা। তবে, মাঝে মাঝে সে এমন কথা কয় যে তার উত্তর মেলা ভার। যেমন ধরো, এর্নার মা বলছে, "হেই ক্লাইন এর্না! বেড়ালের ন্যাজটা মিছে মিছে টানছিস কেন?" এর্না বললে, "আমি টানছি কোথায়? কি যে বলো মা! বেড়ালটাই তো খালি খালি টানছে। আমি তো স্রেফ্‌ ন্যাজটা ধরে আছি।"

"ক্লাইন" মানে ছোট, ক্ষুদে। কিন্তু কারো কারো নাম বড় হয়ে যাবার পরও "ছোট" থেকে যায়। আমাদের দেশেও তাই। বাড়ির বড় বড় কর্তারা সব ওপারে চলে গিয়েছেন, কিন্তু "ছোট (ক্লাইন) বাবুর" নাম "ছোট বাবুই" রইল।

ক্লাইন এর্নার বেলাও তাই। আর এ-গল্পটা আমার বিশেষ করে ভালো লাগে, কারণ গল্পটা আমাদের দেশেও চালু আছে।...ক্লাইন এর্নার তখন একটুখানি বয়স হয়েছে। ইস্কুলে "বয়-ফ্রেণ্ড" জুটেছে। সে বললে, "চলো ক্লাইন এর্না। নৌকো ভাড়া করে আমরা ঐ হোথাকার চর হেলিগোলাণ্ডে যাই। দু'তিন টাকা লাগবে। সে আমার আছে। কি বলো? লক্ষ্মীটি, না বলো না।"

আমাদের ক্লাইন এর্না সত্যি লক্ষ্মী মেয়ে। "না" বলবে কেন? তদ্দণ্ডেই রাজী হয়ে গেল।

নৌকো ভাড়া করে বন্ধু শুধোলো, "ক্লাইন এর্না, তুমি দাঁড় ধরতে পারো? আমি তা হলে বৈঠে বাই। নইলে—"

ক্লাইন এর্না বাধা দিয়ে বললে, "দাঁড় ধরতে পারবো না কেন? বাবার সঙ্গে কতবার নৌকোয় করে মাছ ধরতে গিয়েছি।"

ঘণ্টাখানেক বৈঠে ঠেলার পর ফ্রেণ্ড বললে, 'ক্লাইন এর্না, এক ঘণ্টা তো হয়ে গেল। এখনো হেলিগোলাণ্ডে পৌঁছলুম না কেন? ওটা তো দেখাও যাচ্ছে না।"

ক্লাইন এর্না বললে, "অ। তাই বুঝি। আম্মো তো খেয়াল করিনি। নৌকো যে পাড়ের খুঁটিতে এখনো বাঁধা। আমি খেয়ালই করিনি।"

আমাদের দেশেও বলে, "পুরা রাইত নাও বাইয়া দেখি, বাড়ির ঘাটেই আছি।" এর আসল অর্থ: মোদ্দা, সব চেয়ে যেটা প্রয়োজনীয়, সেটা আগে না করলে বাদবাকি পণ্ডশ্রম।

বিদেশী ভাষা—ক্লাইন এর্না

স্বর্গত সুকুমার রায় একদা বলেছিলেন, "কেই বা শোনে কাহার কথা, কই যে দফে দফে—গাছের পর কাঁঠাল দেখে তেল দিয়ো না গোঁফে।" অর্থাৎ মানুষ উপদেশ শুনতে মোটেই ভালোবাসে না। বিশেষ করে যারা ছেলেমানুষ। নিজের কথা যদি তুলি তবে নির্ভয়ে, কিন্তু ঈষৎ লজ্জা সহ বলবো, আমি যখন ছেলেমানুষ ছিলুম তখন কারোরই কোনো উপদেশে কান দিতুম না। একমাত্র মায়ের আদেশ উপদেশ—তা সে-কথা বাদ দাও, এখনো, এই পরিপক্ক বৃদ্ধ বয়সে আমার চোখে জল আসে। হ্যাঁ, কি বলছিলুম? বলছিলুম কি, তাই উপদেশ দিতে আমার বড়ই অনিচ্ছা। কিন্তু আজ কিছুটা দিতেই হচ্ছে। খুলে বলি। পরশু দিন আমার প্রতিবেশী একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে আমায় শুধোলে, "স্যর, এটা কি সত্য, ইউ অ্যাণ্ডারস্টেণ্ড টুয়েনটি ল্যাঙগুজেস?" আমি সঙ্গে সঙ্গে বললুম, "সম্পূর্ণ মিথ্যে কথা। আই মিসআণ্ডারস্টেণ্ড মোর দেন টুয়েনটি ল্যাঙগুজেস।" এর থেকেই বোঝা যায় যে, এ-পাড়ায় আমার বদনাম আছে, আমি নাকি একাধিক ভাষা জানি। তাই ইংরেজি শেখা সম্বন্ধে দু'একটি কথা এই সুবাদে বলে নিতে চাই। মাস্টারমশাইরা সর্বদাই বলে থাকেন, যে বই পড়বে

তার কোনো শব্দ জানা না থাকলে অভিধান খুলে দেখে নেবে। এটা অবশ্যই টেকস্‌ট্‌ বই সম্বন্ধে খাটে। কিন্তু ভেবে দেখো তো, তুমি যে সব কঠিন বাঙলা শব্দ শিখেছ, তার ক'টি অভিধান দেখে? যে-সব বাঙলা গল্প উপন্যাস ভ্রমণ-কাহিনী পড়েছো তাতে বার বার কঠিন শব্দ এখানে, ওখানে, সেখানে ঘুরে ফিরে এসেছে এবং তারই ফলে শব্দগুলোর সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় হয়ে গিয়েছে। ইংরেজির বেলাও এই পদ্ধতি প্রযোজ্য।...এবং এই "রেপিড রীডিং" জিনিসটি আরম্ভ করবে শারলক হোমস, আগাথা ক্রিসটি ইত্যাদির ডিটেকটিভ নভেল দিয়ে। সেগুলো এমনই ইন্‌টরেসটিং যে, হেসেখেলে বইয়ের শেষ পাতায় পৌঁছে যাবে। যতক্ষণ অবধি গল্পটা বুঝতে পারছো,ততক্ষণ অভিধানের কোনো প্রয়োজন নেই। এ-সম্বন্ধে আরো অল্পবিস্তর বলার আছে। উপস্থিত ভাষা নিয়ে আমাদের ক্লাইন এর্না'র একটা গল্প মনে এল।...ক্লাইন এর্না বিয়ে করেছে এক ইংরেজকে, কিন্তু হায়, এক বছর যেতে না যেতে তার বর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তারপর তার একটি বাচ্চা হল। কিন্তু হায়, হায়, ছ'দিনের দিন বাচ্চাটি মারা গেল। বেচারীর কী কান্না, কী কান্না। তার মা তাকে অনেক প্রবোধবাক্য শোনানোর পর শেষটায় বললে, "আর গ্যাখ, ক্লাইন এর্না, বাচ্চাটার বাপ তো ইংরেজ। মুখে কথা ফুটতেই সে ইংরেজি বলতো। আমি তো ইংরেজি জানিনে। দিদিমা হয়ে তার এক বর্ণও বুঝতে পারবো না—সেটা কি খুব ভালো হত?"

ক্লাইন এর্না

২

ক্লাইন এর্না গোয়ালঘরের সামনে বসে হোম-টাস্ক লিখছে। এমন সময় তার আদরের গাইটি পাশে এসে দাঁড়িয়ে শুধলো, কি লিখছো, ক্লাইন এর্না?

চুলোয় যাক্। মোটর গাড়ি সম্বন্ধে লিখতে বলছে। আমার মাথায় কিছু আসছে না।

গোগম্ভীর কণ্ঠে গাই বললে, আমি বলে যাই, তুমি লেখো। মোটরগাড়ি অবিশ্বাস্য অদ্ভুত জানোয়ার। এদের বিকট বিকট দুটো দারুণ উজ্জ্বল চোখ থাকে। কিন্তু সে-দুটো শুধু রাতের অন্ধকারেই জ্বলে ওঠে।...এরা যখন রাস্তার উপর দিয়ে হুশ হুশ করে যায় তখন সম্পূর্ণ অচেনার মত একে অন্যের দিকে কোনো খেয়াল না করে চলে যায়। কিংবা দুম করে একে অন্যকে মারে মরণ-ধাক্কা। তখন দুজনাই মারা যায়। আশ্চর্য, এদের কোনো মধ্যপন্থা বা তৃতীয় পন্থা নেই।...এরা নিজেদের

খাবার যোগাড় করতে পারে না। মানুষই এদের জল তেল আরো কি যেন খেতে দেয়। আমার আশ্চর্য লাগে, ওরা মুখ দিয়ে ও অন্য দিক দিয়ে, দু দিক দিয়েই খায় কি প্রকার!…লোকে ভাবে, ওরা খুব তীব্রগতিতে চলতে পারে। আদৌ না। ঐ সেদিন আমার এক বান্ধবী রাস্তা দিয়ে আপন গোয়ালে ফিরছিল। পিছন থেকে, অনেকক্ষণ ধরে ওদেরই একজন কোঁক-কোঁক, কোঁক-কোঁক করে চিৎকার করছিল, কিন্তু এগিয়ে যেতে পারছিল না। অবশেষে আমার বান্ধবী যখন বাঁ-দিকে মোড় নিয়ে তার বেডরুমে পৌঁছে গেল তখন বাবু এগোলেন।…ওরা রাস্তায় যা ফেলে যান সেটা ঘুঁটেকুড়োনি ঘৃণার চোখে দেখে।…শেষ প্রশ্ন ওরা কি মোটেই কোনো বন্ধু-বান্ধব চায় না? সেদিন সন্ধ্যাবেলা ওদেরই একজন রাস্তার পাশের কাঁটার বেড়া ভেঙে আমাদেরই মাঠের মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালেন। ওর সঙ্গী-সাথী মানুষরা ওকে ফেলে চলে গেল। আমি ভাবলুম, আহা বেচারী, একা একা রাত কাটাবে। একটুখানি সঙ্গ দিই। কোনো সাড়া পেলুম না। তখন দেখি ওর চোখ দুটোও জ্বলছে না। পরদিন সকালবেলা এল তার মা। বিরাট দেহ। দড়ি দিয়ে বেঁধে তাকে নিয়ে চললো শহরপানে। আমি যখন তার মা'র সামনে দাঁড়িয়ে—নমস্কার, আসুন তবে, বললুম, তখন তিনি সুপ্রসন্ন কোঁক-কোঁক বলে উত্তর দিলেন। মা-টি মেয়ের চেয়ে ঢের ঢের ভদ্র।

গুরুদেব

প্রমথ চৌধুরীর মত মনীষী যখন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা অনবদ্য ভাষায় লেখেন, তখন তা পড়ে আমরা বুঝতে পারি, রবীন্দ্রনাথের বিপুল ব্যক্তিত্বের গৌরব এবং মহিমা তিনি পরিপূর্ণ ভাবেই উপলব্ধি করেছেন। তাঁর লেখার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাবের গভীরতা, চিন্তার ঐশ্বর্য এবং রবীন্দ্র-জীবনের বৈচিত্র্যের সঙ্গে আমরা নিবিড়ভাবে পরিচিত হতে পারি।

আমার লেখাও সফল হত যদি আমি কবি বা স্রষ্টা হতুম। কবির দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনাই হোক, আর তাঁর কাব্যালোচনাই হোক কিঞ্চিৎ সৃজনী-শক্তি না থাকলে সে-রচনা কবির বিরাট ব্যক্তিত্বের পটভূমিতে প্রক্ষিপ্ত হয়ে শুধু বৈচিত্র্যহীনতার পরিচয়ই দেয়। তাই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু লিখতে আমার বড় সঙ্কোচ বোধ হয়। ভয় হয়, যত ভেবেচিন্তেই লিখি না কেন বিদগ্ধজনেরা পড়ে বলবেন,

দীর্ঘ পাঁচ বৎসর রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষালাভ করেও এই ব্যক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচয় পেল না। এই অভিমত যে নিদারুণ সত্য তা আমি জানি ; তাই স্থির করেছিলুম যে, কয়েক বৎসর রবীন্দ্রনাথকে যে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনে সহজ, সরলভাবে পেয়েছিলুম, সে-কথা একেবারে অপ্রকাশিতই রাখব।

কিন্তু মুশকিল হ'ল এই যে,—কবি-প্রণামের রচনা-সংগ্রাহকগণ ও আমার নিজের দেশ 'শ্রীহট্টে'র অনেকেই জানেন যে, আমি শান্তিনিকেতনে শিক্ষালাভ করেছি। এই সঞ্চয়িতার মধুকর যে আমার লেখা চেয়ে আমাকে পরম সম্মানিত করেছেন, তার একমাত্র কারণ তিনি জানেন যে, আমি রবীন্দ্রনাথের শিষ্য ; তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। কিন্তু আমার দেশবাসী প্রিয়জনকে কি করে বোঝাই যে, রবীন্দ্রনাথের ঘরের দেয়াল, আসবাব তাঁকে আমার চেয়ে ঢের বেশী দেখেছে। আপনারা বলবেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তোমার ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা বাদ দাও, তাঁর কাব্য আলোচনা কর। উত্তরে আমি বিনীতভাবে বলতে চাই—সে তো সহজ কর্ম নয়।...তবে আর কিছু না হোক্, এ আমি নিশ্চয় করে জানি যে, আমার মনোজগৎ রবীন্দ্রনাথের গড়া। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বলুন, দর্শন, কাব্য, ধর্মের ভিতর দিয়ে বহুর মধ্যে একের সন্ধান বলুন ; কালিদাস, শেলি, কীট্‌সের কাব্যের ভিতর দিয়ে বিশ্ব-সাহিত্যের রসাস্বাদই বলুন—আমার মনোময় জগৎ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। জানা-অজানায় গঠিত—আমার চিন্তা, অনুভূতির জগতে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব সব চেয়ে বেশী। জীবনের ক্রমবিকাশ-পথে নানা দিক থেকে রবীন্দ্রকাব্যের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু, সেই কাব্য-সৌন্দর্যের বিশ্লেষণ কতটুকুই বা আমি করতে পারি? তাই এতদিন সে চেষ্টা করিনি। কিন্তু 'দেশে'র ডাকে তো নীরব থাকতে পারলাম না। তাই রবীন্দ্রনাথের জীবিতাবস্থায় আমার অক্ষমতা-নিবন্ধন যা আমি করতে পারিনি, আজ তাঁর জীবনান্তে সেই ব্রত উদ্‌যাপন করতে ব্রতী হয়েছি।

একথা তো ভুলতে পারিনে যে, একদিন তাঁর চরণপ্রান্তে বসে আশীর্বাদ লাভ করেছি, তাঁর অজস্র অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ধন্য হয়েছি—সেই অপরিমেয় স্নেহের ঋণ অপরিশোধ্য। তাই আজ অশ্রুসজল চিত্তে সকলের সঙ্গে কবিগুরুকে আমারও সম্মিলিত প্রণাম নিবেদন করছি।

* * *

১৯২৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দর্শন' পড়তে যাই। বিদ্যালয়ের বিশাল প্রাসাদে পথ ভুলে 'ফনেটিক ইনস্‌টিট্যুটে'র বক্তৃতাগৃহে উপস্থিত হই। বহু ছাত্র-

ছাত্রী ভিড় করে বসে আছে—বক্তৃতা শুরু হবার দেরি নেই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি দেশবাসী কেউ নেই। ভয়ে ভয়ে বসে পড়লুম। প্রোফেসার বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন, "অদ্যকার বক্তৃতা ফনেটিক বিজ্ঞানের অবতরণিকা। নানা ভাষায় নানা দেশের লোকের নানা উচ্চারণ আজ শোনানো হবে।" ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিয়ে দেয়ালে ম্যাজিক লেণ্টর্নের ছবি ফেলা হল।…রবীন্দ্রনাথ!… সঙ্গে সঙ্গে কলের গানে বেজে উঠল সেই পরিচিত কণ্ঠস্বর :

Through ages India has sent her voice—অন্ধকার ঘরে রবীন্দ্রনাথের ঋজুদীর্ঘ মূর্তির আলোকোদ্ভাসিত প্রতিচ্ছবি। কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথের—না তপোবনের ঋষির—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে',—ভারতবর্ষের সেই চিরন্তন বাণী।

আবার আলো জ্বলল। অধ্যাপক বললেন, এমন গলা, ঠিক জায়গায় জোর দিয়ে অর্থ প্রকাশ করার এমন ক্ষমতা শুধু প্রাচ্যেই সম্ভব। পূর্বদেশে মানুষ এখনো "বট"কে (শব্দব্রহ্ম) বিশ্বাস করে। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বরে তারই পূর্ণতম অভিব্যক্তি। কণ্ঠস্বরের এমন মাধুর্য, বাক্যের এমন ওজস্বিতা পশ্চিমে কখনও হয় না।

গর্বে আমার বুক ভরে উঠল। ডাইনে তাকালুম, বাঁয়ে তাকালুম। ভাবটা এই, "আলবৎ, ঠিক কথা, ভারতবাসীই শুধু এমন ধ্বনির ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করতে পারে।" ক্লাসের বহু ছাত্রছাত্রী সে সন্ধ্যায় আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আমি মাথা উঁচু করে বসেছিলুম। আমার গুরুদেব ভারতবর্ষের, আমিও ভারতবাসী।

* * *

তার চেয়েও আশ্চর্য হয়েছিলুম ১৯২৭ সালে—জর্মনী যাওয়ার দুই বৎসর পূর্বে—কাবুলে।

ইউরোপ যাওয়ার জন্য অর্থ-সংস্থান করতে গিয়েছিলুম কাবুলে। ফরাসী ও ফারসী জানি বলে অনায়াসে চাকরি পেয়েছিলুম। তখনকার দিনে বিশ্বভারতীই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান যেখানে ফরাসী, ফারসী, জর্মন একসঙ্গে শেখা যেত।

দু'শো টাকা মাইনেতে গিয়েছিলুম; কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কাবুল সরকার আবিষ্কার করলেন যে আমি জর্মনও জানি। মাইনে ধাঁ করে একশো টাকা বেড়ে গেল। পাঞ্জাবী ভায়ারা ক্ষুব্ধ হয়ে ওজীরে মওয়ারীফের (শিক্ষামন্ত্রী) কাছে ডেপুটেশন নিয়ে ধরণা দিয়ে বললেন, সৈয়দ মুজতবা এক 'অনরেকগনাইজড্' বিদ্যালয়ের ডিপ্লোমাধারী। আমরা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ; এম. এ। আমাদের মাইনে শ-দেড়শো; তার মাইনে তিনশো, এ অন্যায়।

শিক্ষামন্ত্রীর সেক্রেটারী ছিলেন আমার বন্ধু। তিনি আমার কাছে ঘটনাটা বর্ণনা করেছিলেন ফারসীতে।*—"জানো, বন্ধু, শিক্ষামন্ত্রী তখন কি বললেন?" খানিকক্ষণ চুপ করে জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বললেন—"বিলকুল ঠিক! কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, তোমাদের ডিগ্রীতে দস্তখত রয়েছে পাঞ্জাবের লাটসাহেবের। তাঁকে আমরা চিনি না, দুনিয়াতে বিস্তর লাটবেলাট আছেন—আমাদের ক্ষুদ্র আফগানিস্তানেও গোটাপাঁচেক লাট আছেন। কিন্তু মুজতবা আলীর সনদে আছে রবীন্দ্রনাথের দস্তখত,—সেই রবীন্দ্রনাথ যিনি সমগ্র প্রাচ্যের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।"

* * *

এসব অভিজ্ঞতা যে কোনোদিন হবে সে তো স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, যখন ১৯২১ সালে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাই। বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগ তখনও খোলা হয়নি। ছ'মাস পরে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পৌরোহিত্যে তার ভিত্তি-পত্তন হয়। বিশ্বভারতীতে তখন জনদশেক ছাত্রছাত্রী ছিলেন; তাঁরা সবাই শান্তিনিকেতন স্কুল থেকেই কলেজে ঢুকেছেন—শ্রীহট্টবাসীরূপে আমার গর্ব এই যে বিশ্বভারতীর কলেজ বিভাগে আমিই প্রথম বাইরের ছাত্র।†

প্রথম সাক্ষাতে গুরুদেব জিজ্ঞাসা করলেন, কি পড়তে চাও?

আমি বললুম, তা তো ঠিক জানিনে তবে কোনও একটা জিনিস খুব ভাল করে শিখতে চাই।

তিনি বললেন, নানা জিনিস শিখতে আপত্তি কি?

আমি বললুম, মনকে চারদিকে ছড়িয়ে দিলে কোনও জিনিস বোধ হয় ভাল করে শেখা যায় না।

গুরুদেব আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, একথা কে বলেছে?

আমার বয়স তখন সতেরো,—থতমত খেয়ে বললুম, কনান ডয়েল।

গুরুদেব বললেন, ইংরেজের পক্ষে এ বলা আশ্চর্য নয়।

কাজেই ঠিক করলুম, অনেক কিছু শিখতে হবে। সম্ভব অসম্ভব বহু ব্যাপারে ঝাঁপিয়ে পড়লুম। গুরুদেবের সঙ্গে তখন সাক্ষাৎ হত ইংরেজি ও বাংলা ক্লাসে। তিনি শেলি, কীটস আর 'বলাকা' পড়াতেন।

---

* ("থী দানীদ আগাজান, ওজীরে মওয়ারিফ, চি গুফতন্দ")

† রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি ১৯১৯ ইংএ শ্রীহট্ট শহরে। পূজ্যপাদ ৺গোবিন্দনারায়ণ সিংহের আমন্ত্রণে তিনি শ্রীহট্টের আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন।

তারপর ১৯২২-এর কাছাকাছি শান্তিনিকেতনে টলস্টয়ের ভাবধারা হঠাৎ ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করল। আমরা বললুম, শান্তিনিকেতনে আমরা যে জীবনযাপন করছি সেটা বুর্জুয়া জীবন, বিলাসের জীবন। তাতে সরলতা নেই, সাম্য নেই, স্থৈর্য নেই। আমাদের উচিত সেই সহজ সরল জীবনকে ফিরিয়ে আনা, মাটির টানে প্রকৃতির কোলে ফিরে গিয়ে ক্ষেত করা, ফসল ফলানো। আমাদের মতবাদ যখন প্রবল হয়ে বিদ্রোহের আকার ধরেছে, তখন একদিন গুরুদেব আমাদেরে ডেকে পাঠালেন। আমাদের মতবাদের বিরুদ্ধে তিনি তর্ক করলেন। নাস্তানাবুদ হয়ে আমরা আধঘণ্টার ভেতর চুপচাপ। সবশেষে তিনি বললেন, আমি জানি একতারা থেকে যে সুর বেরোয় তাতে সরলতা আছে কিন্তু সে সরলতা একঘেঁয়েমির সরলতা। বীণা বাজানো ঢের শক্ত। বীণাযন্ত্রের তার অনেক বেশী, তাতে জটিলতাও অনেক বেশী। বাজাতে না জানলে বীণা থেকে বিকট শব্দ বেরোয় কিন্তু যদি বীণাটাকে আয়ত্ত করতে পার তবে বহুর মধ্যে যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি হয় (হারমনি ইন্ মল্‌টিপ্লিসিটি) তা একতারার একঘেঁয়েমির সরলতার (মনটনস্ সিম্‌প্লিসিটি) চেয়ে ঢের বেশী উপভোগ্য। আমাদের সভ্যতা বীণার মত, কিন্তু আমরা এখনও ঠিকমত বাজাতে শিখিনি। তাই বলে সে কি বীণার দোষ, আর বলতে হবে যে একতারাটাই সব চেয়ে ভালো বাদ্য যন্ত্র।

আমার মনে হয় এইটেই ছিল রবীন্দ্রনাথের মূল সুর। চিরজীবন তিনি বহুর ভেতর একের সন্ধান করেছিলেন। তাঁর সে সাধনা আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। সৌভাগ্যক্রমে প্রায় এক বৎসর শান্তিনিকেতনে আমি ছিলুম এক ঘরের নীচের তলায়। সেখান থেকে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালেই দেখতে পেতুম, গুরুদেব তাঁর জানালার পাশে বসে লেখাপড়া করছেন। সকালে চারটার সময় দুঘণ্টা উপাসনা করতেন। তারপর ছটার সময় স্কুলের ছেলেদের মত লেখাপড়া করতেন। সাতটা আটটা, নটা, তারপর দশ মিনিটের ফাঁকে জলখাবার। আবার কাজ—দশটা, এগারোটা, বারোটা। তারপর খেয়েদেয়ে আধঘণ্টা বিশ্রাম। আবার কাজ—লেখাপড়া; একটা, দুটো, তিনটে, চারটা, পাঁচটা—কাজ, কাজ, কাজ। পাঁচটা থেকে সাতটা ছেলেমেয়েদের গান শেখাতেন—বা দিনুবাবুর আসরে বসে গান শুনতেন, অথবা গল্প-সল্প করতেন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে আবার লেখাপড়া, মাঝে মাঝে গুন গুন করে গান—আটটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত। কী অমানুষিক কাজ করার ক্ষমতা! আর কী অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা!

আমি তখন নিতান্তই তরুণ। আমার থেকে যাঁরা প্রবীণ এবং জ্ঞানী তাঁরা

গুরুদেবের জীবনের অনেক ইতিহাস জানেন। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের নানা সৃষ্টির নানা আলোচনা করবেন। তাঁর সৃষ্টির অনেক কিছু অমর হয়ে থাকবে, অনেক কিছু লোপ পাবে।

কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, চিরন্তন হয়ে থাকবে রবীন্দ্রনাথের গান। জর্মনীর 'লীডর' গান য়ুরোপের গীতিকাব্যের মধ্যে সব চেয়ে সমৃদ্ধ একথা বললে অত্যুক্তি করা হয় না। এমন সব গান 'লীডরে' আছে যার কথা দিয়েছেন গ্যেটের মত কবি আর সুর দিয়েছেন বেটোফেনের মত সুনিপুণ সুর-শিল্পী। আমার মনে হয়, তার চাইতেও শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের গান। কারণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল একাধারে গীতিকার এবং সুরস্রষ্টার প্রতিভা। রবীন্দ্রনাথের গান বাঙালীর কণ্ঠে চিরকাল বেঁচে থাকবে। কেউ যদি বলেন, না, চিরস্থায়ী তা হবে না,—আমি তর্ক করব না। কারণ আর যা নিয়ে চলুক ; গান নিয়ে, গীতি-কবিতা নিয়ে তর্ক চলে না। গানের আবেদন সরাসরি একেবারে মানুষের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছায়। গান হৃদয়কে দোলা দেয়, অন্তরে জাগায় অনির্বচনীয় অনুভূতি ;—যুক্তিতর্কের অপেক্ষা রাখে না।

প্রসঙ্গক্রমে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বললাম। সে-বিপুল সাহিত্যের খানিকটা বুঝেছি, বেশীর ভাগই বুঝি নি। কিন্তু, তাঁর সাহিত্যালোচনার দিন আজ নয়। আজ শুধু আমার স্নেহপ্রবণ গুরুদেবের সংবেদনশীল অন্তরটির পরিচয় দেবার জন্যেই আরো কয়েকটি কথা বলে এ প্রসঙ্গ শেষ করব। কবি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন, ধরা-ছোঁয়ার অতীত ; সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। কিন্তু আমাদের কাছে তিনি যে ছিলেন স্নেহাসক্ত গুরু, নিতান্তই মাটির মানুষ। কিন্তু মানুষ রবীন্দ্রনাথের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করাও যে দুঃসাধ্য। হিমালয়ের পাদমূলে বসে বিচিত্র পুষ্প চয়নকালেও ক্ষণে ক্ষণে গৌরী-শিখরের বিরাট, বিশাল, গম্ভীর মহিমা হৃদয়কে নির্বাক বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

শান্তিনিকেতন লাইব্রেরীতে অবসর সময়ে ক্যাটালগ তৈরি করতুম। তখন প্রতিদিন দেখতুম পাঠান্তে নূতন পুরাতন বই তিনি লাইব্রেরীতে ফেরত পাঠাতেন। রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, কাব্য, কত বলব। এমন বিষয় নেই যাতে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ছিল না।

এদিক দিয়ে তিনি ছিলেন আজীবন জ্ঞান-সাধক। কিন্তু তাই বলে জীবনকে সকল দিক থেকে বঞ্চিত করে কঠোর জ্ঞানমার্গ তিনি অবলম্বন করেননি। তিনি তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতায় বলেছেন—"ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করি যোগাসন সে

নহে আমার”—পৃথিবীর রূপ-রস-গন্ধ উপভোগের আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন কঠোর সংযমী। এক হিসেবে তিনি ছিলেন প্রকৃত তপস্বী। তপস্যা ;—সে তো শক্তি সঞ্চয়ের জন্যেই। তাঁর একটি কবিতায় আছে—

“জানি জানি এ তপস্যা দীর্ঘ রাত্রি
করিছে সন্ধান,
চঞ্চলের মৃত্যুস্রোতে আপন উন্মত্ত অবসান।”

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ জীবনে অতীন্দ্রিয় সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। তাঁর ঋষি-দৃষ্টির সমক্ষে সত্যের স্বরূপটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল পরিপূর্ণ মহিমায়। তারি পরিচয় তাঁর অজস্র গানে, কবিতায়, ‘ধর্ম’ এবং ‘শান্তিনিকেতনে’র নিবন্ধগুলোতে। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান শুধু পুঁথি-পড়া জ্ঞান নয়, তা সম্পূর্ণই অনুভূতির।

‘মহুয়া’ প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পরে রবীন্দ্রনাথ নিজে চয়ন করে ‘সঞ্চয়িতা’ প্রকাশ করেন। তাতে ‘মহুয়া’র অতি অল্প কবিতা স্থান পায়। তখন রব উঠেছে ‘মহুয়া’তে কবির সৃজনী-শক্তির অপ্রাচুর্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। ভয় হল, রবীন্দ্রনাথও বুঝি তাই বিশ্বাস করে ‘মহুয়া’র যথেষ্ট কবিতা ‘সঞ্চয়িতা’য় স্থান দেন নি। কলকাতায় থাকতুম; শান্তিনিকেতনে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি ‘সঞ্চয়িতা’তে ‘মহুয়া’র আরো কবিতা দিলেন না কেন? আমাকে যদি ‘সঞ্চয়িতা’ সম্পাদন করার ভার দেওয়া হত, আমি তাহলে ‘মহুয়া’র মলাট ছিঁড়ে ‘সঞ্চয়িতা’ নাম দিয়ে প্রকাশ করতুম। বলতুম, এতেই সব চাইতে ভালো কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

গুরুদেব হেসে বললেন, ভাগ্যিস তোমাকে ‘সঞ্চয়িতা’ তৈরি করবার ভার দেওয়া হয়নি। আমি ‘মহুয়া’র কবিতা ‘সঞ্চয়িতা’তে যে বেশী পরিমাণে দিইনি, তার কারণ এই যে ‘মহুয়া’র কাব্য-সৌন্দর্য সম্বন্ধে আমি সন্দিহান। আসলে ‘মহুয়া’র কবিতাগুলি মাত্র সেদিনের লেখা। কবিতার ভালোমন্দ বিচার করার জন্য যে দূরত্বের প্রয়োজন সেটা ‘মহুয়া’র বেলায় এখনও যথেষ্ট হয়নি।

ঠিক সেই কারণেই, রবীন্দ্রনাথের কবিতা আলোচনা করার দিন বোধ হয় এখনও আসেনি। যে পৃথিবীকে তিনি দীর্ঘকাল ধরে অতি নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলেন সেই পৃথিবী ছেড়ে তিনি মাত্র সেদিন চলে গেছেন। শোকে বাংলাদেশ মুহ্যমান। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য-সমালোচনার জন্য যে পরিমাণ সময়ের ব্যবধান প্রয়োজন তা আমরা এখনও পাইনি।

১৯৩৯ সালে গুরুদেবের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় শান্তিনিকেতনে।

তাকিয়ে বললেন, লোকটি যে বড় চেনা-চেনা ঠেকছে। তুই নাকি বরোদার মহারাজা হয়ে গেছিস?

আমি আপত্তি জানালুম না। তর্কে তাঁর কাছে বহুবার নাজেহাল হয়েছি। আপত্তি জানালে তিনি প্রমাণ করে ছাড়তেন, আমিই বরোদার মহারাজা, নয়তো কিছু একটা জাঁদরেল গোছের।

নিজেই বললেন, না না। মহারাজা নয়, দেওয়ান-টেওয়ান কিছু একটা।

আমি তখনও চুপ। 'মহারাজা' দিয়ে যখন আরম্ভ করেছেন, কোথায় থামবেন তিনিই জানেন।

তারপর বললেন, কি রকম আছিস? খাওয়া-দাওয়া?

আমি বললুম, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

আরে না না, আজকালকার দিনে খাওয়া-দাওয়া যোগাড় করা সহজ কর্ম নয়। তোকে আমি একটা উপদেশ দি'। ওই যে দেখতে পাচ্ছিস 'টাটা ভবন' তাতে একটি লোক আছে, তার নাম পঞ্চা; লোকটি রাঁধে ভাল। তার সঙ্গে তুই যদি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারিস তবে এখানে তোর আহারের দুর্ভাবনা থাকবে না।

আমি তাঁকে আমার খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হবার জন্যে অনুরোধ জানালাম।

তখন বললেন, তুই এখনও বরোদা কলেজে ধর্মশাস্ত্র পড়াস না?

আমি জানতুম, তিনি ঠিক জানেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রেরা কে কি করে। তাই মহারাজা বা দেওয়ান আখ্যায় আপত্তি জানাইনি।

তারপর বললেন, জানিস, তোদের যখন রাজা মহারাজারা ডেকে নিয়ে সম্মান দেখায় তখন আমার মনে কি গর্ব হয়, আমার কী আনন্দ হয়। আমার ছেলেরা দেশে-বিদেশে কৃতী হয়েছে।

তারপর খানিকক্ষণ আপন মনে কি ভেবে বললেন, কিন্তু জানিস, আমার মনে দুঃখও হয়। তোদের আমি গড়ে তুলেছি, এখন আমার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য তোদের প্রয়োজন। গোখলে, শুক্ল, তোরা সব এখানে থেকে আমাকে সাহায্য করবি। কিন্তু তোদের আনবার সামর্থ্য আমার কোথায়?

তা যাক্। বলতে পারিস সেই মহাপুরুষ কবে আসছেন কাঁচি হাতে করে?

আমি অবাক। মহাপুরুষ তো আসেন ভগবানের বাণী নিয়ে, অথবা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম নিয়ে। কাঁচি হাতে করে?

হাঁ, হাঁ কাঁচি নিয়ে। সেই কাঁচি নিয়ে সামনের দাড়ি ছেঁটে দেবেন, পেছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুরমার করে একাকার করে দেবেন। হিন্দু-মুসলমান আর কতদিন এরকম আলাদা হয়ে থাকবে।

তারপর আধঘণ্টা ধরে অনেক কিছু বললেন হিন্দু-মুসলমানের কলহ্ নিয়ে। তাঁকে যে এই কলহ কত বেদনা দিত সে আমি জানি। আমাকে যে বলতেন তার কারণ বোধ হয় আমি তাঁর মুসলমান ছাত্র। বোধ হয় মনে করতেন আমি তাঁকে ঠিক বুঝতে পারব।

গুরুদেব তখন বেশী কথা বললে হাঁপিয়ে উঠতেন। আমি তাই তাঁর কথা বন্ধ করার সুযোগ খুঁজছিলুম। তিনিই হঠাৎ লক্ষ্য করলেন, আমার জামার পকেটে ছোট্ট ক্যামেরা। বললেন, ছবি তোলার মৎলব নিয়ে এসেছিস বুঝি। তোল, তোল। ওরে সুধাকান্ত, পর্দাগুলো সরিয়ে দে তো। কি রকম বসব বল্।

আমি বললুম, আপনি ব্যস্ত হবেন না ; আমি ঠিক তুলে নেব।

তোর বোধ হয় খুব দামী ক্যামেরা, জার্মানী থেকে নিয়ে এসেছিস, সব কায়দায় ছবি তোলা যায়। অন্যেরা বড় জ্বালাতন করে ; এরকম করে বসুন, ওরকম করে বসুন। কত কী !

ছবি তোলা শেষ হলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বললেন, কি রে, কিছু বলবি নাকি ?

আমি বললুম, একটা কথা বলতে চাই যদি কিছু মনে না করেন।

তিনি ক্লাসে যে-রকম উৎসাহ দিতেন ঠিক সেই রকম ভাবে বললেন, বল, বল, ভয় কি ?

আমি বললুম, এই যে আপনি বললেন, আপনার সামর্থ্য নেই আমাদের এখানে নিয়ে আসবার, সেই সম্পর্কে আমি শুধু আমার নিজের তরফ থেকে বলছি যে, বিশ্বভারতীর সেবার জন্য যদি আমাকে প্রয়োজন হয় তবে ডাকলেই আসব। যা দেবেন হাত পেতে নেব।

গুরুদেব বললেন, সে কি আমি জানিনে রে, ভালো করেই জানি। তাই তো তোদের কাছে আমার সামর্থ্যহীনতার কথা স্বীকার করতে সঙ্কোচ হয় না।

মনে হল গুরুদেব খুশী হয়েছেন।

গুরুদেব আজ নেই।

কিন্তু সেই হারানো দিনের স্মৃতি আজো আমার মনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

রবির বিশ্বরূপ

রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করার শক্তি আমাদের নেই। গীতাতে উক্ত তিন মার্গেই একসঙ্গে একই মানুষ চলেছে এর উদাহরণ বিরল। তিনি জ্ঞানী ছিলেন; শব্দতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তিনি কর্মী ছিলেন; গ্রামোন্নয়ন, কৃষির ঔৎকর্ষ্য, সমবায় সমিতি, শ্রীনিকেতন বিদ্যালয় তিনি নির্মাণ করেছিলেন। তিনি রসের সাধক ছিলেন—এটাকে ভক্তিমার্গ বলা যেতে পারে—তিনি তাঁর ভগবানকে প্রধানতঃ রসস্বরূপেই আরাধনা করেছিলেন এবং ইহজগতের প্রিয়া, প্রকৃতিকে সেই রসস্বরূপেই কাব্যে, নাট্যে, গানে প্রকাশ করেছেন।

অথচ কোনো স্থলেই তিনি খণ্ডিত বা বিচ্ছিন্ন নন। অর্থাৎ প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শব্দ সঞ্চয় করে ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে পুস্তিকা লিখছেন তখন তাঁর ভাষা কঠিন শব্দতাত্ত্বিকের নয়, তাঁর ভাষা সরস কবির মত। এবং সেখানে তিনি কর্মযোগীর ন্যায় এ উপদেশও দিচ্ছেন, কি করে সে ভাষাতত্ত্বের পুস্তক কাজে লাগাতে হয়। পক্ষান্তরে তিনি যখন বর্ষা, বসন্তের গান লিখছেন তখন উদ্ভিদবিদ্যায় অজ্ঞ সাধারণ কবির মত একই ঋতুতে কদম্ব আম্রমঞ্জরী ফোটান না। বস্তুতঃ আমাদের দেশে যে শত শত দিশী বিদেশী ফুল ফোটে, কোন্ জায়গায় কি সার দিলে ভালো করে ফোটে, এসব খবরও রাখতেন। বিদেশী ফুলের নামকরণ করতেন, একাধিক নাম-না-জানা দিশী ফুলেরও নামকরণ করেছেন। কথিত আছে—শহরাগত এক নবীন শিক্ষক অত্যন্ত সাধারণ জাম না গাব গাছ চিনতে পারেননি বলে কবি তাঁর হাতে শান্তিনিকেতনের ছেলেমেয়েদের সঁপে দিতে নারাজ হয়েছিলেন। আবার হাল চালানো, গাছ পোঁতার মত নীরস গদ্যময় ব্যাপার কি হতে পারে?—শ্রীনিকেতনে যাঁরাই হলকর্ষণ বৃক্ষ-রোপণ উৎসব দেখেছেন তাঁরাই জানেন কবি কি ভাবে ঐ দুই সাধারণ কর্মকে সৌন্দর্যের পর্যায়ে তুলে নিয়েছেন। অনেকেরই বিশ্বাস—

“এস এস হে তৃষ্ণার জল”

বর্ষার গান। অন্তত সেই ঋতুতেই গাওয়া হয়। তা হলে প্রশ্ন উঠবে ‘ভেদ করি[১] কঠিনের ক্রূর বক্ষতল’ ‘গূঢ় অন্ধকার হতে’ কে আসছে? ‘মরুদৈত্য কোন্ মায়াবলে তোমারে করেছে বন্দী পাষাণশৃঙ্খলে’—কে সে?

---

(১) আমরা ‘করিই’ শুনেছি। গীতবিতানে দেখছি ‘করো’ আছে। অর্থের অবশ্য কোনো পার্থক্য হয় না।

আসলে এটি রচিত হয় শান্তিনিকেতনে প্রথম টিউব-উয়েল খননের সময়। মাটির নিচে যে জল বন্দী হয়ে আছে তাকে বেরিয়ে আসবার জন্য কবি কর্মযোগের প্রতীক কলকব্জার বন্দনা-গীতি ধরেছেন।

সব সময়েই তিনটি জিনিস যে একই আধারে থাকবে এমন কোনো ধরা-বাঁধা নেই কিন্তু মোটামুটি বলা যেতে পারে, তিনি দুই, আড়াই, কিংবা তিন ডাইমেনশনেই চলুন, আমরা চলতে জানি শুধু এক ডাইমেনশনে এবং তাই তাঁর সমগ্র রূপ আমাদের পক্ষে ধরা কঠিন, প্রায় অসম্ভব। (তিরোধানের পূর্বে তিনি এক চতুর্থ ডাইমেনশনে চলে যান এবং সেটি এমনই রহস্যাবৃত যে, উপস্থিত সেটি উল্লেখ করবো না ; কারণ ঐটে ভালো করে বোঝবার জন্য আমি এখনো হাতড়ে হাতড়ে এগোচ্ছি)।

সে অসম্ভব কি কখনো সম্ভব হবে, এবং যদি হয় তবে কি প্রকারে হবে ?

এটা বোঝানো যায় শুধু তুলনা দিয়ে।

চিত্রকর বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়কে গুণী রসিকেরা চেনেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তি বাল্যবয়স থেকেই ক্ষীণ। তিনি চার হাত দূরের থেকেই কোন জিনিস ভালো করে দেখতে পেতেন না।

যৌবনে তিনি একখানি বিরাট দেয়াল-ছবি বা ফ্রেস্কো আঁকতে আরম্ভ করেন। বড় বড় চিত্রকররাও সম্পূর্ণ ফ্রেস্কোর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখার জন্য বার বার পিছনে হটে ছবিটাকে সমগ্ররূপে দেখে নেন। আমরা, দর্শকরাও ছবি শেষ হওয়ার পর যখন সেটি দেখি তখন দূরের থেকে তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখি—তখন খুঁটিনাটি, সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখতে পাইনে—পরে কাছে গিয়ে খুঁটিনাটি দেখি—তখন আর তার পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখতে পাইনে।

পূর্বেই বলেছি, বিনোদবিহারী দূরের থেকে কিছুই দেখতে পান না। তাই তিনি অনুমানের উপর নির্ভর করে একদিকে ছবি আঁকা আরম্ভ করে অন্য প্রান্তে এসে শেষ করতেন, কিংবা থাবলা থাবলা করে যেখানে খুশী খানিকটে এঁকে নিতেন। পরে দেখা যেত পার্সপেক্‌টিভ না দেখতে পেয়েও বিনোদবিহারীর বিরাট ফ্রেস্কোর এ-কোণের হাতী ও-কোণের প্রজাপতির চেয়ে যতখানি বড় হওয়ার কথা ততখানি বড়ই হয়েছে। তিনি অবশ্য কখনো সেটা দেখতে পেতেন না, কারণ যতখানি দূরে এলে আমরা সমগ্র ছবি দেখতে পাই ততখানি দূরে এলে তিনি সব কিছু ধোঁয়াটে দেখতেন।

একদিন তাঁর এক শিষ্য একটি ক্যামেরা নিয়ে এসে উপস্থিত। যতখানি দূরে

দাঁড়ালে পুরো ক্যামেরায় ধরা পড়ে ততখানি দূরে দাঁড়িয়ে সে ক্যামেরায় ঘষা কাচের উপর প্রতিবিম্বিত পুরো ফ্রেস্কোটি সে বিনোদবিহারীকে দেখালে। এই তিনি তাঁর আঁকা পূর্ণাঙ্গ ছবি জীবনে প্রথম দেখতে পেলেন। একসঙ্গে এক কোণের হাতী ও অন্য কোণের প্রজাপতি দেখতে পেলেন, এক চিত্রাংশ অন্য চিত্রাংশের সঙ্গে ঠিক ঠিক যেমনটি তিনি চেয়েছিলেন থাপ খেয়ে আঁকা হয়েছে কিনা দেখতে পেলেন। অবশ্য ঘষা কাচের উপর খুঁটিনাটি কারুকার্য দেখতে পাননি ; কিন্তু সে জিনিসে তাঁর প্রয়োজন ছিল না ; কারণ কাছে দাঁড়িয়ে তো তিনি সেগুলো ভাল করেই দেখতে পান।

এই ক্ষুদ্র রচনায় আমি এত দীর্ঘ একটি উপমা দিলুম কেন ? কারণ বহু বৎসর ধরে ভেবে ভেবেও আমি এযাবৎ খুজে পাইনি কি করে আরো সংক্ষেপে আমার বক্তব্যটা বোঝাতে পারি।

পূর্বেই বলেছি, সমগ্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে হলে আমাদের যতখানি দূরে যেতে হয় ততখানি দূরে গেলে আমাদের সব কিছু ধোঁয়া লাগে। ঘষা কাচ হলে আমরা তাঁর পূর্ণ রূপ দেখতে পেতুম।

তা হলে এই ঘষা কাচ জিনিসটে কি ?

কোনো মহৎ কবির পরবর্তীকালে যখন সবাই তার বিরাট সমগ্র রূপ দেখার চেষ্টা করে নিষ্ফল হচ্ছে তখন হঠাৎ আবির্ভূত হন আরেক মহৎ ব্যক্তি—যিনি কবির সর্বাঙ্গসুন্দর সমগ্র ছবি ঘষা কাচের মত তাঁর বুকে ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর রচনায়, তাঁর কাব্যে তিনি তখন কবিকে এমনভাবে এঁকে দেন যে আমরা অক্লেশে তাঁর পূর্ণ ছবিটি দেখতে পাই। শক্তিমান জন দ্বারা কোনো দুরূহ কার্য সমাধিত হওয়ার পর সাধারণের পক্ষে তা অতি সহজ হয়ে দাঁড়ায়। তাই কালিদাস বলেছেন,

'মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ'

'কঠিন মণিকে হীরক দ্বারা বিদ্ধ করিলে যেমন সেই ছিদ্র দিয়া অনায়াসে ঐ মণির মধ্যে সূত্রের প্রবেশ সম্ভব।'

কালিদাস সুবাদেই বলি, এই এ-যুগের আমাদের রবীন্দ্রনাথই তাঁর যে সর্বাঙ্গসুন্দর ছবি এঁকেছেন, ভারতীয় সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর যে বিরাট কলেবর আমাদের দেখিয়েছেন, সে তো অন্য কেউ ইতিপূর্বে করে উঠতে পারেননি।

পৃথিবীর ইতিহাসে এ যোগাযোগ বিরল নয়। এ-বিষয়ে সর্বাপেক্ষা ভাগ্যবান

জর্মন সাহিত্য। গ্যোটের পঞ্চমুখে পঞ্চতন্ত্র কথা একই সঙ্গে শোনবার ক্ষমতা অর্জন করার জন্য জর্মনিকে বহুকাল অপেক্ষা করতে হয়নি। তাদের সৌভাগ্য, অংশত গ্যোটেরও সৌভাগ্য যে, তাঁরই জীবদ্দশায় হাইনের মত কবি জন্মগ্রহণ করেন। দুজনাতে কয়েক মিনিটের তরে দেখাও হয়েছিল—মাত্র একবার। সে অভিজ্ঞতা কারোরই পক্ষে সুখদা হয়নি। কিন্তু পরবর্তী যুগে হাইনে যখন ঘষা কাচের মত তাঁর বুকের উপর গ্যোটের পূর্ণ ছবি প্রতিবিম্বিত করলেন তখন জর্মন মাত্রই গ্যোটের বিরাট ব্যক্তিত্ব অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারলো।

রবীন্দ্রনাথকে সে-ভাবে দেখাবার মত মনীষী এখনো এ জগতে আসেননি।

প্রার্থনা করি, আমাদের জীবদ্দশায়ই তিনি আসেন। বড় বাসনা ছিল, মৃত্যুর পূর্ব তাঁর বিশ্বরূপটি দেখে যাই॥

ইয়োরোপ ও রবীন্দ্রনাথ

ইয়োরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসীর সঙ্গে যাঁরাই অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন তাঁরাই হৃদয়ঙ্গম করেছেন যে, ইয়োরোপবাসী রবীন্দ্রনাথকে চেনে কত অল্পই। অথচ আমরা সকলেই জানি যে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি যখন প্রথম বিলাতে প্রকাশিত হয় তখন তিনি সে দেশে কী অদ্ভুত সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তার কয়েক বৎসর পর যখন কবি কন্টিনেণ্ট ভ্রমণ করেন তখন তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য কী অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে রুত লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর চতুর্দিকে সমবেত হয়েছে। এবং সর্বশেষ কথা এ জানি যে, ক্রমে ইয়োরোপে তাঁর খ্যাতি ম্লান হতে থাকে, এমন কি একাধিক সুপরিচিত সমালোচককে এ-কথাও বলতে শোনা গিয়েছে, তাঁকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল কোন্ স্থূল বুদ্ধিতে এবং যাঁরা টমসনের রবীন্দ্রজীবনী মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরাও হতাশ হলেন এই দেখে যে তিনি পর্যন্ত কবির কাব্যরসে আদৌ নিমজ্জিত হতে পারেননি, অথচ তিনি যে খানিকটা বাঙলা ভাষা জানতেন সে-কথাও সত্য। এ বইখানা রবীন্দ্রনাথকেও কিঞ্চিৎ বিক্ষুব্ধ করেছিল এবং বোধ হয় তার প্রধান কারণ তিনিও হতাশ হলেন এই ভেবে যে, টমসনই যখন তাঁর কাব্যরস আস্বাদন করতে পারলেন না তখন ইয়োরোপের সাধারণ পাঠক করবে কি প্রকারে?

রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি গীতাঞ্জলি নিয়ে যখন ইংরেজ কবিগণ মত্ত তখন এ-দেশে আমরা আশ্চর্য হয়েছি যে এর ভিতর ইংরেজ কি পাচ্ছে যে তার এত উচ্ছ্বসিত

প্রশংসা করছে। গীতাঞ্জলির গান বাঙলায় গাওয়া হয়—ইংরেজিতে তা নেই—বাঙলায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে এ গানগুলি—ইংরিজিতে যেন চুম্বক, এবং বাঙলা কবিতারূপে এ গানগুলির যে গীতিরস পাই (সুর বাদ দিয়েও) ইংরেজিতে তা কই! মনকে তখন এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছি যে হয়তো ইংরেজ পাঠক ইংরেজি গীতাঞ্জলিতে তার মাতৃভাষায় এমন এক ইংরেজি গীতিরস পায় যেটা আমাদের অনভ্যস্ত কান ধরতে পারে না।

হংস যেমন মানসযাত্রী তেমনি সারা দিবস রাত্রি
একটি নমস্কারে প্রভু, একটি নমস্কারে
সমস্ত প্রাণ উড়ে চলুক মহামরণপারে।

এটিকে কবিতারূপে পড়ে আমরা যে গীতিরস পাই,

Like a flock of homesick cranes flying night & day back to their mountain nests, let all my life take, its voyage to its eternal home in one salutation to Thee :

পড়ে তো সে-রস পাইনে। তখন মনকে বুঝিয়েছি যে হয়তো এই ইংরেজি অনুবাদে শব্দগুলি এমনভাবে চয়ন ও সাজানো হয়েছে যে ইংরেজ তার ভিতর আপন গীতিরস পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে।

গীতাঞ্জলির ফরাসী জর্মন এবং অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ ইংরেজি অনুবাদ থেকে। সে সব অনুবাদে মূলের রস আরো পরিশুষ্ক হওয়ার কথা।

রসের দিকের কিছুটা বাদ দিয়ে যখন ভাবের দিকটা দেখি তখন বরঞ্চ খানিকটা বুঝতে পারি, ইংরেজি এবং অংশত ফরাসী জর্মন তথা অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার গীতাঞ্জলি কেন গুণীজনকে মুগ্ধ করেছিল।

প্রথমত রবীন্দ্রনাথ তাঁর ইংরেজি অনুবাদে ব্যবহার করেছেন কিঞ্চিৎ প্রাচীন ইংরেজি। সে ভাষা কিছুটা ইংরেজি বাইবেলের ভাষা। এ দেশের তুলনা নিলে বলবো, যে বাঙালী বৈষ্ণব ভক্ত বিদ্যাপতি পড়ে আনন্দ পান তিনি ভানু সিংহের পদাবলীর ভাষা পড়েই মুগ্ধ হবেন, তার গভীরে অতখানি প্রবেশ করবেন না—বিশেষতঃ সে যদি অবাঙালী হয় এবং বৈষ্ণব না হয়ে ম্লেচ্ছ-যবন হয়।

দ্বিতীয়তঃ গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রভু-সখা-প্রিয়কে যে রূপ দিয়েছেন তার সঙ্গে ইংরেজ কিছুটা পরিচিত। বাইবেলের 'সং অব সংস' (সং অব সলোমোন) এবং 'সাম্‌স' গীতির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁরা মিলটি অনায়াসেই দেখতে পাবেন। পার্থক্য শুধু এই যে 'সং অব সলোমনে' প্রেমের দৈহিক দিকটা

অনেকখানি প্রাধান্য পেয়েছে—গীতাঞ্জলিতে তা নয়—এবং সাম্‌স্‌ গীতিতে ভগবানের প্রিয় স্বরূপ কম, তিনি সেখানে দয়াল প্রভু, তিনি সর্বশক্তিমান কর্তা, তিনি ইচ্ছে করলে এ দাসকে তাঁর করুণা থেকে বঞ্চিতও করতে পারেন। এর সঙ্গে যোগ দেওয়া যেতে পারে সান্ খোয়ান দে লা ক্রুসের ভগবদ প্রেমের কাব্য। এর মিল 'সং অব সংসের' সঙ্গে—কিঞ্চিৎ কায়িক প্রেম। যে ইয়েটস রবীন্দ্রনাথকে ইয়োরোপের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রপাত করে দিয়েছিলেন তিনি সান্ খোয়ানের ভক্ত ছিলেন এবং তাঁর রচনাতে এঁর প্রচুর উদ্ধৃতি আছে। কিছুটা এই কারণেও ইয়েটস এবং তাঁর সম্প্রদায়ের পক্ষে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা সহজ হয়েছিল।

তৃতীয়তঃ গীতাঞ্জলির প্রভু-সখা-প্রিয়া কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা ধর্মের ভগবান নহেন। ইংলণ্ডে এরকম অনেক ভাবুক আছেন যাঁরা খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন, এবং তাই সম্প্রদায়মুক্ত চিত্তে ঈশ্বরের কাছে আসতে চান। ওদিকে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু (এখানে ব্রাহ্ম হিন্দুর পার্থক্যের কথা উঠছে না—বিদেশীর কাছে এ-দেশের ব্রাহ্মণ মাত্রই যে হিন্দু সে তারা ধরে নেয়) হয়েও যে ব্রহ্মকে তাঁদের সামনে কাব্যে রসস্বরূপ প্রকাশ তা দেখে তাঁদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। এইসব সংস্কারমুক্ত ইংরেজ দূর বিদেশীর আরাধনার ধন আপন সাধনার ধনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে—দুইই এক ভগবান। তারা আশ্বস্ত হল, তারা একা নয়। খৃষ্টধর্মে আস্থা হারিয়েও তারা দেখে ধর্ম তাদের ছাড়েনি।

অনেকটা এই সব কারণেই 'ডাকঘর' তাই জনপ্রিয় হয়েছিল।

তাই আমার মনে হয়, ইংরেজ রবীন্দ্রনাথের ভাবের দিকটাই দেখেছিল বেশী, তাঁর রস-সৃষ্টি তারা করতে পারেনি। আমরা বাঙালী কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে চিনি প্রধানতঃ রসস্রষ্টারূপে ; তাই তাঁর বর্ষাবসন্তের গীতি তার বিরহ-বেদনার প্রতি প্রীতি আমাদের বেশী। রবীন্দ্রনাথ যতই অভিমান করে থাকুন না কেন, আমরা তাঁকে চিনেছি অন্য যে কোনো জাত অপেক্ষা বেশী।

তা সে যাই হোক, মূল কথায় ফিরে গিয়ে বলি, ভাবের পরিবর্তন হয় রসের পরিবর্তনের চেয়ে বেশী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর বিজেতা ইংলণ্ডেই ভগবানে বিশ্বাস একসঙ্গে অনেকখানি কমে যায়। বরঞ্চ পরাজিত জর্মনি আর কিছু না পেয়ে ভগবানকে আঁকড়ে ধরলো। ইংলণ্ডে তাঁর জনপ্রিয়তা কমলো ; জর্মনিতে বাড়লো। তার কয়েক বৎসরের মধ্যেই জর্মনি যখন আপন পায়ে খানিকটে দাঁড়ালো সেখানেও তাঁর জনপ্রিয়তা কমলো—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ সেটা লক্ষ্য করে উল্লেখ করেছেন।

এর সঙ্গে একটা অত্যন্ত স্থূল কথা বলে রাখি। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ভাবের দিক দিয়ে হয়তো বা ইয়োরোপের দু'একজন গুণীজ্ঞানী গীতাঞ্জলির ব্রহ্মকে চিনতে পারবেন, কিন্তু ঐ মহাদেশের সাধারণজন হয় তাঁকে অবহেলা করে নয় চার্চের ভগবানকে নিয়েই তারা সন্তুষ্ট। আপন চেষ্টায় রসস্বরূপ পরমেশ্বরকে পাবার চেষ্টা তাদের নেই বললেও চলে। কিছুটা আছে ক্যাথলিক মিস্টিক ফাদারদের ভিতর—কিন্তু তাঁরাও আপন ধর্মের দিগদর্শক নিয়েই সন্তুষ্ট। কাজেই এদিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে ইয়োরোপে কখনো জনপ্রিয় হবেন তা আমার মনে হয় না।

তাই যখন তাঁর খ্যাতি ইয়োরোপে কমলো, আমরা আশ্চর্য হইনি।

আজ যে রবীন্দ্রনাথের স্মরণে বিশ্ববাসী তাঁকে সম্মান জানাচ্ছে, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করছে তাতে আমরা খুশী। কিন্তু কারণ অনুসন্ধান করলে জানবো, আজ পৃথিবীর সব দেশই আমাদের প্রিয় হতে চায়—তার অন্যতম কারণদ্বয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। এ উচ্ছ্বাস রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয়ের উৎস থেকে উদ্বেলিত হয়নি। তাই বর্ষ শেষে আবার যদি দেখি—১৯১৯ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত যা দেখেছিলুম—সে জোয়ার কোনো চিহ্নই রেখে যায়নি তাতে যেন বিস্মিত বা মর্মাহত না হই।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার অত্যন্ত সুদৃঢ় বিশ্বাস ইয়োরোপ একদিন রবীন্দ্রনাথের সত্য পরিচয় পাবে। সেটা সম্ভব হবে যেদিন ইংরেজ ফরাসী জর্মনের বেশ কিছু লোক বাঙলা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ব্যাপকভাবে আপন আপন মাতৃভাষায় তাঁর রসসৃষ্টির অনুবাদ করবে। তার কিছু কিছু লক্ষণ এদিক ওদিক দেখতে পাচ্ছি। একাধিক ক্যাথলিক ইতিমধ্যে অত্যুত্তম বাঙলা শিখে নিয়েছেন এবং একাধিক জর্মন এই নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। রাজনৈতিক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক আরো অনেক বিদেশী বাঙলা শিখবে এবং অবশেষে রবীন্দ্রনাথের রচনা উপযুক্ত লোক দ্বারা অনূদিত হবে।

আমার ভয় শুধু একটি, এ-দেশে তথা বিদেশে ক্লাসিকসের সম্মান ক্রমেই কমে যাচ্ছে। মানুষ মনোরঞ্জক দিকটাই দেখছে বেশী; ক্লাসিকদের স্থায়ী গভীর সচ্চিদানন্দ রস তারা পরিশ্রম করে আস্বাদ করতে চায় না অথচ রবীন্দ্রনাথের মূল উৎস সেইখানেই।

সেই ভয় আমি কাটাই এই ভরসা করে যে রেনেসাঁসও তো হয়। বিরক্ত হয়ে আধুনিককে বর্জন করে মানুষ এ সংসারে কত না বার অপেক্ষাকৃত প্রাচীনের সন্ধানে বেরিয়ে নিত্য নবীনের সন্ধান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিত্য নবীন।

কবিগুরু গুরুদেব

রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিষ্ঠান নানা পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করছেন। এঁদের অন্যতম প্রতিষ্ঠান এই সম্পর্কে একটি শর্ত আরোপ করেন যে, কোনো লেখক যেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের উপলক্ষ করে কোনো রচনা না পাঠান। এই প্রতিষ্ঠানটির মনে হয়তো শঙ্কা ছিল, রবীন্দ্রনাথের নাম করে এঁরা হয়তো নিজেদের আত্মজীবনী লিখে বসবেন। শঙ্কাটা কিছু অমূলক নয়।

কিন্তু এ-শর্তের ভিতর একটা গলদ রয়ে গেল। এই প্রথম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা উল্লেখ করা যাবে—দ্বিতীয় জন্ম-শতবার্ষিকীর সময় এত দীর্ঘায়ু কেউ থাকবেন বলে ভরসা হয় না। কাজেই এই শতবার্ষিকীতে কেউই যদি মানুষ রবীন্দ্রনাথকে কিভাবে চিনেছিলেন, সে কথা না লেখেন, তবে দ্বিতীয় শতবার্ষিকীতে যাঁরা আজকের দিনের প্রকাশিত প্রবন্ধাদি পড়ে মানুষ রবীন্দ্রনাথের মূর্তিটি নির্মাণ করতে চাইবেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বিক্ষুব্ধ হবেন। অবশ্য এই নিয়ে যে অন্যত্র ভূরি ভূরি লেখা হয়নি তা নয়, কিন্তু শতবার্ষিকীর নৈমিত্তিক ধ্যান এক রকমের অন্য নিত্য-রচনা অন্য ধরনের।

* * *

কিন্তু এই মানুষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয়, তারও বর্ণনা দেওয়া হওয়া কি সহজ? প্রথমত, রবীন্দ্রনাথ আর পাঁচজন কবি কিংবা গায়কের মত আপন কবিতা বা গান রচনা করার পর চট করে ধূলার সংসারে ফিরে এসে রাম-শ্যাম-যদুর মত তাস পিটে, হুঁকো টেনে দিন কাটাতেন না। দৈনন্দিন জীবনে ফিরে আসার পরও তাঁর বেশভূষা, বাক্যালাপ, আচার-আচরণে, দুষ্টের দমনে এবং শিষ্টের পালনে (আশ্রমের ছাত্রদের কথা হচ্ছে) তিনি কবিই থেকে যেতেন। এমন কি, আশ্রমের নর্দমা সম্বন্ধে আলোচনা করার সময় কবিজনোচিত কোনো বাক্য বেমানানসই মনে হলে—এবং মনে রাখা উচিত সেই বেমানানসইটাও তাঁর কবিসুলভ হৃদয়ই ধরে নিত—সেটাকে তিনি অন্তত কিছুটা হাস্যরস দিয়ে উচ্চ পর্যায়ে তুলে নিয়ে আসতেন। কিংবা সামান্য একটু অন্য ধরনের একটি উদাহরণ নিন।

তাঁর ভৃত্য বনমালী তাঁর জন্য এক গেলাস শরবৎ এনে দেখে বাইরের কে বসে আছেন। বনমালী থেমে যাওয়াতে কবি বললেন, 'ওগো বনমালী দ্বিধা

কেন ?' কবি বলেছিলেন সাধারণ ধুলো-মাটির দৈনন্দিন ভাষাকে একটু মধুরতর করার জন্যে। অথচ এ-দুটি তাঁর নিজের মনেও এমনই চাঞ্চল্য তুললো যে, তিনি সেদিনই গান রচনা করলেন,

হে মাধবী, দ্বিধা কেন,
আসিবে কি ফিরিবে কি—
আঙিনাতে বাহিরেতে
মন কেন গেল ঠেকি ॥

এমন কি কমলালেবুর সওগাৎ পেয়ে, ধূপকাঠি জ্বালিয়ে যে তাঁকে সেগুলো নিবেদন করেছিল, তার স্মরণে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছেন, সেগুলো অনেক পাঠকই তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে না চিনেও স্মরণ করতে পারবেন।

এতেও কিন্তু তাঁর এদিকটার পরিচয় অতিশয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমরা তাঁকে প্রধানত চিনেছি গুরুরূপে। সে সম্বন্ধে সুধীরঞ্জন দাশ, প্রমথনাথ বিশী প্রাঞ্জল ভাষায় সবিস্তর লিখেছেন—আমারও সংক্ষেপে লেখার সুযোগ অন্যত্র হয়েছে। কিন্তু কেমন যেন মনে হয়, আমরা যেটুকু অসম্পূর্ণভাবে দেখেছি, সেটিও যেন সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারিনি।

এমন গুরু হয় না। পড়াবার সময় তিনি কখনো বাক্য অসম্পূর্ণ রাখতেন না—প্যারেনথেসিসে, অর্থাৎ এক বাক্যের ভিতর অন্য বাক্য এনে কখনো ছাত্রদের মনে দ্বিধার সৃষ্টিও করতেন না, এবং প্রত্যেকটি বক্তব্য তাঁর পরিপূর্ণ মধুরতম ভাষায় প্রকাশ করতেন। আমার মনে কণামাত্র দ্বিধা নেই যে, তাঁর ক্লাস-পড়ানো যদি কেউ শব্দে শব্দে লিখে রাখতে পারতো তবে সে রচনা তাঁর 'পঞ্চভূত' কিংবা অন্য যে-কোনো শ্রেষ্ঠ রচনার সঙ্গে একাসনে বসতে পারতো। এমন কি একথাও অনায়াসে বলা যায়, সে হত এক অদ্ভুত তৃতীয় ধরনের রচনা। এবং আশ্চর্য, তারই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের প্রশ্নও জিজ্ঞেস করেছেন, উত্তরগুলো শুদ্ধ করে দিয়েছেন, তার একটি-আধটি শব্দ বদলে কিংবা সামান্য এদিক-ওদিক সরিয়ে তাকে প্রায় সুষ্ঠু ভদ্র-গদ্যে পরিণত করেছেন।

ছাত্রের সব প্রশ্নের উত্তর কোনো গুরু দিতে পারেন কি না বলা কঠিন, কিন্তু এটুকু বলতে পারি, আমাদের সম্ভব-অসম্ভব সব প্রশ্নের কথা ভেবে নিয়ে প্রতিদিন তিনি অনেক মূল্যবান (মূল্যবান এই অর্থে বলছি যে, তিনি যদি ঐ সময়ে বিশ্বজনের জন্য গান কিংবা কবিতা রচনা করতেন, তবে তারা হয়ত বেশী উপকৃত

হত) সময় ব্যয় করে 'পড়া তৈরী' করে আসতেন। শেলী-কীটসের বেলা তা না হয় হল, কিন্তু একথা কি সহজে বিশ্বাস করা যায়, তিনি তার আপন রচনা 'বলাকা' পড়াবার সময়ে পূর্বে দেখে নিয়ে রেখে তৈরী হয়ে আসতেন!

এই ক্লাসেরই বৃহত্তর রূপ আমাদের সাহিত্য-সভা।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত নিয়মানুরাগী ছিলেন। যদিও আমাদের সাহিত্য-সভা নিতান্ত ঘরোয়া ব্যাপার, তবু তিনি যেভাবে সে-সভা চালাতেন, তার থেকে মনে হত—অন্তত আইনের দিক দিয়ে—যেন তিনি কোনো লিমিটেড কোম্পানীর শেয়ার-হোল্ডারের মিটিং পরিচালনা করছেন। কোথায় কখন সভা হবে, তার কর্মসূচী বা এজেণ্ডা নিয়মানুযায়ী হল কি না, প্রত্যেকটি জিনিস তিনি অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। একটি সামান্য উদাহরণ দিই।

সভাতে পাকাপাকিভাবে এজেণ্ডা অনুযায়ী গান, প্রতিবেদন-পাঠ (মিনিটস্ অব দি লাস্ট মিটিং), প্রতিবেদনে কোনো আপত্তি থাকলে সে সম্বন্ধে আলোচনা এবং সর্বসম্মতিক্রমে তার পরিবর্তন, প্রবন্ধ পাঠ, আবৃত্তি, সংগীত ইত্যাদির পর সাধারণের বক্তব্য (জেনারেল ডিসকাশন) শেষ হয়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির বক্তব্য বলতেন। এবং বিষয় গুরুতর হলে তাকে এক ঘণ্টা, দেড় ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিতেও শুনেছি।

একদা প্রতিবেদন পাঠের সময় সভার সব কিছু উল্লেখ করার পর আমি পড়ে যাচ্ছি। 'সর্বশেষে গুরুদেব সভাপতির বক্তব্যে বলেন—'

এখানে এসে আমি থামলুম। কারণ গুরুদেব তাঁর পূর্ববর্তী সভাতে প্রায় এক ঘণ্টাকাল বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এবং আমার প্রতিবেদনে তার সারাংশ লিখতে গিয়ে সাধারণ খাতার প্রায় আট পৃষ্ঠা লেগেছিল। আমার মনে সন্দেহ জাগলো, এই দীর্ঘ আট পৃষ্ঠার প্রতিবেদন শোনার মত ধৈর্য গুরুদেবের থাকবে কিনা। কারণ যে জিনিস তিনি অতি সুন্দর ভাষায় এক ঘণ্টা ধরে বলেছেন, তারই সারাংশ লিখেছে একটি আঠারো বছরের বালক তার কাঁচা, অসংলগ্ন ভাষায়। সেটা শোনা কবির পক্ষে স্বভাবতই পীড়াদায়ক হওয়ার কথা। আমি তাই পড়া বন্ধ করে গুরুদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে দ্বিধাভরা স্বরে শুধালুম, 'এই সারাংশটি আট পৃষ্ঠার। পড়বো কি ? তিনি তাঁর চিবুকে হাত রেখে আমার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'পড়ো।' আমাকে পড়তে হলো। লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছিল। কিছুদিন পরে দ্বিতীয় সভাতেও তারই পুনরাবৃত্তি। এবারেও সেই দ্বিধা প্রকাশ করলুম। একই উত্তর, 'পড়ো'।

তখন বুঝলুম, তিনি সম্পূর্ণ না শুনে প্রতিবেদন-পুস্তকে তাঁর নাম সই করবেন না। সেটা নিয়মানুযায়ী—লীগেল নয়।

কিন্তু পাঠককে চিন্তা করতে অনুরোধ করি, আঠারো বছরের ছোকরার কাঁচা বাঙলায় লেখা তারই সর্বাঙ্গসুন্দর বক্তৃতার বিকলাঙ্গ প্রতিবেদন শোনার মত পীড়াদায়ক অভিজ্ঞতাও তিনি এড়িয়ে যেতেন না। আমার শুধু মনে হত, এই অযথা কালক্ষয় না করে ঐ সময়টুকু বাঁচিয়ে তিনি তো কোনো মহৎ কাজ করতে পারতেন!

* * *

রবীন্দ্রনাথ আমাদের গুরু এবং তিনি কবি। তাই তিনি আমাদের কবিগুরু। তিনি অবশ্য তাবৎ বাঙালীর কাছেই 'কবিগুরু', কিন্তু সেটা অন্যার্থে অন্য সমাস। আমরা তাঁর কবি-রূপ দেখেছি অন্যভাবে।

তিনি দিনের পর দিন কবিতা, প্রবন্ধ, ছোট গল্প এবং বিশেষ করে গান রচনা করে যেতেন এবং প্রত্যেকটি শেষ হলেই আমাদের ডেকে শোনাতেন। এই ভিন্ন রূপটি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই সচেতন ছিলেন।

কোনো কবিতা লেখা শেষ হলে তিনি সেটি শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবিশকে কপি করে পাঠাতেন। একবার একটি গান পাঠিয়ে সঙ্গের চিঠিতে লেখেন,—

'বলা বাহুল্য, বর্ষামঙ্গলের গানগুলি একটা-একটা করে রচনা করা হয়েছে। যারা বইয়ে পড়বে, যারা উৎসবের দিনে শুনবে, তারা সবগুলি একসঙ্গে পাবে। প্রত্যেক গান যে অবকাশের সময় আত্মপ্রকাশ করেছিল, সেটাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে তারা দেখবে। আমার বিবেচনায় এতে একটা বড় জিনিসের অভাব ঘটল। আকাশের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে হার গাঁথলে সেটা বিশ্ব-বেনের বাজারে দামী জিনিস হতেও পারে, কিন্তু রসিকেরা জানে যে, ফাঁকা আকাশটাকে তৌল করা যায় না বটে কিন্তু ওটা তারাটির চেয়েও কম দামী নয়। আমার মতে যেদিন একটি গান দেখা দিলে, সেইদিনই তাকে স্বতন্ত্র অভ্যর্থনা করে অনেকখানি নীরব সময়ের বুকে একটিমাত্র কৌস্তভমণির মতো ঝুলিয়ে দেখাই ভালো। তাকে পাওয়া যায় বেশী। বিক্রমাদিত্যের সভায় কবিতা পড়া হত, দিনে দিনে, ক্রমে ক্রমে—তখন ছাপাখানার দৈত্য কবিতার চারদিকের সময়াকাশকে কালি দিয়ে লেপে দেয়নি। কবিও প্রতিদিন স্বতন্ত্র পুরস্কার পেতেন—উপভোগটা হাইড্রলিক জাঁতায় সংক্ষিপ্ত পিণ্ডাকারে এক গ্রাসের পরিমাণে গলায় তলিয়ে যেত না।

লাইব্রেরিলোকে যেদিন কবিতার নির্বাসন হয়েছে, সেদিন কানে শোনার কবিতাকে চোখে-দেখার শিকল পরানো হল, কালের আদরের ধন পাব্লিশারের হাটের ভিড়ে হলো নাকাল। উপায় নেই—নানা কারণে এটা হয়ে পড়েছে জটলা পাকানোর যুগ—কবিতাকেও অভিসারে যেতে হয় পটলডাঙার কলেজপাড়ায় অগ্নিবাসে চড়ে। আজ বাদলার দিনে আমার মন নিঃশ্বাস ফেলে বলছে, “আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে”—দুর্যোগে জন্মালুম ছাপার কালিদাস হয়ে—মাধবিকা, মালবিকারা কবিতা কিনে পড়ে—জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কান পেতে শোনে না। ইতি—১৫ই শ্রাবণ, ১৩৩৬” (দেশ, ১৩৬৮, পৃ ৮৩৫)।

আমরা তাঁকে পেয়েছি যেভাবে তিনি চেয়েছিলেন—তাঁরই ভাষায় বলি, ‘আজকের দিনের মাধবিকা, মালবিকার মত নয়।

কিন্তু এই রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি দিয়ে গঙ্গাজলে যে গঙ্গাপুজো করলুম, তারপর নিজের আর কোন্ অর্ঘ্য এনে বিড়ম্বিত হই ?

মোল্লা ফয়েজ

অপেক্ষাকৃত বয়স্কদের স্মরণ থাকিবার কথা আমানউল্লা আফগানিস্তানকে রাতারাতি ফ্রান্সভূমিতে পরিবর্তন করিতে গিয়া কি দুরবস্থায় রাজত্ব হারান। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি কাবুল হইতে পলায়ন করিলে পর দস্যু-দলপতি হবীবউল্লা, তখলুস বাচ্চা-ই-সকাও (ভারতবর্ষে বাচ্চা-সক্কা নামে পরিচিত) কাবুল ও উত্তর আফগানিস্তানের বাদশা হন।

বাচ্চা ডাকাত। কাজেই রাজা হইয়া কাবুলে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিবার দুরভিসন্ধি তাঁহার ছিল না। শান্তি স্থাপন করা অর্থ লুটতরাজ বন্ধ করা, আর লুটতরাজ বন্ধ করিলে তাঁহার সৈন্যেরাই বা মানিবে কেন ? তাহাদিগকে তো ঐ লোভেই দলবদ্ধ করিয়া আমানউল্লার সঙ্গে লড়ানো হইল। রাজকোষ হইতে অর্থ দিয়া তাহাদিগকে শান্ত করিবার কথাই উঠে না, কারণ আমানউল্লা তাহার অর্ধেক ফুঁকিয়া দিয়াছিলেন নানারকম বিবেকবুদ্ধিহীন, অর্থগৃধ্নু দলপতিদিগকে বাচ্চার সঙ্গে লড়িবার জন্য প্ররোচিত করিতে গিয়া। দলপতিরা টাকা লইয়াছিল অসঙ্কোচে ও ততোধিক অসঙ্কোচে ও তৎপরতার সঙ্গে টাকা লইয়া উধাও-ও তাহারা হইয়াছিল। কিছু দিয়া কিছু হাতে রাখিয়া, টালবাহানা দিয়া লড়ানোর হুঁশিয়ার ফেরেব্বাজী জানিতেন আমানউল্লার পিতা আমীর হবীবুল্লা ও তাঁহার

পিতামহ, পরমনমস্য আমীর আব্দুর রহমান।

'জলের মত অর্থব্যয়' আর কলিকাতা শহরে বলা চলে না কাজেই বলি ইনফ্লেশেনী অর্থব্যয় করিয়া যখন আমানউল্লা লড়াই ও অর্থ উভয়ই হারাইলেন তখন তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। সূর্যোদয়ের পূর্বেই এক কালরাত্রিতে তিনি বাকি অর্ধেক অর্থ লইয়া কান্দাহার মামার বাড়ী পলায়ন করিলেন—বিপদকালে আমীর-ফকির সকলেই মামার বাড়ীর সন্ধান লয়।

কান্দাহার ইস্তিংগার মেহমনদারী করিল বটে, কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ দিতে নারাজ এ তত্ত্বওটি বুঝাইয়া দিল। আমানউল্লা তখন দেশত্যাগ করিলেন।

এদিকে বাচ্চার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চমস্তম্ভীয় মোল্লাদের জেল্লাই বাড়িল কিন্তু অর্থাগম সরগরম হইল না। বাচ্চার সৈন্যকেই যখন লুট করিয়া জান বাঁচাইতে হয়, তখন মোল্লার তত্ত্বতালাশ করিবে কোন্ ইয়ার—ডাকুর সর্দারের তো কথাই উঠে না। তবুও বাচ্চা কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য মোল্লাদের চেল্লাচেল্লিতে কান দিলেন—তাঁহাদিগকে নানারকম ছোটখাটো চাকরি দিলেন। কিন্তু যে-দেশে বিশেষ কায়দায় পাগড়ী পরিলেই মোল্লা হওয়া যায় সেখানে মোল্লার সংখ্যা সাকুল্যে বিল্লির চেয়ে বেশী। বাচ্চা নিরুপায় হইয়া ফালতুদিগকে 'মুহতসিব' কর্মে নিযুক্ত করিয়া কাবুল বাসিন্দাদিগের পশ্চাতে লেলাইয়া দিলেন।

মুহতসিব এক অদ্ভুত কর্মচারী। ইনি একরকম 'রিলিজিয়স পুলিসম্যান'। তাঁহার কর্ম হাতে চাবুক লইয়া রাস্তাঘাটে নিরীহ প্রাণীকে নানারকমে উদ্ব্যস্ত করা। 'আজানের পর তুমি এখানে ঘোরাঘুরি করিতেছ কেন, ঈদের নামাজে কয়বার সেজদা দিতে হয়, আসরের নামাজের পর নফল পড়া মুনাসিব কিনা, ইফতারের নিয়ম কি?' ইত্যাদি নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর না পাইলে মুহতসিব নাগরিকের পৃষ্ঠদেশে নির্মম চাবুক লাগান, অথবা নাগরিক ঠিকঠিক ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া মুহতসিবের দক্ষিণহস্তে ক্ষিপ্রগতিতে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন নহে—পৃষ্ঠরক্ষা করে। মুহতসিব প্রতিষ্ঠানই খারাপ একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু অজ্ঞ মোল্লাকে বেতন না দিয়া নাগরিকের পশ্চাতে লাগাইয়া দিলে সে যে বহুদিন যাবৎ গৃহস্থের অন্ন ধ্বংস করিয়া কাননস্থ মহিষকে তাড়না করিবে না তাহাতে কি সন্দেহ? বিজ্ঞ এবং ধার্মিক মোল্লারা এই মতই পোষণ করিতেন।

১৯২৮-২৯-এর শীতকালে কাবুলের রাস্তায় একদিকে লুটতরাজ অন্যদিকে মুহতসিব।

আমাকে একদিন ঐ সময় বিশেষ কর্মোপলক্ষে বাহির হইতে হইয়াছিল। বিশেষ কি, অত্যন্ত বিশেষ কর্ম থাকিলেও তখন কেহ বাহির হইত না। কারণ যেখানে মরণ-বাঁচন সমস্যা সেখানে রাস্তায় নিশ্চয় প্রাণ দিতে বাহির হইবে কে? কিন্তু আমি নিতান্ত নিরুপায় হইয়া দুইটি প্রাণ বাঁচাইবার জন্য বাহির হইয়াছিলাম —বন্ধুবরকে রাখিয়া গিয়াছিলাম তাঁহার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে সাহস দিতে ও নিজে ডাক্তারের সন্ধানে।

পথে মোল্লা আবুল ফয়েজের সঙ্গে দেখা। তিনি ছিলেন মকতব-ই-হবীবিয়ার ধর্মশাস্ত্র বা দীনিয়াতের অধ্যাপক—আমার সহকর্মী। মোল্লাজী ছিলেন পরস্পরবিরোধী আচার-বিশ্বাসের মানোয়ারী জাহাজ। দেওবন্দের টাইটল কোর্স পাস ভাষ্যকর দিগ্‌গজ মৌলানা—অথচ পরিতেন স্যুট, পাগড়ী না—কারাকুলি টুপি অথবা ফেল্ট হ্যাট, গোঁফ ছিল কিন্তু দাড়ি অতি নিয়মিত কামাইতেন! নামাজ কড়াগণ্ডায় আদায় করিতেন, রোজা ফাঁকি দিতেন না; কিন্তু অন্য কোনো ধর্মকর্ম বা ধর্মালোচনায় কখনো তাঁহাকে লিপ্ত হইতে দেখি নাই। অনুসন্ধিৎসু হইয়া প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতেন, কিন্তু কলেজের অন্যান্য মোল্লাদের সঙ্গে মসলা মসাইল লইয়া কখনও বাকবিতণ্ডা করিতেন না। আমানউল্লার পক্ষ লইয়া হামেশা লড়িতেন এবং আফগানিস্তানের স্বাধীনতা রক্ষা করার একমাত্র উপায় যে ইংরেজ-রুশকে বাঁদরনাচ নাচাইয়া সে-বিষয়ে তাহার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। প্রকাশ্যে সেই রায়ই জাহির করিতেন।

তাঁহাকে রাস্তায় পাইয়া যেন জান কলবে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া আমার সেই কলব ধুকুধুকু করিতে লাগিল। বাচ্চার ভয়ে তখন বিদেশী ছাড়া কেহই স্যুট পরিবার সাহস করিত না। প্যারিস-ফের্তা পয়লা নম্বরের কাবুলী সায়েবরা তখন কুড়িগজি শেলওয়ার ও বাইশ-গজী পাগড়ী পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। অথচ দেখি মোল্লা আবুল ফয়েজ সেই মারাত্মক চেকের কোটপাতলুন পরিয়া নির্বিকারচিত্তে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে চলিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া আলিঙ্গন করিলেন ও আমার মৃদু আপত্তি সত্ত্বেও আমাকে আমার গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিবার প্রস্তাব নিজেই করিয়া নিজেই বহাল করিলেন। আমি তাঁহাকে ঐ উৎকট সঙ্কটের সময় কেন স্যুট পরিয়াছেন জিজ্ঞাসা করিতে যাইব এমন সময় কোথা হইতে এক ভীষণ-দর্শন মুহতসিব ততোধিক রোমাঞ্চন প্রজনন চাবুক হস্তে লইয়া আমাদিগকে ক্যাক্ করিয়া ধরিল।

আমার দিকে তাকাইয়া মুহতসিবজী বলিলেন, "আপনি (শুমা) বিদেশী,

আপনার উপর আমার কোনো হক নাই। আপনি যাইতে পারেন।"

বান্ধব-ত্যাগ সঙ্কটের সময় অনুচিত। বিশেষতঃ সেই বান্ধব ত্যাগ করিয়া যখন বৈদ্যরাজের বাড়ীতে একা যাওয়া ততোধিক অনুচিত অর্থাৎ প্রাণহানির সম্ভাবনা। সবিনয়ে বলিলাম, "হুজুর যদি ইজাজত দেন তবে দোস্তের আখেরী হাল কি হয় দেখিয়া যাইবার ইরাদা।" মুহতসিব বিরক্তির সঙ্গে বাঞ্ছিত ইজাজত মঞ্জুর করিলেন।

এদিকে দেখি মোল্লা আবুল ফয়েজ উর্ধ্বমুখে, নির্বিকারচিত্তে কাবুল পর্বত-গাত্রে চিনার পত্রে সূর্যরশ্মির ক্রীড়াজনিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অভিনিবেশ সহযোগে নিরীক্ষণ করিতেছেন। কোন্ বিপদে, কোন্ ভাবে, তাহার খেয়ালই নাই।

মুহতসিবের মুখ দিয়া তখন শিকার ভোজনের লালা পড়িতেছে। স্যুটপরা কাবুলী! বেদীন নিশ্চয়ই 'দীনের' 'দ'ও জানে না, ইহাকে দীনিয়াতের তর্ক-বিতর্কের দ'য়ে মজাইতে ডুবাইতে কতক্ষণ! তারপর বিলক্ষণ অর্থাগম।

হায় মুহতসিব, তোমার হাতে চাবুক থাকুক আর নাই থাকুক, জানিতে না কোন্ বাঘার খপ্পরে পড়িয়াছ!

হুঙ্কার দিয়া, শহর-আরা হইতে চিল-সকুন প্রকম্পিত করিয়া মুহতসিব জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্ তো দেখি (ফার্সীতে দুই রকম সম্বোধন আছে, 'শুমা' অর্থাৎ 'আপনি' বা 'তুমি', আর 'তু' অর্থাৎ তুই—অপরিচিত কাহাকেও 'তু' বলা অভদ্রতার চরম লক্ষণ) কোন্ ইঁদারায় ইঁদুর পড়িয়া মরিয়া গেলে, সেই ইঁদারা হইতে কয় ডোল পানি তুলিলে পর সেই পানি নামাজের জন্য পুনরায় পাক বা জাহিজ হইবে?"

প্রশ্নটি কিছু সৃষ্টিছাড়া নহে। কিন্তু সাধারণ নাগরিককে এহেন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা দুষ্টবুদ্ধির কর্ম। মুহতসিবের কর্তব্য সাধারণ নাগরিককে নিত্য অবশ্য প্রয়োজনীয় নামাজ রোজা সংক্রান্ত প্রশ্ন করা, যেগুলি না জানিলে ফর্জ কর্মগুলি আদায় করা যায় না। ইঁদারা কোন্ অবস্থায় পাক আর কোন্ অবস্থায় না-পাক এ প্রশ্নের উত্তর দিবেন অলিম মৌলবী-মৌলানারা। কারণ কাহারো ইঁদারায় ইঁদুর পড়িলে ব্যাপারটা এমন কিছু জরুরী দীন-ঘাতি নয় যে, তাহার ফৈসালা না জানিলে তদ্দণ্ডেই কাফির হইয়া যাইবার সমূহ সম্ভাবনা। সাধারণ নাগরিককে এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার অর্থ আর কিছুই নহে, তাহাকে বিপদারণ্যে নিক্ষেপ করা ও তৎপরে গুলী করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করা।

দেখি মোল্লা আবুল ফয়েজ তখনো তাঁহার সঙহিটৃ গুনগুন করিতেছেন,—

"শবি আগর আজ লবে ইয়ার বোসয়ে তলবম
জোয়ান শওম, জসেরো জিন্দেগী দুবারা কুনম।" *

মুহতসিব এবারে দারুল আমান হইতে খাক-ই-জব্বার পর্যন্ত বিদীর্ণ করিয়া চীৎকার করিলেন, "শুনিতে পাস নাই?"

আবুল ফয়েজ বলিলেন, "বিলক্ষণ, কিন্তু মসালা এতই প্যাঁচিদা যে মুক্ত রাজবর্ত্মে তাহার সমূহ আলোচনা ও সমস্যা-নিরূপণ সহজে সম্ভব হইবে না। এই তো কাওয়াখানা, চলুন চা খাইতে খাইতে শাস্ত্রালোচনা ও অন্যান্য বিবেচনা করা যাইবে।"

'অন্যান্য বিবেচনার' কথা শুনিয়া মুহতসিবের তুষ্টমুখে মিষ্টহাসি খেলিয়া গেল—যেন কাবুলি বরফে সোনালি রোদ—বাঙলায় যাহাকে বলে 'গাছে না উঠিতেই এক কাঁদি!'

কাওয়াখানায় ঢুকিয়া মোল্লা আবুল ফয়েজ ছোকরাকে দুইজনের জন্য চা আনিতে বলিলেন। আমি নিজের জন্য চা'র হুকুম দিতে গেলাম—মোল্লা ফয়েজ আমাকে থামাইয়া বলিলেন, "সে কি কথা, দুইজনের চা তো তোমার আমার জন্য। মুহতসিব সাহেবকে আমরা চা খাওয়াইব কি করিয়া, সে তো রিশওদ দেওয়া হইবে; তওবা, তওবা, সে বড় অপকর্ম, কবীরা গুণাহ, ওস্তাগফিরুল্লাহি রব্বি জম্বি মিন কুল্লি, ওতুবু ইলাইহি।"

বলিয়া মুহতসিবের দিকে কটাক্ষে চাহিয়া এক গাল হাসিয়া লইলেন।

মুহতসিব রাগে সিদ্ধ-চিংড়ির রঙ ধারণ করিয়াছেন। তবে কাওয়াখানার পাবলিক অর্থাৎ আমান্নাসের সম্মুখে হুংকার দিবার ঠিক হিম্মৎ না পাইয়া বলিলেন, "ফিতরতি রাখ্, সওয়ালের জবাব দে।"

মোল্লা ফয়েজ বলিলেন, খাস আরবীতে "ইস্তান্না সুগাইর", অর্থাৎ 'ধৈর্যংকুরু'; "মসালা খয়নী পেচিদা অর্থাৎ বড়ই প্যাঁচালো। ঝটপট উত্তর হয় না, প্রথম বিবেচনা করা উচিত—বায়দ দীদা শওদ—ইঁদুর কেন ইঁদারায় পড়িল? সেই সবব মজবুত পাকাপোথতা মওজুদ না হওয়া পর্যন্ত জবাব অত্যন্ত কঠিন, বসীয়ার দুশওয়ার!"

মুহতসিব চটিয়া বলিলেন, "কী বাজে বকিতেছ, ইঁদুর ইঁদারায় পড়িয়াছে সেই তো কাফী।"

---

* আজি এ নিশীথে প্রিয়া অধরেতে চুম্বন যদি পাই
যৌবন পাব, গোড়া হতে তবে এ জীবন দোহরাই।

মোল্লা ফয়েজ বারতিনেক অর্ধচক্রাকারে দক্ষিণ হইতে বাম দিকে মস্তকান্দোলন করিয়া বলিলেন, "ওয়াহ ওস্তাদ! কারণ বিনা কার্যের অনুসন্ধান—বেগয়ের ওয়াজহ তফতীশ বিলকুল বেফায়দা। প্রথম মনঃসংযোগ করিয়া দেখিতে হইবে ইঁদুর কেন ইঁদারায় পড়িল। তাই তো বলিলাম, খসালা বসীয়ার পেচিদা। তবু আপনার তকদীর ভালো—আমার মত পাক্কা ফীকাহ জাননেওয়ালা পাইয়াছেন। শুনুন, আমার মনে হয়, ইঁদুরকে কোনো বিড়াল তাড়া করিয়াছিল, তাই সে প্রাণের ভয়ে ইঁদারার দিকে পলাইয়া যায় ও জলে ডুবিয়া মরে। নয় কি?"

এই বলিয়া মোল্লা ফয়েজ আমার দিকে এমন ভাবে তাকাইলেন যেন গভীর অতল সমুদ্র হইতে অতি উজ্জ্বল বহুমূল্য খনি উত্তোলন করিয়াছেন। সে-তাকানোতে আত্মশ্লাঘা যেন ঝিলমিল করিয়া উঠিল।

আমি হাওয়া কোন্ দিকে বহিতেছে ঠিক আন্দাজ করিতে না পারিয়া অন্ধকারেই লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া বলিলাম, "বেশক, আলবৎ, জরুর।"

মোল্লা ফয়েজ পরম পরিতোষের দিলখুস হাসি হাসিয়া বলিলেন, "দেখুন মুহতসিব সাহেব, দীনদুনিয়ার মামেলায় নাদান এই নওজোয়ানও সায় দিতেছে। আচ্ছা, আবার মোদ্দা কথায় ফিরিয়া যাই। যখন প্রমাণসবুত হইল যে প্রাণরক্ষার্থে মূষিক কূপতলস্থ হইয়া পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়াছে তখন সে তো শহীদ। কারণ, কোন্ উল্লু জানে না, জান বাঁচানা ফর্জ? ফর্জকাম করিতে গিয়া ইঁদুর শহীদ হইল। তাহার কবর হইবে বিনা দফন কাফনে। তাহাই হইল। শহীদের লাশ পানি নাপাক করিবে কেন? পানি দুরুস্ত।"

মুহতসিব দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া বলিলেন, "সে কি কথা?"

মোল্লা ফয়েজ তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন, "ইস্তান্না, ইস্তন্না স্নগহির, সবুর, সবুর। মসলা মসাঈলের মামেলা, ধীরেসুস্থে কদম ফেলিতে হয়। ইঁদুর মরিবার আরও তো কারণ থাকিতে পারে, সবব কি আর নাই?

এও তো হইতে পারে যে, ইঁদুর জান বাঁচানার ফর্জকামে মসগুল ছিল না। সে ইঁদারার কিনারায় খেল-কূদ করিতেছিল, হঠাৎ পা পিছলাইয়া পড়িয়া গিয়া জান কব্জ হইল। তাহা হইলে তো সে আলবত্তা শহীদ নহে। তবেই সওয়াল—আর সে সওয়াল আরও পেচিদা—ইঁদুরের দরজা কি? আমি বহুত তফতীশ করিয়া দেখিলাম, ইঁদুর যে খেল-কূদ করিতেছিল সে সম্পর্কে হদীস আছে। নও-মুসলিম ও আনসাররা মদীনা শরীফে বহুত খেল-কূদ করিতেন কাফেরের সঙ্গে লড়িবার জন্য। লেহাজা কাজে কাজেই আনসাররা যাহা কর্তব্যকর্ম বিবেচনা

করিয়া করিতেন তাহা নবীর উপদেশ মতই। অতএব ফর্জ কাজের ফায়দা না পাইলেও সে কর্ম সুন্নতুন্নবী, অর্থাৎ নবীর আদেশে-কৃত অতিশয় অনুমোদিত পুণ্য কাজ। তাহার লাশেও তো পানি না-পাক হইতে পারে না। কি বলো, আগা জান ?" শুধাইয়া মোল্লা ফয়েজ আরেক দস্ত হাসিয়া লইলেন।

মুহতসিব বেশ কড়া স্বরে বলিলেন, "দেখ, ওসব ঠাট্টা মশকরার কথা নয়—"

"সবুর সবুর", মোল্লা ফয়েজ বলিলেন "সবুর করুন সরকার। বুঝিলাম, আপনার রসকস বিলকুল নাই। তবে মরুন গিয়া আপনার দশ ডোল না বারো ডোল পানি তুলিয়া,—পাড়ার যে কোন মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করুন, সে বাতলাইয়া দিবে। ভাবিয়াছিলাম, গুণীজনের সহবতে আসিয়াছেন, জখমী মসলা মসাইল দুরুস্ত করিয়া লইবেন, সে মতলব যখন নাই তখন আমি বে-চারা না-চার। চলো হে আগাজান, তুমি না হেকিমের বাড়ী যাইবে !"

বাহির হইবার সময় শুনিলাম, কাওয়াখানায় অট্টহাস্যের রোল উঠিয়াছে।

বড়লাটি লাঠি

বড়লাট ভারতবর্ষের নেতাদের ডাকিয়া তাঁহাদের হাতে লাঠি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ; যাহাতে তাঁহারা গাঁটের খাইয়া মনের আনন্দে বনের মহিষ তাড়াইতে পারেন। নেতারা সে লাঠিটা আত্মসাৎ করিবার লোভে একে অন্যের বাড়ীতে বিস্তর হাঁটাহাঁটি বিস্তর লাঠালাঠি করিয়া দেখিলেন ভাগবখরার প্রচুর বখেড়া। কেহ চায় সে লাঠির পাঁচ বিঘৎ, কেহ চায় তিন বিঘৎ, কেহ বলে লাঠিটা উদয়াস্ত বন্‌বন্ করিয়া ঘুরিবে, কেহ বলে, না, যখন বড়লাটি লাঠি তখন লাট সাহেব ইচ্ছা করিলেই বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন। ইত্যাকার বাক্য বিনিময় মনোমালিন্যের পর যখন কিছুতেই কোনও প্রকার চরম নিষ্পত্তি হইল না, তখন লাট সাহেব প্রকাশ্যে অশ্রুবর্ষণ করিয়াও গোপনে সানন্দে মৌলা আলীতে মানত পূর্ণ করিয়া লাঠিখানা মাচাঙে তুলিয়া রাখিলেন। লাঠিখানি তিলোত্তমার কার্য উত্তমরূপে সমাধান করিয়াছে। ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় আবার সুন্দ উপসুন্দ ভাই-ব্রাদার হইয়া কৌঁসিল রণাঙ্গণে দেবতাদের পর্যুদস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে, তাহা হইল শুষ্ক যষ্টিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

বড়ভাই বলিতেছেন, ছোটভাই বড়ই অর্বাচীন ; ছোট ভাই বলিতেছেন, 'ভাই

ভাই কোরো না বলছি। তুমি আমার ভাই নাকি, তুমি আমার জানি দুশমন।' তিলক-কাটা গোঁড়া ভাইকে ডাকা হয় নাই বলিয়া তিনি খণ্ডিত বিপ্রলব্ধের ন্যায় রোদন করিতেছিলেন (এমন কি এই শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে যাইবেন বলিয়া মস্কোর ফসার উপেক্ষা করিয়া অনুশোচনা করিতেছিলেন), লাঠির ভাগাভাগি হইল না দেখিয়া পরমানন্দে বগল বাজাইতেছেন।'

আমরা দুঃখিত হই নাই, আনন্দিতও হই নাই। এ যষ্টি যে আমাদের তমসাবৃত দেশকে জ্যোতিতে লইয়া যাইবে, মৃত্যু হইতে অমৃতে লইয়া যাইবে এমন আশা আমরা কখনও করি নাই। যুদ্ধের পর বেকারী, অর্থাভাব, পল্টনফের্তা সৈন্যের কৃষিক্ষেত্রাভাব ইত্যাদি যে গন্ধমাদন জগদ্দলন হইয়া আমাদের দেশে বুকের উপর চাপিবে, তাহা ঐ যষ্টি-লিভার দ্বারা উত্তোলন করা আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। এতদ্ব্যতীত যষ্টি লোভ না করার আরও বাহান্নটা কারণ আছে তাহার নির্ঘণ্ট অথবা ফিরিস্তি উপস্থিত নিষ্প্রয়োজন। শুধু বাহান্ন নম্বরের কারণটা নিবেদন করি; যাহারা মানদণ্ডকে রাজদণ্ডে পরিণত করিতে পারে, তাহাদের সে-রাজদণ্ড হর্ষের ন্যায় সন্তোষক্ষেত্রে দান করিবার ক্ষমতা নাই।

অপিচ অকপট চিত্তে স্বীকার করি যে, বিপক্ষে বাহান্নটা কারণ থাকা সত্ত্বেও যষ্টিতে লোভ করিবার স্বপক্ষে একটি প্রকৃষ্ট যুক্তি ছিল। সে যুক্তি নিবেদন করিতে আমাদের অত্যন্ত লজ্জা ও সঙ্কোচ বোধ হয়, কারণ যাঁহাদের জন্য আমাদের এই লোভ তাঁহারা হয়ত এই বৃত্তিকে ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ভাবিয়া আমাদিগকে ধিক্কার দিবেন।

আমরা রাজবন্দীদের কথা ভাবিতেছি। '৪২ আন্দোলনের দেশসেবক, তৎপূর্ববর্তী তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী, স্টালিন-বিরোধী গণতন্ত্রী, জমিয়ত 'উল-উলমার কর্মিগণের কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয় যে, ইঁহাদের দুঃখের অবসান যদি হিমালয়ের কলির শৈলেশ্বরকে সন্তুষ্ট করিয়াই হয়, তবে তাহাই হউক। আত্মজন বন্ধুজন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা হইতে বৎসরের পর বৎসর বিরহ, দিনে দিনে জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার তুষানল দাহন, যৌবনের সূক্ষ্ম সুকুমার বৃত্তির নিষ্পেষণ, কারাগারে পাষাণপ্রাচীরের অন্তরালে বিপাকের বিভীষিকাময় রজনী যাপন, আশাহীন উদ্যমহীন নিঃসঙ্গ জীবন নিয়ত ঘূর্ণ্যমান তাঁহাদের অদৃষ্ট চক্রনেমিতে এইগুলিই তো তীক্ষ্ণ লৌহকীলক। স্বাধীনতা সংগ্রামে সফল হইয়া তাঁহাদের বিজয়মাল্যে বিভূষিত করিয়া হৃদয়ে টানিয়া লইবার আশা যখন দিন দিন মরীচিকার মত চক্রবাল হইতে চক্রবালান্তরে বিলীন হইয়া যাইতেছে তখন আর অত শাস্ত্র

মিলাইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার করিয়া কী-ই বা হইবে। বলিতে ইচ্ছা করে, হে গিরীশ্বর, হে গণ (পাটি) পতিগণ, যে যাহা চাও লও। বুকের-শিরা-ছিন্ন-করা-ভীষণ পূজাই যদি আত্মজনের মুক্তি দিবার একমাত্র বিধান হয়, তবে পরাজয় স্বীকার করিতেছি। যে ইংরাজ রাজত্বকে একদিন 'শয়তানী' নাম দিয়াছিলাম আজ তাহারই প্রতীক বড়লাটকে দেশের 'প্রধান নেতা' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলাম। মান-অপমান-বোধ আজ আর নাই। মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, সে মুক্তি রাজকারা হইতে বাহির করিয়া নিত্য কারাগারে লইয়া যাইলেও তাহা শিরোধার্য।

বড়লাটি পরিকল্পনা গ্রহণ না করায় দেশ-বিদেশের বহু লোক বলিতেছেন, কংগ্রেস অসহযোগ করিয়া এমন অসহযোগমনা হইয়া গিয়াছেন যে, সে শুভক্ষণ শুভ যোগ চিনিতে পারিল না। গুজরাতি প্রবচন আছে যে, 'ছুৎবায়ুগ্রস্ত লোককে স্বয়ং লক্ষ্মী টিকা পরাইতে আসিলেও সে অন্ধকূপের দিকে ছুটে মুখ ধুইবার জন্য'। অর্থাৎ কংগ্রেসের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছে।

বড়লাটি পরিকল্পনা গ্রহণ করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়া রাজ্যচালন করা। অর্থাৎ তাহার পর দেশে যে সব আইনজারী হইবে, যে সব ক্রিয়াকর্ম হইবে তাহার জন্য ভারতবাসী দায়ী হইবে। বিদেশে যে সব ভারতীয় সৈন্য যাইবে সে মিশরেই হউক ফলস্তীনেই হউক আর মালয়েই হউক, তাহারা আইনতঃ ভারতীয়—আর শুধু ভারতীয় নহে, স্বাধীনতাকামী ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের আশীর্বাদ শিরে বহন করিয়া যাইবে; অথচ তাহাদের উপর কি আদেশ কখন হইবে তাহার নিয়ন্ত্রণাধিকার জাতীয়তাবাদীদের থাকিবে না। বিস্তর বাক্যবিন্যাস করিবার কোন প্রয়োজন নাই, একবার ভাবিয়া দেখিলেই হয় যে, যদি মিশরী সৈন্যরা একদিন কলিকাতার জনতার উপর কোন কারণে গুলী চালায়, আর যদি তখন ওয়াফদীরা মিশরের শাসনকর্তারূপে বিরাজ করেন—সে শাসন আইনত (ডি জুরে) হউক কার্যতই (ডি ফাক্টো) হউক—তাহা হইলে প্রাতঃস্মরণীয় সাইজগলুল পাশা ও তাঁহার অনুবর্তিগণের প্রতি আমাদের কতটুকু ভক্তি থাকিবে ?

সে যাহাই হউক। কথাটা তুলিলাম এই কারণে যে, যদিও পরাধীন জাতির কোনো পলিটিকস্ থাকিতে পারে না, একমাত্র স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া, তবু মিশর আরব পরাধীন ভারতবর্ষের নেতাদের ক্রিয়াকলাপের খবর রাখে। মিশরী ফলস্তনীরা আমাকে প্রায় বলিতেন, "আমাদের ক্ষুদ্র দেশ, আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, কিন্তু তোমাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া স্বাধীনতা অর্জন করিবার ক্ষমতা

রাখো। আর তোমরা যদি স্বরাজ পাও, তবে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্যনীতির অবসান হইবে।” ভারতবর্ষের প্রতি তাঁহাদের এই ভক্তি-উচ্ছ্বাস শুনিয়া তখন লজ্জা অনুভব করিয়াছি। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত অসহিষ্ণু তাঁহারা স্পষ্ট বলিতেন যে, আমাদের পরাধীনতাই তাঁহাদের পরাধীনতাকে অটুট করিয়া রাখিয়াছে। এমন কি কাবুলেও বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতিতে বিরক্ত আফগানদের মুখে শুনিয়াছি যে, আমাদের দৌর্বল্যই বৃটিশ রাজনীতিকে পুষ্ট করিতেছে ও আফগানিস্তানকেও তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। আমি তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা সব সময় মানি নাই; এস্থলে কিন্তু আমার এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করার উদ্দেশ্য এই যে কাবুল হইতে মিশর তুর্কী পর্যন্ত সব দেশের লোক আমাদের গতিবিধির পর্যালোচনা করে। আমরা সাধারণতঃ তাহাদের খবর রাখি না।

বড়লাটি পরিকল্পনা স্বীকার না করাতে যাঁহারা নিতান্ত মর্মাহত হইয়াছেন, তাঁহাদের শুধু এইটুকু আমার বলিবার ইচ্ছা যে যাঁহারা অস্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা সৃষ্টিছাড়া কিছু করেন নাই।

প্রথম ধরুন মিশর। মিশরের ওয়াফ্‌দ্‌ দল ভারতবর্ষের কংগ্রেস-লীগ অপেক্ষা অনেক বলীয়ান। সে দলকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী যদি কাজে লাগাইতে পারে তবে তাহার যে কত সুবিধা হয়, তাহার খবর ওয়াফ্‌দ্‌ জানে সাম্রাজ্যবাদীও জানে। ওয়াফ্‌দ্‌ এত ভাল করিয়া জানে যে, যে-সব বিভীষণরা সাহায্য করিতে অত্যধিক মাত্রায় প্রস্তুত তাহাদের পরিষ্কার বলিয়া দেয় চাচা যেন আপন প্রাণ বাঁচায়। পাঠকের অজানা নাই যে, কেহ কেহ নিজের প্রাণটা ঠিক রক্ষা করিতে পারে নাই। ইংরাজের প্রভুত্বহীন মিশরে ওয়াফ্‌দ্‌ সর্বদাই রাজত্ব করে ও করিতে প্রস্তুত কিন্তু রাজা যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীর ক্রীড়নক হইয়া পড়েন, তখন ওয়াফ্‌দ্‌ আর সহযোগ করিতে সম্মত হয় না। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ওয়াফ্‌দকে বলে, “তোমরা রাজত্ব চালাইতেছ না কেন? তোমাদের সঙ্গে আমাদের স্বার্থের অনেক মিল, সে কি বুঝিতে পারো না। এই ধরো না সুয়েজ খাল। তাহার কনট্রাক্ট তো প্রায় শেষ হইল, নূতন কনট্রাক্টে তোমাদিগকে অনেক কিছু দিতে হইবে, সেজন্য আমরা প্রস্তুত। তোমরা তো এখন আর দুগ্ধপোষ্য শিশু নহ, তোমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আমরা তো মানিয়া লইয়াছি। তোমরা মুরুব্বি, আইস সুয়েজখাল সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। হাঁ, আর সেই সুদানের ব্যাপারটা! হাঁ, হাঁ, সুদানও তোমাদের ফিরাইয়া দিতে হইবে বই কি। সে তো আমরা সর্বদাই বলি। তবে কিনা কোনও কোনও সুদানী (পাঠকের অবগতির

জন্য বলি এইসব সুদানী নূন মুদ্‌লেয়ার গোত্রীয়) আপত্তি জানাইয়াছেন, মিটিং করিয়াছেন, ডেপুটেশন ভেজিয়াছেন। সে কথাটাও তো বিবেচনা করিতে হয়। তাই পরিষ্কার কিছু বলিতে পারিতেছি না। আর ছাই বলিবই বা কাহাকে ? তোমরা যদি দেশের রাজ্যশাসনভার গ্রহণ না করো (দিশি ভাষায় বড়লাটি লাঠি গ্রহণ না করো), তবে তোমাদের সঙ্গে আলাপ করিব কি করিয়া, তোমাদের 'লুকস স্টাণ্ডি' কোথায় (অর্থাৎ মুসলমানী ভাষায় তওবা করিয়া কুফর্‌ ইন্‌কার করো, বৈদিক ভাষায় হে ব্রাত্য যজ্ঞোপবীত ধারণ করো) ?

আরে আরে, ও শ্যামদাস পালাস কেন ? শোন্-ই না। সেই যে ইংরেজ পলটন মিশরে বসিয়া আছে। সত্যি ভাই, তাতে মিশরীদের আত্মসম্মানে ঘা লাগে, আমরাও বুঝি। সে বিষয়েও একটা সমঝাওতার বড় প্রয়োজন। আহা কি মুশকিল, পালাচ্ছিস কোথায় ?”

কিন্তু মুস্তফা নহ্হাজ্‌ পাশা ঘুঘু ছেলে। মুখের ভদ্রতা অন্তত উশকুরুকুম (থ্যাঙ্ক্‌) পর্যন্ত না বলিয়া তিনি তুর্কী টুপির ফুন্না উড়াইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে আজহর মসজিদে আশ্রয় লন। এবং নহ্হাজ্‌ পাশার পিছনে থাকে তামাম দেশ—যাহারা থাকে না, তাহাদের বিপদের কথা পূর্বেই সভয়ে পেশ করিয়াছি।

মুস্তফা ও ওয়াফ্‌দীরা যে কত বড় লোভ সম্বরণ করিয়া সর্বপ্রকার সমঝাওতা, দরকষাকষি প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা আমাদের পক্ষে অনুমান করা শক্ত। সুয়েজ খাল, সুদান, ব্রিটিশ পলটন এই তিন প্রশ্নের সমাধান তাঁহাদের কাছে বৌদ্ধদের ত্রিশরণ অপেক্ষাও কাম্য।

ফলস্তীনের (প্যালেসটাইন) মত দুর্ভাগ্য দেশ পৃথিবীতে আমি কোথাও দেখি নাই। ইহুদী পঙ্গপাল দেশটাকে ছাইয়া ফেলিবার পূর্বে (১৯১৮) আরবদের সুখে দুঃখে দিন কাটিত—আফগানিস্থান যেমন তাহার দারিদ্র্য নিয়াও বাঁচিয়া আছে। ফলস্তীন তখন তুর্কীর অধিকারে ছিল ও খলীফার অধঃপতনের যুগে তাহার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির কোনও প্রকার চেষ্টা করা হইতেছিল না বলিয়া ফলস্তীন নবীনেরা স্বরাজ্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সে আন্দোলনের নেতারা সফলতা লাভ করিতেন কি না-করিতেন সে প্রশ্ন অবান্তর—মূল কথা এই যে ফলস্তীন শিক্ষাদীক্ষায় পশ্চাৎপদ থাকিলেও আপামর জনসাধারণ জাফা কমলানেবুর চাষ করিয়া নিজের জমিতে নিজের কুঁড়েঘরে জীবন যাপন করিত।

কুক্ষণে তাহারা লরেনসের ধাপ্পায় ভুলিল, কুক্ষণে তাহারা খাল কাটিয়া ঘরে

কুমির আনিল। সে ইতিহাস আজ আর তুলিব না। ইহুদীরা আসিয়া তাহাদের কোটি কোটি টাকার পুঁজির জোরে আরবদের ঘরছাড়া ভিটাছাড়া করিয়া এমন অবস্থায় পৌঁছাইল যে অবস্থায় মানুষ আর কিছু না করিতে পারিয়া দাঁত দিয়া কামড়ায়, নখ দিয়া ছিঁড়ে। পৃথিবীর সহানুভূতি ফলস্তীন পায় নাই, কারণ ইহুদীরা দুনিয়ার প্রেসের মালিক। তবু মনে আছে ১৯৩৪ সালে যখন আমি ফলস্তীনে বাস করিতেছিলাম তখন ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে আমি আরবদের বলিয়াছি যে, আমাদের দেশের জাতীয়বাদীরা তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করেন। নিঃস্ব আর্ত আরবদের সেকথা শুনিয়া চক্ষে জল আসিতে আমি দেখিয়াছি। ফলস্তীনের বেদুইন চাষী হয়ত কংগ্রেস লীগ চিনে না কিন্তু আমি জানি যে সে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিরা খবর পাইয়াছেন যে, ভারতের নিপীড়িত জনসাধারণ কংগ্রেস ও লীগের ভিতর দিয়া আরবদের মঙ্গল কামনা করিয়াছে। দোহাই কংগ্রেস লীগের কর্তাগণ, যাহা খুশী কর কিন্তু তোমাদের আশীর্বাদ লইয়া যেন গুর্খা পাঠান শিখ মারাঠা ফলস্তীনে না যায়।

ফলস্তীন পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য আন্দোলন করিয়াছে। কিন্তু ইহুদীরা গণতন্ত্র চায় না যতদিন না দেশের লোক শতকরা ৫১ জন ইহুদী হয়। ততদিন দলে দলে ইহুদী আমদানি হইতেছে।

বয়তউল-মুকদ্দসের (জেরুজালেমের) ম্যুনিসিপ্যালিটি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। তাহাতে যোগদান করিলে আরবদের অনেক ছোটখাটো সুবিধা হয়, কিন্তু তৎসত্ত্বেও যখনই তাঁহারা দেখিতে পান ক্ষুদ্র সহযোগের দ্বারা তাহাদের বৃহত্তর স্বার্থ স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা ব্যাহত হইতেছে, তখনই তদ্দণ্ডেই তাঁহারা বড়লাটি দণ্ডকে হাতে লওয়া পণ্ডশ্রম মনে করেন। অসহিষ্ণু মহা-মুফতী তো ফ্যাসিস্ট দলেই যোগদান করিলেন। কিছুদিন হইল খবর আসিয়াছে, আরবরা মুকদ্দসে ম্যুনিসিপ্যালিটি বয়কট করাতে সরকার ছয়জন সিভিল কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন।

ফলস্তীনদের বাঙাল রাগ। বিশেষ অপবিত্র তরল দ্রব্য দ্বারা বরঞ্চ চিঁড়া ভিজায় তবু জল ব্যবহার করে না।

লেবানন সিরিয়া ফরাসীকে তাড়াইবার জন্য ইংরাজের সাহায্য লইতে পরাঙ্মুখ হয় নাই। ভালো করিতেছে কি মন্দ করিতেছে—ফরাসীকে তাড়ানোর কথা হইতেছে, না ইংরেজের সাহায্য লওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করিতেছে—আল্লাই জানেন। কণ্টক দিয়া কণ্টক উৎপাটিত করা হইতেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু শেষের কণ্টক যেন মুশল হইয়া বাহির না হয়। তখন যদুকুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

তবু যেন কেহ মনে না করেন যে, লেবানন সিরিয়া আজাদ জিন্নার ব্যবহারে উষ্ণ হইয়া গোস্‌সা প্রকাশ করিবে। নিজেরাই তাহারা ফরাসী যষ্টি বারম্বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। নীতি একই।

ইরাক ক্ষাত্রতেজে বলীয়ান। সেখানে সাম্রাজ্যবাদীদের ডাল বেশিদিন গলিবে না। গত যুদ্ধের পর তাহারাই সর্বপ্রথম সাম্রাজ্যবাদীদের অর্ধচন্দ্র দিয়াছিল। ইরাকেও অসহিষ্ণু নেতার অভাব ছিল না, এখনও নাই।

হে মাতঃ মুক্তি দাও যাহাতে রোরুদ্যমান হইয়া প্রাণরক্ষা করিতে পারি—হেন ক্রন্দনধ্বনি ইরানের ক্রন্দসী হইতে উত্থিত হইতেছে।

ইরানের স্নেহজাতীয় পদার্থের প্রতি সকলেরই লোভ। রুশ সপত্নও হুঙ্কারধ্বনি ছাড়িতেছেন। যে রুশ একদিন মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উত্তর ইরানের স্বাধিকার ত্যাগ করিয়াছিল, সেই রুশই আজ ইরানের তেল চায়—কারণ তৈল একা আসে না। ঘৃত লবণ তৈলতণ্ডুল বস্ত্র ইন্ধন একসঙ্গে যায়। আজরবইজানের প্রতি রুশের লোভ নাই একথা এত জোরে বলা হইতেছে যে, আমরা শেক্ষপীয়রী ভাষায় বলি—"মহারাজ, মহিলা বড় বেশী প্রতিবাদ করিতেছে।" রুশিয়া যে ইরানের প্রতি রুষিয়াছেন তাহাতে কোন বাতুল সন্দেহ করিবে না। কিন্তু কহি তবু তো ইরানের ইংরাজ প্রেম সঞ্চারিত হইতেছে না। ইরান ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল, "হে কর্তারা, যুদ্ধ তো শেষ হইয়াছে, তবে পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত বিদায় লইতেছ না কেন? তোমাদের জন্য আতর সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি, আর কেন, আমাদের অনেক শিক্ষা হইয়াছে।" কিন্তু মুজঃফর (বিজয়ী) নগরের কম্বল ছাড়িবে কেন?

শুনিয়াছি ইরাণে নাকি ভারতীয় সৈন্য আছে। যদি থাকে তবে বড ভাগ্য মনে গণি যে, ইহাদের কপালে বিজয়তিলক কংগ্রেস-লীগ অঙ্কন করেন নাই। লাঞ্ছন শ্বেত-গৈরিক-শ্যাম নহে।

আফিগানিস্থান সম্বন্ধে আলোচনা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন। আমি সমরশাস্ত্রে নিতান্তই মূর্খ, সংখ্যাতত্ত্বে ততোধিক। যত আফগানযুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে কি পরিমাণ গোরা কি পরিমাণ পাঠান-গুর্খা-শিখ-মারাঠা ছিল জানি না।

আফগানিস্থানের ব্রিটিশ প্রীতি সম্বন্ধে শুধু এইটুকু বলিতে পারি যে, আমি যখন কাবুলে ছিলাম তখন সমগ্র আফগানিস্থানে মাত্র কজন ইংরাজ ছিলেন এবং সকলেই ব্রিটিশ রাজদূতাবাসের কর্মচারী। আফগানিস্থানের স্কুল-কলেজে তখন ফরাসী পড়াইতেন ফরাসী গুরুরা, জর্মন পড়াইতেন জর্মন গুরুরা, কিন্তু ইংরেজী

পড়াইতেন ভারতবাসীরা। আমি যখন শিক্ষামন্ত্রীকে বলিয়াছিলাম যে ইংরাজের প্রয়োজন, তা না হইলে ছাত্রদের উচ্চারণ ভালো হইবে না, তিনি মৃদু হাস্যসহকারে বলিয়াছিলেন, "কুরাণ তো আর ইংরেজী ভাষায় লেখা হয় নাই যে উরুশ্চারণের জন্য সায়েবদের মেলা তকলীফ্ দিয়া এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আনিতে হইবে।"

ইংরাজ তখন রুশিয়ার পাসপোর্ট বরঞ্চ পাইত, কিন্তু আফগানিস্থান! বরঞ্চ পঞ্চম মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করিতে পাইত, কিন্তু ইংরাজ লাণ্ডিকোটালের ঐ পারে পা দিতে গেলে নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির স্বষ্টি হইত।

ইংরাজ-রুশে বন্ধুত্ব হওয়ায় আফগানিস্থান মহা বিপদে পড়িয়াছে। হায় জালালাবাদ হায়, মজার-ই-শরীফ!

বড়লাটি লাঠি আমরা হাতে লইলে বেচারী পাঠানদের দুইখানা লাঠির খর্চার ধাক্কায় পড়িতে হইবে। সে কি উত্তম প্রস্তাব? কাবুলীদের ভদ্রতা-বোধ কম। ভারতবাসীদের তাহারা গোলাম বলে। গোলামের হাতে কি লাঠি শোভে? লাঠি বাজিবে না?

হাইলে সেলাস্মি সাম্রাজ্যবাদীদের অনুনয় করিয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা যেন দয়া করিয়া আর আদিস-আব্বাবার মত বর্বর শহরে থাকিয়া বিস্তর কষ্টভোগ না করেন। ইতালীয়রা হাবশীদের যথেষ্ট সভ্য করিয়া গিয়াছে, ঐটুকুতেই তাহাদের কাজ চলিবে। সাম্রাজ্যবাদীরা নাকি তথাপি 'শ্বেত ভদ্রতার' নামাইতে পারিতেছেন না। হাবশীদের হৃদয়ও অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ, সহযোগ যষ্টি লইবার জন্য হস্তোত্তলন করিতেছে না।

তুর্কীরা অবশ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাসীদের দিলিদোস্ত! কারণ কোন্ মূর্খ বলিবে যে, তুর্কী জর্মনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা না করিলে জর্মনী পরাজিত হইত। সে যুদ্ধে কি পরিমাণ লোকক্ষয়. বলক্ষয়, অর্থক্ষয় হইয়াছে তাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই তবে আশা করতে পারি ভারতবর্ষে যত পরাজিত জাপানী সমরবন্দী আছে, তুর্কীতে তাহা অপেক্ষা বেশী জর্মন বন্দী আছে। তবে সব সময়েই কি আর 'ফলেন পরিচিয়তে'। বরঞ্চ "ম ফলেষু" এইক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তৎসত্ত্বেও হায় রে তুর্কী তোমার দার্দানেলেজ যে যায়-যায়। মিত্রশক্তি যখন তোমাকে অনুনয়-বিনয় করিয়াছিল, তখন তুমি সাম্রাজ্যবাদীর যষ্টি হাতে নাও নাই, এখন তোমার সপ্ত-কুশ-বৎসরের চক্র। কিন্তু বল তো আলেপ্পো, তোমাকে কে ভেট দিতেছে?

কিন্তু তুর্কী স্বাধীন। হিজ্জাজের ইবনে সউদ স্বাধীন যমনের ইমাস ইয়হিয়া স্বাধীন। সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতা অসহযোগিতা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। ট্রেনসজর্ডানও গুছাইয়া লইয়াছে।

বুঝিতে পারিতেছি পাঠকের ধৈর্যচ্যুতির উপক্রম। আর বাক্যবিন্যাস করিব না। তবে আশা করি এইটুকু বুঝিতে কাহারো অসুবিধা হইবে না যে, বড়লাটি লাঠি ভারতীয়দের হাতে না আসায় দুঃখ করিবার কিছু নাই। কংগ্রেস-লীগ ভিন্ন ভিন্ন কারণে লাঠি নেন নাই বা পান নাই, কিন্তু আর যাহাই হউক, মধ্য প্রাচ্য সেজন্য তাঁহাদের নিন্দা করিবে না। সাম্রাজ্যবাদীরা করিতেছে, তাহাতেই মনে হয় ভালো কর্মই করিয়াছি। আল্লা মেহেরবান, আমাদের অজানাতেই হয়ত আমাদিগকে শুভবুদ্ধি দিয়াছেন।

যুবরাজ-রাজা-কাহিনীর পটভূমি

তুলনাত্মক শব্দতত্ত্ব যেরূপ কোনো এক শুভদিনে আপাদমস্তক নির্মিত হয়নি ঠিক সেইরূপ তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্ব হঠাৎ একদিন জন্মগ্রহণ করেনি। গ্রীক রোমান ঐতিহাসিকরা যে-সব জাতির সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের ধর্মের বিবরণও অল্পবিস্তর দিয়েছেন। বলা বাহুল্য এসব বিবরণের অধিকাংশই পক্ষপাতদুষ্ট। আর এঁদের ভিতর যাঁরা নাস্তিক ছিলেন তাঁরা নানা ধর্মের বিবরণ দেবার সময় সব কটাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন, নিজেরটাকেও ব্যত্যয় দেননি, অর্থাৎ প্রতিচ্ছবির স্থলে কেরিকেচার এঁকেছেন। তথাপি যে পদ্ধতির গ্রন্থই হোক না কেন, এগুলোকে বাদ দিয়ে কোনো বিশেষ ধর্মের বা একাধিক ধর্মের ইতিহাস রচনা করা অসম্ভব, এবং বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস রচিত না হওয়া পর্যন্ত তুলনাত্মক ধর্মশাস্ত্রের গোড়াপত্তনও অসম্ভব।

খৃষ্টধর্মের প্রচার ও প্রসার হওয়ার ফলে গ্রীক, রোমান তথা ইউরোপীয় অন্যান্য ধর্ম লোপ পায়। শুধু তাই নয়, ভিন্ন ধর্মের বিবরণ লেখার ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দী ধরে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়। আজ যাঁরা জানতে চান, গ্রীক, রোমান, ট্যুটন্‌দের ধর্ম প্রাথমিক খৃষ্টধর্মের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল তাদের তন্ন তন্ন করে গ্রীক ও রোমানদের সর্বপ্রকারের রচনা পড়তে হয় এবং সেখান থেকে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেন সেগুলোর সন্ধান নিতে হয় প্রাথমিক খৃষ্টধর্মের

কোন্ কোন্ আচার অনুষ্ঠানে এরা নির্বিঘ্নে অনুপ্রবেশ করেছে, কিংবা খৃষ্টধর্ম গ্রন্থের অনুশাসন উপেক্ষা করে নবদীক্ষিত খৃষ্টানগণ নিজেদের প্রাক খৃষ্টীয় আচার অনুষ্ঠান নূতন ধর্মে কিভাবে এবং ইয়োরোপের কোন্ কোন্ জায়গায় প্রবর্তন তথা সংমিশ্রণ করেছে—এইসব তাবৎ তথ্য প্রভূত পরিশ্রম তথা গভীর গবেষণা দ্বারা সঞ্চয় করে তবে খৃষ্টধর্মের সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা সম্ভব। আজ যে-রকম ভারতীয় চার্বাক প্রভৃতির লোকায়ত দর্শন পুনর্নিমাণ করা অতিশয় সুকঠিন কর্ম।

সপ্তম শতাব্দীতে নবজাত ইসলামের সঙ্গে খৃষ্টধর্মের সংঘর্ষের ফলে একে অন্যের ধর্মের বিরুদ্ধে রূঢ়তম কুৎসা প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু মুসলমানদের বাধ্য হয়ে অনেকখানি সংযত ভাষা ব্যবহার করতে হল কারণ পবিত্র কুরানে খৃষ্টকে আল্লার প্রেরিত-পুরুষ বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, ক্রুসেডের নৃশংস যুদ্ধ সত্ত্বেও দুই ধর্মের গুণীজ্ঞানী একে অন্যের বিজ্ঞান, দর্শন ও ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। আরবরা ব্যাপকভাবে গ্রীক দর্শন পদার্থবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র আরবীতে অনুবাদ করলেন ও পরবর্তীকালে আরব দর্শনশাস্ত্রের লাতিন অনুবাদ ইয়োরোপে প্রচার ও প্রসার লাভ করলো। এবং এ-স্থলে বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে আরব (ও পরবর্তীকালে ইরানের) সূফীপন্থা (ভক্তিবাদ ও রাজযোগের সমন্বয়) খৃষ্টীয় মিস্টিজিম বা রহস্যবাদের সঙ্গে বারম্বার নিবিড় সংস্পর্শে এল এবং ফলে একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারিত করলো। কোনো কোনো ইয়োরোপীয় পণ্ডিত বিশ্বাস করেন, ইতিমধ্যে ভারতীয় রহস্যবাদ আরব সূফীতত্ত্বকে প্রভাবান্বিত করেছিল।

এ-স্থলে স্পেনবাসী আরব ধর্মপণ্ডিত ইব্ন্ হজ্ম্-এর উল্লেখ করতে হয়। তিনি ইহুদি, খৃষ্ট ও ইসলাম নিয়ে অতি গভীর আলোচনা করেন, কিন্তু পুস্তকখানা যদিও বহু বহু স্থলে অমূল্য রত্ন ধারণ করে, তবু পূর্ণ পুস্তক পক্ষপাতদুষ্ট। ইব্ন্ হজ্মের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল সপ্রমাণ করা : ইসলাম সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম এবং শুধু তাই নয়, ইসলামে যে শতাধিক শাখা-প্রশাখা বহুবিধ সেক্ট্, ‘স্কুল্স্’ আছে, তার মধ্যে তিনি নিজে যেটিতে জন্মগ্রহণ করেন সেইটিই সর্বোৎকৃষ্ট বটে ও সর্বগ্রাহ্য হওয়া উচিত।

এক হাজার বছর পূর্বেকার গজনীর বাদশা মাহমূদের সভাপণ্ডিত আলবীরূনীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—যদিও তিনি মূলত তাঁর “ভারতের বিবরণ” গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম, তার নানা শাখা-প্রশাখা, আচার-অনুষ্ঠান, কুসংস্কার, কিংবদন্তীর বয়ান দিয়েছেন এবং যেহেতু ভারতীয় ধর্ম মাত্রই কোনো না কোনো দর্শনের দৃঢ়ভূমির

উপর নির্মিত, তিনি তাঁর প্রামাণিক গ্রন্থে ভারতীয় দর্শন সাতিশয় নৈপুণ্যসহ বিশ্লেষণ করেছেন। এবং স্থলে স্থলে ইসলামের সঙ্গে তুলনাও করেছেন। প্রতিমানাশক, কট্টরতম মুসলমান মাহমূদের সভাপণ্ডিত কোনো স্থলে হিন্দু ধর্মের বিশেষ কোনো মতবাদ বা আচারের প্রতি দৈবাৎ সহানুভূতি প্রকাশ করলে সেটা যে তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে সাতিশয় উপকারী হত না সেটা সে যুগের রাজ-জহ্লাদ ভিন্ন অন্যজনও নিঃসঙ্কোচে ভবিষ্যবাণী করতে পারতো। তৎসত্ত্বেও পরম আশ্চর্যের বিষয় তিনি ইসলামের প্রতি সরল অনুরাগ প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু ধর্মের প্রশংসনীয় দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং কোনো কোনো নিন্দনীয় আচারের কারণ দেখিয়েছেন। পাঠক মাত্রই সহজে প্রত্যয় করবেন না, যে-মাহমূদ হিন্দুর প্রতিমা ভঙ্গ করাটা অতিশয় শ্লাঘার বিষয় বলে মনে করতেন তাঁরই সভাপণ্ডিত আভাসে ইঙ্গিতে এবং তুলনার সাহায্যে প্রতিমা পূজার পিছনে যে হেতুটি রয়েছে সেটা যে অত্যন্ত স্বাভাবিক সেটা বুঝিয়ে বলেছেন। এ-স্থলে জরাজীর্ণ স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে সংক্ষেপে সেটি নিবেদন করি : মক্কা গমনে সম্পূর্ণ অসমর্থ অথচ হজ পালন করা যখন তার একমাত্র অবশিষ্ট কাম্য, সেই অর্ধমৃতজনকে যদি কেউ মক্কার একখানা ছবি দেখায় তবে কি তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হবে না, অশ্রুজল দুই চক্ষু সিক্ত করবে না, কম্পিত কলেবরে সে হজকামী ছবিখানাকে হয়তো বারম্বার চুম্বন দিতে আরম্ভ করবে এবং হয়তো বা যুক্তিতর্কের বিধান বিস্মৃত হয়ে সেই অতি সাধারণ জড় কাগজখণ্ডকে অলৌকিক দৈবশক্তির আধার বলে সম্মান প্রদর্শন করতে আরম্ভ করবে! অতএব যে স্থলে কলায় সুনিপুণ শিল্পী বহুমানবের ধারণা সাধনাকে মৃন্ময়রূপ দিতে সক্ষম হন, সে-প্রতিমার সম্মুখে কি সাধারণ মানুষ নতজানু হবে না? অবশ্য গোড়াতেই আলবীরূনী প্রতিমা পূজার প্রতি আপন বিরাগ প্রকাশ করেছেন। এস্থলে স্মরণীয় যে অস্মদ্দেশীয় বহু বেদান্তবাগীশ তথা ব্রহ্মসমাজ প্রতিমা-পূজা সমর্থন করেন না। অন্যান্য অনেকেই এ-মার্গকে নিম্নস্তরে স্থান দেন।

পাঠান যুগে যদিও নিজামউদ্দীন আউলিয়া প্রভৃতি চিশ্‌তী সম্প্রদায়ের সুফী ভাবাপন্ন সাধুগণ অতিশয় পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন বলে যে-কোনো ব্যক্তি আপন ধর্ম ত্যাগ না করে তাঁদের শিষ্য হতে পারতো, তথাপি ব্যাপকভাবে উভয় ধর্ম নিয়ে বিশেষ কোনো চর্চা হয়েছে বলে এ অক্ষম লেখকের জানা নেই। তবে নিজামউদ্দীনের শিষ্য ও সখা সুকবি আমীর খুসরৌ ভারতের প্রচলিত ভাষা, সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধে অতিশয় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন।

পাঠান রাজবংশ ভারতে বাস করার ফলে ক্রমে ক্রমে মার্জিত রুচিসম্পন্ন হয়ে যান। তাঁদের তুলনায় সে যুগের মোগলদের বর্বর বললে অত্যুক্তি করা হয় না। বাবুর অসাধারণ মেধাবী, বহুগুণধারী পুরুষ। কিন্তু যদিও তিনি তাঁর রোজনামচায় ঘন ঘন আল্লাতালার নাম স্মরণ করেছেন, সেজন্য তাঁকে সত্য ধর্মানুরাগী মনে করাটা বোধ হয় ঠিক হবে না (ইংরেজ প্রতিদিন পাঁচশ' বার "থ্যাঙ্ক" আওড়ায় ; অতএব তার কৃতজ্ঞতাবোধ, উপকারীর প্রতি তার আনুগত্য আমাদের চেয়ে পাঁচশ' গুণে বেশী এহেন মীমাংসা বোধ হয় সমীচীন হবে না)। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে ইসলাম-নিন্দিত একাধিক ব্যসনে অত্যধিক আসক্ত তিনি তো ছিলেনই, তদুপরি যুদ্ধজয়ের পর তিনি যে রুদ্রমূর্তি ধারণ করে ইসলামের মূল সিদ্ধান্ত অনুশাসন লঙ্ঘন করে উৎপীড়ন, বর্বরতম পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ সমাপন করেছেন, সে-সব তিনি সগর্বে নিজেই আপন রোজনামচায় লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

বস্তুত এক কথায় বলা যেতে পারে, ইসলামে দীক্ষিত বাবুরাদি তুর্কমান (মোগল নামে এদেশে পরিচিত) ইসলাম সেভাবে গ্রহণ করেনি, বাঙলাদেশের মুসলমান যেরকম হৃদয় দিয়ে করেছে। আর মোগল রাজাদের ভিতর এক ঔরঙ্গজেব ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন স্বধর্ম ইসলামের প্রতি উদাসীন, একাধিকজন সিনিক্ এবং প্রায় সকলেই কি ইসলাম কি হিন্দুধর্ম সব ধর্ম ব্যবহার করেছেন অস্ত্ররূপে রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য।

হুমায়ূনের জীবন এতই সংগ্রামবহুল যে তিনি অন্য কোনো বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করতে পারেননি। আপন যুবরাজ সম্পূর্ণ নিরক্ষর রইলেন তাঁরই চোখের সামনে।

নিরক্ষরজন যে অশিক্ষিত হবে এমন কোনো আপ্তবাক্য নেই।

নিরক্ষরজন সম্বন্ধে কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু সে সাক্ষর হয়ে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাস করেনি তাই কোন্ পুস্তক উত্তম আর কোন্টা অধমাধম, কোন্টা সত্য আর কোন্টা নিছক বুজরুকী, এক কথায় তার মূল্যায়নবোধ বিকশিত হয় না। তারই ফলে দেখা যায় নিরক্ষরজন সাধারণত আপন স্বার্থের সামগ্রী ভিন্ন অন্য কোনো বাবদে বিশেষ কৌতূহলী নয়। পক্ষান্তরে এটাও মাঝে মাঝে দেখা যায় যে কোনো কোনো নিরক্ষরজনের বিধিদত্ত জ্ঞানতৃষ্ণা ছিল কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক সে সাক্ষর হয়ে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসের রীতি অনুযায়ী উত্তম অধম নানাবিধ পুস্তক অধ্যয়ন করেনি। ফলে তার মূল্যায়নবোধ যথোপযুক্ত-রূপে বিকাশলাভ করতে পারেনি।

আকবর এরই প্রকৃষ্টতম উদাহরণ। সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হিসেবে তিনি উত্তমরূপেই হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে, ভারতের সর্বপ্রধান সনাতন হিন্দুধর্ম, ইসলাম, দুই ধর্মের শাখাপ্রশাখা এবং হিন্দু-মুসলমান সাধুসন্ত সর্বধর্মের মিলন সাধনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যে-সব "পন্থা" প্রচার করেছেন এগুলোর কোনো একটা সমন্বয় না করতে পারলে সাম্প্রদায়িক কলহের ফলে যে কোনো দিন মোগল বংশ সিংহাসনচ্যুত হতে পারে। অতএব আহ্বান জানালেন, সর্বধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের। এমন কি যে-জৈনদের সংখ্যা ভারতে নগণ্য এবং সে-যুগে তারা প্রধানত গুজরাত, কাঠিয়াওয়াড ও মারওয়াড় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁদেরও প্রধানতম জৈন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ জানালেন। তিনি অতি সুন্দর ভাষায় জৈনধর্মের মূল সিদ্ধান্ত এবং বিশেষ করে জীবে দয়া সম্বন্ধে আম-দরবারে বক্তৃতা দিয়ে মায় আকবর সভাজনকে মুগ্ধ করলেন। ওদিকে আকবর ছিলেন ছিদ্রান্বেষী তথা "ইনসাইড স্টরি" জানবার জন্য মহা কৌতূহলী এবং তিনি জানতেন, হিন্দু এবং জৈনদের মধ্যে একটা আড়াআড়ি ভাব আছে। রাত্রে ডেকে পাঠালেন হিন্দু পণ্ডিতকে। তিনি বললেন, "জৈন গুরু যে এত লম্ফঝম্প করলেন তাঁকে শুধোবেন তো মহারাজ, এ-প্রবাদটির অর্থ কি—

"হস্তীনা তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ জৈন মন্দিরম্।

হস্তী কর্তৃক বিতাড়িত হলেও জৈন মন্দিরে (বা গৃহে) প্রবেশ করে না।"

আকবর পরদিন প্রশ্নটি শুধানোর পর জৈন গুরু মৃদু হাস্যসহকারে বললেন, "আমি যদি উত্তরে বলি

"হস্তীনা তাড্যমানপি ন গচ্ছেৎ (শৈব) মন্দিরম্[১]

হস্তী কর্তৃক বিতাড়িত হলেও শৈব মন্দিরে (বা শৈবের গৃহে) প্রবেশ করো না। তা হলে ছন্দপতন হয় না, অর্থও তদ্বৎ—শুধু জৈনের পরিবর্তে শৈবের কুৎসা করা হয়। বিদ্বেষপ্রসূত এ-সব প্রবাদের কোনো সত্যমূল্য নেই।"

আকবর রাজনৈতিক কারণে, নিজ স্বার্থে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বিবরণ শোনার পর স্বয়ং একটি নবীন 'ধর্ম' প্রচার করতে চেয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, "ইসলামের হজরৎ নবী ছিলেন নিরক্ষর, আমিও নিরক্ষর। তদুপরি আমার হাতে রাজদণ্ড। আমা দ্বারা এ-কর্ম সফল হবে না কেন?" সে যা-ই হোক, তিনি

---

[১] অধমের সংস্কৃত জ্ঞান এতই অল্প যে তার জন্য ক্ষমাভিক্ষা করতেও লজ্জা বোধ করি। বানানে নিশ্চয়ই একাধিক ভ্রম আছে। পাঠক নিজ গুণে শুধরে নেবেন। কাহিনীটিও স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে লিখেছি।

তুলনাত্মক ধর্মতত্ত্বের নিরপেক্ষ সন্ধানীজন নন। তবে এ-কথা অতি সত্য যে তিনি সর্বধর্মের সর্বগুরুকে বাদশাহী নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাজদরবারে আসন দেওয়ার ফলে ধর্ম বাবদে মোগল রাজসভা অনেকখানি সঙ্কীর্ণতা-মুক্ত হয়ে যায় এবং পরবর্তীকালে "সর্বধর্মজিজ্ঞাসা"র পন্থাটি সুখগম্য করে তোলে।

জাহাঙ্গীর সর্ব বিষয়েই ছিলেন উদাসীন—যা অত্যধিক মদ্যাসক্তজনের প্রায়শ হয়ে থাকে।

শাহজাহানের মতিগতি বোঝা কঠিন। সুবৃহৎ লালকেল্লাতে কত না রঙমহল, কত না হাম্মাম, সম্পূর্ণ একটি হট্ট, কত না নিষ্কর্মা এমারৎ, নহবৎখানা, বন্দীশালা, এবং দুই বিরাট সভাগৃহ। অথচ বেবাক ভুলে গেলেন (?) দুর্গবাসীদের পাঁচ বেলা নামাজ পড়ার জন্য একটি ছোটাসে ছোটা মসজিদ বানাতে! দিল্লীর দারুণ গ্রীষ্ম এবং নাকেমুখে আঁধির ধুলো খেতে খেতে তাদের দ্বিপ্রহরে যেতে হত জামি মসজিদে। দিল্লীর কাঠ-ফাটা শীতের রাত্রে এশার নমাজ পড়তে।

তা সে যাই হোক, তিনি অদ্ভুত একটা একস্‌পেরিমেণ্ট করেছিলেন তাঁর চার পুত্রের শিক্ষা ব্যবস্থায়। এক পুত্রকে স্পেশালাইজ করালেন রণকৌশলে, অন্যকে সঙ্গীতাদি চারুকলায়, কনিষ্ঠ ঔরঙ্গজেবকে ছেড়ে দিলেন কট্টর মোল্লাদের হাতে এবং তাঁর সর্বাধিক প্রিয় জ্যেষ্ঠ দারা শীকূহকে শেখালেন সর্বধর্ম সর্ব সম্প্রদায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন।

* * *

সর্বধর্ম চর্চা করার জন্য মোল্লাদের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও আকবর যে-পথ সুগম করে দিয়ে সর্বধর্মগুরুকে রাজসভায় ডেকে এনে বসিয়েছিলেন, সেই সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম দুই পুরুষ ধরে ছিল অনাবৃত অবহেলিত। দারা স্বয়ং সে পথ দিয়ে যাত্রারম্ভ করলেন। এবং শুধু তাই নয়, আকবরের কালে মৌলভী সাহেব সভাস্থলে প্রচার করতেন ইসলাম, হিন্দু পণ্ডিত প্রচার করতেন হিন্দুধর্ম, যে যার আপন ধর্ম—দারা সম্মুখে আদর্শ ধরলেন সর্বশাস্ত্র মূল ভাষাতে অধ্যয়ন করে, ব্রাহ্মণসন্তান যে রকম সংস্কৃত অধ্যয়ন করে, মুসলিম-সন্তান যে-রকম আরবী ভাষা আয়ত্তে আনে—তিনি একাই যেন সর্বধর্মের মুখপাত্র হতে পারেন। কিন্তু এস্থলে একটি বিষয়ে আমাদের মনে যেন কোনো দ্বন্দ্ব না থাকে, দারা কোনো নবধর্ম প্রবর্তনের উদ্দেশ্য নিয়ে অধ্যয়ন, গবেষণা তথা অনুবাদকর্মে লিপ্ত হননি। আকবর যে পদ্ধতিতে অগ্রসর হয়েছিলেন সেটা দারার মনঃপূত হয়নি। আকবর ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের বিবরণ শোনার পর প্রত্যেক ধর্মের কতকগুলো সিদ্ধান্ত, যেগুলো ঐ ধর্মের প্রত্যেককে বিনা

যুক্তিতর্কে মেনে নিতে হয় অর্থাৎ ডকট্রিন, শিবলেথ এবং ঐ ধর্মের অবশ্য করণীয় আচার-অনুষ্ঠান—রিচুয়াল এ-দুটি অঙ্গের উপর দিলেন প্রধান জোর ; ডকট্রিন এবং রিচুয়াল। অতঃপর আকবর সর্ব প্রধান প্রধান ধর্মের সর্ব ডকট্রিন ও রিচুয়াল সংগ্রহ করে বিচার করে দেখলেন এর কোন্-কোন্গুলো এ-দেশের জনসাধারণে প্রচলিত ও সর্বজনগ্রাহ্য হয়েই আছে, কোন্-কোন্গুলো আপন ধর্মে না থাকা সত্ত্বেও সে ধর্মের লোক ঐগুলো আপত্তিজনক বলে মনে করে না এবং কোন্ কোন্গুলো ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মধ্যে বিদ্বেষ, কলহ এমন কি রক্তপাত পর্যন্ত ঘটিয়েছে। বিচার-বিবেচনার পর তিনি তাঁর নবীন ধর্মে এমন সব ডকট্রিন ও রিচুয়েল নিলেন যেগুলো সবধর্মগ্রাহ্য হয়েই আছে এবং যেগুলো হওয়ার সম্ভাবনা ধরে।

দারা এ-পথ নিলেন না। তিনি বিচার করে দেখলেন, প্রত্যেক ধর্মের অন্তত কয়েকজন গুণী আপন আপন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন এবং অল্পসংখ্যক ধর্মানুরক্তজনের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকলেও সেগুলি প্রাণবন্ত, ডায়নেমিক। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি মুগ্ধ হলেন হিন্দুর উপনিষদের গভীরে প্রবেশ করে। তসওউর্ফ বা সুফীতত্ত্বকে তিনি ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে দৃঢ়বিশ্বাস রাখতেন—ইসলামের সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করার পর। এবং নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন যে, দুই সাধনার ধারাই সম্মিলিত হয়েছে একই সিন্ধুতে। তাই তাঁর উপনিষদ-সাধনা পুস্তকের নামকরণ করেছিলেন—দ্বিসিন্ধু মিলন—মুজম্ উল্ বহুরেন্। সেযুগে দুই ভিন্ন ধর্মের সাধক একান্তে বসে ধর্মালোচনা করতেন না—বস্তুত আপন ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানের যে বিশেষ ভাষা হয় সেটা অন্যজনের কাছে ছিল সম্পূর্ণ অবোধ্য।

দারার আশা ছিল, উপনিষদ সযত্নে ফার্সী ভাষাতে অনুবাদ করলে মুসলিম তত্ত্বজ্ঞানী সুফী উল্লাসে 'ইউরেকা' শব্দ দ্বারা 'আপন' আবিষ্কারজনিত হর্ষপ্রকাশ করবেন।

দারার বিশ্বাস ছিল, যদিও আপাতদৃষ্টিতে হিন্দুর পুরোহিত তথা মুসলমানের মোল্লা যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেন, তথাপি তাদের মূল উৎস দুই ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের অধিকারী যারা তাঁরাই।

মুসলিম সুফী একবার হিন্দুর উপনিষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর তাঁর ও হিন্দু ব্রহ্মবাদীর মাঝখানে তো কোনো অন্তরাল থাকবে না—কুৎসা-কলহের তো কথাই ওঠে না। ফলে এঁরাই পুরোহিত মোল্লাদের যে নূতন অনুপ্রেরণা দেবেন, তারই ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শাশ্বত মিলন স্থাপিত হবে।

নিয়তি দারাকে আপন কর্ম সমাপ্ত করতে দিলেন না। নইলে তিনি যে হিন্দুর বিচিত্র সব মণিমানিক্য মুসলমানের সামনে এবং মুসলিম জওহর-জওয়াহির হিন্দুর সম্মুখে ক্রমে ক্রমে তুলে ধরতেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ভারতেরই নিয়তি, বিবেকানন্দ দীর্ঘজীবী হলেন না, শঙ্করাচার্যের আয়ুষ্কাল তো মাত্র বত্রিশ, চৈতন্যের বিয়াল্লিশ। রামমোহন দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন বটে কিন্তু তিনি হাত দিলেন একই সময়ে সর্বকঠিন দুটি কর্মে, যার একটাই যে-কোনো কালের যুগশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তমকে নিঃশেষ করে দেয়—ধর্ম সংস্কার এবং সমাজ সংস্কার যুগপৎ! তদুপরি তাঁকে ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আরো বহুবিধ কর্মে লিপ্ত হতে হয়; সর্বশেষে উল্লেখ করতে হয়, পাদ্রী মোল্লাদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে তাঁর কালক্ষয় হয় প্রচুর।

দারা ও রামমোহনের উভয়েরই শিক্ষার বাহন ফার্সী, সংস্কৃত এবং আরবী। দীক্ষা দুজনার ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু উভয়েই মিলিত হয়েছিলেন উপনিষদের একই সিন্ধুতে। অতএব দারার গ্রন্থ 'মুজম উল-বহরেন' এই উভয় সাধকের বেলাও প্রযোজ্য। অপিচ রামমোহনের ফার্সীতে লিখিত প্রথম কেতাব 'তুহাফাতুল মুওয়াহ্‌হিদীন'—'একম এবং অদ্বিতীয়মে বিশ্বাসীজনের প্রতি সওগাৎ যদি কাউকে উৎসর্গ করতে হয় তবে রাজার সঙ্গে একই তীর্থের যাত্রী রাজপুত্র দারাকে। রামমোহনের প্রথম পুস্তক ফার্সীতে এবং দারার পুস্তকও ঐ ভাষায় এবং উভয়ের পুস্তকের শিরোনাম আরবীতে। দুজনাই পুস্তক লিখেছেন মুসলমান সাধকের উদ্দেশ্যে। দারা আপন বক্তব্য বলেছেন উপনিষদ মারফৎ, রামমোহন তাঁর যুক্তিতর্ক সঞ্চয় করেছেন ইসলামের ভাণ্ডার থেকে। দুই পুস্তকই ধর্ম ও দর্শনের সংমিশ্রণ। আরো বহুক্ষেত্রে দুজনার ঐক্য, একাত্মবোধ ধরা পড়ে—শুধু লক্ষ্যবস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গীতেই নয়।

নেতির দিক দিয়ে দেখলে যে-সাদৃশ্য চোখে পড়ে সেটি বিস্ময়কর। কেউই কোনো নূতন ধর্ম প্রচার করেননি, করতে চাননি।

দারা এবং রাজা সম্বন্ধে গত ত্রিশ বৎসর ধরে যে-সব গবেষণা হয়েছে তার অধিকাংশ—অধিকাংশ কেন, শতাংশের একাংশ পড়বার সুযোগ আমার হয়নি। গ্রহচক্রে আমি সে মণ্ডল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। তাই এই রচনায় বিস্তর ত্রুটিবিচ্যুতির অবকাশ অনিবার্য। তবু কেন যে বার্ধক্যে এই অর্বাচীনসুলভ অপকর্ম করলুম সে তত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় অবগত আছেন। পাঠককে জানিয়ে কোনো লাভ নেই। লেখকের ভুলভ্রান্তি তার চক্ষুগোচর হলে সে অকৃপণ হস্তে হতভাগ্যের কর্ণমর্দন করার সময় আদৌ কর্ণপাত করে না—বেচারা লেখকের ওজুহাত-অছিল

তথা করুণকণ্ঠে তার ক্ষমাভিক্ষার প্রতি।

সৈয়দ মুজতবা আলীর এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধ রচনার একটি ছোট্ট ইতিহাস আছে। প্রবন্ধটি রচনার তারিখ ১৯৭৩ সনের ৩০ জানুয়ারি। ওই বছরটি ছিল রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম দ্বিশতবার্ষিকীর বছর। ইন্দো-ইটালিয়ান সোসাইটির বর্তমান সম্পাদক শ্রীরবিউদ্দীনের (যিনি কাজী নজরুল ইসলামের চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ইউরোপ যাবার সময় কবির একান্ত সচিব ছিলেন) প্রচেষ্টায় রাজা রামমোহনের জন্মস্থান রাধানগরের সন্নিকটস্থ নতিবপুর গ্রামে ওই উপলক্ষে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল রাজা রামমোহন ও যুবরাজ দারাশীকূহ্‌র উদার সহনশীল সমন্বয়ধর্মী কর্ম ও আদর্শ সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা। ওই সভার সভাপতি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ইংরেজী ভাষার অধ্যাপক ডঃ অমলেন্দু বসু। ওই আলোচনা সভার জন্য এই প্রবন্ধটি রচনা করেন সৈয়দ মুজতবা আলী তাঁর একান্ত স্নেহভাজন ডাক্তার মহম্মদ আব্দুল ওয়ালীর বিশেষ অনুরোধে এবং আলী সাহেব এই প্রবন্ধটি পড়বার দায়িত্বও ডাক্তার ওয়ালীর উপর ন্যস্ত করেন।

যোগাযোগ

নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভ করার উপলক্ষে যে কোনো জাতিরই উল্লসিত হওয়ার কথা; বিশেষত যে জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে, যে জাতি অতীতে মানব-সংসারে জ্ঞানের চিরন্তন দেয়ালি উৎসবে বহু প্রদীপ জ্বালিয়েছে, তার স্বরাজ্যলাভে পৃথিবীর বিদগ্ধ সম্প্রদায়েরও নিরঙ্কুশ আনন্দ হওয়ারই কথা। যে জাতি একদিন উপনিষদের দর্শন দিল, তথাগতের অমৃতবাণী শোনালো, গীতার সর্বধর্মসম্মেলন শিখালো, ত্রিমূর্তি নির্মাণ করলো, তাজমহলের মর্মর স্বপ্ন দেখালো, তার কাছ থেকে পৃথিবীর গুণীজ্ঞানীরা এখন অনেক কিছুই আশা করবেন। স্বাধীনতা লাভের পর এখন আর তাদের নিরাশ করবার কোনো ওজুহাত আমাদের রইল না। এখন আর ইংরেজের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে আমরা রেহাই পাবো না।

সাংস্কৃতিক বৈদগ্ধ্যের নবজীবন লাভ অনেকখানি নির্ভর করে দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুসামঞ্জস্যের উপর। দারিদ্র্য যদি না ঘোচে, শক্তির সাধনায় স্বাধিকারপ্রমত্ত হয়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা যদি খাদ্যের পরিবর্তে আগ্নেয়াস্ত্র সঞ্চয়ে মনোযোগ দিয়ে দেন, তাহলে যে উচ্চাঙ্গের সাহিত্য-কলা-দর্শন এ-দেশে পুনরায় বিকশিত হবে না, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হতে পারি। হিটলারের জর্মনি, স্তালিনের রুশিয়া যে বিশ্বমানবকে হতাশ করেছে, সে কথা

কারো অজানা নয়।

মহাত্মা গান্ধী যখন আততায়ীর হাতে প্রাণ দিলেন, তখন আমরা ভয় করেছিলুম যে হয়ত বা আততায়ীর শক্তি সম্প্রদায় তাবৎ দেশটাকে গ্রাস করে নব নব হিটলার, নব নব স্তালিনের দাস্যগ্রহণ করবেন। আমাদের পরম সৌভাগ্য আমরা সে 'মহতী বিনষ্টে'র হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি, আমাদের চরম সান্ত্বনা যে দেশের আপামর জনসাধারণও সে নিষ্কৃতির কিছুটা হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছে।

পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যে স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, আমরা শান্তি ও মৈত্রীর কামনা করি, কোনো দেশ জয় করার কামনা আমাদের নেই, হিন্দুস্থান-পাকিস্তান সংযুক্ত করার কোনো ইচ্ছা আমাদের নেই, এ বড় কম কথা নয়। কারণ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, আমাদের ভৌগোলিক অবস্থা এমন যে, একমাত্র পাকিস্তান ভিন্ন অন্য কোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রাম হবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। তাই আশা করতে পারি, আজ না হোক কাল নেতাদের সর্বপ্রচেষ্টা দেশের অভাব-অঘটন মোচন করাতে নিয়োজিত হবে।

কিন্তু তাই বলে এ-কথা বলা চলে না যে, দেশের দারিদ্র্য না ঘোচা পর্যন্ত সংস্কৃতি বৈদগ্ধ্যের ক্ষেত্রে আমাদের বীজ পোতার প্রয়োজন নেই, ফসল ফলাবার ত্বরা নেই। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এই তিন প্রচেষ্টাই একই সঙ্গে চালাতে হয়—অবস্থার তারতম্যে বিশেষ জোর দেওয়া বিশেষ কোনো অঙ্গে, এই মাত্র।

ভারত এবং পাকিস্তানের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব যে বিকট রুদ্র রূপ নেবে না, সে সম্বন্ধে আশ্বস্ত হওয়ার পরও প্রশ্ন থেকে যায় সংস্কৃতির দিক দিয়ে এই দুই রাষ্ট্রের যোগাযোগ থাকবে কি থাকবে না, এবং যদি থাকে তবে সেটি কি প্রকারের হবে।

একটা দৃষ্টান্ত পেশ করি। সকলেই জানেন, প্যালেসটাইনের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ট্রান্সজর্ডান এবং তার প্রতিবেশী সউদী আরব যে পালেসটাইনের আরবকে ইহুদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে কোনো সাহায্য করতে পারল না, তার প্রধান কারণ আমীর আবদুল্লা ও ইবনে সউদের শত্রুতা। আমীর আবদুল্লার ভয় ছিল যে তিনি যদি সর্বশক্তি নিয়ে প্যালেসটাইন আক্রমণ করতে পারেন, আবদুল্লার পক্ষে উভয় রণাঙ্গনে যুদ্ধ করা অসম্ভব হবে—হিটলারও পারেননি এবং ফলে তাঁর দুই কূলই যাবে।

কিন্তু তাই বলে ট্রান্সজর্ডান ও সউদী আরবের কৃষ্টিগত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। কাবাশরীফের চতুর্দিকে ধর্ম সম্বন্ধে আরব তথা অন্য দেশবাসী শেখরা প্রতিদিন যে বক্তৃতা দেন, সেগুলোতে ট্রান্সজর্ডানের অধিবাসীরা আগেরই মত হাজিরা দিয়েছে এবং আম্মানে লেখা কেতাব মক্কাতে পূর্বেরই ন্যায় সম্মান পেয়েছে। শুধু তাই নয়, মক্কা এবং আম্মান উভয় শহরের বিদ্যার্থীরাই কাইরোর আজহরে গিয়ে আগেরই মত পড়াশোনা করেছে। ইবনে সউদ মক্কা দখল করার পর বহু বৎসর পর্যন্ত মিশর-মক্কায় মনোমালিন্য ছিল—এমন কি মিশর থেকে কাবাশরীফের বাৎসরিক গালিচা আসা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের মক্কা-মদনওয়ী ছাত্রাবাস বন্ধ হয়ে যায়নি কিংবা ছাত্রেরও অপ্রাচুর্য হয়নি—মিসরে ছাপা ইমাম আবু হনিফার ফিকার কিতাব আগেরই মত মক্কার বাজারে বিক্রয় হয়েছে।

আরব-ভূমি আজ কত ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত, তবু যখন আজহরে পড়তুম, সব রাষ্ট্রের ছেলেদের সঙ্গেই আলাপ-পরিচয় হয়েছে, তাদের আপন আপন হস্টেলে গিয়েছি, সকলে মিলে বাজার থেকে মুর্গী কিনে এনে হৈ-হুল্লোড় করে রান্না করে খেয়েছি। বিশ্বাস করবেন না, রান্নার সর্দার ছিলো মালদ্বীপের একটি ছেলে—মালদ্বীপ কোথায়, সে কথাই বহু ছাত্র জানতো না।

এইবার গোটা দুই ইয়োরোপীয় উদাহরণ পেশ করি। ভাষা এবং কৃষ্টির দিক দিয়ে দেখতে গেলে ফ্রান্সের উত্তর-পূর্বাংশ পড়েছে সুইটজারল্যাণ্ডের ভিতর। উত্তরাংশের খানিকটা পড়েছে লুক্সেমবুর্গের ভিতর এবং আরো খানিকটা বেলজিয়ামের ভিতর। এ-সব দেশের লোকেরা আপন আপন রাষ্ট্রের প্রতি সর্বান্তঃকরণে আনুগত্য স্বীকার করে—ফ্রান্সও কখনো বলে না, এসব ফরাসী-ভাষী ভূখণ্ডগুলো লড়াই করে দখল করবো। অথচ কৃষ্টিগত আদান প্রদান এই তিন ভূমিতে হামেশাই চলেছে। প্যারিসে আঁদ্রে জিদের বই যে-দিন বেরোয় ঠিক সেই দিনই সে-বই জিনিভা, লুক্সেমবুর্গ এবং ব্রাসেলসসে কিনতে পাওয়া যায়। জিনিভার বড় প্রকাশকরা প্যারিসে ব্রাঞ্চ রাখে, ব্রাসেলসের প্রকাশকরা জিনিভায় আপন শাখা খুলতে পারলে খুশী হয়।

কিন্তু ঢাকার সাহিত্যামোদী এবং প্রকাশক হয়ত বলবেন, 'আমরা কলকাতার ধামাধরা হয়ে থাকতে চাইনে, কাজেই এ উদাহরণটা আমাদের মনঃপূত হল না।'

উত্তরে ভিয়েনা-বার্লিনের দৃষ্টান্ত পেশ করবো। দুই শহর দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানী। কেউ কারো চেয়ে কম নয় এবং এককালে অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির (-মায়

যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া) প্রতাপ জর্মনির চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। দু'শহরের লোকই জর্মন বলে, জর্মন থিয়েটার দেখে, জর্মন অপেরা শোনে। ভিয়েনাতে কোনো নাট্য-সমঝদারের সাবাসী পেলে সঙ্গে সঙ্গেই নাট্যকার, অভিনেতা এবং নর্তক-নর্তকীদের নিমন্ত্রণ হয় বার্লিনে—বার্লিনে কোনো লেখক নাম করতে পারলে ভিয়েনা য়ুনিভার্সিটি তাঁকে অনারারি ডক্টরেট দেয়।

এই দু' শহরের দুশমনি-বর্জিত আড়াআড়িতেই বিরাট জর্মন সাহিত্য গড়ে উঠেছে, জর্মন সঙ্গীত বলতে এ কথা কেউ শুধায় না মৎসার্ট, স্ট্রাউসের জন্ম কোথায় হয়েছিল এবং একথা সকলেই জানে যে সঙ্গীতসম্রাট বেটোফেনের জন্ম হয় বন্ (উপস্থিত পশ্চিম জর্মনির রাজধানী) শহরে এবং জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কাটান ভিয়েনাতে।

বাঙলা ভূমিতে ফিরে আসি।

বাঙলার বিদগ্ধ সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ হয় প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে পশ্চিম-বঙ্গের কলকাতাকে কেন্দ্র করে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ (এমন কি শরৎচন্দ্র পর্যন্ত), প্রথম চৌধুরী, নজরুল ইসলাম এরা সবাই জীবনের অধিকাংশ ভাগ কাটিয়েছেন কলকাতায়। বাঙলা সাহিত্য (গদ্যসাহিত্য তো বটেই) রাজধানীর সাহিত্য,—কম্যুনিস্টরা এই সাহিত্যকেই গালাগাল দিয়ে বলেন 'বুর্জোয়া' সাহিত্য—যদিও আমাদের কর্ণে এ গালাগাল বংশীধ্বনির ন্যায় শোনায়।

মাত্র সেদিন পূব-বাঙলার লোক সাহিত্যের আসরে নামলেন। বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, মানিককে কিন্তু বাধ্য হয়ে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়েছে। ঢাকা যে সাহিত্যের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারেনি, তার প্রধান কারণ ঢাকা কখনো কলকাতার মত তামাম ভারত এবং বাঙলার রাজধানী হয়ে উঠতে পারেনি।

আমাদের ভয় হয়েছিল পূর্ববঙ্গ পাছে বাঙলা ভাষা বর্জন করে উর্দু গ্রহণ করে বসে। সে ভয় কেটে গিয়েছে এবং ঢাকার বাঙলা যে উরদু হরফে লেখা হবে না, সে খবরটা পেয়েও আমরা আশ্বস্ত হয়েছি।

এইবার ঢাকার পালা নূতন সাহিত্য সৃষ্টি করবার। কলকাতা যে অদ্যকার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা লাভের ফলে নবীন উৎসাহ, নবীন উদ্দীপনায় নূতন সাহিত্য গড়তে মন দেবে, সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই এবং কলকাতার অধিকাংশ সাহিত্যিকই যে পূর্ববঙ্গে আপন পুস্তকের বহুলপ্রচার কামনা করেন. সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মনে একটু দ্বিধা রয়ে গিয়েছে পূব-বাঙলার ভবিষ্যৎ সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে। কেউ কেউ ভাবছেন পূব-বাঙলা হয়ত এমন সব শব্দ বাক্যবিন্যাস আরবী ফারসী থেকে গ্রহণ করতে আরম্ভ করবে যে, কালে কলকাতার লোক ঢাকায় প্রকাশিত বাঙলা বই পড়ে বুঝতে পারবে না। তাঁদের এ ভয় দূর করে দেবার জন্যই আজ আমার এ-প্রবন্ধ লেখা—যাতে করে পশ্চিমবঙ্গবাসীর স্বাধীনতা লাভের আনন্দ আজ সর্বপ্রকার দ্বিধাবর্জিত নিরঙ্কুশ হয়।

ইচ্ছে করলেই যে-কোনো ভাষা থেকে জাহাজ-বোঝাই শব্দ গ্রহণ করা যায় না। দৃষ্টান্তস্থলে আজকের দিনের বাঙলা ভাষাই নিন। এ ভাষা যে শব্দসম্পদে কত দীন, সে কথা যাঁরা অর্থনীতি, বিজ্ঞান এবং অন্যান্য নূতন চিন্তা নিয়ে বাঙলায় কারবার করেন তাঁরাই জানেন এবং তাঁদের অধিকাংশই ইংরেজি থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি শব্দ গ্রহণ করতে পারলে বহু মুশকিল, বহু গর্দিশ থেকে বেঁচে যেতেন। কিন্তু উপায় নেই—তাঁরা বিলক্ষণ জানেন, ইংরেজি-অনভিজ্ঞ যে পাঠকের জন্য তাঁরা বই লিখতে যাচ্ছেন, তারাই সে বই বুঝতে পারবে না। তাহলে আর লাভটা কি হল?

পূব-বাঙলায় তার চেয়েও বড় বাধা এই যে, গাদা গাদা আরবী ফারসী শব্দ ঢোকাবার মত উমদা আরবী ফারসী এবং বাঙলা জানেন কয়টি গুণী? ডঃ শহিদুল্লা তো একজন। এবং বঙ্গ বিভাগের পরও তিনি বেধড়ক, বেদরদ আরবী-ফারসী শব্দ প্রয়োগ করেননি। যদি করেনও, বুঝবে ক'টা লোক? এন্তার আরবী ফারসী মেশানো বাঙলা বোঝার মত এলেম পূর্ব-বঙালীর এবং আপনার আমার পেটে তো নেই। আর যদি বলেন ভবিষ্যতে একদিন পূর্ব-বাঙলার জনসাধারণ, চাষাভুষো সব্বাই উত্তম আরবী-ফারসী শিখে যাবে আর হুশ হুশ করে আরবী-ফারসীর বগহারে রান্না বাঙলা ভাষা বুঝে ফেলতে পারবে, তাহলে তো সে আনন্দের কথা। প্রত্যেক ব্যক্তি তিনটি ভাষায় (তারও একটা আরবীর মতো কঠিন ভাষা! বিবেচনা করুন) আলিম-ফাজিল, এত বড় ডাঙর সুখস্বপ্ন পূর্ব-বাঙলার নমস্য ব্যক্তিরাও দেখেন না।

আর যদি বলেন, নজরুল ইসলামের মত কোনো শক্তিশালী লেখক এসে সেই কর্মটি করে দেবেন তবে উত্তরে বলি, একদা পশ্চিম-বাঙলাতেই এবং আরবী-ফারসী-অনভিজ্ঞ রসিক সম্প্রদায়ের ভিতরই তাঁর কদর হয়েছিল প্রথম—পূর্ব-বাঙলা তাঁকে আদর করে বহু পরে। আজ যদি ঢাকায় নজরুল ইসলামের মত কবি জন্মান, তবে কলকাতা তাঁর কেতাব আগেরই মত উদ্গ্রীব, স্তম্ভিত-নিঃশ্বাস হয়ে পড়বে। তাতে করে তাবৎ বাঙলা সাহিত্যই শক্তিশালী হবে, শুধু পূব-বাঙলার সাহিত্যই না।

তাই এই আনন্দের দিনে নিবেদন করি, রাজনৈতিকরা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করেছেন। ভারতীয় অন্ততঃ বাঙালী সাহিত্যিক যেন সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের ভিতর দিয়ে সে শান্তি পরিপূর্ণতায় পৌঁছিয়ে দেয়।

‘বাংলা-একাডেমী পত্রিকা’

পূর্ববঙ্গের বাঙলা-একাডেমীর ইতিহাস দিতে গিয়ে একাডেমীর মুখপত্র বলছেন :

“পূর্ব পাকিস্তানে ‘ভাষা আন্দোলনে’র সহিত ‘বাঙলা-একাডেমী’র ইতিহাস অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ১৯৪৮ ইংরেজীর একেবারেই গোড়ার দিকে বাঙলা-ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতিদানের জন্য যে স্বতঃস্ফূর্ত দাবী দেশের তরুণ ছাত্র-সমাজ হইতে উত্থিত হয়, নানা বাধা-বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া তাহা দৈনন্দিন প্রবলতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকে। মাত্র চারি বৎসর পার হইতে না হইতেই, ১৯৫২ ইংরেজীতে আসিয়া এই আন্দোলন চরম বেগ সঞ্চয় করে এবং তাহার ফলে এই সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাঙ্গণে ভাষা-আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। এই অপ্রত্যাশিত ও অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনায় চারিটি ছাত্র নিহত এবং আরো কতিপয় ছাত্র আহত হয়। এই দুর্ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষা-আন্দোলন ছাত্র-সমাজের সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া দেশের সর্বত্র গণআন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।······আন্দোলনটি অচিরেই সরকারের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যায়। এইভাবে ১৯৫৩ সাল কাটিয়ে গেলে পর, ১৯৫৪ সালে দেশে সাধারণ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য জনাব মৌলানা আব্দুল হামিদ খাঁ ভাসানী সাহেবের নেতৃত্বে আওয়ামী-মুসলিম-লীগ যে একুশ দফা কর্মসূচী লইয়া আগাইয়া আসেন, বাঙলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃতি দিয়া ‘বর্ধমান হাউসে’ একটি ‘বাঙলা-একাডেমী’ স্থাপনের পরিকল্পনাও ছিল তাহার মধ্যে অন্যতম।······‘নূতন যুক্তফ্রণ্ট’ সরকারের আমলে ১৯৫৫ ইংরেজীর ৩রা ডিসেম্বর একুশ দফার রূপায়ণরূপে ইহার অন্যতম দফা ‘বাঙলা-একাডেমীর’ উদ্বোধন কার্য ‘বর্ধমান হাউসে’ সুসম্পন্ন করা হয়।”

একাডেমীতে থাকবে (অ) গবেষণা বিভাগ : তার দুটি শাখা—(১) বাঙলা ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস, (২) পাণ্ডুলিপি তথা লোকগাথা, লোকসঙ্গীত ইত্যাদির সংগ্রহ ও প্রকাশ। (আ) অনুবাদ বিভাগ, (ই) সঙ্কলন

ও প্রকাশনা- বিভাগ, (ঈ) সাংস্কৃতিক-বিভাগ—পাঠাগার, সাহিত্য-সভা, পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদি।

বক্ষ্যমান সংখ্যা 'বাঙলা-একাডেমী'[1] পত্রিকার প্রথম সংখ্যা।

পত্রিকায় ন'টি তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত মূল্যবান প্রবন্ধ রয়েছে—মাত্র একটি ছাড়া আর সব কটি প্রবন্ধই একাডেমির সাহিত্যসভায় পড়া হয়েছিল।

প্রথম প্রবন্ধটি উভয় বাঙলায় সুবিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সায়েবের রচনা—এ প্রবন্ধে তিনি 'পণ্ডিত রেয়াজ অল্-দিন আহমদ মাশহাদি' নামক একজন বাঙালী লেখকের 'সমাজ ও সংস্কারক' নামক পুস্তকখানির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তার প্রয়োজনও বিলক্ষণ ছিল, কারণ ১২৯৮ সালে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ সরকার পুস্তকখানি বাজেয়াপ্ত করেন। কেন করেছিলেন সেটা পুস্তকের উদ্ধৃতি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। রেয়াজ অল-দিন রাজনৈতিক নেতা জমাল্উদ্দীন আফগানীর ন্যায় ইংরেজের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার প্রয়াসী ছিলেন। এই প্রচেষ্টা করতে গিয়ে রেয়াজ অল্-দিন হৃদয়ঙ্গম করেন যে একদল হিন্দু যেরকম অন্ধভাবে বিশ্বাস করেন 'সব-কিছু আমাদের শাস্ত্রেই আছে', 'ইয়োরোপীর জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন কিছু নেই যা আমাদের মুনি-ঋষিরা জানতেন না' ঠিক সেই রকম বেশীর ভাগ মুসলমানই বিশ্বাস করেন যে, আরবীর মাধ্যমে তাঁরা যে আরবী-ইরানী আভিচেন্না আভেরস এবং গ্রীক প্লাতো-আরিস্টট্লের দর্শন-বিজ্ঞান ৮০০। ১০০০ বৎসর পূর্বে আয়ত্ত করেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীতেও সেই যথেষ্ট, নূতন কিছু শেখবার নেই। এ বিতর্কের সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যের তেমন কোনো আন্তরিক সম্পর্ক নেই, কিন্তু রেয়াজ অল্-দিন সেদিন তাঁর পর্যবেক্ষণ, মনোবেদনা ও পথনির্দশন যে-ভাষায় প্রকাশ করেছেন সেটি তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ও একাধিক ভাষার সঙ্গে তাঁর দৃঢ় যোগসূত্রের পরিচয় দেয়।

"হিজরি দ্বিতীয়াদি শতাব্দীতে মোসলমান পণ্ডিতেরা যে-সমস্ত দর্শন-বিজ্ঞান-গণিতবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইদানীন্তন শাস্ত্রকোবিদগণও সম্পূর্ণরূপে তাহারই অনুবর্তন করেন। বিশেষ যাঁহাদিগের রচনাশক্তি ও কল্পনাশক্তি সমধিক তেজস্বিনী, তাঁহারা সেই কীট নিষ্কুষিত প্রাচীনতম শাস্ত্রের ব্যাখ্যা বিবৃতি প্রকৃতি লিখিয়া আপনাদের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের বিবেচনা অনুসারে বর্তমান চিন্তা ও নবাবিষ্কৃত সমস্তই ভ্রমপ্রদায়ে আশ্রয় ও অকিঞ্চিৎকর; কেবল

'একাডেমীর' ইংরিজি উচ্চারণই যখন নেওয়া হয়েছে তখন 'একাডেমী' লিখলেই বোধ হয় ভালো হত; কারণ ইংরেজিতে 'মি' হ্রস্ব।

প্রাচীন পণ্ডিতগণের মতের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা পৃথিবী এখনও চলিতেছে; অনুবীক্ষণ, দূরবীক্ষণ, লৌহবর্ত্ম, তড়িতবার্তাবহ, তাপমান, বাতমান প্রভৃতি লোকসমাজের আবশ্যক ও বিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত সত্যাদি সমুদায়ই হিন্দুদিগের বিশ্বকর্মার ন্যায় মুসলমানদের লোক্‌মান-হাকিমের চর্বিত-চর্বণ মাত্র। এ সমস্তকে কল্পতরুরূপী বর্তমান বিজ্ঞান-বৃক্ষের অভিনব বিষ-অমৃত-ফল তাহা মুসলমান অর্ধশিক্ষিত লোকেরা কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না, তাঁহারা আরাস্ত্ত (আরিস্‌টট্‌ল), আফ্‌লাতুন্‌ (প্লেটো) প্রভৃতির প্রাচীন জীর্ণমত সকল গভীর মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া কৃতার্থ হয়েন বটে, কিন্তু আধুনিক নিউটন, গালিলিয়ো, কেপ্‌লার, ডারুইন, লাপ্লাস, কম্‌টির (কঁৎ) অতুল প্রতিভার দিকে তাঁহাদের অনুমাত্রও মনঃসংযোগ নাই। প্রত্যুত একপ্রকার বিদ্বেষ-বুদ্ধি দৃষ্ট হয়। প্রাচীন মোসলমান মহাপণ্ডিতগণ ভারতবর্ষ ও গ্রীসকে আপনাদের শিক্ষাগুরু বলিয়া জগতে অকুণ্ঠিত চিত্তে, মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আধুনিক অজ্ঞান মোসলমান শিক্ষিত লোকেরা তাদৃশ্য প্রাধান্যের কথা মুখে আনিতেও লজ্জা বিবেচনা করেন। সুতরাং পৃথিবীর জাতি-সাধারণের পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞান ও বুদ্ধির আদানপ্রদানে যে কুশল ও কল্যাণ সম্ভব, মোসলমানেরা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিদূরিত রহিয়াছেন। কিন্তু যাহা সত্য তাহা নিউটনের সত্য, কোপার্নিকস বা আর্যভট্টের সত্য বা আবু আলি সিনার (আভিচেন্না) সত্য নহে, তাহাতে প্রত্যেক বিশ্ববাসীরই তুল্য অধিকার।"

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি মুসলমানদের ঔদাসীন্য দেখে রেয়াজ অল্‌-দিন যে কতদূর মর্মাহত হয়েছিলেন এবং কী অকুণ্ঠ ভাষায় তার প্রকাশ দিয়েছিলেন নিম্নে তার উদাহরণ দি ;—

"যাঁহারা এসলাম গ্রহণ পূর্বক মোসলমান নামে বিখ্যাত হয়েন, তাঁহাদের গভীর প্রেম, স্বপ্ন, স্নেহ ও স্বদেশবাৎসল্য সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়, কেবল তৎসমুদায়ের স্থানে এক সামান্যরূপ সাম্প্রদায়িক সহানুভূতির সঞ্চারদৃষ্ট হয়। সুতরাং তাঁহাদের হস্ত সকলের বিরুদ্ধে এবং সকলের হস্ত তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। মাতৃভূমি ও জন্মভূমি ঘটিত ভাষার প্রতি তাঁহাদের মমতাজ্ঞান নাই; প্রত্যুত তৎসমস্ত পরদেশ ও পরভাষা বলিয়া অবিরত উপেক্ষিত হইতেছে। তাঁহাদের স্বদেশও নিজ ভাষা বলিয়া অপর কোনও পৃথক বস্তু দৃষ্ট হয় না, অথবা তাঁহারা অখিল মোসলমান সমাজ ও ধর্মকে এক ভাষার অধীনে স্থাপন করিতে উদ্যত।"

এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষকে অনায়াসে বাঙালী মুসলমানের রামমোহন বলা

যেতে পারে। কিন্তু হায়, বাঙালী মুসলমান এঁকে তখন চিনতে পারেনি। আজ যদি উভয় বাঙলার মুসলমান এঁকে চিনতে পারে, তবে পূব বাঙলার একাডেমী আমাদের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য অন্তহীন প্রশংসা অর্জন করবেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধে পূব বাঙলার জনপ্রিয় মাসিক 'মাহেনও'-এর সম্পাদক জনাব আবহুল কাদির, কবি মালিক মুহম্মদ জয়সীর 'পদুমাবৎ কাব্যে'র 'অনুবাদক' পূব বাঙলার কবি সৈয়দ আলাওলও তাঁর কাব্যের সঙ্গে আমাদের নূতন করে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। 'পদ্মাবতী'র পুঁথি সংগ্রহ করা অতি কঠিন। লেখক এই প্রবন্ধের উদ্ধৃতি এতই পাণ্ডিত্য ও রসবোধের সঙ্গে করেছেন যে মূল পড়া না থাকলেও কাব্যখানির সঙ্গে যে পরিচয় হয় তা অকৃত্রিম ও বিকৃতিহীন। তবে লেখক যে আলাওলকে 'নিঃসন্দেহে ভারতচন্দ্র হইতেও শ্রেষ্ঠ কবি' বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। আশা করি কাদির সাহেব এ সম্বন্ধে দীর্ঘতর প্রবন্ধ লিখে আমাদের সন্দেহভঞ্জন করবেন।

অধ্যাপক আশরাফ সিদ্দিকী মীর মশার্‌রফ হোসেনের কর্মজীবন ও সাহিত্য-চর্চা নিয়ে যে গভীর গবেষণাত্মক প্রবন্ধটি লিখেছেন তাতে 'বিষাদ সিন্ধু'র অনুরাগীদের প্রভূত উপকার হবে সন্দেহ নেই। মশারফ হোসেনকে বাঙালী এক 'বিষাদ-সিন্ধু'র লেখক হিসাবেই চেনে; তাঁর বহুমুখী প্রতিভার প্রচুর পরিচয় এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ থেকেই পাওয়া যায়।

সৈয়দ মোর্তাজা আলী সাহেব 'বাঙলা গদ্যের আদিযুগ' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে চারটি উদাহরণ দিয়েছেন। (১) ১৫৫৫ খৃঃ অহমরাজ চুকম্পাকে লেখা কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের চিঠি, (২) ১৬৪৭ খৃঃ শ্রীহট্টাঞ্চলে লেখা একটি 'হকীকৎ নামা', (৩) জয়ন্তিয়া বুরুঞ্জী থেকে উদ্ধৃত আসাম রাজকে লেখা জয়ন্তিপুরের রাজার একখানা চিঠি ও (৪) মনোএলদা—আসসুমের ক্রপার শাস্ত্রের অর্থভেদ থেকে। যে সমস্ত অঞ্চলের ভাষা থেকে তিনি উদাহরণ নিয়েছেন সে-সব অঞ্চলের ঐতিহ্য ও বর্তমানে প্রচলিত উপভাষাগুলির সঙ্গে তিনি সুপরিচিত এবং তাঁর 'হিসটরি অব জয়ন্তিয়া' ঐ ভূখণ্ড সম্বন্ধে ইংরেজিতে লিখিত একমাত্র গ্রন্থ (পাঠান-মোগল কেউই খাসিয়া পাহাড়ের সানুদেশে অবস্থিত 'জয়ন্তিয়া রাজত্ব' অধিকার করতে পারেনি বলে এদেশে প্রাচীন হিন্দু পলিটির প্রচুর আবিষ্কৃত নিদর্শন পাওয়া যায় ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র চর্চাকারীর পক্ষে অপরিত্যাজ্য। অগ্রজের সাহিত্যচর্চার নিরপেক্ষ আলোচনা নন্দনশাস্ত্রসম্মত,

কিন্তু সংস্কার বাধা দেয়।

পাবনার সাধক কবি জহীরউদ্দীনের জীবন ও গীত সম্বন্ধে লিখেছেন মৌলবী গোলাম সাকলায়েন ও শ্রীহট্টের কবি শাহ্ হুসেন আলম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন মৌলবী নিজামউদ্দীন আহম্মদ।

ইরানের সুফী মতবাদ বাঙলাদেশে এ-দেশের নিজস্ব শ্রীরাধাকেন্দ্রিক বৈষ্ণব ভক্তিবাদের সঙ্গে মিলে যাওয়াতে এইসব মারিফতী (গুহ্য তত্ত্বাত্মক) গীতের সৃষ্টি জর্মনপণ্ডিত গলড্‌ৎসিহার ও হর্টেনের বিশ্বাস ইরানে থাকাকালীনই সুফী মতবাদ বেদান্ত, যোগ ও নারদ শাণ্ডিল্যের ভক্তিবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল; ফরাসী পণ্ডিত মাসিন্নো অস্বীকার করেন কিন্তু ইরানী এবং আরব কবিদের ন্যায় এঁরা আপন জীবনকাহিনী তাঁদের সৃষ্টির ভিতর বুনে দিতেন না। আত্মগোপন করার ভারতীয় ঐতিহ্যই বরঞ্চ তাঁরা স্বীকার করে নিয়েছিলেন (কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, 'চণ্ডীদাস কয়' জাতীয় ভণিতা মুসলমানদের কাছ থেকে নেওয়া)। দুই প্রবন্ধের লেখকই যেটুকু খবর পাওয়া যায় তাই নিঙড়ে নিঙড়ে তাঁদের কাব্যসৃষ্টি থেকে বের করেছেন। এই ধরনের কাজের প্রতি একাডেমী যে বিশেষ মনোযোগ দেবেন সে-কথা পূর্বেই বলেছি। ভালোই, কারণ পশ্চিমবঙ্গের লেখকেরা যথেষ্ট আরবী-ফার্সী জানেন না বলে মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্রের আরবী-ফার্সী-ভর্তি অংশগুলোর টীকাটিপ্পনী কর্মটি পর্যন্ত এড়িয়ে যান—এ-কাজ বিশেষ করে পূব বাঙলাতেই ভালো হবে।

চৌধুরী শামস্থর রহমান সায়েবের 'আমাদের সাংবাদিক প্রচেষ্টা' তথ্যবহুল প্রবন্ধ—অশেষ পরিশ্রমের পরিপূর্ণ সাফল্য।

'মধুরেন সমাপয়েৎ' করেছেন একাডেমীর সুযোগ্য সম্পাদক ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক্ মধ্যযুগীয় বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র মুসলিম মহিলা কবি 'রহীমুন্নিসা' প্রবন্ধ দিয়ে। ১৭৬৩—১৮০০-র মধ্যবর্তী কালের এই মহিলা কবি সরস স্বাভাবিক বাঙলায় যে কাব্যসৃষ্টি করে গিয়েছেন তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন হক্ সাহেব—ভবিষ্যতে আরো হবে সে আশা রাখি। উপস্থিত দু' একটি উদাহরণ পেশ করছি। স্বামীর আদেশে তিনি সৈয়দ আলাওলের 'পদ্মাবতী' নকল করে দেন; সেই সম্পর্কে বলেন—

'শুন গুণিগণ হই এক মন
লেখিকার নিবেদন।

অক্ষর পড়িলে　　টুটাপদ হৈলে
শুধরিতা সর্বজন ॥
পদ এই রাষ্ট্র　　হেন মহাকষ্ট
পুঁথি সতী পদ্মাবতী ।
আলাওল মণি　　বুদ্ধি বলে গুণী
বিরচিল এ ভারতী ॥
পদের উকতি　　বুঝি কি শকতি
মুই হীন তিরী জাতি ।
স্বামীর আদেশ　　মানিয়া বিশেষ
সাহস করিনু গাঁথি ॥'

রহীমুন্নিসার পিতামহ ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চট্টগ্রামে অজ্ঞাতবাস বরণ করেন :—

অগ্রগামী হৈয়া ইংরাজ যুদ্ধ দিল ।
দৈবদশা ফিরিঙ্গীর বিজয় হইল ॥
মুখ্য মুখ্য সবের বহুল রত্নধন ।
লুটিয়া করিল খয় যত পাপিগণ ॥

পিতামহের মাতৃভাষা নিশ্চয়ই হয় ফার্সী নয়, উর্দু ছিল। রহীমুন্নিসা কিন্তু খাঁটি বাঙালী। নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন,

স্বামী আজ্ঞা শিরে পালি লিখি এ-ভারতী ।
রহিমন্নিচা নাম জান, আদৌ ছিরীমতী ॥

অর্থাৎ তাঁর নাম 'শ্রীমতী রহিমুন্নিসা'।

শোকের কবিতায় এ মহিলার অসাধারণ সরল কবিত্বরস প্রকাশ পেয়েছে। সামান্য উদাহরণ দিয়েও ভবিষ্যতে এর 'ভারতী' আরো প্রকাশিত হবে এই আশা নিয়ে এ আলোচনা শেষ করি ;—

নয়া সন নয়া মাস ফিরে বারে বার ।
মোর জাদু কাল ফিরি না আসিল আর ॥
আশ্বিনেতে খোয়াময়　　কান্দে তরুলতাচর,
'ভাই' বলি কান্দি উভরায় ।
আমার কান্দন শুনি　　বনে কান্দে কুরঙ্গিনী
জলে মাছ কান্দিয়া লুকায় ॥

একাডেমীর ভার যোগ্য স্কন্ধে পড়েছে, এ বিষয়ে কণামাত্র সন্দেহ নেই।

একাডেমীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো না। বিদ্যুৎ আবিষ্কৃত হলে তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ফ্যারাডেকে নাকি এক মহিলা এই প্রশ্ন করেছিলেন। তিনি নাকি গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিলেন, "ম্যাডাম্, নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ কি কে বলতে পারে!"

উপস্থিত দেখতে পারছি শিশুটি বলিষ্ঠ, প্রাণবন্ত ও তার কৌতুহল অসীম। আমরা মুক্তকণ্ঠে বলি, "শতং জীব, সহস্রং জীব।"

রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ

(বগুড়া কলেজের সাহিত্য-অধিবেশনের সভাপতিরূপে অভিভাষণ)

পৃথিবীর সমস্ত প্রাচীন সভ্যতা এবং সমস্ত ধর্মমত ভৌগোলিক কারণে অল্পপরিসর নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের সভ্যতা এবং ধর্মমত গড়ে তুলেছে। কিন্তু যখনই সেই সভ্যতা এবং ধর্মমত নিজের গতি মুক্ত হয়ে বাইরে অন্যের সঙ্গে যোগস্থাপন করেছে তখনি তাদের মধ্যে দেশকাল পাত্রভেদে একটু পরিবর্তন হয়েছে। আমার আজকের বক্তব্য ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলাম ধর্ম প্রসঙ্গে আপনাদের আমার আগের কথাটা একটু চিন্তা করতে বলি। আমি নিজে মুসলমান, কাজেই এ বিষয়ে আমার স্বাভাবিক আগ্রহ থাকা ছাড়া আমি নানা দেশ ঘুরে এবং এ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানসঞ্চয় করে আমার নিজস্ব চিন্তাধারা আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করছি।

আজ বিজ্ঞানের কৃপায় দেশে-দেশের ভৌগোলিক ব্যবধান ঘুচেছে, কাজেই এক দেশ আর এক দেশকে এক সভ্যতা আর এক সভ্যতাকে নিবিড় করে জানবার সুযোগ পাচ্ছে। এই আধুনিক যুগে সত্যিকারের ইসলামের সেবককে মানসিক জড়ত্ব ত্যাগ করে ইসলামের সঙ্গে অন্য প্রচলিত সব ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করে তার আপেক্ষিক মূল্য নির্ধারণ করতে হবে—শুধু মৌলভী-মোল্লার অনুশাসন এবং ধর্মব্যাখ্যানের উপর নির্ভর করলে চলবে না।

ইসলাম সম্বন্ধে আপনাদের বোধ হয় একটা ধারণা আছে যে 'ইহাই একমাত্র ভগবান কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট একমাত্র সত্যধর্ম'। কিন্তু সেটা সত্যি নয়—কেননা

এর আগেও মূশা ও যীশুখৃষ্টের নিকট ভগবানের প্রত্যাদেশ সত্যধর্মরূপে প্রকাশ হয়েছিল। এক বিষয়ে ইহুদী ও খৃষ্টধর্মের সঙ্গে ইসলামের সাদৃশ্য আছে—আল্লা যুগে যুগে সত্যপুরুষ বা প্রফেটের মাধ্যমে সত্যবাণী প্রকাশ করেন, কাজেই ইসলামকে একেবারে আকস্মিক বলে ধরলে চলবে না—পূর্বোক্ত দুই ধর্মমতের পরিণতি হিসাবেই জানতে হবে এবং কোরানও এ সম্বন্ধে এই এক কথাই বলেন।

নতুন কোন ধর্মপ্রচারের পশ্চাতে শুধু ধর্মের মহান বাণী ব্যতীত একটা অর্থনৈতিক ভিত্তি না থাকলে তার প্রতিষ্ঠা হওয়া শক্ত। যীশুখৃষ্ট সুঁদখোর ইহুদী বণিক-সম্প্রদায়ের পবিত্র ধর্মস্থানকে টাকার লেনদেনের স্থান দেখে তার প্রতিবাদ করেছিলেন—ধনীশোষিত জনসাধারণ তাঁকে সমর্থন করলেও স্বার্থ-হানিভীত ধনী ইহুদীরা তাঁকে রাজদ্রোহী হিসাবে অভিযুক্ত করে তার প্রাণহানি করিয়েছিলেন। হজরত মহম্মদের নতুন ধর্ম ইসলামের প্রচারের পশ্চাতেও এই প্রকার একটা আর্থিক প্রোগ্রাম ছিল—কিনা ধনীদের আয়ের কিয়দংশ 'জাকাত' অর্থাৎ গরীবদের দান করতে হবে। এতে 'হ্যাভ-নট'রা আশ্বস্ত হ'লেও 'হ্যাভে'র দল আশঙ্কিত হয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করতে আরম্ভ করল। একেশ্বরবাদ প্রচারে যারা বিশেষ বিচলিত হয়নি সেই কোরেশ সম্প্রদায় তাকে মক্কা-ছাড়া করলো। কাজেই ইসলামের এই সাম্যের ভিত্তিতে ধনবণ্টন-নীতি যদি পালন না করা হয়—redistribution of weath দ্বারা যদি 'হ্যাভ-নট'দের কোন সুব্যবস্থা না হয়, তাহা হলে ইসলামের মূলনীতি মানা হবে না। সবাইকে—ধনী-দরিদ্রকে সঙ্গে নিয়ে শুধু একসঙ্গে আহার এবং বাসের সুবিধা দিলেই Islamic democracy প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইসলামের যে অর্থ নৈতিক প্রোগ্রাম আছে তাকেও কার্যকরী করে তোলবার জন্য প্রয়াস করতে হবে।

হজরত মহম্মদ যখন মদিনা থেকে আবার মক্কায় ফিরে এলেন তখন মক্কাবাসীরা তাঁর ধর্মকে সাদরে গ্রহণ করলো—কোনো রক্তপাতের দরকার হয়নি। সেটা শুধু তাঁর মহাপুরুষত্বের জন্য, না তিনি 'হ্যাভনট'দের সহানুভূতি পেয়েছিলেন বলে? তারপর খলিফাদের আমলে পারস্যসাম্রাজ্য জয়ে ইসলামের এই অর্থবণ্টননীতি কার্যকরী হয়েছিল—পারস্যের জনগণ করভারে নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল এবং যখনই ইসলামের অর্থনৈতিক প্রোগ্রামের কথা ছড়িয়ে পড়লো তাদের মধ্যে তখনই তারা ইসলামকে সাদরে বরণ করে নিলো—নইলে যে বিরাট পারস্যবাহিনী গ্রীকদের পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেছিল তারা কেন ইসলামের কাছে পরাস্ত হবে! ইসলামের

ধনসাম্যের Message বা বাণী তাদের জনগণের Morale একেবারে নষ্ট করে দিয়েছিল। এই ইসলামের বাণীই তুরস্ক, মিশর, উত্তর আফ্রিকা স্পেন জয়ে সাহায্য করেছে—শুদ্ধ অস্ত্রবল এবং নতুন ধর্মের বাণীতে হয়নি। ইসলামের আদিযুগের কাহিনী হচ্ছে এই।

তারপর যখন ইসলামের ক্ষমতা বিস্তৃত হোল—দেশজয়ে যখন সম্পদে ইসলাম সাম্রাজ্য-সমৃদ্ধ হতে লাগল, তখন থেকে তাঁরা হ্যাভনটদের কথা বিস্মৃত হতে লাগল এবং ইসলামের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পতন আরম্ভ হল। ভারতে যখন মুসলমান এলো তখন ইসলামের সেই Message আর নেই। কাজেই দেখি নবাব ওমরাহদের বংশধর ব্যতীত মধ্যভারতের কয়েকটি শহর অঞ্চল ছাড়া ইসলাম আর কোথায়ও প্রতিষ্ঠিত হলো না। বাংলায়ও মুসলমান ধর্মের প্রসার হোত না যদি আরব থেকে প্রচারকরা ইসলামের মূল নীতির বাহক ও ধারক হয়ে এখানে প্রচারে অবতীর্ণ না হতেন।

এদিকে ভারতে ঢুকেও ইসলাম নিজের ধর্মমত সম্বন্ধে একপেশে হয়ে রইল। কারণ হিন্দুধর্মের ভগবান-সম্পর্কিত দিকটা বড় উদার—তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে যাকে খুশী যখন মেনে নিলেই হোল—তা নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু খাওয়া-ছোঁওয়া-বিবাহাদি ব্যাপারে সামাজিক অনুশাসন বেশ কড়া—বিশেষ বিশেষ পন্থী এবং নিয়মকানুনের মধ্যে আবদ্ধ করা হয়েছে—সে সব অমান্য করলেই জাত গেলো। মুসলমানদের এ বিষয়ে ঠিক হিন্দুদের বিপরীত—ভগবান 'একমেবাদ্বিতীয়ম' এটা মানতেই হবে এবং এ সম্বন্ধে কোন ভিন্নমত পোষণ করা একেবারেই চলবে না। আর সামাজিক ব্যাপারে অর্থাৎ আহারবিহারে একেবারে উদার। কাজেই হিন্দুধর্মের সঙ্গে কোন Common Platform বা আপোস-ক্ষেত্র পাওয়া গেল না, কাজেই মুসলমান হিন্দুর সঙ্গে সাত-আটশ বছর বাস করলেও হিন্দুর বিরাট দর্শনশাস্ত্র ইসলামে কোন ছায়াপাত করতে পারলো না।

এইভাবে হিন্দু এবং মুসলমান টোল এবং মাদ্রাসাতে মশগুল হয়ে রইল। ধর্মমতের মিল আর হয়ে উঠলো না। কেউ কাউকে জানার জন্য বিশেষ চেষ্টাও করলো না। ইংরাজ এসে কিন্তু 'মিরাকেল' ঘটালো—টোল মাদ্রাসা ছেড়ে হিন্দু-মুসলমান এক বিদ্যায়তনে পড়াশুনা করতে লাগল—১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজী পারসীর জায়গায় রাষ্ট্রভাষা হওয়াতে মুসলমান কিছুকাল মুখ ফিরিয়ে অভিমান করে বসেছিল—হিন্দুরা আগেই এসেছে বলে শিক্ষায় মুসলমানরা একটু পেছিয়ে গেলো। কিন্তু আজকের দিনে রাষ্ট্র দুটো হলেও দু'রাষ্ট্রের মধ্যেই সকল ধর্মের লোক আছে,

কিন্তু তাতে শিক্ষার বা কালচারের অসুবিধা কেন হবে। হিন্দু-মুসলমানে কোন কোন বিষয়ে পার্থক্য থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গীর একটা ঐক্য থাকতে পারে—সেখানে ধর্মের কোন স্থান নেই। পারস্যের কালচার যেমন পারস্য ভাষার সাহায্যে নতুন করে গড়ে উঠেছে—যদিও পারসী ভাষা আরবী অর্থাৎ পবিত্র কোরাণের ভাষা নয়—একেবারে কাফেরের ভাষা। পারসী ভাষায় রুমি, জালালুদ্দিন, সাদি হাফিজ সার্থক সাহিত্যের সৃষ্টি করলো। ভারতের উর্দুভাষা কিন্তু আরবী-পারসী-হিন্দী মন্থন করে গড়ে ওঠেনি—উর্দুর বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে তো ঢের হিন্দু রয়েছে। উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের বহু মন্দিরের গঠনশিল্প কি হিন্দু ও ইসলামের মিলিত কালচারের চিহ্ন বহন করছে না? গজনীর সুলতান মামুদের সভাকবি আলবেরুনী এদেশে দীর্ঘকাল বাস করেছেন শুধু এদেশের সভ্যতাকে জানবার জন্য এবং সেটার যেটুকু ভাল সেটুকু আহরণ করে নিজের দেশের সভ্যতার অঙ্গবৃদ্ধি করার জন্য। এই যে Power of assimilation বা পরের ভালটুকু আত্মস্থ করে নেওয়ার ক্ষমতা সেটা একদিন ইসলামের ছিল—সেক্ষেত্রে সে ধর্ম নিরপেক্ষভাবেই চলেছিল।

আজ পূর্ব-পাকিস্তানের এই বিরাট জনসংখ্যাকে ইসলামের ঐতিহ্য মনে রাখতে হবে এবং সেই পরমতসহিষ্ণুতাকে সম্বল করে নিজের ধর্মমতকে আর একটু পরের সমালোচনার দ্বারা সহনশীল এবং তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্র করে অগ্রসর হতে হবে—তাহলে জনসংখ্যায় এবং আয়তনে পারস্যাপেক্ষা বড় এই যে পূর্ব বাংলা এ কি উন্নত হতে পারবে না! শুধু ধর্মের ঝুলির উপর নিজস্ব বিচারবুদ্ধিকে বিসর্জন দিয়ে একটা নতুন দেশের পত্তন করা যায় না। নতুন রাষ্ট্রকে নতুন রূপে দেখতে হলে ইসলাম ধর্ম ভাল করে জানতে হবে—পড়তে হবে ইসলামের মূলনীতিগুলো যা সর্বদেশের এবং সর্বকালের জন্য। তা হলেই দেশস্বাধীন সত্যিকারের হবে। প্রাক-স্বাধীন যুগে ছিল ভাঙার কাজ—স্বাধীনোত্তর সময়ে হবে গড়ার কাজ। ভারত ডোমিনিয়নের কটা বন্দুক-কামান আছে এবং আমাদেরই বা কটা আছে এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দেশের কোন উপকার হবে না। হিন্দুস্থান-পাকিস্তানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা নয়—নিজের দেশের কিসে ভাল হবে, দেশের লোক কিসে পেটভরে খেতে এবং পরতে পারবে সেই সব শুভঙ্করী বুদ্ধিবৃত্তির দিকে আপনাদের উৎসাহ প্রয়োগ করতে হবে। যদি এই কথা মনে রাখেন, দেশের সেবাই আপনাদের উদ্দেশ্য, তাহলে পাতঞ্জলের ভাষায় সেটাই হবে আপনাদের রাষ্ট্রের 'দৃঢ়ভিত্তি'—তার উপর প্রতিষ্ঠিত হলে এর আর অধঃপতন নেই।

বৈদেশিকী

ইংরাজ রাজত্বে আমাদের মস্ত সুবিধা এই ছিল যে দেশ-বিদেশের খবর রাখার আমাদের কোনো দায় ছিল না। জর্মনীর সঙ্গে লড়াই করার প্রয়োজন বোধ করলে ইংরেজ যে শুধু আমাদের জিজ্ঞাসা না করেই যুদ্ধ বাধাতো তা নয়, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে হতভাগা দেশকেও সে তার সঙ্গে জড়িয়ে ফেলত। কোনো সরল ইংরেজ যদি তখন শুধাত যে ভারতবাসীর এ যুদ্ধে সায় আছে কি না, তখন লণ্ডনের বড়কর্তারা অভিমানভরে বলতেন, "এ বড় তাজ্জব প্রশ্ন! এ প্রশ্নে লুকানো রয়েছে আমাদের প্রতি অন্যায় সন্দেহ। খবর নাও, দেখতে পাবে ভারতবর্ষে আমরা কস্মিনকালেও জবরদস্তি-রঙ্‌রুট (কন্‌স্‌ক্রিপশন) করিনি। ভারতের প্রত্যেকটি সেপাই আপন খুশ্‌-এক্তেয়ারে জর্মনীর বিরুদ্ধে লড়ছে।"

কাজেই এ রকম উত্তরে শুনে ভূ-ভারত ভাবতো, ভারতীয় সৈন্য অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শবাদী বীরপুরুষ। তাঁরা যে উচ্চ শিক্ষিত সে বিষয়ে আর কি সন্দেহ? তাঁরা নিশ্চয়ই হিটলারের 'মাইন কাম্‌ফ্‌', রজেনবের্গের 'মিথ্‌' পড়েছেন, কন্‌সান্‌ট্রেশন ক্যাম্প সম্বন্ধে তাঁরা ওকীব-হাল, নাৎসিদলের বর্বরতা সম্বন্ধে তাঁরা বিলক্ষণ সচেতন এবং তাই তাঁরা পৃথিবীতে সত্যসুন্দরমঙ্গল সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য জর্মনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন।

তাই যদি হত তা হলে আমাদিগকে মেহন্নত করে এই 'বৈদেশিক পর্যায়' আরম্ভ করতে হত না। আমরা জানি, ভারতবাসী আপন বিরাট দেশ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, এমন কি তার জাতীয় সঙ্গীতে যে পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়ের উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো সম্বন্ধেও তার জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ।

কাউকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। পরাধীনতার সব চেয়ে মারাত্মক অভিসম্পাত সপ্রকাশ হয় তার 'শিক্ষা'-পদ্ধতিতে। আমরা এতদিন ধরে যে শিক্ষালাভ করেছি তার প্রধান উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, আমরা দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে জ্ঞানসঞ্চয় করে পৃথিবীতে আপন আসন বেছে নি। আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমাদিগকে আত্মবিস্মৃত জড়ভরত করে রাখার; তাতে ইংরেজের লাভ ছিল।

তাই আশ্চর্য বোধ হয় যখন বাঙালীর ছেলে দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে। আনন্দ বোধ হয় যে অশিক্ষা-কুশিক্ষা, দুঃখ-দৈন্যের ভিতরও তারা

তাদের মনের জানালা ক'খানা বন্ধ করে দেয় নি। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা এখানে তুলব না;—দেশ-বিদেশ ভ্রমণকারী বান্ধবদের মুখে শুনেছি যে, তাঁরা বিদেশে কি শিক্ষা পেয়েছেন, সে সম্বন্ধে বাঙালী তরুণের যত না অনুসন্ধিৎসু তার চেয়ে অনেক বেশী তাদের কৌতূহল যে-দেশ তাঁরা ভ্রমণ করে এসেছেন সে-দেশের নানা খবরাখবর শুনতে। বই পড়াতেও তাদের উৎসাহ কম নয়, আর খবরের কাগজ তো তারা পড়েই।

কিন্তু খবরের কাগজে তারা বিদেশী খবরের সন্ধান পায় কতটুকু?

আমি বাঙালী দৈনিক কাগজগুলির কথা ভাবছি। সেগুলিতে বিদেশী খবর যেটুকু পরিবেশন করা হয় সে এতই নগণ্য যে তার উপর নির্ভর করে যদি কোনো বাঙালী 'সাধারণ জ্ঞানের' পরীক্ষায় বসে, তবে তার 'অনার্স' বা সসম্মান ফেল অনিবার্য। বাঙলা দৈনিক পড়ে মনে হয়, বিদেশী খবর দেবার বরাত যেন ইংরেজি কাগজের, আবার 'দেশী' ইংরেজি কাগজ পড়লে মনে হয় তাঁরা যেন বরাত চাপিয়ে দিচ্ছেন 'স্টেটসম্যানের' ঘাড়ে। 'বিদেশী খবর?' ওগুলো দেবে বিদেশী কাগজ—ওসব হচ্ছে 'স্টেটসম্যানের' কর্ম। যেন বাঙালী কাগজ বাঙালী বিধবার সামিল। বিলিতি বেগুনের মত বিলিতী খবর তার পক্ষে নিষিদ্ধ!

আর বিদেশী খবর যে-হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় দেন সেও আবার সর্বপ্রকার টীকা-টিপ্পনী বিবর্জিত। ইংলণ্ডে, ফ্রান্সের মতও সুশিক্ষিত দেশের কাগজওলারা পর্যন্ত খবর রাখে যে সাধারণ পাঠক কতটুকু জানে না-জানে এবং সেই হিসেবে বিদেশী খবর পরিবেষণ করার সময় প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনী দিতে কসুর করে না। শুধু তাই নয় সম্পাদকীয় স্তম্ভে সে সম্বন্ধে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা হয়, রবিবারের কাগজে তার বিস্তৃত সচিত্র বিবরণ বেরোয় এবং যদি সমস্ত ব্যাপারটা দেশের সাধারণ লোকের মনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে তবে রাজনৈতিক কর্তাদের আসরে নেবে আপন আপন বক্তব্য খোলসা করে বলতে হয়। শেষ পর্যন্ত হয়ত প্রধান মন্ত্রীকেই বিবৃতি দিতে হয়। দেশের লোকেরা তখন অন্ততঃ এইটুকু প্রত্যয় রাখে যে তাঁর বিবৃতি বিশেষজ্ঞের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর তৈরী করা হয়েছে। সে-বিশেষজ্ঞ রাজদূত; যে-দেশ নিয়ে আন্দোলন আলোড়ন চলছে তিনি সে দেশে বসবাস করেন ও প্রতিদিন না হোক প্রতি সপ্তাহে সে-দেশ সম্বন্ধে একখানা গোপনীয় রিপোর্ট বা প্রতিবেদন পাঠান।

আমাদের পত্রিকাওলারা কোনো রকম মেহন্নত করতে নারাজ। পাঠক কি খবর চায় না-চায়, তাকে কি করে পৃথিবীর খবর সম্বন্ধে উৎসুক করে তোলা যায়,

সে সম্বন্ধে তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। বায়স্কোপওলারা যদি যথেষ্ট বিজ্ঞাপন দেয়, বড় বড় কোম্পানীর নেকনজর থেকে যদি তাঁরা বঞ্চিত না হন তবে কাগজ চলবেই— কেউ ঠেকাতে পারবে না। ভালো খবর পরিবেষণ করার চেষ্টা দেখতে পাওয়া যায় একমাত্র নবজাত কাগজের মধ্যে। বাচ্চা হরিণের মত তাঁরা ছুটোছুটি করেন ভালো খবরের সন্ধানে কিন্তু কাগজ চালু হয়ে যাওয়ার পর তাঁরাও মেদস্ফীত হরিণের ন্যায় পাঁচতলা-গাছের ছায়ায় শুয়ে থাকাটাই জীবনের চরম মোক্ষ বলে ধরে নেন।

বক্ষ্যমান মাসিক এ-সমস্ত অভাব ঘুচিয়ে দেবার স্পর্ধা বা দম্ভ করে না। তার যদি কোনো দম্ভ থাকে তবে সেটুকু মাত্র এই যে সে চেষ্টায় কসুর করবে না। এবং তার ভরসা যে একদিন যোগ্য পাত্র এসে আমাদের আরব্ধ কর্ম সুসম্পন্ন করে দেবেন।

দেশের অত্যন্ত কাছে, যে-দেশকে বিদেশ বলা প্রায় ভুল, সেই দেশ নিয়ে আমাদের এ পর্যায় আরম্ভ হল।

আফগানী দাবী

একদা এক কান্দাহারী রাজকুমারী বহুশত যোজন অতিক্রম করে বরের সন্ধানে দিল্লীতে এসে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষের সব চেয়ে বড় কবি তখন ভূ-ভারত দাবড়ে বেড়াচ্ছিলেন—রাজকন্যার দিকে ভালো করে এক নজর তাকিয়ে বল্লেন, 'এ কন্যার নিদেনপক্ষে একশ বাচ্চা হবেই হবে।' একশ বাচ্চা শুনে যেন আমরা আশ্চর্য না হই; কান্দাহারী পাঠান কুমারীর দৈর্ঘ্যপ্রস্থ দেখলে এরকম ভবিষ্যৎবাণী সবাই করে থাকে—গান্ধারীকে দেখে হস্তিনাপুরের ব্যাস যে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল সেটা ফলেছিল তো বটেই, এমন কি ছেলেগুলো ঠ্যাঙাবার জন্য একটা বোনও পেয়ে গিয়েছিল।

এ হল প্রায় চার হাজার বৎসরের কথা। কিন্তু আফগানিস্থান পাহাড়ী মুল্লুক, আইনকানুন জানে না, দলিল-দস্তাবেজের ধার ধারে না। সেদেশে কোনো দাবীদাওয়ার মেয়াদ ফুরোয় না, কোনো পাওনা তামাদি হয় না—'টাইমবার' নামক বাঁধাবাঁধি আফগান ঐতিহ্যে কখনো ঠাঁই পাইনি। তাই আজ চার হাজার বৎসর পর আফগানিস্থান তার কান্দাহারী মেয়ের বিয়ের যৌতুক হিসেবে পাকিস্তানের সীমান্ত-প্রদেশ চেয়ে বসেছে।

এ খবর শুনতে পেয়ে পাকিস্তানীরা ঈষৎ উদ্বিগ্ন হয়েছেন। ডমিনিয়নবাসীরা

বক্রহাসি হেসে বলছেন, 'করো পাকিস্তান, হও আলাদা। এইবারে ঠ্যালাটা সামলাও। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে হুঙ্কার দিতে না এককালে ?—এইবার তাগড়া তাগড়া পাঠানদের সঙ্গে লড়ে বাঁচাও 'আপন জান্ আপন পাকিস্তান'।'

পাকিস্তানীদের মনে আবছা-আবছা ধারণা, আফগানিস্থানের ভাষা পশতু, আফগানরা জাতে পাঠান ; উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের বাসিন্দারাও পশতু বলে, তারাও জাতে পাঠান। অতএব আফগানিস্থানের দাবীটা হয়ত সম্পূর্ণ কাবুলী পাওনাদারের লাঠির জবরদস্তির ভয় দেখানো নয়।

এ-ধারণা ভুল ইতিহাস পড়ার ফল।

আর্য অভিযান থেকে আরম্ভ করি। আর্যরা এদেশে এসেছিলেন আফগানিস্থান হয়ে। আজ যাঁরা আফগান-পাঠান নামে পরিচিত তাঁরা আমাদেরই এক অংশ। পশতু ভাষা আর্য ভাষা।

আফগানিস্থানের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় আমাদের মহাভারত পুরাণে—আফগানিস্থানের নিজস্ব কোনা দলিল-দস্তাবেজ নেই। বল্‌হিক দেশ (ফারসী বল্‌খ্‌), কাম্বোজ, বক্ষু নদী (Oxus=গ্রীক অক্সুস্) বিধেতি পার্বত্যভূমি আজ 'আফগানিস্থান' নামে পরিচিত। আমাদের ইতিহাসে এসব অঞ্চলকে ভারতবর্ষের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। আজও কাবুলীওলারা যে জাফরাণ ও হিঙ 'বল্‌খ্‌' অঞ্চল থেকে এ দেশে নিয়ে আসে তার নাম সংস্কৃতে 'বাল্‌হিকম্'।

পাকাপাকি ইতিহাস আরম্ভ হয় সিকন্দর সাহের বিজয়-অভিযানের পর থেকে। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বল্‌খ্‌ বাদ সমস্ত আফগানিস্থান গ্রীকদের কাছে কিনে নেন।

রাজা অশোক বৌদ্ধশ্রমণ মাধ্যন্তিককে পাঠান আফগানিস্থানে। আফগানরা অগ্নি-উপাসনা। সে উপাসনাও বৈদিকধর্মের অংশবিশেষ ও জরথুস্ত্রী ধর্ম নামে পরিচিত) ছেড়ে দিয়ে খাস ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। আফগানিস্থানের পর্বতগাত্রে খোদিত বামিয়ানের বিরাট বৌদ্ধমূর্তিযুগল ভারতীয় শিল্পের নিদর্শন। গান্ধার শিল্পের যে-ভাণ্ডার আফগানিস্থানে পাওয়া গিয়াছে তাও ভারতীয় ও গ্রীক শিল্পকলার সম্মেলনে তৈরী। এসব শিল্পকলাতে আফগানরা কোন অংশ নেয় নি।

মৌর্য পতনের পর গ্রীকরা আফগানিস্থানে রাজত্ব করে। তারাও যে কতদূর ভারতীয় প্রভাবে পড়েছিল সেটা সপ্রমাণ হয় তাদের মুদ্রালাঞ্ছন থেকে। তাতে রয়েছে গ্রীক ও ভারতীয় ব্রাহ্মী লিপি—পশতুর কোনো সন্ধান নেই।

কনিষ্ক ভারত-আফগানিস্থানের রাজা ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল

পেশোয়ারে—কাবুলে নয়।

গুপ্তরা আফগানিস্থান দখল করেন নি। কিন্তু গুপ্তযুগের পুনরুজ্জীবিত হিন্দুধর্ম আফগানিস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ধর্ষ পাঠানের পক্ষে তথাগতের অহিংসানীতি পালন করা যে সুকঠিন হয়ে উঠেছিল সে-তত্ত্বটা সহজেই অনুমান করতে পারি।

সপ্তম শতাব্দীর চীনা পর্যটক হিউ এন সাঙ কাবুলে এসে দেখেন আফগানিস্থানবাসীদের অর্ধেক হিন্দু, অর্ধেক বৌদ্ধ। তিনি কান্দাহার, গজনী, কাবুল অঞ্চলকে ভারতবর্ষের অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন।

পাঠক যেন মনে না করেন যে ভারতবর্ষ যে-সব যুগে আফগানিস্থানে রাজত্ব করে নি সে-সব যুগে আফগানরা ভারতবর্ষে রাজত্ব করেছে। আফগানরা লড়াই করতে জানে, কিন্তু শান্তি-স্থাপনার কর্ম অনেক কঠিন—আফগানের পেটে সে বিদ্যে নেই। আর শান্তি স্থাপন না করে রাজত্ব করা যায় কি প্রকারে?

তারপর আফগানিস্থান ও পশ্চিম ভারতবর্ষ মুসলমান হয়ে গেল। পাঠান রাজারা আফগানিস্থানে রাজত্ব করেন নি সত্য কিন্তু দিল্লী ফারসী সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হয়ে উঠল। কাবুলীরা শিক্ষাদীক্ষা অর্থাগমের জন্য ভারতবর্ষে আসতে লাগল। আলাউদ্দীন খিলজির সভাকবি আমির খুসরৌ ফার্সীতে যে 'ইশকিয়া' নামক কাব্য লিখেছেন তাতে 'দেবল-দেবী'র প্রেমের কাহিনী বর্ণিত আছে। কত শত বৎসর হতে চলল আজো কাবুল শহরে জনপ্রিয় কবি ভারতীয় আমির খুসরৌ। কোন আফগান কবির নাম তো কেউ কখনো এদেশে শোনে নি।

বাবুর আফগান নন। তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি কান্দাহার, গজনী, কাবুলকে ভারতবর্ষের অংশ হিসাবে ধরেছেন ও এসব জায়গার প্রতি তার যতই দরদ থাকুক না কেন তিনি রাজধানী বসিয়েছিলেন দিল্লীতে। তাঁর দৌহিত্র জলালউদ্দীন আকবর জলালাবাদ শহরের নূতন ভিত্তি নির্মাণ করে শহরকে আপন নাম দিলেন। তাঁর দৌহিত্র শাহজাহান কাবুলে বাবুরের কবরের কাছে যে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন তামাম কাবুল শহরে সেই একমাত্র দ্রষ্টব্য স্থপতি। (বাবুর কান্দাহার, গজনী, কাবুল অঞ্চলকে তাঁর আত্মজীবনীতে ভারতের অংশ হিসাবে গণ্য করেছেন)।

কিন্তু এসব তথ্যের চেয়ে বড় তত্ত্বকথা এই যে আফগানরা এককালে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ভারতীয় শিল্পকলা গ্রহণ করেছিল; পাঠান-মুঘল যুগে দিল্লীতে এসে আরবী-ফার্সী শিখত। ১৭৪৭ সালে আহম্মদ শাহ দুররাণী কর্তৃক আফগানিস্থানে স্বাধীন রাজত্ব (আফগানিস্থানের ইতিহাসে এই প্রথম স্বাধীন

আফগান রাজ্য) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও, এবং আজ পর্যন্ত আফগানরা আরবী-ফারসী এবং ধর্ম শিক্ষার জন্য আসে ভারতবর্ষের দেওবন্দ-রামপুরে। তারা পারস্যে যায় না, কারণ পারস্যবাসীরা শীয়া। শিক্ষাদীক্ষায় আফগানিস্থান যে ভারতবর্ষের কাছে কি পরিমাণ ঋণী তার সামান্যতম উদাহরণ এই যে, ভারতবর্ষের কোথাও ফার্সী মাতৃভাষারূপে প্রচলিত নয়, কাবুলবাসীদের মাতৃভাষা ফার্সী এবং কাবুলীরা আসে ফার্সী শিখতে ভারতবর্ষে। দেওবন্দ-রামপুরে ফার্সী শেখাবার জন্য যে-রকম বিদ্যালয় আছে, আফগানিস্থানের কোথাও সেরকম নেই।

শুধু ইসলাম শাস্ত্র চর্চার জন্য যে আফগান এ-দেশে আসে তা নয়, বিস্তর ভারতীয় অধ্যাপক, শিক্ষক কাবুল-জালালাবাদের স্কুল-কলেজে শিক্ষাদান করেছেন। আজ যদি এঁরা সব চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসেন তবে আফগানিস্থানের 'ওজারত-ই-ম' আরিফ (শিক্ষা দফতর) চোখে নরগিস্ ফুল দেখবেন! পক্ষান্তরে আজ যদি সব কাবলীওলা এ-দেশ থেকে চলে যায় তবে বহু কলের মজুর মৌলা আলীতে শিরনি চড়াবে।

এ-সব তো হল প্রাচীন অর্বাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি-বৈদগ্ধ্যের কথা। তার সব দলিল যে সবাই মেনে নেবেন সে আশা দুরাশা। কারণ শিক্ষা-দীক্ষার জগতে আজকের দিনে সব চেয়ে বড় 'কালোবাজার' চলছে ইতিহাস-পট্টিতে। হিটলার থেকে আরম্ভ করে ট্রুম্যান পর্যন্ত সে বাজারে এক্স-দিল্ দামের সাত ডবল দাম চায়! সাদা বাজারের সসেজ-খেকো ভুঁড়িওলা জর্মন সেখানে 'নর্ভিক-হীরো', ট্রুম্যান-পট্টিতে সুদখোর ইহুদি প্রিয়দর্শী অশোকের ন্যায় (প্যালেস্টাইনে) ধর্মপ্রচারাকাঙ্ক্ষী শ্রমণ!

কাজেই বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েই আলোচনা হোক্। আফগানদের যুক্তি যদি ভাষা ও জাতীয়তার (racial) ঐক্যের উপর খাড়া হয় তবে আফগানিস্থানের,—প্রথম কর্তব্য হবে আফগানিস্থানের উত্তরাঞ্চল রুশিয়াকে (অর্থাৎ উজবেগিস্থান তুর্কিস্থান) ছেড়ে দেওয়া; কারণ এ অঞ্চলের লোক জাতে এবং ভাষায় তুর্কোমান, মঙ্গল, উজবেগ।

দ্বিতীয় কর্তব্য হবে আফগানিস্থানের পশ্চিমাঞ্চল ইরানকে ছেড়ে দেওয়া; কারণ এ অঞ্চলের লোক জাতে এবং ভাষায় ইরানি।

অথবা উচিত রুশকে দাবী জানানো; রুশরা যেন তাদের উজবেগিস্থান ও তুর্কিস্থান আফগানিস্থানের হাতে সঁপে দেয় এবং ইরানকে বলা যেন তাবত ইরানভূমি আফগানিস্থানের অংশীভূত হয়ে যায়।

এ-দাবীটা যে কতদূর বেহেড তার একটা তুলনা দি। সুইস জাতি গড়ে উঠেছে তার পশ্চিম অঞ্চলের ফরাসী, উত্তর অঞ্চলের জার্মান ও পূর্ব অঞ্চলের ইতালীয়কে নিয়ে। এই তিন অঞ্চল আবার শব্দার্থে অঞ্চল, কারণ এরা সবাই মূল শাড়ী ফ্রান্স, জর্মনী এবং ইতালির প্রান্ত থেকে খসে পড়ে সুইজারল্যাণ্ডে লুটোচ্ছে। আজ যদি সুইজারল্যাণ্ড ক্ষেপে গিয়ে ফ্রান্স, জর্মনী এবং ইতালিকে সুইস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য দাবী জানায় তবেই তার তুলনা হবে আফগান দাবীর সঙ্গে।

কিন্তু যদিও এ দাবী শুধু পাগলা-গারদেই নির্ভয়ে করা চলে তবু এ ধরনের দাবী আমাদের সম্পূর্ণ অজানা নয়। কাবুলীওলাদের সুদের দাবী যে অনেক সময় আসলের বিশগুণ হয়ে দাঁড়ায় সে অনেক মজুরই জানে।

পশতুভাষী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তো কস্মিনকালেও আফগানিস্থানের অংশরূপে পরিচিত হয় নি, বরঞ্চ কান্দাহার—গজনী—কাবুল—জলালাবাদ অঞ্চল (এবং এই অঞ্চলই খাস আফগানিস্থান—এই অঞ্চলের লোকই পশতু বলে এবং 'পাঠান' নামে পরিচিত—পূর্বেই বলেছি বাদবাকি অঞ্চল ইরাণ ও সোভিয়েট তুর্কমানিস্থানও উজবেগিস্থানের অংশরূপে পরিচিত) ভারতবর্ষের অংশ, অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে কেটে নিয়ে আফগানিস্থানে জুড়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন এই, খেয়ালী দাবীর হাওয়া বইয়ে কাবুলী পাগলকে জাগাল কে?

রুশ।

ফরাসীতে প্রবাদ বাক্য আছে, 'প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা মেম্ শোজ', অর্থাৎ 'যতই সে বদলায় ততই তার চেহারা বেশী করে আগের মত দেখায়।' স্তালিনী গুণীরা যতই তাঁদের বৈদেশিক নীতি বদলাতে চান ততই তাঁদের চেহারা জারের চেহারার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। রক্ত-শোষক জার প্রলেতারিয়ারক্ষক স্তালিনের বৈদেশিক নীতিতে আজ আর কোনো পার্থক্য নেই। বাংলা সাহিত্য পাটনির বরাতজোরে 'দুধে-ভাতে' বেঁচে-ওঠা সন্তান। কিন্তু এই উপযুক্ত সঙ্গীন বৈদেশিক নীতি তার ছাপ এই মোলায়েম সাহিত্যের উপরও রেখে গিয়েছে ;—

"বেশ মনে আছে, আমাদের ছেলেবেলায় কোনো এক সময়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের চিরন্তন জুজু রাশিয়ান কর্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা লোকের মুখে আলোচিত হইতেছিল। কোনো হিতৈষিণী আত্মীয়া আমার মায়ের কাছে সেই আসন্ন বিপ্লবের সম্ভাবনাকে মনের সাধে পল্লবিত করিয়া বলিয়াছিলেন। পিতা

তখন (ইং ১৮৬৮ মে—১৮৭০ ডিসেম্বর) পাহাড়ে ছিলেন। তিব্বত ভেদ করিয়া হিমালয়ে কোন্ একটা ছিদ্রপথ দিয়া (আসলে আফগানিস্থান দিয়ে—লেখক) যে রুশীয়েরা সহসা ধূমকেতুর মতো প্রকাশ পাইবে তাহা তো বলা যায় না। এইজন্য মা'র মনে অত্যন্ত উদ্বেগ উপস্থিত হইয়াছিল। বাড়ির লোকেরা নিশ্চয়ই কেহ তাঁহার এই উৎকণ্ঠার সমর্থন করেন নাই। মা সেই কারণে পরিণত-বয়স্ক দলের সহায়তা লাভের চেষ্টায় হতাশ হইয়া শেষকালে এই বালককে আশ্রয় করিলেন। আমাকে বলিলেন, "রাশিয়ানদের খবর দিয়া কর্তাকে একখানা চিঠি লেখো তো। মাতার উদ্বেগ বহন করিয়া পিতার কাছে সেই আমার প্রথম চিঠি। কেমন করিয়া পাঠ লিখিতে হয়, কী করিতে হয় কিছুই জানি না। দফতরখানায় মহানন্দ মুনশির শরণাপন্ন হইলাম। পাঠ যথাবিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ভাষাটাতে জমিদারি সেরেস্তার সরস্বতী যে জীর্ণ কাগজের শুষ্ক পদ্মদলে বিহার করেন তাহারই গন্ধ মাখানো ছিল। এই চিঠির উত্তর পাইয়াছিলাম। তাহাতে পিতা লিখিয়াছিলেন—ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাশিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাশিয়ান-ভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না—কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল।" (রবীন্দ্র-রচনাবলী, ১৭ খণ্ড, ৩০৫ পৃঃ)

যে জুজুর ভয়ের উল্লেখ করে কবিগুরু কাহিনীটি বললেন, আফগানিস্থান আজ সেই জুজুর ভয়ই দেখাচ্ছে। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে রুশ তখন যে ভয় দেখাত আজ সেটা প্রকাশ পাচ্ছে আফগানিস্থানের মুখভেংচিতে। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ সত্যও জানি যে রুশ যেমন অন্তরে অন্তরে বুঝত যে আফগানিস্থান শেষ পর্যন্ত ভারত আক্রমণ করতে কখনো রাজী হবে না, আজও তেমনি আফগানিস্থান যত ভেংচিই কাটুক না কেন, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধং দেহি বলে আসরে নামবে না। দোস্ত মুহম্মদ, আব্দুর রহমান, হবিবউল্লাকে রাশা বিস্তর তোয়াজ করেছে ভারত আক্রমণের জন্য। শেষ পর্যন্ত এ-দোহাই পর্যন্ত পেড়েছে যে মুসলিম আফগানের উচিত ভারতীয় মুসলিমকে কাফির ইংরেজের অত্যাচার থেকে মুক্ত করা, কিন্তু কাবুল নদীর জলে কোনো দিব্য-দিলাশার হাল কোনো দিনই কোনো পানি পায় নি। কারণ দোস্ত, রহমান, হবীব তিনজনাই জানতেন, ভারত আক্রমণ করেছ কি সঙ্গে সঙ্গে রুশ কপ্ করে আফগানিস্থানটি গিলে ফেলবে। হিটলারের বহুপূর্বেই কাবুলী গুণীরা জানতেনঃযে একসঙ্গে দুই অঙ্গনে নাচা-কুঁদা যায় না।

অধম বান্দা দুটি বৎসর কাবুলে ছিল। কাবুল এমনি নীরস নিরানন্দ পুরী

যে সেখানে বেঁচে থাকতে হলে রাজনৈতিক দাবাখেলায় মনোযোগ করা ছাড়া অন্য কোনো পন্থা নেই। আফগানিস্থানের সৈন্যবল, অস্ত্রবল আমাদের যাত্রার দলের ভীমসেনের গদার মত—ফাঁপা এবং কাঁকরে ভর্তি। শব্দ করে প্রচুর।

আফগানিস্থানের আসল জোর তার পার্বত্যভূমি, তার গিরিসঙ্কটে। তাই দিয়ে সে আত্মরক্ষা করে আর আপন স্বাধীনতা বজায় রাখে। কিন্তু আফগানিস্থান ভারত আক্রমণ করলে তো আর পার্বত্যভূমি, গিরিসঙ্কট আপন কাঁধে করে নিয়ে এসে ভিন্ দেশে কাজে লাগাতে পারবে না।

কিন্তু এসব হল পাকিস্তান এবং ডমিনিয়নের বৈদেশিক রাষ্ট্রনীতি। সে আলোচনা আর একদিন হবে! এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল, আফগানিস্থানের অন্তঃসারশূন্য দাবী নিয়ে আলোচনা করার।

সর্বশেষে বক্তব্য, পাকিস্তান যদি আফগানিস্থানকে নিয়ে কোনো দিন সত্যই বিপদগ্রস্ত হয় তবে ডমিনিয়নের তাতে উল্লসিত হওয়ার কিছু নেই। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ শুধু পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশ নয়, ভারতেরও বটে।

সুদিনে দুর্দিনে জর্মনী

চীনের সঙ্গে যে আমাদের হৃদ্যতা আছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এত প্রাচীন, বিরাট, বিপুল দেশ যে একদিন আমাদের রাজাধিরাজ চক্রবর্তী বুদ্ধ তথাগতের দর্শনলাভ না করেও তাঁর পদানত হয়েছিল সে-কথা ভাবতে আমাদের হৃদয়ে গৌরবের সঞ্চার হয়। উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে সেদিন পর্যন্ত আমাদের রাজনৈতিক জাত্যাভিমানকে যখনই ইংরেজ অবমানিত করেছে তখনই আমরা আমাদের অধমর্ণ চীনের কথা ভেবে সান্ত্বনা পেয়েছি।

আরেকটি দেশ সে-দুর্দিনে আমাদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে। সে দেশ জর্মনী। কবিগুরু গ্যোটে শকুন্তলার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে, শোপেনহাওয়ার উপনিষদের প্রশস্তি গেয়ে জর্মনির বিদ্বজ্জনের দৃষ্টি ভারতবর্ষের প্রতি আকর্ষণ করেন। ফলে জর্মন পণ্ডিতরা সংস্কৃত ও পালি নিয়ে যে-গবেষণা আরম্ভ করেন সে মণিমঞ্জুষার দশমাংশের সঙ্গেও আমরা এখনো পরিচিত হইনি। ভারতীয় বৈদগ্ধ্যানুরাগীরা কিন্তু জানেন, আচার্য মোক্ষমূলর আর্যাভিযানের বিজয়রথ কি করে

জাহ্নবীর ন্যায় অনুসরণ করেছেন, ইয়াকবি জৈনধর্মের লুপ্তপ্রায় গৌরব উতঙ্কের ন্যায় পুনরুদ্ধার করলেন, তাঁর শিষ্য 'কিফের্ল অগাধ পুরাণশাস্ত্রে নিমজ্জিত হয়ে মৎস্যাবতারের মত বিরাট পুস্তক 'ইণ্ডিশে কলগনি' মস্তকে তুলে ধরলেন, গেল্ডনার গণপতির ন্যায় ঋগ্বেদ জর্মন ভাষায় অনুলিখন করলেন, উইনটারনিৎস সর্বশেষে সঞ্জয়ের ন্যায় ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ অন্ধ পৃথিবীকে সামসঙ্গীত উদাত্তকণ্ঠে শুনিয়ে দিলেন।

মৃচ্ছকটিকার জর্মন অনুবাদ অন্ততপক্ষে সাতজন লেখক করে গিয়েছেন, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উপর থিসিস লিখে ক'জন জর্মন, অজর্মন ডক্টরত্ব পেয়েছেন সে-সম্বন্ধেও একখানা থিসিস লেখা যায়।

জর্মন ঔপন্যাসিক টেয়োডোর স্টর্মের 'ঈমেন্‌জে' পুস্তকের গোড়ার দিকে একপাল ছেলেমেয়ে ছোট্ট একখানা গাড়ী বানিয়ে তার মধ্যে গুটিকয়েক বসেছে, বাদবাকিরা গাড়ী টানছে, আর সবাই চেঁচিয়ে বলছে :—

"নাখ্‌ ইণ্ডিয়েন্‌, নাখ্‌ ইণ্ডিয়েন !"

অর্থাৎ

"ভারত চলো, ভারত চলো !"

পিরামিডের দেশ মিশর রইল, ড্রাগনের দেশ চীন রইল, আরবোপন্যাসের বাগদাদ রইল, ছেলেগুলোর মন কেন ভারতবর্ষেরই দিকে ধাওয়া করল কে জানে ? তবু যদি শকটিকাটি মাটির গড়া হত তবু বুঝতুম, কারণ মৃচ্ছকটিকার দেশ ভারতবর্ষ। তবে হাঁ, হয়ত শকটটি ক্ষুদ্র ছিল বলে সে 'হীনযান'কে শরণ করে তারা তথাগতের দেশে পৌঁছতে চেয়েছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্য বলেছেন বালকেরা ক্রীড়া করে এবং বৃদ্ধেরা চিন্তা করেন। শকটিকাতত্ত্ব আবিষ্কার করবেন বৃদ্ধেরা চিন্তা করে, বালকের মধ্যে যদি কোনো আবিষ্কার-শক্তির সন্ধান পাওয়া যায় তবে সে জিনিস নিশ্চয়ই কল্পনাপ্রসূত।

এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জর্মনদের শিশু এবং কবি মনের কল্পনা যে নৈসর্গিকতার বেড়া কতবার ভেঙেছে তার লেখাজোখা নেই। হাইন্‌রিশ্‌ হাইনে যে শুধু সুকবি ছিলেন তা নয়, সুপণ্ডিতও ছিলেন। তিনি পর্যন্ত বলেছেন,—

"কী অপূর্ব দৃশ্য !

শ্যামাঙ্গী সুন্দরী গঙ্গাতটে নতজানু হয়ে গঙ্গাজলে প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্মের উপাসনা করছে।"

পদ্মপূজা ! সে-পদ্মও ফুটেছেন গঙ্গাস্রোতে ! একেই বলে কল্পনা !

ওদিকে ভারতবর্ষও জর্মনিকে প্রচুর সম্মান দেখিয়েছে। আমরা জর্মনিকে যে সম্মান জানিয়েছি তার বেশী দেখানো আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম মহাপুরুষ মহাত্মা গান্ধী যখন রৌণ্ড-টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করতে বিলেত যান তখন বহু সাংবাদিক মহাত্মাজীকে এদেশ ওদেশ বহুদেশ দেখে যাবার জন্য অনুরোধ জানান। মহাত্মাজী বলেন যে, একমাত্র গ্যোটের বাইমার দেখবার তাঁর বহুদিনের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

শুনে জর্মনি যে আনন্দধ্বনি করেছিল তার প্রতিধ্বনি জর্মনির বেতারে বেতারে বহুদিন ধরে শোনা গিয়েছিল। জর্মনির বড়কর্তারা তৎক্ষণাৎ দূত পাঠিয়ে মহাত্মাজীকে ষোড়শোপচারে আমন্ত্রণ করেন; হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র মহাত্মাজীকে বেতারে যৎকিঞ্চিৎ বলার জন্য তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়ে যায় এবং আর সব বেতার-কেন্দ্রের ঈর্ষা তখন যেমন যেমন বিকট হতে বিকটতর রূপ নিতে লাগল, হামবুর্গ বেতারকেন্দ্রের ঢক্কানিনাদ সেই অনুপাতে জর্মনির কর্ণপটহ ছিঁড়ে ফেলবার উপক্রম করল। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, যেদিন হামবুর্গ বেতারকেন্দ্র প্রথম খবর দিল যে মহাত্মাজী বেতারযন্ত্রের সামনে উপস্থিত হতে স্বীকৃত হয়েছেন তখন প্রচারকের (এনাউন্সারের) কণ্ঠে কি গদ্‌গদ ভাব; চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম লোকটা আনন্দে গলে পড়ছে আর 'সখি, আমায় ধরো ধরো' বলে ঢলে পড়ছে; রেডিয়োর আর পাঁচজন তাকে চতুর্দিক থেকে ঠেকো দিয়ে কোন গতিকে খাড়া করে রেখেছে।

তারপর যেদিন দুঃসংবাদ দেবার কাললগ্ন এল যে মহাত্মাজী কনফারেন্সে বিফলমনোরথ হয়েছেন বলে বাইমার আসবেন না তখন সে-প্রচারকের আর সন্ধান নেই। যে দেবদূত মা-মেরীকে যীশুর শুভাগমনের 'সুসমাচার' দিয়েছিলেন তিনি এবং সঞ্জয় কি করে এক ব্যক্তি হতে পারেন?

ভেবেছিলুম অন্যান্য বেতারকেন্দ্র হামবুর্গের কান কাটাতে বগল বাজাবে কিন্তু তার পরিবর্তে শোনা গেল কেন্দ্রে কেন্দ্রে দরদী গলা এবং সবাই মিলে একজোটে কনফারেন্সের বড়কর্তা ইংরেজের পিঠে মারল কিল।

মহাত্মাজী যে বাইমার যেতে পারেননি সে-কথাটা বড় নয়। আসল কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষের মহত্তম আদর্শবাদের প্রতীক মহাত্মাজী লণ্ডনে বসে ব্যঞ্জনায় বলেছিলেন, ইয়োরোপে যদি দেখবার মত কিছু থাকে তবে সে হচ্ছে গ্যোটের বাইমার।

* * *

পরশুদিন চিঠি পেলুম জর্মন সতীর্থ পাউল হর্স্টারের (Paul Horster) কাছ থেকে। জর্মনির এখন যা দুরবস্থা এবং ভারতবর্ষের মাথায় এখন যা কাজের চাপ তার মাঝখানে জর্মনির সঙ্গে ভারতের যোগসূত্র ক্ষীণ হয়ে গিয়ে ঠেকেছে জর্মনির পাউল এবং 'ভারতে'র অখ্যাতনামা লেখকের সঙ্গে।

পাউল চিঠি আরম্ভ করেছে, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভে আনন্দ প্রকাশ করে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত আমরা দুজনে রাইনের পারে, ভিনাস পাহাড়ের (ভেন্সুস-বের্গ) উপরে, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনায়, কাফের ধুঁয়োর মাঝখানে কখনো উচ্চস্বরে, কখনো নীরবে, কখনো পত্রবিনিময়ে ভারতবর্ষের ভাবী স্বাধীনতা-লাভের সুখস্বপ্ন গড়েছি। আমি বলতাম, ভারতের স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্বেই আমি মরব। পাউল বাঁকা হাসি হেসে বলত, 'আগাছা সহজে মরে না, কাঁটাতে পোকা ধরে না ; স্বরাজ না দেখার পূর্বে তোমার মত কাঁটা শুকিয়ে ঝরে পড়বে না।'

আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন, কিন্তু জর্মনি পরাধীন। সে পরাধীনতা চরমে পৌঁছেছিল গেল শীতে। অনাহারে পাউলের দুই শিশুকন্যার যক্ষ্মা হয়, তার স্ত্রী মৃত সন্তান প্রসব করেন। ছাত-চোঁয়ানো হিমজলে ভিজে পাউলের নিউমনিয়া হয় ; ভৃগুস্তি কপালে এখনো অনেক বাকী আছে বলে পাউল এখনো পটল বা কপি কিছুই তুলতে পারে নি।

পাউল লিখেছে ;

"সুসংবাদ দিয়ে চিঠি আরম্ভ করি। আহারাদির বন্দোবস্ত আগের চেয়ে অল্প ভালো হয়েছে। তার কারণ কিন্তু এই নয় যে, মিত্রশক্তি আমাদের দুর্দশা দেখে বিগলিত করুণায় আমাদের ভিক্ষা দিতে রাজী হয়েছেন। খুব সম্ভব তুমি জানো যে মিত্রশক্তিরা লড়াই জেতার পর স্থির করেছিলেন যে, ১৯৫১ পর্যন্ত—অর্থাৎ লড়াইয়ের যে ছ' বছর আমরা তাদের ভুগিয়েছি, ঠিক সেই পরিমাণ—আমাদের না খাইয়ে মারবেন। কিন্তু কর্তাদের মত বদলে গিয়েছে, এবং তার কারণ—

১। "আমাদের কলকারখানা যদি আগুন নিবিয়ে বসে থাকে তবে হলাণ্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ে, গ্রীস আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে পারবে না এবং তাহলে তাদেরো আমাদেরি মত দুরবস্থা হবে। হলাণ্ড তো গেল বৎসরও তার শাকসব্জী বিনে পয়সায় দিতে রাজী ছিল, কিন্তু ইংরেজ এতদিন অনুমতি দেয়নি (এক বৎসর পরে আজ এই পয়লা তরকারি খেলুম)।"

হলাণ্ড-ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশের দুরবস্থা যেন জর্মনির মত না হয় সে দুশ্চিন্তা

ইংরেজের মাথায় কেন ঢুকল সে-কথা পাউল লেখে নি। অনুমান করি, মার্শাল প্ল্যান চালু করে রুশকে ঠেকাবার জন্য এসব দেশের ধনদৌলত বাড়ানো ইংরেজ ও আমেরিকার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

২। "বেভিন সায়েব বিপদগ্রস্ত হয়েছেন : আমরা যদি মাল-সরঞ্জাম তৈরী এবং রপ্তানি না করি, তবে আমাদের অন্য কোনো উপার্জন নেই। ইংরেজ জনসাধারণকে তাহলে গাঁটের পয়সা খরচ করে আমাদের খাওয়াতে পরাতে হবে। আর যদি ইংরেজ আমাদের কলকারখানা চালু করতে দেয় তা হলেও বিপদ—আমাদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছে যাওয়ার দরুন আমাদের খাইখর্চা এত তলায় এসে ঠেকেছে যে, আমাদের মাল তৈরী হবে অত্যন্ত সস্তাদরে—জাপান যে রকম একদা অত্যন্ত সস্তা মাল তৈরী করতে পারত—এবং সে সস্তা মাল ইংরেজের রপ্তানী-মালের দাম কমিয়ে দেবে। শেষটায় ইংরেজ ইয়োরোপে আর কিছুই বিক্রি করতে পারবে না।"

ইংরেজ যদি কোনোটাতেই রাজী না হয় তাহলে কি হবে সে কথাটা পাউল লেখে নি। বিবেচনা করি, না খেতে পেলে জর্মনরা হন্যে হয়ে সবাই কম্যুনিস্ট হয়ে যাবে এবং তাই রুশ ভালুককে ঠেকাবার জন্য ইংরেজ জর্মনিকে বাঘের দুধ খাওয়াতেও রাজী আছে।

৩। "আমেরিকার সমস্যা, হয় মার্কিন কলকারখানা পুরোদমে চালু রেখে পশ্চিম ইয়োরোপকে কলকব্জা, মালপত্র দাও—কিন্তু ভোলো না, বিনি পয়সায়—নয় রপ্তানি একদম্ বন্ধ করে দাও, কিন্তু ভোলো না, তাহলে রপ্তানি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন কলকারখানাও বন্ধ হয়ে যাবে এবং বেকার সমস্যা বাড়বে।"

পাউল লেখে নি, কিন্তু বিবেচনা করি, আমেরিকা বাইরের শত্রু রুশের চেয়েও ভেতরের শত্রু বেকার-সমস্যাকে ভয় করে বেশি।

"এদিকে আমেরিকা পশ্চিম ও মধ্য ইয়োরোপে যাতে কম্যুনিজম না ঢুকতে পারে তার জন্য ধনপ্রাণ সব দিতে প্রস্তুত। এই তো সেদিন মার্কিন যখন দেখল ইতালির লোক ভোট্ দিয়ে হয়ত কম্যুনিজম ডেকে আনবে, সেদিনই সে বড় বড় জাহাজ-ভর্তি খানাদানা ইটালিতে পাঠাতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে মার্কিনরা আমাদের খবর পাঠালো যে আমাদেরও রেশন বাড়িয়ে দেবে।

ওদিকে রুশ রেশন বাড়াচ্ছেন জর্মনির আপন এলাকায়। এদিকে মার্কিন রুশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপন অধিকৃত জর্মন অঞ্চলেও রেশন বাড়াচ্ছেন। এত দুঃখেও আমার হাসি পায়, এই নিলামের ডাকাডাকির দস্তুর দেখে।"

শুধু পাউলের নয়, আমাদেরও হাসি পায়। দুদিন আগে যে জর্মনিকে মার্কিন রুশ দুদিক থেকে পাইকারি কিল মেরে ধরাশায়ী করেছিলেন, আজ তাকে চাঙ্গা করে তোলবার জন্য একজন গলায় ঢালছেন ব্র্যাণ্ডি, অন্যজন নাকে ধরেছেন স্মেলিঙ-সল্টের শিশি! শুধু কি তাই, গ্যোবেল্‌স্ সাহেব মরার পূর্বে যে একখানা সাত-পৌণ্ডী টাইম-বম্ রেখে গিয়েছিলেন সেখানা কানে তালা লাগিয়ে ফেটেছে। গ্যোবেল্‌স্ মার্কিন-ইংরেজের উদ্দেশে বলেছিলেন, "আমাদের যে তোমরা বিনাশ করছ, তার জন্য তোমরা একদিন আফসোস করবে। তোমাদের শত্রু জর্মনি নয়, শত্রু তোমাদের রুশ। এবং সেই রুশের সঙ্গে লড়বার জন্য আমাদের আবার বাঁচিয়ে তুলতে হবে, তোমাদের টাকায় বিয়ার-সসিজ্ খাইয়ে, বাড়ী-ঘরদোর বানিয়ে দিয়ে।"

গ্যোবেল্‌সের সে টাইম-বম্—আমরা বলি ফলিত-জ্যোতিষ—ফেটেছে। রুশের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করতে গিয়ে মার্শাল ট্রুম্যান যে সব বক্তৃতা ঝাড়েন সেগুলো শুনে মনে হয়, ট্রুমান যেন 'মাইন কাম্‌ফ্' পড়ে শুনাচ্ছেন, মার্শালের গলা আর গ্যোবেল্‌সের গলায় তফাৎ ধরতে পারিনে।

শুধু কি তাই, হিটলার একদিন সদম্ভে চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করেছিলেন—গণতান্ত্রিক চেম্বারলেনের গালে ঠাস্ করে চড় মেরে। ঠিক সেই কায়দায় রুশ যখন সেদিন চেকোশ্লোভাকিয়ার গণতন্ত্র গলা টিপে মেরে ফেলল (মাজারিক নাকি আত্মহত্যা করেছেন, বেনেশ্ নাকি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন !), তখন আমেরিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। জর্মনি চেঁচিয়ে বলল, "কিছু করো না-করো, অন্তত চোখ দুটো তো রাঙা করো।" আমেরিকা চোখ-দুটি বন্ধ করেছে।

ফরাসিতে প্রবাদ আছে, 'প্ল্যু সা শাঁজ, প্ল্যু সে লা মেম শোজ।' অর্থাৎ 'যতই সে রঙ বদলায় ততই তাকে আগের মতন দেখায়।' অনেকটা বাঙলা দেশের 'গবিতা' লেখকদের মত। যতই তারা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ঢাকতে চান, ততই তাদের লেখাতে সে প্রভাব ধরা পড়ে।

মার্কিন, রুশ, ইংরেজ যতই তাদের রাজনীতি বদলাতে চায় ততই তাদের চেহারা আগের মতন হতে চলে।

জর্মন আবার শক্তিশালী হবে।

* * *

ভুলে গিয়েছিলুম পাউলের চিঠি শেষ হয়েছে প্রশ্ন দিয়ে, "Was fangen die Inder mit der wiedergewonnenen Freiheit an ? Sich gegenseitig zu erschlagen kann doch unmoeglich das einzige Ergebnis gewesen sein."

অর্থাৎ, "নবলব্ধ স্বাধীনতা দিয়ে ভারতবাসীরা কি করছে? একে অন্যকে খুন করাই তো আর সে স্বাধীনতার একমাত্র ফল হতে পারে না।"

উত্তরে কি লিখি যদি কেউ বলে দেন!

এ্যানডরুজ সাহেব

আমরা ঐ নামেই তাঁকে চিনতুম। আমি তাঁকে গুরুরূপে পাই ১৯২১ থেকে ১৯২৬ অবধি। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গুণী-জ্ঞানীরা তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর মহত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন। সে-অধিকার আমার নেই।

১৯২১-এর বর্ষায় শান্তিনিকেতনে ভরতি হওয়ার কয়েক দিন পরই জানলুম, আসাম চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য তিনি এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছেন। গুরুদেব তখন বিদেশে। ফিরে এলেন জুলাই মাসে। বোম্বাইয়ে নেমেই নাকি তিনি মহাত্মা গাঁধীর অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একমত হতে পারেননি বলে তাঁর বিরুদ্ধে আপন বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। ওদিকে আবার রবীন্দ্রনাথের সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ গাঁধীজীকে তাঁর আশীর্বাদ জানিয়েছেন। শুনলাম, এ্যানডরুজ সায়েব রবীন্দ্রনাথ ও গাঁধীজী দুজনারই সখা এবং দ্বিজেন্দ্রনাথের শিষ্য। এই তিনজনের সখ্য, প্রীতি, স্নেহ তিনি একসঙ্গে পান কি করে? সে যুগে যাঁরা যুবক ছিলেন তাঁরা স্মরণে আনতে পারবেন, এক দিক দিয়ে আমাদের সর্বগর্ব ছিল রবীন্দ্রনাথের গান, কাব্যাদি নিয়ে, অন্য দিক দিয়ে আমরা যোগ দিয়েছি গাঁধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে। এই দ্বন্দ্বেই আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত। আর এ্যানডরুজ সায়েব এই তিনমুখী লড়াই সামলান কি করে?…এমন সময় শান্তিনিকেতনে খবর পৌঁছল, গুরুদেব ও গাঁধীজীতে নাকি মুখোমুখি বসে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হবে। অন্যে যা বলুন বলুন, আমার বিশ্বাস এই মোলাকাৎটির ব্যবস্থা করেন এ্যানডরুজ সায়েব। তার দু-একদিন পরেই গুরুদেব আর সায়েব আশ্রমে ফিরে এলেন। এবং আমরা আরও দিগ্‌ভ্রান্ত, ওঁদের আলোচনার কোন রিপর্ট কোনো কাগজে বেরোয় নি। এ্যানডরুজ সায়েব সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও কিছু বলেন নি। শুনেছি রুদ্ধদ্বারে চার ঘণ্টাব্যাপী আলোচনা হয়েছিল। বিশ্বজনের প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু আর্টিস্টে ঠেকায় কে?

আচার্য অবনীন্দ্রনাথ চাবির ফুটো দিয়ে ভিতরকার অবস্থাটা এক পলক দেখে নিয়ে একটি ছবি আঁকেন। সেটি এখন শান্তিনিকেতনের কলাভবনে।…আশ্রমে ফেরার দু'একদিন পরই সায়েব বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রীদের ডেকে পাঠালেন। সায়েব সর্বপ্রথম বললেন—অর্ধশতাব্দী পরে আমার প্রতিবেদনে যদি ভুলভ্রান্তি থেকে যায় তবে সে-সভায় উপস্থিত কোনো মহাশয় সেটি সংশোধন করে দিলে অধম বড়ই কৃতজ্ঞ হবে—গুরুডেব (সায়েব 'ড' 'দ'-য়ে তফাৎ করতে পারতেন না) এবং মহাটমাজী কলকাতাতে যে আলোচনা করেছেন সেটা জনসাধারণের সামনে প্রকাশ করার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু তোমাদের জানানো দরকার। কিন্তু তোমরাও সেটি কাগজে প্রকাশ করো না।'

আহা, কী সুন্দর ইংরেজি উচ্চারণ! এতদিন যা দু-চারবার ইংরেজের মুখে ইংরেজি শুনেছি তার চৌদ্দ আনা বুঝতে পারি নি। তারা ছিল চা-বাগানের মালিক। খুব সম্ভব ককনি। আর ইনি যা বলছেন তার প্রত্যেকটি শব্দ বুঝতে পারছি। যদিও তাঁর কথাগুলো বিরাট দাড়িগোঁফের মাঝখান দিয়ে ছেঁকে ছেঁকে বেরুচ্ছিল।

পরদিন নোটিশ বেরুল সায়েব আমাদের ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে ক্লাস নেবেন। অধ্যক্ষ বিধুশেখরের বারান্দায়। হায়, আজকের লোক বুঝতে পারবে না, আমাদের কী স্থানাভাব ছিল! ব্ল্যাকবর্ড ছিল না বলে সায়েব বারান্দার মেঝেয় সঙ্গে আনা চক দিয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয়বস্তুর শিরোনামা লিখতেন। বিরাট দেহ। সমস্ত রক্ত চলে আসতো দাড়ি আর চোখের মাঝখানে।…

ঘণ্টা বাজলো। সায়েব ছুটলেন তাঁর থালা আনতে। সে-আমলে সব্বাইকে যেতে হত আপন আপন থালা নিয়ে রান্নাঘরের পাশে ডাইনিংরুমে। কিন্তু বিদেশীদের অন্য ব্যবস্থা ছিল। সায়েব সেখানে মাঝে-মধ্যে যেতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ খেতেন আমাদের সঙ্গেই।…তারপর সায়েব পড়ালেন শেকসপীয়র এবং আমাদের অনুরোধে নিউ টেসটামেণ্ট। কিন্তু কোনো বইই তিনি শেষ করার সুযোগ পেতেন না। আজ ঐ হোথায় পালাবে না কোথায় পুলিস মজুরদের কোথাও—ব্যাস্ হয়ে গেল। তাঁর ক্লাস বন্ধ।

কিন্তু কে শুনতে চায় আজকের দিনে এ-সব কাহিনী!

যুগ-যুগ-ধাবিত যাত্রী

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ ও নব রাষ্ট্র নির্মাণপ্রচেষ্টা বহু মহাপুরুষের দেশপ্রীতি এবং আত্মত্যাগ দ্বারাই সম্ভবপর হয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সঙ্গে আরো দুটি কথা স্বীকার করতে হয় যে ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও এর জন্য অংশত দায়ী। তাই ভারতীয় রাষ্ট্র ভবিষ্যতে কি রূপ নেবে সে আলোচনা করতে গেলে ঐ তিনটি জিনিসেরই প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

কোনো ভূখণ্ড পরাধীন হয়ে গিয়েছিল, ফের স্বাধীন হল এ পরিস্থিতি পৃথিবীতে বহুবার হয়ে গিয়েছে এবং তার নক্সা প্রতিবারেই কিছু না কিছু আলাদা হয়েছে। তাই যে সব দেশের সঙ্গে আমাদের কিছুটা মিল আছে তাদের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলে ভবিষ্যতের ভারত সম্বন্ধে কিছুটা আবছা-আবছা ধারণা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব নয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আরব ভূখণ্ডের এক বৃহৎ অংশ, তুর্কী, ইরান ও আফগানিস্থান স্বাধীন হয়ে যায়। এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা এ প্রবন্ধ যে মূল সূত্র নিয়ে আরম্ভ করছি তার-ই পুনরাবৃত্তি করতে হয়। কিন্তু উপস্থিত দ্রষ্টব্য এই সব দেশ তাদের নবলব্ধ স্বাধীনতা নিয়ে করলো কি?

মুস্তফা কামাল ধর্মে বিশ্বাস করতেন না—এ বিষয়ে তিনি যে সম্পূর্ণ একা ছিলেন তা নয়, তুর্কী পল্টনের বিস্তর আপিসার ফ্রান্স অথবা জর্মনিতে শিক্ষা লাভ করেছিলেন বলে ধর্মের প্রতি এঁদের কোন প্রকারের শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি যখন স্বাধীনতা লাভের পর দেশ নির্মাণ শুরু করলেন তখন বুনিয়াদি স্বার্থ ধর্মের মুখোশ পরে তাঁকে প্রতিপদে বাধা দিতে লাগলো। একে তো মুস্তফা কামাল জাত কালা-পাহাড় তার উপর তাঁর শক্তি ও আত্মবিশ্বাস ছিল অসীম। জীবনটাকে তিনি একটা আস্ত জুয়ো খেলা বলে ধরে নিয়েছিলেন বলেই শত্রুর সামান্যতম পণের বিপক্ষে তিনি গোটা জীবনটাকে পণ ধরে 'খেলায়' নামতেন। এ রকম লোক হয় তিন দিনেই দেউলে হয়, অর্থাৎ আততায়ীর হাতে প্রাণ দেয়, কিম্বা কোটিপতি হয় অর্থাৎ শত জীবন লাভ করে। তাই মুস্তফার কাছে প্রতি বাজীতে মোল্লাদের নির্মম হার মানতে হল। একবার ভেবে দেখলেই হয়, আজ যদি পণ্ডিতজী হুকুম দেন গায়ত্রী সংস্কৃতে উচ্চারণ না করে রাষ্ট্রভাষা হিন্দীতে পড়তে হবে তবে তাবৎ ভারতবর্ষে কি রকম বিরাট আন্দোলন সৃষ্ট হবে। অথচ মুস্তফা কামাল ঠিক ঐ হুকুমটিই জারী করেছিলেন—আজান আরবী ভাষায় না দিয়ে দিতে হবে তুর্কীতে,

নামাজের মন্ত্রোচ্চারণ করতে হবে তুর্কী ভাষায় !

আফগানিস্থানের বাদশা আমান উল্লাও আপন দেশটাকে গড়ে তুলতে গিয়ে দেখেন মোল্লারা শত্রুতা সাধছেন। তিনিও তখন রুদ্ররূপ নেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু একে তো তিনি মুস্তফার মত জোয়াড়ি ছিলেন না, দ্বিতীয়ত তাঁকে সাহায্য করবার জন্য তাঁর মত স্বাধীনচেতা জোয়ান আফগানিস্থানে ছিলেন অতি অল্পই। আরো কারণ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ দুটো কারণই তাঁর পরাজয়ের পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু আসল যুদ্ধটা লাগলো আরবে। একদিকে ইব্‌ন্ সঊদ, অন্যদিকে কট্টরতম মোল্লার পাল। তুর্কী-আফগানিস্থান ইসলাম ধর্মের পীঠভূমি নয়, এ সব দেশের লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করে ইসলাম নিয়েছে। কিন্তু আসল ইসলাম জন্ম নেয় আরব দেশে, আরবের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য যা কিছু তার সবই ইসলামের চতুর্দিকে গড়ে উঠেছে, ইসলাম ছাড়া অন্য সভ্যতার সঙ্গে তারা বহু যুগ ধরে কোনো সংস্পর্শে আসে নি বলে জগতের অন্য কোনো চিন্তাধারা, অন্য কোনো জীবন-সমস্যা সমাধান যে হতে পারে সে সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। লোকমুখে তারা শুনেছে, আরবের বাইরে রমণীরা উচ্ছৃঙ্খল, পুরুষেরা নাস্তিক, ধর্মের বন্ধন সেখানে একেবারেই নেই, সেখানকার নরনারী নির্লজ্জতায় পশুরও অধম।

গোড়ার দিকে ইব্‌ন্ সঊদ নিজেও ঐ দলেরই ছিলেন কিন্তু নজ্‌দ্ ও হিজজাজের রাজা হওয়ার পর তিনি যখন রাজ্য গঠন কর্মে নিযুক্ত হলেন তখন দেখেন ইউরোপীয় যন্ত্রপাতি ভিন্ন কৃষি বাণিজ্য কোনো প্রতিষ্ঠানেরই দ্রুত এবং দীর্ঘস্থায়ী উন্নতি করা অসম্ভব। এ তত্ত্বটি তিনি তখন ধীরে ধীরে মোল্লা সম্প্রদায়কেও বোঝাতে চেষ্টা করলেন—ওদিকে আবার প্রগতিশীল মিশর থেকে প্রত্যাবর্ত যুবক সম্প্রদায় দু'একখানা মোটর গাড়ী, কিছু কিছু গ্রামোফোনও সঙ্গে আনতে আরম্ভ করেছেন, মোদ্দা কথা ধর্মের দোহাই দিয়ে আজকের সংসারের আনাগোনা, যোগাযোগ কি করে সম্পূর্ণ বন্ধ করা যায় ?

মোল্লারা ক্রমে ক্রমে নরম হলেন। তখন প্রশ্ন উঠল বন্দুক-কামান ডাইনামো-ট্র্যাকটর কেনবার মত কড়ি ইব্‌ন্ সঊদের কোথায়—আরবের মরুভূমি এমন কি ফলায়, যার বদলে এ সব কেনা যায় ? তখন দেখা গেল সঊদী আরবের মাটির তলায় প্রচুর পেট্রল। ইব্‌ন্ সঊদ সেটা মার্কিনদের কাছে বিক্রী করে পেলেন কোটি কোটি ডলার। তাই দিয়ে অনেক কিছু হল—এখন ইব্‌ন্ সঊদের প্রাসাদে লিফ্‌ট্ হয়েছে, সে প্রাসাদ এ্যার-কণ্ডিশন্‌ড্। আবার সেই টাকার জোরেই মিশর এবং ভারতবর্ষ থেকে লক্ষ লক্ষ কুরান কেনা হচ্ছে এবং আরবদের মধ্যে বিতরণ করা

হচ্ছে (সউদী আরবে ছাপাখানার ব্যবস্থা ভালো নয় বলে বোম্বাই লক্ষ্ণৌয়ে নওলকিশোর প্রেসে ছাপা কুরান সেখানে যায়, কলকাতা থেকে এখনো ঢাকায় লক্ষ লক্ষ কুরান যায়)। ওদিকে সউদী আরবের কোনো কোনো শহরে গোপনে গোপনে স্কচ্ পানও আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

আরবের 'ধর্মে' ও ইয়োরোপের 'অধর্মে' খানিকটা সমঝাওতা হয়ে গিয়ে থাকা সত্ত্বেও একথা মানতে হবে যে ইয়োরোপীয় চিন্তাধারা এখনো মক্কা-মদীনাতে প্রবেশ করতে পারে নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরো চারটি দেশ স্বাধীন হয়ে গণতন্ত্র নির্মাণ করেছে—ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, বর্মা এবং ইন্দোনেশিয়া, মিশরও যুগধর্ম রক্ষা করে গণতন্ত্র হতে চললো এবং চীন কম্যুনিস্ট হয়ে গিয়েছে।

স্বাধীনতা-লাভের প্রথম কট্টর প্রতিক্রিয়া দেখা গেল ইন্দোনেশিয়ানদের মধ্যে। তারা রাতারাতি তাবৎ ডাচ্ রাস্তার নাম, প্রতিমূর্তি, স্মৃতিস্তম্ভ ভেঙে চুরমার করে দিল (আমাকে এদেশে আগত ইন্দোনেশিয়ানরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে আমরা এখনো ময়দানে ব্রিটিশ প্রতিমূর্তিগুলি বরদাস্ত করি কেন, উত্তরে আমি বলি, কলা হিসেবে এগুলো এতই নিম্নশ্রেণীর যে এগুলো রেখে দিলেই ইংরেজ মাথা হেঁট করবে, অন্যান্য বিদেশী মৃদু হাস্য করবে)।

কিন্তু তাই বলে ইন্দোনেশিয়া ইয়োরোপীয় সভ্যতাকে বর্জন করলো না। ওলন্দাজদের পরিবর্তে তারা এখন ইংরেজি সভ্যতার কিছুটা গ্রহণ করার চেষ্টায় আছে। সুতান শহরীরের মত আরো অনেক বিচক্ষণ ব্যক্তি ইন্দোনেশিয়ায় আছেন—এঁরা পণ্ডিত নেহরু গোত্রীয়, এঁরা ইয়োরোপীয় সভ্যতার আওতায় বড় হয়েছেন এবং দেশের ঐতিহ্যকে জাতীয়তাবাদী হিসেবে শ্রদ্ধা করলেও সে ঐতিহ্যের সঙ্গে এঁদের যোগসূত্র সূক্ষ্ম এবং ক্ষীণ।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সউদী আরবের মত ইন্দোনেশিয়ারও ধর্ম মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। নব রাষ্ট্র-নির্মাণে এঁদের বিশেষ একটা হকও ছিল—শহরীর সুকার্নোর বহু বহু পূর্বে এঁরা হজে যাওয়ার ফলে মক্কা-মদীনার প্ররোচনায় দেশে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এঁরা যে ভূমি নির্মাণ করেছিলেন তারই উপর শহরীর সম্প্রদায় তাঁদের ফুলের বাগান সাজাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কিন্তু পূর্বেই নিবেদন করেছি, স্বদেশ-জাত ধর্মের বেলায় মানুষ যে রকম উত্তেজনা ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মের পুনরুত্থানের জন্য চেষ্টা করে বিদেশাগত ধর্মের জন্য—বিশেষতঃ এই জাতীয়তাবাদের যুগে—মানুষ অতখানি করে না। তাই

ইন্দোনেশিয়ার মোল্লা সম্প্রদায় ইরানের কশানী সম্প্রদায়ের মত বহু বল ধারণ করলেও এখনো 'আধুনিক' সম্প্রদায়ীদের আসনচ্যুত করতে পারেন নি।

বর্মাতে ধর্মান্দোলন আরো কম, আর পাকিস্তানের খবর সকলেই অল্পবিস্তর রাখেন। চীন কম্যুনিস্ট, তবু চীন সম্বন্ধে একটি কথা জোর দিয়ে বলা যেতে পারে—চীনে ধর্ম এবং সমাজ আলাদা আলাদা থাকে বলে ধর্ম সেখানে অনেকটা আমাদের দার্শনিক মতবাদের মত। এদেশে পিতা যদি বেদান্ত মানেন, পুত্র যদি সাংখ্যবাদী হন এবং নাতি যদি যোগশাস্ত্রের চর্চা করেন তবে তিনজনকে পৃথক পৃথক বাড়ী বানিয়ে আলাদা আলাদা বসবাস করতে হয় না। তাই চীনে একই বাড়ীতে এক ভাই বৌদ্ধ, দ্বিতীয় মুসলমান, তৃতীয় খৃষ্টান এবং এঁরা একই বাড়ীতে নির্বিবাদে গুষ্টিসুখ অনুভব করেন। তিন ভ্রাতাই কিন্তু চীনা ঐতিহ্যের সম্মান করেন এবং তাই আজ চীন ১৯১৭ সালের রুশ বলশেভিকদের মত আপন বৈদগ্ধ্য 'বুর্জুয়া নামে গালাগাল দিয়ে চীন-দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় নি। বরঞ্চ গুণীদের মুখে শুনতে পাই মাওৎসেতুঙ্ যখন কম্যুনিজম সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তখন বিশেষ করে চোখে পড়ে তার নিজস্ব চীনা রূপ—ভাব, ব্যঞ্জনা, অলঙ্কার প্রয়োগে মাও নাকি খাঁটি চীনা ঐতিহ্য মেনে চলেন।

এ স্থলে একটি কথায় বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। প্রাচ্যের কোনো দেশই ভারতীয়দের মত অতখানি ইংরেজি পড়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতার আওতায় পড়ে নি—এমন কি তুর্কীও অতখানি ফরাসী শেখে নি। ইয়োরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস-লেখন-পদ্ধতি, অর্থশাস্ত্র, রাজনীতি আমাদিগকে যতখানি প্রভাবান্বিত করেছে তার শতাংশের একাংশ অন্য কোনো প্রাচ্য দেশে হয়নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলতে পারি, আমরা সংস্কৃত, বাঙলা সব কিছু ভুলে গিয়ে প্রায় একশ' বৎসর ধরে ইংরেজির মাধ্যমে সর্বপ্রকারের জ্ঞানচর্চা করেছি—চীন কিংবা আরব একদিনের তরেও করে নি। তাই আজ আমরা বাঙলায় ফিরে গিয়ে ইংরেজি ভাবের বাঙলা অনুবাদ করার সময় শব্দের সন্ধানে মাথা কুটে মরি। চীন আরবে এ সমস্যা অনেক সরল, নেই বললেও চলে এবং ঠিক তেমনি তাদের সাহিত্য বর্তমান যুগের আন্তর্জাতিক সাহিত্য কলার সম্পদ আহরণ করে অতখানি বিত্তমান আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য, কলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার মত হতে পারে নি।

এই বিত্ত এই সম্পদের বিরুদ্ধে ভারতেও একদল ওয়াহ্হাবী (আরবের কট্টর), কশানী সম্প্রদায় দেখা দিয়েছেন। এরা সকলে মিলে যে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক সম্প্রদায় করেছেন তা নয়, যে কোনো রাজনৈতিক দলের ভিতর এই মতবাদের

বিস্তর লোক পাওয়া যায়। এঁদের ধারণা যে খুব স্পষ্ট তাও নয়, কিন্তু মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, এঁরা চান অতীতের কোনো 'সত্যযুগে' ফিরে যেতে, এঁদের বিশ্বাস ভারতের ইতিহাসে এ রকম পাপতাপহীন যুগ ছিল এবং সে যুগে ফিরে যাওয়া অসম্ভব নয়।

আমি ধর্মে বিশ্বাস করি, ঐতিহ্যে বিশ্বাস করি। কিন্তু সত্যধর্মের জন্য আমাকে পশ্চাতের কোনো বিশেষ যুগে ফিরে যেতে হবে এ কথা বিশ্বাস করি না। ধর্মে বিশ্বাস করি বলেই কায়মনোবাক্যে মানি,

"নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃষদ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখ্য ॥
চরৈবেতি, চরৈবেতি

চলিতে চলিতে যে শ্রান্ত তাহার আর শ্রীর অন্ত নাই, হে রোহিত, এই কথাই চিরদিন শুনিয়াছি। যে চলে দেবতা ইন্দ্রও সখা হইয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলেন। যে চলিতে চাহে না, সে শ্রেষ্ঠ জন হইলেও সে ক্রমে নীচ (পাপী) হইতে থাকে, অতএব, অগ্রসর হও, অগ্রসর হও।"

এবং ধর্মের চেয়েও বেশী মানি ভারতীয় বৈদগ্ধ্যকে—যে বৈদগ্ধ্যকে আমরা এতদিন অবহেলা করেছি।

যদি জানতুম যে ইয়োরোপীয়, আরব কিংবা চীনা বৈদগ্ধ্যের তুলনায় ভারতীয় বৈদগ্ধ্য বিত্তহীন তাহলে হয়ত আমি সনাতন পন্থায় সে বৈদগ্ধ্য নিয়ে আলোচনা করতুম, কোনো বিশেষ যুগের বিশেষ বৈদগ্ধ্য আঁকড়ে ধরে বসে থাকতুম, কিন্তু দেখছি দেশে দেশের মাঝখানের সর্বপ্রকার ভৌগোলিক বাধা প্রায় লোপ পেতে বসেছে, আজ যেমন ইংরেজী ফরাসী জর্মন বৈদগ্ধ্য একে অন্যের গোপনতম সম্পদের খবর রাখে ঠিক তেমনি সেদিন শীঘ্রই এসে উপস্থিত হবে যখন ভারতীয় বৈদগ্ধ্যকে আর সব বৈদগ্ধ্যের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে। আমার সম্পদকে তখন তাদের সামনে এমনভাবে সাজিয়ে দিতে হবে, তাকে এমনি ধরণে যুগধর্মোপযোগী করতে হবে যে বিশ্বজন যেন তাকে বুঝতে পারে, এবং তারপর এগিয়ে চলতে হবে তাদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে, ইয়োরোপ, চীন, আরবের সর্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলার সর্বোত্তম নিদর্শন গ্রহণ করে, ভারতীয় সম্পদ দান করে।

তাই ভারতের ভাগ্যবিধাতা নিয়ে চলেছেন,

'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীকে'

তারা দাঁড়িয়ে নেই—তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না ॥

ভাষার হাটে বেইমানি

একদা এদেশে মুসলমানী সভ্যতা-সংস্কৃতি এতদূর ছড়িয়ে পড়েছিল যে বাঙলার সভ্যতা, বেশভূষা, আলাপ-আচরণে অনেকখানি মোগলাই-মোগলাই রং ধরেছিল। আমার নমস্য গুরুজন জয়রাম মুন্সী চোগা-চাপকান পরতেন আর বড় বড় মজলিসে তাঁর ফার্শী বয়েত আওড়ানো শুনে দেশবিদেশের জমায়েৎ মৌলবী-মওলানারা শাবাশ শাবাশ বলতেন। তারপর আমরা একদিন কোটপাতলুন পরে কাঁটা-চামচ দিয়ে খেতে আরম্ভ করলুম আর আমাদের ইংরেজি কপচানো শুনে দেশ-বিদেশের লোক ধন্যি ধন্যি বললে। সেদিনও গেছে—হরেদরে আমরা সব কিছু সামলে নিয়ে এখন আবার অনেকখানি সম্বিতে ফিরেছি।

আরবী-ফারসী থেকে শব্দ সঞ্চয় করার ফলে বাঙলা ভাষা গতিবেগ পেল সে কথা পূর্বেই একদিন নিবেদন করেছি। 'আলাল', 'হুতোমের' জোয়ার কেটে যাওয়ার পর বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ হয়ে বাঙলা ভাষা এমন জায়গায় এসে দাঁড়ালো যেখানে সে অনায়াসে গুরু-গম্ভীর ভাবাবেগ প্রকাশ করতে পারে, আবার চাষী বউয়ের কান্নাহাসিরও ঠিক ঠিক খবর দিতে জানে। এ ভাষা দিয়ে যে রকম 'প্রাচীন সাহিত্যের' মন্দ্ররব শোনানো যায় ঠিক তেমনি 'রামের সুমতি'র মত ভেজা ভেজা ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কাহিনীও শোনানো যায়—শুধু শব্দ আর বাচনভঙ্গীর বেলায় একটুখানি হিসেব করে নিলেই হল।

উনবিংশ শতকের শেষ আর এ শতকের গোড়ার দিকে যে হিন্দী লেখা হত সে হিন্দীও মোটামুটি এই কায়দায়ই রচনা করা হত। শুধু তাই নয়, অধিকাংশ হিন্দীলেখক উত্তম উর্দুও জানতেন বলে তাঁদের হাতের নাগাল রইত বিস্তর আরবী-ফারসী শব্দ—কারণ বাঙলা যে রকম শব্দভাণ্ডারের জন্য প্রধানতঃ নির্ভর করে সংস্কৃতের উপর, উর্দু নির্ভর করে আরবী-ফারসীর উপর। আরবীর শব্দ-ভাণ্ডার সংস্কৃতেরই মত বিরাট (সংস্কৃতের মত আরবীও আপন ধাতু থেকে অসংখ্য শব্দ বানাতে পারে, যথা 'জালাসা'= 'বসা,' তার থেকে 'মজলিস', 'এজলাস' ইত্যাদি) এবং বাঙলায় যে রকম যে কোনো—তা সে 'ক্রন্দসী'র মত অজানা শব্দই হোক না কেন—সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার 'শাস্ত্রাধিকার' আছে, উর্দুও ঠিক সেই রকম আরবীর লক্ষ লক্ষ শব্দের যে-কোনো শব্দ ব্যবহার করতে পারে।

তারপর হিন্দীতে এল ভাষাশুদ্ধীকরণের 'বাই'। তার ফলে সে ভাষা বিদ্যেসাগরী ভাষার রঙ না ধরে ধরলো সং। কারণ বিদ্যেসাগর মশায়ের মত ওরকম

জবরদস্ত লেখক হিন্দীতে কেউ তখন ছিলেন না। তবু সে ভাষা আরবী-ফারসী বিকটভাবে বর্জন করে নি বলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস তখনো তর্জমা করা হত।

স্বাধীনতা পাওয়ার পর কিন্তু এ 'বাই' চরমে গিয়ে পৌঁছল। আমরা বাঙলায় বলি 'তারপর' কিম্বা 'তার বাদে' ("বাদ" শব্দটা আরবী সে কথা আমরা বেবাক ভুলে গিয়েছি) হিন্দীতে মাত্র একটি উপায়ে বলা যায় এবং সেটি হচ্ছে 'উস্‌কে বাদ'। হিন্দীওলারা তাই সেই 'বাদটুকু'কে পর্যন্ত বাদ দিয়ে বলতে আরম্ভ করেছেন 'উস্‌কে পশ্চাৎমে'!

বছর তিনেক পূর্বে শ্রীযুত অমরনাথ ঝা'র একটি ভাষণ আমি শুনি। পূর্ণ অর্ধ ঘণ্টা ভদ্রলোক অতি বিশুদ্ধ হিন্দীতে বক্তৃতা দিয়ে শেষ করলেন এই কথা বলে 'অব জো হমারী রাষ্ট্রভাষা হোগী বহ সংস্কৃতময়ী হিন্দী হোগী' অর্থাৎ আমাদের রাষ্ট্রভাষা 'সংস্কৃতময়ী' হবে।

শ্রী ঝা তাঁর অর্ধঘণ্টাব্যাপী ভাষণে একটিমাত্র আরবী কিম্বা ফার্সী শব্দ ব্যবহার করলে না।

আজ তাই হিন্দী ভাষা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে সে অনায়াসে 'সীতার বনবাস' অনুবাদ করতে পারে, কিন্তু 'রামের সুমতি' কিম্বা 'গড্ডলিকা' করতে পারে না।

এ বড় মারাত্মক অবস্থা—সেই কথাটি আমি পাঠককে বলতে চাই। কারণ একথা ভুললে চলবে না, গণ-আন্দোলনের ফলেই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রনির্মাণের জন্য জনগণের সহযোগিতার প্রয়োজন। চাষা-ভূষোর সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা নিয়ে আমাদের বই লিখতে হবে, বক্তৃতা দিতে হবে, নাটক সিনেমা বানাতে হবে। এসব জিনিস বিদ্যেসাগরী বাঙলা দিয়ে যে রকম প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব ঠিক তেমনি আজকের দিনে হিন্দী দিয়েও প্রকাশ করা যায় না। একেবারে যায় না বলা অনুচিত, কিন্তু সে ভাষা যে সাহিত্যের পর্যায়ে ওঠে না তাই নয়, সে ভাষা অবোধ্য।

সুশীল পাঠক হয়ত অতিষ্ঠ হয়ে বলবেন, হিন্দী কি করে না-করে তা নিয়ে তোমার অত শিরঃপীড়া কেন?' কথাটা খুবই ঠিক, কারণ হিন্দী আমার মাতৃভাষা নয়, হিন্দী নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে আমার কিম্বা আপনার ব্যক্তিগত কোনো লাভক্ষতি নেই—অবশ্য যতক্ষণ হিন্দী আপন জমিদারিতেই দাবড়ে বেড়ায়, আমাদের পাকা ধানে মই না দিতে আসে।

সেইখানেই তো বিপদ। মেনে নেওয়া হয়েছে হিন্দী আমাদের রাষ্ট্রভাষা হবে

ও ক্রমে ক্রমে বাঙালী, আসামী, মাদ্রাজী সবাইকে যে শুধু হিন্দী পড়তে হবে তাই নয়, সে ভাষায় লিখতে হবে, বলতেও হবে। অর্থাৎ রাষ্ট্র-নির্মাণের কর্ম অনেকখানি হিন্দীর মাধ্যমে করতে হবে। আজকের দিনের ছুঁৎবাইগ্রস্ত হিন্দী দিয়ে কি সে-কর্ম সুচারুরূপে সমাধান হবে ?

রসিকতা বাদ দিন। পরশুরামের 'ছি ছি বলিয়া তৃপ্তি হয় না, তওবা, তওবা বলিতে ইচ্ছা করে'র অনুবাদ তো হয়ই না, ইংরেজকে যে খেদাতে হবে 'আব্রু দিয়ে, ইজ্জৎ দিয়ে, ইমান দিয়ে, বুকের রক্ত দিয়ে' সেই জোয়ালো বাঙলা পর্যন্ত অনুবাদ করা যাবে না। কারণ 'আব্রু', 'ইজ্জৎ' ,ইমান শব্দ ফারসী-আরবী—হিন্দী এ শব্দগুলো বরদাস্ত (থুড়ি ! 'সহ্য') করবেন না। 'আব্রুর' সংস্কৃত কি জানিনে, 'ইজ্জৎ' না হয় কেঁদে-কুকিয়ে 'মান' দিয়ে চালালুম, কিন্তু 'ইমান' শব্দের সংস্কৃত নেই সেকথা নিশ্চয় জানি। 'বেইমানির' জায়গায় বিশ্বাসঘাতকতা' চালাতে গেলে 'ভাষার হাটে বেইমানি' করা হয়।

যে ভাষা রাষ্ট্রভাষা হতে চায় তার শব্দভাণ্ডার হবে বিরাট। কারণ বহু প্রদেশের নানা রকম চিন্তাধারা তাকে প্রকাশ করতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রয়োজন মত নানা প্রদেশ থেকে নানারকম নূতন শব্দও তাকে গ্রহণ করতে হবে—ইংরেজি যেমন নানা দেশ থেকে নানা রকমের শব্দ নিয়ে আপন ভাষা বিত্তবতী করেছে।

যে ভাষা আপন শব্দভাণ্ডার থেকে অকাতরে খেদিয়ে দিচ্ছে বিস্তর শব্দ শুদ্ধমাত্র 'পবিত্র' হওয়ার জন্য সে ভাষা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ থেকে নানাপ্রকারের শব্দ নিতে রাজী হবে সে আশা দুরাশা।

আমার একমাত্র সান্ত্বনা যে হিন্দী সাহিত্যিকদের ভিতর এমন লোকও আছেন যাঁরা শ্রী ঝা'র সমর্থন করেন না।

ধৈর্যং কুরু ! পুনঃ গচ্ছং ঢাকায়ে

গত পঁচিশ বৎসর ধরে কী ঘটি কী বাঙাল কলকাতায় মাছের বাজার থেকে বাড়ি ফেরার সময় দিবাস্বপ্ন দেখেছে, আহা ঢাকার লোক কী সুখেই না আছে। বিশেষ করে বাঙাল ছেলেমেয়েরা বাচ্চা বয়েস থেকে মা মাসীর কাছ থেকে ঢাকা, বিক্রমপুর, গোয়ালন্দী ইস্টিমারের বিশ্বভুবনে অতুলনীয় রাইসকারির কথা শুনেছে। ঢাকার কই ? সে তো ঘটিদের ইলিশের সাইজ। আর হোথাকার ইলিশ ? সে তো তিমি মাছের সাইজ। গোটা পৃথিবীটা নাকি কোন্ এক প্রাণীর মাথায় বিরাজ

করছে—কিন্তু খাস ঢাকাইয়া মাত্রই জানে ঢাকার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। সৃষ্টির আদিম প্রভাতে ব্রহ্মাণ্ড অলিম্পিকে যে তিনটে ইলিশ হেভি-ওয়েট প্রাইজ পায় সেই তিনটির উপর ঢাকা শহর নির্মিত। এ তত্ত্ব আপনার অজানা থাকলে চেপে যাবেন —নইলে ইলশায় হাসবো।

তদুপরি ঢাকার নবাববাড়ির আওতায়, দীর্ঘ তিনশ' বৎসর ধরে নির্মিত মোগলাই খানা! মোগলাই রান্নার উৎপত্তিস্থল দিল্লী-আগ্রা। একটা শাখা গেছে লক্ষ্ণৌয়ে, অন্য শাখা যমুনা বেয়ে বেয়ে এলাহাবাদ, কাশী থেকে একটু মোড় নিয়ে মোগলসরাই, ফের গঙ্গা বেয়ে পাটনা তারপর মুর্শিদাবাদ। ওদিকে পদ্মা বেয়ে বেয়ে ছোট নদী ধরে ঢাকা। রান্নার শেষ তীর্থ সিলেট—কারণ ওটা পাঠান-মোগল উভয়েরই শেষ সীমান্ত নগরী।

বিক্রমপুর উল্লেখ করলুম কেন তবে? সে তো গ্রাম—আজ না হয় মেনে নিলুম ওটা মহকুমা সাইজ ধরে। এবং এ তো অতিশয় সুপরিচিত সত্য যে, কোনো একটি বিশেষ রন্ধনপদ্ধতি (ফরাসিতে কুইজিন—এবং এই শব্দটিই এখন আন্তর্জাতিক) গ্রামাঞ্চলে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

পাঠান-মোগলের পূর্বে বিক্রমপুর ছিল হিন্দুরাজাদের রাজধানী। এই তো কিংবদন্তী। জঙ্গীলাটরা যেরকম যুদ্ধের পর যুদ্ধের কালানুক্রমিক নির্ঘণ্ট থেকে সে-দেশের ইতিহাস নির্মাণ করেন, এ-রসনা পূজারী রন্ধনপদ্ধতির (কুইজিনের) উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ধরে ধরে সে দেশের ইতিহাস নির্মাণ করে। জনশ্রুতি যদি সেখানে আমার কুইজিন-ইতিহাসকে সায় দেয় তবে সেই জনশ্রুতিই সত্য ইতিহাস—বাঁড়ুয্যে সরকার সেস্থলে অপাংক্তেয়।

বিক্রমপুরের কুইজিন ছিল মৎস্যকেন্দ্রিক। ঢাকার মোগলাই রান্না স্পষ্টতই মাংসকেন্দ্রিক। কিন্তু তাই বলে বিক্রমপুরকে ঠেকানো যায় নি। বস্তুতঃ, এই ঢাকাতেই আপনি পাবেন মৎস্য-মাংস কুইজনের বিরলতম সমন্বয়—গঙ্গা-যমুনার সম্মেলন। এ তীর্থে যে বঙ্গজন আসে না তার পিতা নির্বংশ হোক্ (এটা বিদ্যেসাগর থেকে চুরি)। যে এ তীর্থের প্রসাদ বেক্তেয়ার হয়ে উদরে ধারণ এবং পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হয় সে আখেরে যাবে বেহেশতে যেখানে বিস্তর সুদূর নিস্তরঙ্গ নহর্-তরঙ্গিণী মৌজুদ এবং বলা বাহুল্য সেগুলোতে ইলিশ আবজাব করছে, কোনো প্রকারে সীজ্‌ন্, অফ্‌ফ্‌ সীজনের তোয়াক্কা না করে। সৃষ্টিকর্তা ভক্তের মনোবাঞ্ছা কদাচ অপূর্ণ রাখেন না। আর সে যদি হিন্দু হয় তবে অতি অবশ্যই সে তদ্দণ্ডেই যাবে শিবলোকে, অর্থাৎ তার বাসস্থান হবে শিবশম্ভুর জটালোকে যেখান থেকে

বেরিয়েছেন,

দেবী সুরেশ্বরী / ভগবতী গঙ্গে
ত্রিভুবন তারিণী, / তরল তরঙ্গে।

আর একথা কি আমার মত যবনকে তৈলবট গ্রহণ করে বিধান দিতে হবে যে সে গঙ্গায় বিরাজ করেন ইলিশ শুধু ইলিশ, দূরদিগন্তব্যাপী ইলিশ।

* * *

কিন্তু হায়, পদ্মার ইলিশ পরিপাটিরূপে রাঁধবার জন্য সুনিপুণা বিক্রমপুরাগতা লক্ষণা সমাজ—বিশেষ করে বৈদ্য বর্ণোদ্ভবা। এ বর্ণের প্রতি আমার পক্ষপাতিত্ব পাঠক ক্ষণতরে বিস্মৃতির বুড়ীগঙ্গায় ভাসিয়ে দিন। এঁদের এককেটি যেন সাক্ষাৎ ভানুমতী। এঁদের হাতে কই ইলিশ থেকে আরম্ভ করে এস্তেক কেঁচকি চুনোপুঁটি পর্যন্ত না জানি কোন্ ইন্দ্রজালের মহিমায় এমনই এক অপরূপ সত্তায় পরিণত হন যে তখন তাঁরই রসে সিক্ত রসনা গেয়ে ওঠে :—

ইহাকে জানেন যাঁরা
জগতে অমর তাঁরা
য এতদ্‌বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি॥

* * *

কোথায় আজ সে নবাববাড়ি যাকে কেন্দ্র করে একদা পূর্বাচলের মোগলাই কুইজিন গড়ে উঠেছিল? কলকাতার গোড়াপত্তন থেকেই সে ভুঁইফোঁড় আপস্টার্ট। কাজেই সেখানে অল্পকালের মধ্যেই দেখা দিল হোটেল, রেস্তরাঁ, চায়ের দোকান, মায় পাইস হোটেল এবং এদানির কফি হৌসগুলো। যদ্যপি একশ' বছর পূর্বেও কলকাতায় প্রবাদ ছিল, বাঙাল দেশের জাত মারলে তিন সেন। উইলসেন, কেশব সেন আর ইস্টি শেন। উইলসনের হোটেল, কেশব সেনের ব্রাহ্মধর্ম আর স্টেশনে তো জাত মানার উপায়ই নেই। ঢাকাতে সে-রকম হুশ হুশ করে রেস্তোরাঁ গজাল না। বিরয়ানি, পোলাও, চতুর্ককার—কোরমা, কালিয়া, কাবাব, কোফতা—দোপেয়াজা, এবং ঢাকার অত্যুৎকৃষ্ট রেজালা বুরহানী, সাদামাটা নেহারি (এটা বরঞ্চ সহজলভ্য), ঢাকাই পরোটা (ভিতরে অষ্টগ্রামের পনীরের পুর দেওয়া পরোটা), নানাবিধ সমোসা গয়রহ গয়রহ তাই রেস্তোরাঁর মাধ্যমে ভালো করে প্রচার প্রসার লাভ করার পূর্বেই ঢাকার স্কন্ধে ভর করলো ঢাউস ঢাউস বিলিতি মার্কা হোটেল—তাদের অপেয় সুপ, অখাদ্য ইষ্টু, অকাট্য রোস্ট ইত্যাদি ট্যাশ যত সব গব্বযন্ত্রনা। আর দিশী পোলাওয়ের নামে এক প্রকারের অগা খিচুড়ি (জগা নয়), কোরমার

নামে আইরিশ ইস্টুর সঙ্গে ইণ্ডিয়ান মশলার সমন্বয়—সরি,—খুনোখুনি। যা কিছু গলা দিয়ে নামে সঙ্গে নিয়ে যায় রিটার্ন টিকিট। তিন দিনের নয়, তিন মিনিটের রিটার্ন। কপাল ভালো থাকলে এবং পেটে সুইডিশ স্টীলের লাইনিং থাকলে ঘণ্টা তিনেকের ম্যাদ।

তবে হাঁ, এখনো আছে বাকির (বাখর) খানী রুটি, এবং সুখা রুটি। কথিত আছে জনৈক পশ্চিমা খানদানী মনিষ্যি এস্তের জাগীর পেয়েছিলেন বরিশালে। ঢাকা থেকে বেরুবার সময় সঙ্গে নিয়ে যেতেন এক ডাঁই সুখা রুটি (খাস উর্দুতে অবশ্য সুখী রুটি)। বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি আবিষ্কার করেন এই অপূর্ব চীজ। কোথায় লাগে এর কাছে উৎকৃষ্টতম ক্রীম ক্রেকার? ঝাড়া একটি মাস থাকে মুরমুর ক্রিস্‌প্‌। জনশ্রুতি, এই বাকিরখানের নামেই হয় বরিশালের অন্য নাম বাকরগঞ্জ।

নেই নেই করে অনেক কিছুই আছে।

কিন্তু—কিন্তু—ঠিক এই সময়টায় তীর্থযাত্রাটা স্থগিত রাখুন। "ভাদ্রাশ্বিনে পূর্বাচলযাত্রা নাস্তি।" একাধিক মৌলিক দ্রব্যের অনটন। তবে কি না শিগগিরই ট্যুরিস্ট বুরো খুলবে। আসা-যাওয়ার সুখ-সুবিধে হবে। আসছে শীত নাগাদ পাসপর্ট ভিজার কড়াকড়িও কমবে।

বন্ধুবান্ধবদের যে সদুপদেশ দিয়েছি, সুশীল পাঠক, তোমাকে তো তার উল্টোটা বলতে পারি !

ঈদ-আনন্দোৎসব

ধর্মের একটা দিক চিরন্তন এবং যার পরিবর্তন হয় না। এই যে আমি পাঁচ ইন্দ্রিয় দিয়ে বিশ্বভুবনের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছি তার বাইরে যে-সত্তার কল্পনা আমি অভনুব করতে চাই, তিনি আদিঅন্তহীন, অপরিবর্তনীয়। যে-মানুষ সাধনার ক্ষেত্রে যতখানি অগ্রসর হয় সে সেই অনুপাতে তাঁর নিকটবর্তী হয়, তাঁর অনুভূতি নিবিড়তর হয়। আমাদের হজরত বলতেন তিনি সেই চরম সত্তাকে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন তাঁর স্কন্ধের শিরার (স্পন্দনের) মত। বলা বাহুল্য আমরা মনন দ্বারা যে পরমসত্তাকে অনুভব করি তিনি চিন্ময়। শিরার স্পন্দন-জনিত অনুভূতি সম্পূর্ণ মৃন্ময়। চিন্তায় মারফৎ আমরা কল্পলোকে যে অনুভূতি পাই, স্পর্শলব্ধ দৃঢ় মৃত্তিকাজাত শিরার অনুভূতি তার তুলনায় অনেক বেশী নিবিড় অনেক, বেশী দৃঢ়। তাই হজরত সেই পরম সত্তাকে শারীরিক অভিজ্ঞতার ভ্রান্তিহীন সত্যের মত প্রতি

মুহূর্তে অনুভব করতেন।

পক্ষান্তরে ধর্মানুভূতির জগৎ থেকে বেরিয়ে ধর্মাচরণের কর্মভূমিতে আমরা যখন নামি, তখন সে-আচরণের অনেকখানি দেশকালপাত্রের উপর নির্ভর করে। অবশ্য অন্বেষণ বিশ্লেষণ করলে অবশেষে দেখা যাবে আমাদের প্রত্যেকটি ধর্ম-আচরণও সেই অপরিবর্তনীয় চিরন্তন সত্তাশ্রিত। কর্মজগতে তাই প্রথমত পাত্রের উপর নির্ভর করে ধর্মাচরণ—আমল। আমি পক্ষাঘাতে চলৎশক্তিহীন, অথর্ব। মক্কা শরীফ দর্শনের তরে আমার চিত্ত যতই ব্যাকুল হোক না কেন, আমার যত অর্থ-সম্পদই থাকুক না কেন, কোনো ধর্মজ্ঞজন কোনো ফকীহ আমার হজ-যাত্রার অপারগতাকে নিন্দনীয় বলে মনে করবেন না। আমি এ-অবস্থায় যে-কোনো হাজীকে, আমার হয়ে, পুনরায় হজ করার জন্য মক্কা শরীফে পাঠাতে পারি; অবশ্য তার সমস্ত খর্চা-পত্র আমাকেই দিতে হবে। এর থেকে কিন্তু এহেন মীমাংসা করা সম্পূর্ণ ভুল হবে যে, আমার উপর যে-সব ধর্মাচরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তার সব কটাই আমি অন্য লোককে দিয়ে করাতে পারি।

"পাত্রের" মত "কালও" ধর্মাচরণের সময় হিসাবে নিতে হয়। পূর্বাকাশ ঈষৎ আলোকিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে সলাৎজিক্‌র্ ধ্যানধারণার পক্ষে সর্বোত্তম সময় ইহলোকে সব ধর্মই একথা স্বীকার করেছেন।

এস্থলে বলা প্রয়োজন মনে করি যে, একশ' বছর আগেও সাধারণ ধার্মিকজন আপন ধর্মবিশ্বাস (ইমান) ও ধর্ম-আচরণ ক্রিয়াকর্ম (আমল) নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতো, প্রতিবেশীর ধর্ম সম্বন্ধে তার কোনো কৌতূহল ছিল না। থাকলেও সে-কৌতূহল নিবৃত্তি করা আদৌ সহজ ছিল না। কারণ অধিকাংশ স্বধর্মে বিশ্বাসী-জনই পরধর্মাবলম্বীর সংস্রব এড়িয়ে চলতো, তথা তাকে আপন ধর্মকাহিনী শোনাতে কোনো উৎসাহ বোধ করতো না। উপরন্তু হিন্দু, জৈন এবং পার্সীরা বহু শত বৎসর পরধর্মাবলম্বীকে আপন ধর্মে দীক্ষিত করার দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। এবং আশ্চর্য বোধ হয়, আমাদের আলিমফাজিলগণ প্রতিবেশী হিন্দুকে শুদ্ধমাত্র "কাফিরা, হানূদ, মলাউন" ইত্যাদি কটুবাক্য দ্বারা বিভূষিত করেই পরম তৃপ্তি অনুভব করেন; অথচ তাঁরা সকলেই আমার মত না-দানের চেয়ে ঢের ঢের বেশী দানিশমন্দ—তাঁরা বিলক্ষণ অবগত আছেন, তাঁদের পক্ষে আপন ধর্ম প্রচার করা অবশ্য কর্তব্য। এবং তাঁরা কেন, অতিশয় আহাম্মুখও জানে, বিধর্মীর ধর্ম তুলে কটুবাক্য বললে, তাকে ইসলামের প্রতি তো আকৃষ্ট করা যায়ই না, উপরন্তু আরেকটি প্রতিবেশীকে রুষ্ট করা হয় মাত্র।…

"কাল" ও "পাত্রের" কথা হল। "দেশের" উপর ধর্মাচরণ নির্ভর করে আরো বেশী। যে-দেশে ছ'মাস ধরে সূর্যাস্ত হয় না, সেখানকার মুসলিমের এবং বাংলা-দেশের রোজা রাখার কায়দা-কানুন যে হুবহু একই রকমের হতে পারে না সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।

ঈদের পরব, এবং অন্যান্য তাবৎ পরবই এই "দেশ" অর্থাৎ স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক ধরে। এবং এই সুবাদে আবার পাঠকের স্মরণে এনে দি, বহুবিধ কারণে আমরা প্রতিবেশীর ধর্ম সম্বন্ধে এখন আর সম্পূর্ণ উদাসীন থাকতে পারিনে। মহরমের আর জগদ্ধাত্রী পূজোর মিছিল যদি একই দিনে পড়ে তবে তার হিসেব নগরপাল আগের থেকেই নেয় না তাকে আমরা বিচক্ষণ আই জি বলে মনে করবো না। তদুপরি খৃষ্টান মিশনারীরা দু'শ' বছর ধরে পাক নবীর বিরুদ্ধে এত কুৎসা রটিয়েছে যে তেসাদের ধর্ম—বিংশ শতাব্দীর প্রচলিত খৃষ্টধর্ম, যে-ধর্ম একদিকে শেখায় "কেউ ডান গালে চড় মারলে বাঁ গাল এগিয়ে দেবে", অন্য দিকে বিশ-পঁচিশ বৎসর পর পর আপোসে কেরেস্তানে কেরেস্তানে লাগায় প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ, টাকার লোভ দেখিয়ে দুই দলই টেনে আনে বিধর্মীদের, সরল নিগ্রোদের, এবং সর্বশেষে শ্মশানযজ্ঞ চালায় হিরোসীমার নিরীহ নারীশিশুদের উপর। এবং সঙ্গে সঙ্গে নতমস্তকে স্বীকার না করে উপায় নেই, ইয়েহিয়া এ-দেশে যে তাণ্ডবনৃত্য জুড়েছিলেন সেটাও ধর্মের নামে, ইসলামের দোহাই দিয়ে সেটাও "জিহাদ"! কিন্তু এই আনন্দের, ঈদের মৌসুমে হানাহানির কাহিনী সর্বৈব বর্জনীয়। আমি শুধু তুলনার জন্য কথাটা পেড়েছি, মুসলমানদের আনন্দোৎসব তার সত্য পরিপ্রেক্ষিতে দেখাবার জন্য।

ঈদ অর্থাৎ আনন্দ, আনন্দ-দিবস, পরবের দিন। ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ উদ্-দোহাতে কিন্তু ঈদে সীমাবদ্ধ নয়।

ইমানদার ধর্মনিষ্ঠ মুসলিম ঈদ-উল-ফিতরের আনন্দোৎসব করার বিশেষ একটা কারণ আছে। এক মাস ধরে সুখে-দুঃখে, মানসিক অশান্তির ভিতর দিয়েও উপবাস করাটা সহজ কাজ নয়—কঠিন শারীরিক পীড়া ইত্যাদির ব্যত্যয় অবশ্য আছে। তাই যে মুসল্লি পূর্ণ উনত্রিশ বা ত্রিশ দিন শরিয়তের আদেশমত উপবাস করতে সক্ষম হয়েছে, তার আনন্দই সর্বাধিক হয়। তার অর্থ এই নয়, যে-ব্যক্তি পূর্ণ মাস রোজা রাখতে পারে নি, সে ঈদ আনন্দোৎসবে যোগ দেবে না। অবশ্যই দেবে। যে লোক বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে যোগ দিতে পারে নি—যে কোন কারণেই হোক—তাকে স্বাধীনতা-দিবসের ঈদ-আনন্দোৎসব থেকে বঞ্চিত করার হক স্বাধীনতা-সংগ্রামে যাঁরা লিপ্ত হয়েছিলেন তাঁদের পুরুষোত্তমেরও নেই। অতিশয়

অভাজন জনও যদি আনন্দোৎসবে যোগ দিতে আসে তাকে বিমুখ করা, তার সঙ্গে তর্কাতর্কি করা ঈদের অঙ্গহানি করে। কারণ আনন্দের দিনে যে-কোন প্রকারের অপ্রিয় কর্ম করা নিরানন্দের লক্ষণ, অতএব সর্বথা বর্জনীয়।

ঈদ বা আনন্দ সম্বন্ধে সুন্নী ও শীয়া এবং শীয়াদের নানা শাখা-প্রশাখা সকলেই প্রাগুক্ত ধারণা পোষণ করেন। বাংলাদেশে একদা প্রচুর খোজা ও বোরা ছিলেন। এঁদের দু' দলই ইসমাঈলী শীয়া, পক্ষান্তরে মুর্শিদাবাদ ও সিলেটের পৃথ্বীম-পাশার শীয়োরা ইসনাআশারী শীয়া নামে পরিচিত। ঈদ সম্বন্ধে সকলেরই ধারণা মোটামুটি এক হলেও ঈদ পরব পালনের কর্ম-পদ্ধতি শীয়াদের ভিতর অতি বিভিন্ন।

সুন্নী হানিফীরা বিশুদ্ধ শরীয়তর দৃষ্টিবিন্দু থেকে ঈদ সম্বন্ধে সর্বোৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ পাবেন ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর শিষ্যগণ, ইমাম আবূ ইউসুফ ইত্যাদির সাহচর্যে সংকলিত প্রামাণিক ফিকাহ্ গ্রন্থে। ঈদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গভীর আলোচনা পাবেন প্রখ্যাত দার্শনিক, ফকীহ্ ও সূফীহ্ ইমাম গজ্জালীর অজরামর কিমিয়া সা'দৎ গ্রন্থে। মরহুম ইউসুফ খানের অনুবাদ অনিন্দ্যসুন্দর। কলকাতায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে।

তুলনাত্মক আলোচনা করলে দেখা যায়, ঈদ বা আনন্দ মাত্রেরই অনুষ্ঠানের ব্যাপারে "দেশ" বা ভৌগোলিক অবস্থান তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ইসলামের উদয়কালে খাস আরবদেশ সমৃদ্ধিশালী ছিল না। পক্ষান্তরে ভারত বহু বহু শতাব্দী ধরে ছিল ধন-ধান্যের বিত্তবান দেশ। জনসাধারণের অবকাশও ছিল যথেষ্ট। তাই এই বঙ্গভূমিতে, বর্তমান দারিদ্র্যের দুরবস্থাতেও কী হিন্দু কী মুসলমান সকলেই বারো মাসে তের পার্বণের কথা জানে। ঐ সব পার্বণে একদা দানই ছিল প্রধান অঙ্গ—অন্নবস্ত্র, ছত্র, পাদুকা, প্রকৃতপক্ষে কুটির-শিল্পে হেন বস্তু ছিল না যেটা বিত্তবান কিনে নিয়ে দান করতো না। কিন্তু দান বাধ্যতামূলক ছিল না।

পক্ষান্তরে গরীব আরবদেশে নিত্য নিত্য নানামুখী দান কষ্টসাধ্য বা অসম্ভব ছিল; ধর্ম কখনো মানুষকে এ-ধরনের কর্ম করতে বাধ্য করে না। তদুপরি আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ইসলামের গোড়াপত্তনের সময় থেকেই সে-ধর্ম যে একদিন আরবভূমির বাইরেও ছড়িয়ে পড়বে তার সম্ভাবনাও ছিল। সে-সব দেশ আরবভূমির চেয়ে বেশী ধনী বা বেশী গরীবও হতে পারে। অতএব যতদূর সম্ভব অল্প সংখ্যক 'ঈদ" বা আনন্দের দিন বিধিবদ্ধ করে দেওয়া হয়। দান কিন্তু ইসলামের বিধিবদ্ধ আইন, তার অতি শৈশব অবস্থা থেকেই। ঈদ-উল-ফিতরে দান অলঙ্ঘ্য ধর্মাঙ্গ। বস্তুত ইসলামই ইনকাম ট্যাক্স—জাকাৎ—ধর্মের অঙ্গরূপে পৃথিবীতে

সর্বপ্রথম বাধ্যতামূলক করে।

সমাজতত্ত্বের দৃষ্টিবিন্দু থেকে দেখি, আনন্দোৎসব (ঈদ) ও বাধ্যতামূলক ধর্মাচার (নামাজ রোজা ইত্যাদি) একসঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

পাঁচ ওক্ৎ নামাজ বাড়িতে পড়তে পারো কিংবা মসজিদে। জুম্মার নামাজ কিন্তু অবশ্যই মসজিদে পড়তে হবে। কারণ ধর্মসাধনা ভিন্ন এর অন্য উদ্দেশ্য ছিল ; প্রত্যেক মুসলিম যেন সপ্তাহে অন্ততঃ একদিন মসজিদে প্রতিবেশী সমধর্মীর সঙ্গে মিলিত হয়ে একাত্ম-বোধ-জাত শক্তি অনুভব করতে পারে।

এরপরই আসে বৎসরে দু'বার করে ঈদের নামাজ। ইমানদার মুসলিম মাত্রই চেষ্টা করে, বৃহত্তম মুসলিম জনসংঘের সঙ্গে বৃহত্তম জমাৎ-এ সে যেন নামাজ পড়তে পারে। এর অন্যতম উদ্দেশ্য যত দূর-দূরান্ত থেকে যত সব নামাজার্থী ঈদ-গাহতে জমায়েৎ হয় তাদের সংখ্যা, তাদের ধর্মানুরাগ দেখে তাদের প্রত্যেকেই যেন আত্মবল, সংহতি-শক্তি অনুভব করতে পারে। ঐদিন পরিচিত জনের মাধ্যমে বিস্তর অপরিচিতের সঙ্গে তার পরিচয় হয় ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন দ্বারা। এই দূর-দূরান্ত থেকে, বৃহত্তম জমাৎ যে ঈদ-গাহে হবে, সেখানে নামাজ পড়ার পুণ্য ইচ্ছা নিয়ে ধাবমান যাত্রীদলকে আমি একাধিকবার বহুদূর অবধি তাকিয়ে দেখে দেশের জনসাধারণের প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা অনুভব করেছি, বিস্ময় বোধ করেছি।

বাড়িটি ছিল একেবারে বিরাট পদ্মার পাড়ে, রাজশাহীতে। ওপারে, বহুদূরে দেখা যেত শ্যামল একটি রেখা—ভারত সীমান্ত। বারান্দায় দাঁড়িয়েছি অতি ভোরে। অন্ধকার মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দেখি, কত না দূর-দূরান্ত থেকে, হেথা-হোথা ছড়ানো চরভূমি থেকে, শুনলুম পদ্মার ও-পার ভারত থেকে, কত না নামাজার্থী শীতের শুকনো বালুচরের উপর দিয়ে হেঁটে আসছে রাজশাহী শহরের দিকে। শহরের প্রায় পূর্বতম প্রান্তের বাড়িটি থেকে দেখি, যেখানে সূর্য অস্ত যায় সেই দূরে অতি পশ্চিম প্রান্ত অবধি যেন পিপীলিকার সারির মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব সন্তান শহরের দিকে এগিয়ে আসছে—নিরবিচ্ছিন্ন ধারায়। পূর্বপ্রান্তে, যারা প্রাচীন দিনের জাহাজের খেয়াঘাট, পাশের ফুটকি পাড়ার দিকে এগিয়ে আসছে তাদের নূতন পাজামা কুর্তা, বাচ্চাদের রঙিন বেশভূষা হাসিমুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সবাই অক্লান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে সদর রাজশাহীর ঈদগাহের দিকে।

এদের কেউই হয়ত জানে না, ঈদের নামাজের সামাজিক মেলা-মেশার তাৎপর্য। গ্রামের জুম্মাঘর বা শহরের জামি' মসজিদ ত্যাগ করে বৃহত্তর ঈদ-গাহে এসে বহুগুণে বিস্তৃত অঞ্চলের ঐক্যবদ্ধাবস্থায় বেশুমার নমাজরত মুসলিমের সঙ্গে

শব্দার্থে তথা ভাবার্থে কাঁধ মিলিয়ে যখন পদ্মাচরের সরল মুসলিম ঈদের নমাজ পাঠ শেষ করে তখন সে কি সচেতন যে, বর্ষার উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা তার চরকে তার বউবাচ্চাকে বাদ-বাকী দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেও ঈদগার মুসল্লীদের কাছ থেকে কখনো বিছিন্ন করতে পারবে না। দীন ইসলামের চিরন্তন চিন্ময় বন্ধনে প্রলয়ঙ্করী পদ্মার তাণ্ডব নর্তন কস্মিনকালেও ছিন্ন করতে পারবে না,—অনুভব করে তার অবচেতন মন।

কার্যত আমরা রোজার ঈদেই আনন্দোল্লাস করি বেশী। কিন্তু সর্ব দৃষ্টিবিন্দু থেকেই ঈদ-উল-আজহা বহুগুণে গুরুত্বব্যঞ্জক।

(১) আপন আবাসে পড়া পাঁচ ওক্ত নামাজের ক্ষুদ্রতম গণ্ডী, (২) সেটা ছাড়িয়ে জুম্মার নামাজের বৃহত্তর পরিবেশ, (৩) সে-পরিবেশ ছাড়িয়ে ঈদগার বৃহত্তম পরিবেশ—সাধারণ মুসলিমের জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু আল্লা যাকে তওফীক দিয়েছে তার জন্য ব্যবস্থা, (৪) সে যেন জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কাশরীফে গিয়ে বিশ্ব মুসলিমের সঙ্গে একত্র হয়। বিশ্ব মুসলিমের সত্তা-সংহতি-ব্যাপ্তি সে যেন দেখে, হৃদয় দিয়ে অনুভব করে, তার ক্ষুদ্র সত্তা যেন বৃহত্তম মুসলিম সত্তার সঙ্গে সম্মিলিত হয়।

সে কাহিনী দীর্ঘ, সর্ব বিশ্বে তার গুরুত্ব ছেয়ে আছে। তার জন্য আগামীতে অন্য ঈদ।

ভাষা—বাঙলা

বাঙলা ভাষা মারফত সরকারী বেসরকারী সব কাজ নিষ্পন্ন করাটা আপাত-দৃষ্টিতে যতই কঠিন মনে হোক না কেন, আমি অন্তত একটা দেশের কথা জানি, যেখানে এ সমস্যাটা সহস্রগুণে কঠিনতর ছিল এবং সে-দেশ সেটা প্রায় সমাধান করে ফেলেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে প্যালেস্টাইনে এসে জুটতে লাগলো শব্দার্থে কুল্লে দুনিয়া থেকে ইহুদির পাল। কত যে ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষা নিয়ে তারা এসেছিল সে খতিয়ান নেবার চেষ্টা করা বৃথা। আমাদের পশ্চিম ভারত থেকে পর্যন্ত একদল খাঁটি ভারতীয় ইহুদি মারাঠী জাত তাদের কোঁকনী উপভাষা নিয়ে ইজরায়েলে উপস্থিত হয়। আপন রাষ্ট্র গড়ে তোলার আগের থেকেই ইজরায়েলের প্রধান শিরঃপীড়া ছিল—তাদের রাষ্ট্রভাষা হবে কি? শেষটায় স্থির করা হল হীব্রু—যে ভাষাতে—আমি খুব মোটামুটি আন্দাজ থেকে বলছি—অন্তত হাজার বছর ধরে কেউ কথা বলে নি, সাহিত্য সৃষ্টি করে নি—শুধু পড়েছে মাত্র, তাও সল্পমাত্র ইহুদি যাজক পণ্ডিত রাব্বি সম্প্রদায়। যে-সব ইহুদি অতি প্রাচীনকাল থেকে

প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে অন্য কোথাও যায় নি, নির্বাসিত হলেও কয়েক বৎসরের মধ্যে ফিরে এসেছে তাদের সক্কলেরই মাতৃভাষা আরবী—প্রায় বারোশ' বৎসর আরবদের সঙ্গে বসবাস করার ফলে। সেটাকে রাষ্ট্রভাষা করার তো প্রশ্নই ওঠে না। যে সব রাব্বি হীব্রূতে ওলড টেস্টামেণ্ট ও প্রধানত হীব্রূর সমগোত্রীয় আরমেয়িক ভাষায় রচিত তালমূদ্, মিদ্রাশ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ পড়তে পারেন তাদের সংখ্যা শতকরা এক হয় কি না হয়। তদুপরি হীব্রূভাষা প্রধানত শাস্ত্রগ্রন্থের ভাষা। আড়াই হাজার বছর ধরে ইয়োরোপীয় সভ্যতা সংস্কৃতি যে সব শব্দ গড়ে তুলেছে তার একটিও এ ভাষাতে নেই—'দূর-আলাপনী' বা 'অনপনেয়' কালির তো কথাই ওঠে না। সব চেয়ে বড় বিপদ, বহিরাগত ইহুদিদের মাতৃভাষা—রাশান পোলিশ, ইডিশ থেকে আরম্ভ করে ফরাসী, জর্মন, ইতালীয়, ফিনিশ বলতে গেলে য়ুরোপের তাবৎ ভাষা, আরবী, তুর্কী, ফার্সী, কুর্দী এস্তেক কোঁকনী—সে ফিরিস্তি তো আমি আগেই এড়িয়েছি। এখন সমস্যা হল, মাস্টার যে হীব্রূ শেখাবে, সেটা কোন্ ভাষার মাধ্যমে? তাবৎ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন মাতৃভাষার লোক এক বিশেষ জেলায় জড়ো করে তাদের বৈদিক ভাষা শেখানো ঢের ঢের সহজ।

অথচ ইহুদিরা এই অলৌকিক কর্মটি প্রায় সমাধান করে এনেছে। টেলিফোন, ওয়ান উয়ে ট্র্যাফিক, মোটরের যন্ত্রপাতি যত রকম সম্ভব-অসম্ভব শব্দ তৈরি তো করা হলই এবং কত না অসংখ্য ভাষায়, প্রাচীন অর্বাচীন, বর্ণশঙ্কর হীব্রূ শব্দসহ এ-সব নূতন শব্দের অভিধান রচিত হল। নূতন নূতন শব্দের ফিরিস্তি, বয়ান, নিত্যি নিত্যি সাপ্তাহিক মাসিকে বেরোয়, সাপ্লিমেণ্টরূপে অভিধান যারা ক্রয় করে ফেলেছেন তাঁদের নামে পাঠানো হয়।

এ-বিষয়ে ইজরায়েল যে কতখানি কৃতকার্য হয়েছে, এবং এখনো তারা কতখানি যোগ্যতাসহ কর্মতৎপর তার একটি উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট। আপনি ট্যুরিস্ট। রাত দুটোর সময় আপনার দরকার হয়েছে একখানা ট্যাক্সির। "অনুবাদ বিভাগকে"—নামটা আমি সঠিক জানিনে—প্রাগুক্ত সাড়ে বত্রিশ ভাষার যে কোনো একটিতে ফোন করে শুধোতে পারেন, "আপনারা হীব্রূতে ট্যাক্সি শব্দের কি অনুবাদ করেছেন?" পাঁচ সেকেণ্ডের ভিতর হয় হীব্রূ শব্দটি পাবেন, নয় অন্য প্রান্ত বলবে, "শব্দটি এতই আন্তর্জাতিক যে আমরা এটার অনুবাদ করি নি। আপনি স্বচ্ছন্দে ট্যাক্সি, টাক্সি টাক্সে যা খুশী বলতে পারেন।" মোদ্দা কথা, যে কোনো লোক ইজরায়েলে আগত ইহুদিদের যে-কোনো ভাষায় যে-কোনো সময় যে-কোনো শব্দের হীব্রূ প্রতিশব্দ শুধোতে পারেন ও সদুত্তর পাবেন। অবশ্য এ-হীব্রূ যদিও বাইবেলের হীব্রূর উপর

প্রতিষ্ঠিত তবু এটাকে অভিনব হীব্র্ বলাই উচিত। এ ভাষার প্রধান সম্পদ, বিদেশী ভাষা থেকে অকাতরে অসংখ্য শব্দ গ্রহণ করে নির্মিত হয়েছে।

এহেন অলৌকিক কাণ্ড অবশ্য সম্ভবপর হত না যদি ইজরায়েলে বিশেষ কোনো ভাষা-ভাষীর জোরদার সংখ্যাগুরুত্ব থাকত। ৩৮ বৎসর পূর্বে আমি যখন তেল-আভিভ যাই তখন রাস্তাঘাটে এত জর্মন শুনতে পাই, ফোন ডিরেক্টরিতে এত বেশী জর্মন নাম দেখি যে, আমার মনে ধারণা হয়েছিল শেষটায় ইজরায়েলের প্রধান ভাষা বুঝি জর্মনই হয়ে যাবে। কিন্তু ইহুদিরা এমনই মরণকামড় দিয়ে আপন ঐতিহ্য, ধর্মমূলক কিংবদন্তী আঁকড়ে ধরতে জানে, উৎপীড়ন অত্যাচার বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে অনুরাগ এমনই দিগ্বিদিকজ্ঞানহীন ধর্মান্ধতায় পরিণত হয়, এবং যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঙ্গে ইজরায়েলবাসী সার্থক রাষ্ট্রনির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছে, তার সম্মুখে প্রাচীনতম পূতপবিত্র হীব্র্ ভাষার দুর্বার গতি রোধে কে?

কিন্তু হায়, তবু স্বীকার করতে হয় তাদের সমস্ত আদর্শ, লক্ষ্য, কর্মপন্থা, যে ভূমির উপর তারা সর্বজনগ্রাহ্য রাষ্ট্রভাষার বিরাট সৌধ নির্মাণ করতে চাইছে তার সবই কৃত্রিম, সবই এক স্বপ্নলোকের রূপকথা, মূর্তিমান করার ন দেবায় ন ধর্মায় প্রয়াস।

বার বার অসংখ্যবার নিপীড়িত এই জাতিকে যেন ইয়াহ্বে নিষ্ঠুরতর হিটলারের হাত থেকে রক্ষা করেন। এক আমেরিকা ছাড়া তারা এত অসংখ্য শত্রু সৃষ্টি করেছে—বিশেষত প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে, যেখানে বিস্তর খৃষ্টানও ইহুদিদের প্রাচ্যভূমি থেকে বিতাড়িত হতে দেখলে প্রকাশ্যে জয়ধ্বনি করবে—যে, তাদের মনে সম্প্রতি প্রশ্ন জেগেছে মার্কিন সাহায্য বিপদকালে পুনর্বার কতখানি কার্যকরী হবে? ইয়েহিয়ার দিল্‌-জান্‌-এর প্যারা দোস্ত নিক্‌সন কী না করেছেন, নিরস্ত্র রাইফেল মাত্র সম্বল বাঙালকে ঘায়েল করতে, তদুপরি চীনও তো কম যাননি। উভয়ে মিলে ভারতকে জুজুর ভয় দেখিয়েছেন এবং পারলে অবশ্যই ভারত মায় বাঙলাদেশ শ্মশানে পরিণত করতেন। তাই ইহুদিরা দুশ্চিন্তায় পড়েছে, মার্কিন মদতের উপর কতখানি ভরসা করা যায়? তাদের দুসরা ভরসা ছিল, আরব রাষ্ট্রগুলো একদম ঐক্যবদ্ধ হতে জানে না। কিন্তু কে কসম খাবে, এরা কস্মিনকালেও একজোট হবে না?

আমার মনে হয়, পূর্ব বাঙলায় বাঙলাকে পরিপূর্ণ রাষ্ট্রভাষা করার যে উদ্যোগ, বিশেষ করে সরকারের ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রীদের দফতরগুলোতে যে সহযোগিতার আত্যন্তিক প্রয়োজন, জনসাধারণের যে সদাজাগ্রত, চেতনাবোধ, বাঙলা খবরের কাগজের সহযোগিতা, দিনের পর দিন নিজেদের প্রচেষ্টায় অন্তত একটি কলম জুড়ে নূতন নূতন যে সব পারিভাষিক শব্দ সরকার তথা জনগণ দ্বারা দৈনন্দিন কর্ম

সমাধানের জন্য নিত্য নিত্য নির্মিত হচ্ছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা, ভাষাবিদ্, চিকিৎসক, এঞ্জিনিয়ার, আইনবিদ ইত্যাদিদের সে-সব আলোচনায় যোগ দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানানো, এ-সব যথেষ্ট পরিমাণে হচ্ছে না। একদা বিশেষ করে ১লা বৈশাখের, কখনো বা ২১ ফেব্রুয়ারির রাত্রে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা তাবৎ ঢাকা শহরের উর্দু, ইংরিজিতে লেখা নেমপ্লেট, দেয়াল থেকে উপড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে বাঙলার প্রভুত্ব বুঝিয়ে দিত। এখন তারা স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক। তারা নির্ভয়ে প্রত্যেক গৃহস্থকে অনুরোধ, প্রয়োজন হলে বাধ্য করতে পারে, বাড়ির নাম স্থির করুন, কিন্তু বাঙলাতে। (হোটেল "পূর্বানীর" কর্তৃপক্ষ ৪।৫ বৎসর পূর্বেই জানতেন, হাওয়া কোন্ দিকে বইছে তাই 'মগরীবী সরাই' বা গুলস্তান বোস্তান —'হটেল দ্য লাহোর' বা 'রেস্তোরাঁ আইয়ুবিয়েন্' স্বপ্নেও মনে স্থান দেন নি)। 'ইনডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে যে মহাজন একটা মোটা টাকা পূর্বানীতে খাটান তিনি সোল্লাসে সায় দিয়েছিলেন, কারণ এর বহু পূর্বেই তিনি তাঁর আপন ভবনটির নাম করেছিলেন 'শেফালি' এবং তাঁর মামী শিক্ষা বিভাগের এক প্রধান কর্মচারী তাঁর গৃহভালে তিলক অঙ্কন করেন সনাতন "প্রাস্তিক" নাম দ্বারা। আমি জানি, এ-সব এমন কিছু ইন্‌কিলাবী দুঃসাহসী শহীদজনোচিত কঠিন কর্ম নয়, কিন্তু সে-কর্ম প্রতিটি গৃহস্থকে বহুদিন ধরে সচেতন রাখবে, কয়েক মাস পর পর লেটার-হেড ছাপবার সময় আত্মজনকে ঠিকানা দেবার সময় তার একটি বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্র গড়ে উঠবে এবং দৈনন্দিন উত্তেজনাহীন কিন্তু অতিশয় বাস্তব সেই আধ-ভোলা ভাষা আন্দোলনকে প্রগতির পথে সদাজাগ্রত করে রাখবে। ওদিকে চলুক সরকারী প্রচেষ্টা। সেটা বাঙলা একাডেমি, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ —প্রয়োজন হলে নূতন বিভাগ স্থাপন—ইত্যাদি যে কোনো প্রতিষ্ঠান, এ কাজের ভার নিতে পারেন, ইজরায়েলের উদাহরণ তো এইমাত্র দিলুম। প্রায় ৫০ বৎসর পূর্বে সর্ব রাজকার্য গুজরাতিতে সমাধান করার জন্য বরোদার মহারাজা যে কমিটি নির্মাণ করেন তার সদস্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল। তবু অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে তাঁরা কর্মসমাপণ তথা মুদ্রণান্তে যে বিরাট কোষ দফতরে দফতরে পাঠালেন সে কলেবরের পুস্তক দূর থেকে দেখেই আমি সেই বিভীষিকাকে মারণাত্মক অস্ত্রসমূহের নির্ঘণ্টে স্থান দেবার জন্য পুলিসকে অনুরোধ জানাই। অথচ বছর তিনেকের ভিতরই ইংরিজির স্থান গুজরাতি দখল করে নিল, অক্লেশে!

শ্রীযুক্ত শঙ্কর ক্ষোভ করেছেন, "বাংলা ভাষা আজ ওপার বাংলাতে তেমন প্রাণোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে না।...একুশে ফেব্রুয়ারি আজ তেমনভাবে আর অনেককে

নাড়া দেয় না।" শ্রদ্ধেয়া উমা চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "কোন একটা ঘটনাকে কেউ কোলে নিয়ে তো বসে থাকতে পারে না।" দুটো কথাই ঠিক। কিন্তু শ্রীযুক্ত শঙ্কর তার সঙ্গে সঙ্গে এ-আশাও করছেন, তাঁর সুন্দর সরল ভাষায় সবিস্তর বলে না থাকলেও, একুশের প্রতি শ্রদ্ধা উভয় বঙ্গের বাঙলাপ্রেমীদের চিরন্তন অনুপ্রেরণার অফুরন্ত উৎস হয়ে থাকবে—নিত্যদিনের ব্যবহারিক ভাবচিন্তার আদান-প্রদানের জন্য তো বটেই, সেই শ্রদ্ধাপ্রসাদাৎ রবি কবি যে অক্ষয় ভাণ্ডার রেখে গেছেন তার যোগ্য ওয়ারিশানও আমরা হতে পারব। আমি আরো আশা রাখি, যোগ্যজন সে ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিও করতে পারবেন। অবশ্যই শঙ্কর এ-কথা বলতে চান নি, একুশেকে "কোলে নিয়ে বসে থাকতে হবে" এবং নিশ্চয়ই শ্রদ্ধেয়া উমা এ কথা বলেন নি যে, একুশের প্রতি কোনো প্রকারের শ্রদ্ধা প্রদর্শন নিষ্প্রয়োজন। অধিকাংশ নীতিই চরমে টেনে নিয়ে গেলে সেটা অনেকখানি রিডাকৃশিও আড আবসুর্ডুম হয় বটে, কিন্তু বহু ক্ষেত্রে উভয়ের বক্তব্য পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন ধরা পড়ে উভয়ের বক্তব্যের মধ্যে তেমন কিছু নীতিগত পার্থক্য নেই, পার্থক্য যেটুকু আছে—যদি আদৌ থাকে —তবে সেটুকু শুধু মাত্রা নিয়ে। অবশ্য কট্টরপন্থী লোক সর্বাবস্থায়ই কিছু না কিছু থাকবে। ঢাকা কলকাতার বিস্তর লোক আছেন যারা ঘোরতর আপত্তি তুলে বলেন, বাঙলা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা যদি কোনো বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম হয় তবে সে বিদ্যালয়কে সরকার কোনো আর্থিক সাহায্য তো করতে পারবেনই না—ওই বিদ্যালয়কে কোনো প্রকারের স্বীকৃতিও দিতে পারবেন না।

রবীন্দ্রনাথ নীতিগতভাবে এবং কার্যত পারতপক্ষে বিশ্বভারতীর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা বাঙলার মাধ্যমেই করতেন—আর আদ্যবিভাগের (স্কুলের) তো কথাই। অথচ শ্রীযুক্ত সুধীররঞ্জন দাশ স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে, স্কুল-স্থাপনার প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষাদানার্থে একটি স্বতন্ত্র শাখা খোলেন, কিংবা প্রচেষ্টা করে কৃতকার্য হন নি—আমার ঠিক মনে নেই।

* * *

আমি মাসের পর মাস ঢাকায় কাটিয়ে এসেছি। বাঙলাদেশের অগ্রগতির পথে যে কত কণ্টক, কত অগণন সমস্যা তার একটা অতিশয় অসম্পূর্ণ লিস্টি আমি দিনের পর দিন পূর্ণ একটি মাস ধরে খবরের কাগজ থেকে এবং আত্মজনের বাচনিক—মাত্র এই দুটি পন্থায় নির্মাণ করার প্রচেষ্টাদি—অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলে যাই নি, পূর্ববঙ্গীয় সাংবাদিকদের আমি প্রায় চিনি না বললেও অত্যুক্তি হয় না, কোনো প্রকারের স্টাটিস্‌টিক্‌স্ সংগ্রহ করার জন্য যত্রতত্র টো টো করার মত সামান্যতম

শারীরিক বল আমার নেই—বস্তুত প্রতি মাস অন্তত একটিবার বাসভবন দেহলি আমার ছায়াটি দেখেছে কি না সে-বিষয়ে প্রতিবেশীগণের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।…শেষটায় নিরাশ হয়ে ফিরিস্তি নির্মাণকর্মে ক্ষান্ত দি।

বাঙলাদেশ সরকার অতি উত্তমরূপেই অবগত আছেন তাঁদের সমস্যা কি—এই একটি বিষয়ে আমার মনে কণামাত্র সন্দেহ নেই। '৭১-এর ন'মাস যেন বন্যার মত পূব-বাংলার লোককে হত্যা করে, ইতস্তত নিক্ষিপ্ত করে, গৃহহীন অন্নহীন আত্মীয়-আত্মজনহীন করে দিয়েছিল, কিন্তু, কিন্তু এখন ? এখন দিনের পর দিন—কত দিন ধরে চলবে তৃষ্ণার্তের এক আঁজলা পানির তরে আকূতি ? যে বন্যা কুল্লো মুল্লুক ভাসিয়ে ছয়লাপ করে দিয়েছিল সেই বন্যাই যাবার বেলা নিয়ে গেছে তৃষাতুরের শেষ জলকণাটুকু ! কিস্মৎ ! কিস্মৎ !! কিস্মৎ !!!

বাংলাদেশের আপামর আচণ্ডাল ভদ্রতর, কী রাষ্ট্রের কর্ণধার, কী নাগরিক, কী জনপদবাসী সক্কলের সম্মুখে যে কী নিদারুণ পরীক্ষা সেটা এ বাঙলা থেকে তো কথাই নেই, ও বাঙলায় বাস করেও হৃদয়ঙ্গম করা অতিশয় সুকঠিন।

যত কঠিনই হোক না কেন, একটা সত্যে আমি বিশ্বাস করি :

"আপনি অবশ হলি,
তবে বল দিবি তুই কারে ?
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া,
ভেঙে পড়িস না রে ॥
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়,
আপনাকে তুই করে নে জয়—
সবাই তখন সাড়া দেবে,
ডাক দিবি তুই যারে ॥
বাহির যদি হলি পথে
ফিরিস নে তুই কোনোমতে,
থেকে থেকে পিছন পানে
চাস নে বারে বারে ॥
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে,
ভয় শুধু তোর নিজের মনে—
অভয়চরণ শরণ করে
বাহিরে হয়ে যা রে ॥"

দিনলিপি

সৈয়দ মুজতবা আলীর মাঝে মাঝে দিনলিপি রাখার অভ্যাস ছিল। এইসব দিনলিপির মধ্যে তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টির অনেক মূল্যবান চিন্তা ও তথ্য পাওয়া যায়। এছাড়া রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, ভাষা সম্বন্ধে বহু আলোচনা, পারিবারিক জীবনের বহু খুঁটিনাটি তথ্যে ভরা দিনলিপিগুলি। এইসব দিনলিপিগুলি থেকে হয়তো আত্মজীবনী লেখার বাসনাও তাঁর ছিল। এইরকম একটি অসম্পূর্ণ রচনা 'আত্মজীবনী লেখার প্রচেষ্টা'। মাত্র দুটি পৃষ্ঠার পর আর লেখা হয়ে ওঠেনি। উক্ত রচনাটিও এখানে অন্তর্ভুক্ত হল। বাংলা ১৩৬৭ সালে লেখক কলকাতা থেকে রাজশাহী যান। সেখানে থাকেন প্রায় দেড়মাস। ঐ সময় একটানা দেড়মাস ধরে দিনলিপি রাখেন। এই দিনলিপির মধ্যে রাজশাহী-পদ্মার অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা লেখকের নৈসর্গিক সৌন্দর্য-প্রিয়তার একটি অমূল্য নিদর্শন। ১৯৪৭ সালে লেখককে দক্ষিণভারতে কিছুকাল থাকতে হয়। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র ও প্রকৃতি তাঁকে নিবিড়ভাবে আকৃষ্ট করে। এই সময়ের দিনলিপিতে সমুদ্র সম্বন্ধে বিচ্ছিন্নভাবে যে বর্ণনা লেখেন সেটিও এখানে অন্তর্ভুক্ত করা হল। **—সম্পাদক**

আত্মজীবনী লেখার প্রচেষ্টা

আমার অগ্রজ তাঁর বাল্য, কৈশোর ও পরিণত জীবন যে দেশকালপাত্রের ভিতর কাটে তার বর্ণনা লিখছেন। এতে করে প্রধানত শ্রীহট্টবাসী, গৌণত পূর্ব-পাকিস্তান, এমন কি আসামবাসীরাও উপকৃত হবেন। মুখবন্ধে তিনি বিশেষ করে নবীন সেনের দৃষ্টান্ত তুলে নিবেদন করেছেন, তিনি নিজের ব্যক্তিগত জীবন যতদূর সম্ভব চেপে গিয়ে সেই সময়ের কথা বলবেন বেশী। এ অতি উত্তম প্রস্তাব ও সাতিশয় বিনয়ের লক্ষণ সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীহট্ট জেলার কৃতী-সন্তানের কাছে তাঁর দেশবাসী তাঁর জীবন সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানতে উৎসুক। আর কিছু না হোক, স্কুল-কলেজের ছেলেছোকরারা অন্তত জানতে চাইবে, তিনি কি করে শিক্ষাজীবনে ম্যাথামেটিক্স-ফিজিক্স অধ্যয়ন করে পরবর্তী জীবনেখ্যাতনামা ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্ববিদ, ভৌগোলিক, তথা আর্ট ও স্থাপত্যের পণ্ডিত হলেন। বস্তুত অধুনা প্রকাশিত তাঁর 'চর্যাপদ' সম্বন্ধে অতিশয় গবেষণামূলক প্রবন্ধ না পড়ার পূর্বে আমারও জানা ছিল না, ভাষাতত্ত্বেও তিনি কতখানি ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন।

কিন্তু এস্থলে এটা আমার মূল বক্তব্য নয়। মমাগ্রজ আমাকে অনুরোধ করেছেন, যেহেতু আমরা একই পাঠশালে একই স্কুলে পড়েছি, অতএব আমিও যদি আমার বাল্যস্মৃতি স্মরণ করি তবে তাঁর ভুলে যাওয়া কথাগুলিও তাঁর স্মরণে আসবে।

এটিও উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু বিপদ এই যে আমি প্রায় ষোল বছর বয়েসে, ইস্কুল পাস করার পূর্বেই দেশ ছেড়ে পশ্চিমবাঙলার শান্তিনিকেতনে চলে আসি এবং পরবর্তী জীবনের অধিকাংশ বাইরে বাইরে কাটে। গোড়ার দিকে বছরের দুই ছুটিতেই দেশে গিয়েছি, পরবর্তী জীবনে সেটাও সম্ভব হয়নি,—বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে।

মানুষ বিদেশে দীর্ঘকাল থাকলে বাল্যস্মৃতি ম্লান হয়ে যায়। তার কারণ দেশে থাকলে দেশের লোকজন ঘরবাড়ী তাকে পুনঃ পুনঃ প্রাচীন দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন কি ক্রমে ক্রমে দেশের নানা প্রাচীন কীর্তিকাহিনীও সে শোনবার সুযোগ লাভ করে—বাল্যে যেগুলোর প্রতি স্বভাবতই তার কোনো কৌতূহল ছিল না।

আমার ভাগ্যে হয়েছে উল্টোটা। বছরের পর বছর কেটে গিয়েছে, সিলেটী বলা দূরে থাক, বাঙলা বলারও সুযোগ ঘটেনি। দেশের লোকজন, ছেলেবেলায়

ঘটনাগুলিকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সেগুলোকে সজীব রাখার জন্য জলসিঞ্চন করার নর্মসখা প্রায় পাইইনি বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্মৃতির অঙ্গানে চটুল নৃত্য জাগাতে হলে এক হাতের করতালি অসম্ভব।

অথচ স্মরণ করিয়ে দিলে এখনো অনেক কিছু মনে আসে।

পূর্বেই আমার ভ্রাতার বিষয়ের উল্লেখ করেছি। তাঁর স্মৃতিকাহিনীতে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন : তিনি গোড়ার দিকে রীতিমত পয়লানম্বরী স্কুল-পালানো ছেলে ছিলেন। আমার তখন হঠাৎ যেন কোন্ যাদুমন্ত্রের বলে চোখের সামনে ভেসে উঠলো সেই ছবিটি। দু'তিনখানা তক্তাপোষ-জোড়া বিরাট খাটে সুদূরতম প্রান্তে দাদা দেয়ালে হেলান দিয়ে মুখের ভাব করেছেন, পাদমেকং ন গচ্ছামি; বিদ্যামন্দির নৈব নৈব চ। বাবা-মা সাধাসাধি করছেন। কড়ে আঙুলে দোয়াত ঝুলিয়ে বড়দা স্কুলে যেতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে বিরক্তি প্রকাশ করছেন ও সব_চেয়ে বেশী কাকুতিমিনতি করছেন আমাদের সম্পর্কে দাদা আলফী মিয়া। আর আমি এই পাঁচজনের বাইরে 'পাঁচের বাদ'। আমি শুধু ঘুরঘুর করছি চতুর্দিকে। আর ভাবছি, 'আমাকে যেতে দিলে আমি এখখুনি যাই'। তখনো স্কুল নামক ব্যাঘ্রটির সঙ্গে পরিচয় হয়নি বলে দাদার আতঙ্ক কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম হত না।

অথচ দাদা, বলতে বেবাক ভুলে গেলেন—না চেপে গেলেন—যে যখন যেতে আরম্ভ করলেন তখন এক লফ্‌তে গুয়াগাছের মগ্‌ডালে উঠে বসলেন অবহেলে। এবং সেই যে বসলেন, তারপর কখনো তাঁকে কেউ নামতে দেখেনি। পরে সপ্রমাণ হল তিনি আমাদের তিন ভাইয়ের মধ্যে সব চেয়ে সেরা পড়ুয়া।

সামান্য দু'একটি উদাহরণ দি।

তখনকার দিনে আর কটি মুসলমান ছেলে ইস্কুলে যেত? এবং তাদেরও প্রধান আতঙ্ক ছিল অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি। অথচ সপ্তম শ্রেণীতে উঠে তিনি গায়ে পড়ে নিলেন মেকানিকস্—যার জন্য দরকার তুখোড় ম্যাথ্ জ্ঞান। এবং তখনকার দিনের দুই অঙ্কবিশারদ ক্ষীরোদবাবু (ইনি অল্পবয়সে গত হন) ও গোপালবাবুর প্রিয় শিষ্য হয়ে উঠলেন। পরবর্তী যুগে কলেজে নিলেন **I. Sc.**, সেও এক বিস্ময়। বি. এস-সিতে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়ে তাঁর ক্ষোভের অন্ত ছিল না। তার জন্য প্র্যাকটিকালের একটি দুর্ঘটনা দায়ী। স্থির করলেন, এম. এস-সিতে সেটা তিনি অধ্যাপক রামনের (তখনো রামনরশ্মি আবিষ্কৃত হয়নি ও তিনি ও তাঁর অন্যতম সহকর্মী শিষ্য কৃষ্ণন বিশ্ববিখ্যাত হননি) কাছে শিক্ষালাভ করে পুষিয়ে নেবেন।

দিনলিপি

(১২ই বৈশাখ ১৩৬৭—২৫শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭)

CACUTTA--ISHURDI—RAJSHAHI

১২ই বৈশাখ ১৩৬৭

A terrible journey from Calcutta to Rajshahi.

Yesterday it was 107° here in Calcutta. Fancy catching the train at 16'00, hottest part of the day. Kendu, Mukuldi, Ghantu, Saumen & Prof Saurin Dasgupta at the station.

I do not recollect the times. From 19 to 21 or more at Darsana (India) From 21'30 to 23'45 or so, at Darsana (Pak).

1'35 Ishurdi. No room in the waiting room. Hot like hell even at that early hour. Wait wait till 6. Train left at 7'45. No fan in the compartment till 7'35. Hell again. I thought it was the last leap. No, another change at Abdullapur at about 8.15. jump up & down the railway line ditch. Hot platfrom! Wait for the train. Train left at 8-30. 9-30. at Rajshahi.

রাজশাহী

১৫ই বৈশাখ, ১৩৬৭

এ ক'দিন ধরে পূব বাঙলার সর্বত্রই অসাধারণ গরম যাচ্ছে। কোনো কোনো জায়গায় ১০৫° পর্যন্ত উঠেছে। ঢাকা ১০২°, দিনাজপুর ১০৬°। রাজশাহী তো terrific তবে তার উত্তাপ কাগজে দেয়নি। এখানকার লোকে বলছে ৫।৭ বছরের ভিতর এ রকম গরম পড়েনি। কাগজ বলছে, উত্তর পশ্চিম থেকে

আসা গরমের ফলে। এখানে এসেছি অবধি সেই হাওয়াই দেখছি। দক্ষিণে পদ্মা—সেখান থেকে এযাবৎ কোনো হাওয়া আসেনি। কালবৈশাখী বা অন্য কোনো প্রকারের বৃষ্টি, রাজশাহী অঞ্চলে অন্তত এখনও হয়নি।

অথচ একেবারে খোলা ছাদে শুয়ে ভোরের দিকে গায়ে একখানা চাদর টানতে হয়।

এখানে আজ এই প্রথম দক্ষিণের বাতাস পেলুম। কিন্তু ১০।১১টার ভিতর সেটা বন্ধ হয়ে গেল। তার পর উত্তর-পশ্চিমের বাতাস। তবে কালকের মত দুর্দান্ত নয় ও পদ্মাকে সাদা সাদা ফেনার ঢেউয়ে বিক্ষুব্ধ করেনি।

উত্তর-পশ্চিমের বাতাস কাল থেকে বন্ধ হওয়াতে গরম অল্প কম।

Message incomplete-এর বদলে একটা কাগজে ছিল massacre incomplete.

খবরটা ছিল কোথাকার যেন ম্যাসাকারের। কিন্তু শেষে messaere incomplete সেনসরের ম্যাসাকার না খবরের ম্যাসাকার বোঝা গেল না।

এবারের গরম পুব বাঙলায়ও ভীষণ। ডেলি কাগজে প্রথম পৃষ্ঠায় রোজই ফ্ল্যাশ করছে। পাঁচ বৎসরে এরকম হয়নি। আমার হিসেবে তারও বেশী। সাতমাস ধরে এদেশে বৃষ্টি হয়নি। Simply terrific.

পশ্চিম বাঙলার কোনো খবর পাচ্ছিনে। কিন্তু সেখানে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হয়নি, ঠাণ্ডাও পড়েনি। কারণ তাহলে পুব-বাঙলাকে যে তাতিয়ে তুলেছে উত্তর পশ্চিম থেকে আসা গরম হাওয়ায় সেটা এল কি করে?

শীতে বৃষ্টি হয়নি। গরমে দিনের পর দিন শুকনো কেটে যাচ্ছে, আদপেই বৃষ্টি হল না, এরকম অবস্থা পুব-বাঙলায় আমি কখনও শুনিনি।

১৮ই বৈশাখ, ১৩৬৭

আজকের কাগজ বলছে, দু'একদিনের ভিতর ঝড়ঝঞ্ঝা হতে পারে। এখানে তার একমাত্র লক্ষণ, আকাশে '০১ হয়, কি না-হয়, উটকো শরৎকালের হাল্কা মেঘ! এখন পশ্চিমের বাতাস বন্ধ। সকালে অল্প দক্ষিণা বাতাস পদ্মার উপর দিয়ে এল—সুশীতল না হলেও বেশ ঠাণ্ডা।

কলকাতায় গত ৩৪ বৎসরের মধ্যে এরকম পর পর এত অধিক তাপ দেখা যায়নি। ১৯৫৯ মাত্র এক দিন ১০৮° থেকে ফের গরমি কমে যায়।

৭।৫।৬০-এর খবরের কাগজ রাজশাহী থেকে ৫।৫-এর খবরে বলছে এখানে নাকি পয়লা মে'তে hottest day with 108° গেছে। ব্যস! তার আগে যে একটা খবর বেরল ২৮।৪-এ এখানে ১১০° গেছে?

ধর্ম জানেন আমি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু এই যে প্রতি সন্ধ্যায় বিদকুটে সব যন্ত্রপাতি নিয়ে খচখচানি আর তার সঙ্গে সঙ্গে বেসুরা বেতালা গান রাত বারোটা-তেরোটা অবধি এরও একটা সীমা থাকা দরকার।

ক্ষীণ চাঁদের আলো, মাথার উপর সপ্তর্ষি, দূর পদ্মার মৃদু গুঞ্জরণ, নারকলগাছের অল্প শিহরণধ্বনি—এছাড়া কোনো শব্দ নেই—শান্ত-গম্ভীর পরিবেশ, কেমন যেন রহস্যময়। এর উপর এই অসহ্য খচখচানি!

মানিকগঞ্জ এলাকায় পদ্মায় ভীষণ ঝড় ও নৌকাডুবি।

কয়েকদিন ধরে উত্তর-পশ্চিমের গরম হাওয়া বন্ধ।

আজ দুপুর আর বিকেল গেল গুমোট গরমে। ১০৮°-এর কম নিশ্চয় নয়।

উনিশটার সময় এল দক্ষিণ থেকে ঝড়—লু। অতিশয় সূক্ষ্ম সাদা ধুলোতে সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল। 'দুরাশা' গল্পে রবীন্দ্রনাথ দার্জিলিঙে কুয়াশায়-ঢাকা পৃথিবী দেখে বলেছিলেন, ভগবান যেন রবর দিয়ে সৃষ্টি ঘষে তুলে ফেলতে চান। এখানে সাদা ধুলো দিয়ে। এ ধুলো পদ্মাচরের।

পদ্মা নদী পর্যন্ত আর দেখা গেল না।

কিছুক্ষণের জন্য সপ্তর্ষি পর্যন্ত লোপ পেল।

নটার সময় সামান্য একটু ক্ষান্ত দিয়ে ফের সমস্ত রাত জোর দক্ষিণের বাতাস বইল। ঠিক ঝড় নয়—ঝোড়ো বাতাস। এখনও চলছে।

আকাশের অতি উচ্চে যে আড়াইখানা ছেঁড়া মেঘ তারা পশ্চিমদিকে চলে গেল।

বিদ্যুৎ চমকালো না, মেঘ ডাকলো না।

বাতাস এ সময় যতটা ঠাণ্ডা হয় ততটাই—কোনো দিকে বৃষ্টি হয়ে থাকলে যতখানি শীতল হয় তার কিছুমাত্র না। নিতান্ত পদ্মার বারো মাইল জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছে বলে যা ঠাণ্ডা হওয়ার কথা।

একেবারে মেঘটেঘ না জমেই হঠাৎ ঝড়।

সেই ঝড় যখন তার চরম রুদ্রে তখন দেখি একটা দাঁড়কাক প্রাণপণ তার সঙ্গে লড়ছে। ইচ্ছে করলেই যেখানে খুশী সে আশ্রয় নিতে পারে। কিন্তু সে যেন আশ্রয় না খুঁজে অন্য কিছু খুঁজছে। তার হারিয়ে যাওয়া সঙ্গীকে?

কোথায় কালকের লূর পর আজ দিনটা ঠাণ্ডায় যাবে, আজ গেল সব চেয়ে গরম দিন।

ভোরে পদ্মাতে প্রথম স্নান। আমাদের বাড়ির সামনে পদ্মা একটা মাছের বঁড়শির মত হুক করেছে। সেই হুকে রাজ্যের মেয়েমানুষ ভোর থেকে নাইতে আসে। তাদের ঘন ঘন অঙ্গ বিতাড়ন এবং যত্রতত্র মর্দন থেকে বোঝা যায় তারা এই নিদাঘ যামিনী নিষ্কর্মা কাটায়নি; তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু সেই হুকে তো আর নাইতে পারিনে। তাই হুক পেরিয়ে খানিকটে এগোতে হয়। তখন দেখি পায়ের তলায় লিকলিকে ভলভলে প্যাচপেঁচে পলিমাটি। বালুর সুখস্পর্শের বদলে এই স্লাইমি কাদার উপর হেঁটে যাওয়া, এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কাদার ক্লেদময় স্পর্শে সর্বাঙ্গে কেমন যেন কিরকির করে। শতশত কিলবিলে বাঙ্‌ মাছের উপর দাঁড়ালে যে অনুভূতি হয় এ তাই।

জল ভারী সুন্দর। দক্ষিণের বাতাসে সঞ্চালিত হয়ে সর্বাঙ্গ সহস্র চুম্বনে শীতল করে দেয়।

রাত দশটায় ফের লূ। কিন্তু কালকের মত জোরালো নয়। এবং ঠাণ্ডাও নয়। এ অঞ্চলে অন্তত কোথাও বৃষ্টি হয়নি।

লূ কালকেরই মত এল হঠাৎ আচমকা। আকাশে একরত্তি মেঘও ছিল না। এখন বুঝলুম পদ্মার ঝড় কেন ভয়ঙ্কর। আকাশে বাতাসে কোনো

প্রকারের ইশারা না দিয়ে হঠাৎ হুড়মুড়িয়ে নেমে আসে। আস্তে আস্তে যে গতিবেগ বাড়বে তাও নয়। অসাবধান কেন, সাবধানী দাঁড়ীও এর হঠাৎ ধাক্কা সামলাতে পারে কি ?

সমস্ত রাত এবং এখনও হিল্লোলের পর হিল্লোলে দক্ষিণ বাতাস।

নবমী

ঠিক কালকেরই মত। অসহ, দুঃসহ না কালকের চেয়ে কম না বেশী এসব আর চিন্তা করার শক্তি নেই।

ঠিক কালকেরই মত রাত দশটায় লূ। তবে গোড়াতে কমজোর ছিল। এখন ২২'৪৫ বাড়ছে। ধুলোতে লেখা যাচ্ছে না।

তারপর কিন্তু বাতাস কমে গিয়ে মশার উৎপাত শুরু হল। মশারি খাটাতে হল। সকালে দেখি, হিম পড়েছে। এই প্রথম।

আকাশে কণামাত্র মেঘের চিহ্ন নেই।

সিলেটে জোর বৃষ্টি।

আজ কোনো দিক থেকে কোনো প্রকারের বাতাস ছিল না। গরম অন্য দিনের তুলনায় কম বলেই মনে হচ্ছে। ঢাকা বলেছে, আমাদের এলাকা শুকনো শুকনিতেই যাবে। এটা বলার দরকার ছিল না। আকাশের দিকে তাকিয়ে কল্পনা মাত্র করতে পারিনে, কোন্ দিক হতে, কি কারণে মেঘ জমতে পারে আর বৃষ্টিই বা হতে পারে। এই যে দক্ষিণের বাতাস আসে সেই বা কোত্থেকে ? বঙ্গোপসাগর থেকে ? কলকাতা ছাড়িয়ে ? তা হলে এত জোর পায় কোথায় ? কলকাতার উপর দিয়ে তো এত জোরে বয়ে যায় না। তবে পদ্মাতেই এর জন্ম ? তাই বা কি করে হয়।

একটা জিনিস বিলক্ষণ বুঝেছি। হঠাৎ এমনই আচম্‌কা এই দক্ষিণের বাতাস আসে—কোনো প্রকার মেঘ না জমে—যে, যে কোনো নৌকার পক্ষে এটা কাল।

প্রথম ধাক্কা সামলাতে পারলেও সে বাতাস সামলে হাল ধরে নৌকো বাঁচানো শক্তিশালী পুরুষের দরকার। মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথকে এই আচম্‌কা ঝড় সম্বন্ধে একাধিকবার সাবধান করেছেন।

আজ এগার দিন হল এখানে এসেছি। গরমের ঠেলায় চৈতন্য যেন সময়ের হিসেব রাখতে পারেনি। মনে হয় মাত্র তিন-চার দিন হল।

রাত এগারটায় দক্ষিণের বাতাস উঠলো। ধুলোর ঝড় না তুলে সমস্ত রাত ব্যজন করে গেল।

আজ দিনটা যেমন তেমন কাটল কিন্তু রাতটা গেল খারাপ। বাতাস ছিল না বললেই হয়। মশারির ভিতর বাইরে শুয়ে আরামহীন রাত।

দিনটা জেঁ্যাও ত্যোঁও কাটে কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকেই আরম্ভ হয় গরমের সত্য উৎপাত। ঘরটা তেতে ওঠে চরমে—ওদিকে বিজলির জোর কমে গিয়ে পাখা আর ঘুরতেই চায় না। বাইরেও গরম। হাওয়া বন্ধ। কখন বইতে শুরু করবে তার ঠিক নেই। সেও বইবে গরমই। কারণ চতুর্দিকে বৃষ্টি হয়েছে বা হবার আশা আছে বলে কোনো কাগজ আশা দেয়নি।

রাতটা কাটল দুঃসহ গরমে। অন্য দিনের মত রাত বারোটায়ও ঠাণ্ডা হল না।

গেল দু'দিন ঢাকা ভরসা দিয়েছিল, রাজশাহী অঞ্চলেও বৃষ্টি হতে পারে। আজ তাও প্রত্যাহার করলে।

আজ আরো গরম।

সন্ধ্যার পর দক্ষিণ থেকে বাতাস কিন্তু ঠাণ্ডা নয়।

পূর্বে কিছুক্ষণ খরার বিজলি হানলে। সন্ধ্যায় ছেঁড়াছেঁড়া মেঘ জমেছিল। কিছুক্ষণের ভিতর তাও কেটে গেল। মেঘগুলো যেন কোথাকার বর্ষা-ভোজের পর ইতস্তত ছড়িয়ে ফেলা এঁটো পাতা। দেখলে হিংসে হয়, কোথাও যেন কপালীরা উত্তম বৃষ্টির উৎসব ভোজ করেছেন। আমাদের কপালে ছেঁড়া পাতা। ঘেন্না-ঘেন্না করে সেগুলো চাটতে রাজী আছি—যদি তাঁরা বৃষ্টি হয়ে নামেন। তাও তাঁরা নামলেন না।

এখন (২৩·০০) জোর দক্ষিণের বাতাস কিন্তু আরামহীন। পদ্মা মাঝে মাঝে সমুদ্রেরই মত অনেকক্ষণ ধরে একটানা গর্জন রব ছাড়ে। বড় গম্ভীর—তবে সমুদ্রের মত উদ্দাম নয়। পাড়ে এসে ঢেউও মাথা কোটে না। সমুদ্র-পারেরই মত নারকোলপাতার একটানা ঝিরঝির শব্দ। অন্য পাতার সঙ্গে মেশা বলে ঠিক সমুদ্রপারের আওয়াজ নয়।

কাল রাত্রে বাতাস ক্রমেই ঠাণ্ডা হয়ে এল বলে নিদ্রা হল ভাল।

ভোরে দেখি আকাশে টুকরো টুকরো মেঘ দক্ষিণ থেকে উত্তর দিকে মন্থর গতিতে রওয়ানা দিয়েছে। পদ্মার বুকে কিন্তু দুর্দান্ত দক্ষিণের ঝোড়ো বাতাস। সেই বাতাসে পাল তুলে দিয়ে চলেছে খান-চারেক বিশাল মহাজনী নৌকো। দক্ষিণের বাতাস কি কৌশলে পাল দিয়ে কাবু করে নৌকা উজানে পশ্চিম দিকে যেতে পারে সেটা আমার বুদ্ধির অগম্য।

এখন ১৩·৪৫-এ মৃদুমন্দ কিন্তু গরম বাতাস। মেঘ বেবাক অন্তর্ধান করছে। বুঝেছি এ ধরণের মেঘে বৃষ্টি হবে না। যদি হয় তবে হুড়মুড়িয়ে আসা কালো মেঘে—বিন নোটিসে, সন্ধ্যার দিকে। সে এখন মাথায়।

২০টায় লু উঠে (৩৫-এর মত) ধুলোয় ধুলোয় ত্রিভুবন ধূলিতন্ত্রের তাঁবেতে গেল। বারোটা থেকে সকাল অবধি সুন্দর বাতাস। ঘরের ভিতরে শুয়েও ভোরে গায়ের চাদর খুঁজতে হল।

পদ্মার পাড়ে বাসা—আমাদের বাসা ছাড়িয়ে মাত্র দুটি কি তিনটি—পরিবারটি সিরাজগঞ্জের। বিরাট নদীর সঙ্গে এদের আশৈশব পরিচয় থাকার কথা।

তিন ভাই স্নান করতে গেছে এগারটায়। যার বয়েস বাইশ সে হঠাৎ নাকি চিৎকার করলে, 'ডুবলুম, গেলুম গেলুম।' অন্য ভাইরা মস্করা ভাবলে।

আমি যখন তাকালুম, বাড়ি থেকে, তখন ১১'৩০/১১'৩৫ নাগাদ। একটা নৌকা যোগাড় করে উড়ন জাল ফেলে ফেলে চেষ্টা করা হচ্ছিল ছেলেটাকে খুঁজে বের করার। ইতিমধ্যে গোটাতিনেক ছেলেও ডুব দিচ্ছিল—কেউ কেউ লগি পুঁতে তাই ধরে ধরে নামছিল। এদিকে ওদিকে বিস্তর ছেলে-ছোকরারা সাঁতার কাটছিল কিন্তু ডুব দিয়ে সন্ধান করার মত শক্তি ওদের নেই, কারণ ওখানে ৩/৪ লগি গভীর জল।

ইতিমধ্যে মিলিটারির দুজন লোক—একজনের মাথায় লোহার টুপি—পাড়ে এসে জুটলো। লোকজন তাদের চতুর্দিকে জটলা করলে। তারা চুপ করে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ দেখলে। কিছু করলে না—করবার ছিলই বা কি?

তারপর আরেকটা নৌকা এল রাঘব জাল নিয়ে। সেটা কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজে লাগানো হল না। তবে কি রাঘব-জাল অতখানি গভীরে তলাতে পারে না।

প্রায় একটার সময় ওপার থেকে তরতর করে দক্ষিণ বাতাসে পাটল-রক্ত রঙের পাল তুলে একটা জুড়িন্দা নৌকো আসছে দেখা গেল—আমার মনে একটু আশা হল। এরা এসে সাবধানে খাড়ির ওদিকে প্রথম দাঁড়ালো। তার পর একটা একটা করে—আসলে জুড়িন্দা নয়—দুটোই খাড়ির মুখে এসে আর পাঁচ-জনেরই মত লগির খোঁচা দিয়ে দিয়ে সন্ধান করলে।

প্রায় দেড়টার সময় আস্তে আস্তে সব চেষ্টাই বর্জিত হল। যে জেলে জাল ফেলছিল সে খাড়ির ওপারে চলে গেল। জোড়া নৌকো এবারে লগি পুঁতে নৌকা বাঁধল। শুধু দু'তিনটি ছেলে তখনো মাঝে মাঝে ডুব দিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছিল।

ইতিমধ্যে বাচ্চু এসে বললে, 'ছেলেটি নাটোরের। বাপের এক ছেলে (আপিসের চাপরাসী বললে বাপের নাম ডাঃ রেবতীভূষণ চক্রবর্তী), এখানে মামা

বাড়ীতে এসেছিল, সাঁতার জানত অল্পই; পাড়ার দুই ছেলে তাঁকে নিয়ে সাঁতরাতে যায়। ছেলেটা সাঁতারে অপটু। ডুবে যাচ্ছে দেখে ওরা সাহায্য করেও ছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠেকাতে পারেনি।

আমি শুধু একটা জিনিস বুঝতে পারলুম না। ও যদি খাঁড়ির মুখেই ডুবে থাকে তবে ওখানে সন্ধান বেশী না করে করা তো উচিত ছিল আরো ভাটিতে। যত কমই হোক, স্রোত তো এখানে কিছুটাও আছে।

সন্ধ্যার পর ফের লু। এখন ২৩'৪৫ কিছুটা কমেছে। তবু squalls.

পদ্মা পূর্ণিমায় তাঁর নরবলি নিলেন!

[এই সর্বনাশা রূপ ছাড়াও পদ্মার প্রাকৃতিক-সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে লেখক দিনলিপির এক স্থানে একটি বর্ণনা লিখে রাখেন। প্রসঙ্গক্রমে সেটি এখানে লিপিবদ্ধ করা হল]

পদ্মা—রাজশাহী

একে উজান, তার উপর পবন যেন বান ডেকেছে ভাটার দিকে। এতে কখনও নৌকো বাওয়া যায়? তাও যায়। স্পষ্ট দেখলুম দুজনাতে কি রকম তরতর করে নৌকো উজানে ঠেলে নিয়ে গেল—লগি মেরে মেরে।

পদ্মার সঙ্গে যাদের কারবার তারা সব পারে।

সপ্তমীর রাতে পদ্মা পেরিয়ে আসছে ধুধু করে দক্ষিণ বাতাস—কখনো বা দমকা দমকায়।

আমার সামনে বিরাট পদ্মা। তার চর, চরের পর ফের নদী, তারপর দূর সুদূরের ঝাপসা ঝাপসা গাছপালা—সেও চরের উপর। কিছুই দেখা যাচ্ছে না বলে মনে হয় আমি যেন অন্তহীন সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। বাতাসে জলে ধাক্কাধাক্কিতে যে ধ্বনি উঠছে সেটা ক্ষীণতর হলেও সমুদ্রগর্জনেরই মত। একই গাম্ভীর্য। সমুদ্রে যে রকম পাল পাল ঢেউ বেলাভূমির দিকে এগিয়ে আসে, এখানেও ঠিক তেমনি নদীর স্রোতের গতিকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে পূব-পশ্চিম জোড়া পালের পর পাল ঢেউ আসছে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে, আমার দিকে। দমকা বাতাসে মাঝে মাঝে নদীর এখানে ওখানে ফেনা জেগে উঠছে—ঠিক সমুদ্রেরই মত।

এই ঝোড়ো বাতাসেও কিছুটা শীতলতা আছে বলে তার অস্থিরতা সত্ত্বেও সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে—নদীপারে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

মনে হল, আজ আরেকটা ছোট চর ভেসে উঠেছে।

বাতাসের উল্টোদিকে পাল তুলে দিয়ে নৌকা যেতে পারে, শুনেছিলুম, বিশ্বাস করিনি। এখন এখানে সেটা স্পষ্ট দেখলুম।

স্রোত বইছে পশ্চিম থেকে পূবে, হাওয়া বইছে পূব-দক্ষিণ থেকে উত্তর-পশ্চিম পানে। দু'খানা নৌকো পাল তুলেছে নৌকোর সঙ্গে গা মিলিয়ে প্যারালেল—বোধ হয় উল্টো বাতাস নৌকোর ভারের সঙ্গে আড়াআড়ি আটকা পড়ে হাওয়াটার বিপরীত ধাক্কা **neutralize** করে দেয়। এবং তারপর স্রোতের ভাটার বেগে গন্তব্যদিকে অগ্রসর হয়। কারণ খাঁড়ির ভিতরে ঢুকেই এরা পাল গুটিয়ে নিল—কারণ সেখানে হাওয়া কম।

পদ্মার এ অদ্ভুত সৌন্দর্য থেকে মুখ ফিরিয়ে খাতায় পোকার দাগ কাটতে হবে! বিরাট অথচ ছেঁড়াছেঁড়া একটা কালো ছায়া নদীর ওপার থেকে এপারে ভেসে আসছে দ্রুতগতিতে—তার পিছনে যেন তার বাছুর, সেও আসছে সঙ্গে সঙ্গে। এদের আকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে এই দুটি মেঘ আকাশে খুঁজে নিতে কণামাত্র কষ্ট হয় না। পারে উঠেই যেন এরা অদৃশ্য হয়—ওদের যেন পাসপোর্ট ভিজা নেই। একেবারে মিলিয়ে যায় তা নয়। কারণ পাড়ের বালি বড় সাদা। একটুখানি আমেজ যেন থেকে যায়। **V. I. P**দের বডিগার্ডের মত ভিড়ের মাঝখানে মিলেও মেশেনি।

ঐ দূরে দূরে দু'একখানি ডিঙি নৌকা। তারও দূরে চরের পশ্চিমতম কোণে লম্বা সারির খড়ের ঘর। শুনেছি পদ্মার জল গত বৎসর থেকে এপারের দিকে আসছে—আমাদের বাড়ির সামনেকার জলধারা আর খাড়ি নাকি গত বছরেও ছিল না, মাঝগাঙের চর অবধি হেঁটে যাওয়া যেত—এদের ম্যাদ তাহলে আর ক'বছরের।

ওপারের হিন্দুস্থান ভোরের বৃষ্টি বর্ষণের ফলে বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ঐ উপর দিয়ে গেল বাঘডোগরা থেকে কলকাতার প্লেন।

এপারে মহাজনী নৌকো যাচ্ছে নির্ভয়ে পুরো পাল চেতিয়ে। আরেকখানা বিনা পালেই যাচ্ছে উজান। হালের কাছের মাঝিটা পর্যন্ত নেই। কাৎ হয়ে হয়ে পশ্চিম-দক্ষিণের দিকের বাতাসে চলেছে সূর্যাস্তের দিকে।

কাল রাত্রে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। কিছুক্ষণ ধরে গুমোট থাকার পর বইল উত্তর থেকে বাতাস। হঠাৎ দেখি আমার ঘরের ভিতরই তুমুল কাণ্ড। উত্তর দক্ষিণ বাতাসে লাগিয়েছে হাতাহাতি। যেন ফিরোজ আর ভজু।

২৭শে বৈশাখ, ১৩৬৭

বাড়ির গেট বন্ধ করে যখন বেরলুম তখনো অতি অল্প হাওয়া। বিশ কিংবা পঁচিশ কদম যেতে-না-যেতেই হুড়মুড় করে যে লু ধেয়ে এল তখন রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়াল, এগুবো না বাড়ি যাব। নিতান্ত গোঁয়ার বলেই এগুলুম। অবশ্য গলির ভিতর ঢুকতেই অন্তত চোখ মেলে তাকাতে পারলুম।

কাজেই পদ্মাতে নৌকা চালানো যে কি হুঁশিয়ারির কাজ সেটা এ সময়ে এদেশে এলে একটা অভিজ্ঞতা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

রাত এগারোটা অবধি এই সূক্ষ্ম ধূলোর মাঝখানে খেতে বসতে ইচ্ছে করে না।

মাইল বারো দূরে, শারদার কাছে ছেলেটির মৃতদেহ আজ পাওয়া গেছে। তাই বলছিলুম, দু'ঘণ্টা পরেও যেখানে সে ডুবেছিল সেখানে ওরা জাল ফেলেছিল কোন্ আক্কেলে।

বাপের নাম রেবতী সান্যাল। বিশী যা বললে সেটা বাচ্চুর কাহিনীর সঙ্গে মেলে। তবে প্রথমটায় তার 'গেলুম, গেলুম' কেউ বিশ্বাস করেনি, পরে দুটি ছোকরা তাকে ধরেও ছিল বটে তবে বয়সে কাঁচা বলে ঝাপটাঝাপটিতে দমবন্ধ হওয়ার উপক্রম হওয়াতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

গরম অল্প কমেছে পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই, কিন্তু এখানে প্রতি রাত্রে এই ধূলোর অত্যাচার অসহ হয়ে উঠছে।

মেঘ রোজই সকালের দিকে আকাশের এখানে ওখানে দেখা যায়। বোধহয় শেষরাত্রে বা ভোরে যখন হাওয়া বন্ধ হয় তখন জমবার সুযোগ পায়। তারপর হাওয়া উঠে দুপুর হতে-না-হতে মেঘ হাওয়া।

মেঘের চেহারা অনেকটা আকাশের ডাবরে নীল দুধে বদখদ দম্বল দিলে যেরকম হেথায় জমাট হোথায় জোলো দই জমে সেই রকম!

১২ তারিখ প্রিন্স আলী খান মোটর দুর্ঘটনায় গত হয়েছেন।

জিনিসটা অত সরল নয়।

প্রথমতঃ তিনি মারা গেলে করীম—প্রতিপক্ষ দলের আর কোনো ইমাম প্রার্থী রইলেন না।

দ্বিতীয়তঃ করীমের প্রতিপক্ষ দল নিজেদের অসন্তোষ হালে প্রকাশ করছিল। তাই করীম পক্ষীয় দলের পক্ষে এই 'দুর্ঘটনা'র ব্যবস্থা করা অসম্ভব ছিল না।

দুর্ঘটনায় দেখা যাচ্ছে,

(ক) আলী পূর্বে জানা ঠিকঠাক করা রাঁদেভুতে যাচ্ছিলেন—এলোপাতাড়ি bunmelu করতে বেরোননি। আততায়ীর পক্ষে আগেভাগেই জানা কঠিন ছিল না।

(খ) আলী অতি বিচক্ষণ, অভিজ্ঞ ড্রাইভার। যে বয়সে মানুষ par excellence গাড়ি চালায় তাঁর বয়েস সেই। চালাচ্ছিলেন ৩৮ মাইল বেগে—প্যারিসে সে কিছুই নয়, তাও রাত্রিবেলা।

(গ) তিনি ধাক্কা মারেননি। মোড় নিতেই অন্য গাড়ি এসে তাঁকে ধাক্কা দেয়।

ঘুম থেকে উঠলুম প্রায় উনিশটায়। দেখি মেঘ জমেছে, কিন্তু সেরকম কালা ঘনঘটা নয় যা দিয়ে বোলপুরে বৃষ্টি নামে। সকালে মেঘ করেছিল কিন্তু অন্য দিনের মত দুপুরবেলা হাওয়ার জোড়ে অন্তর্ধান করেনি। আপিসের বড়বাবু বৃষ্টির ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

তারপর বিদ্যুৎ চমকাতে আরম্ভ করল। ক্রমে ক্রমে আকাশের সর্বত্রই। মেঘও ডাকল জোর। তবু বৃষ্টি নামে না।

৮-১০এ অতি সূক্ষ্ম বারিকণা দিয়ে বৃষ্টি আরম্ভ হল। মনে হল পূব-দক্ষিণে কোথাও বৃষ্টি হতে হতে এখানে এসে পৌঁচচ্ছে। অন্য দিনের তুলনায় হাওয়াও ছিল জোলো ও ঠাণ্ডা। অনেকক্ষণ পাঁয়তাড়া কষার পর বৃষ্টি এল উত্তর দিক থেকে। (ঢাকায়ও একাধিকবার এই ব্যাপার দেখেছি) তারপর আরম্ভ হল দক্ষিণ থেকে।

বিদ্যুৎ এমনই ঘন ঘন চমকাচ্ছিল যে পূর্ণ অর্ধ সেকেণ্ডের তরে আকাশ একবারও অন্ধকার যায়নি। আর শিরা-উপশিরা ছড়ানো এতখানি আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ-জাল আমি ইতিপূর্বে কমই দেখেছি। আর মাঝে মাঝে রীতিমত অশনি-পাত। বলতে গেলে মনস্যুন 'ভাঙার' মত তোড়জোড় এবং তাণ্ডব। তবে বৃষ্টিটা সেরকম জোর নয়।

ঘণ্টা দুই পরে থামল। ধরণী শীতল হলেন।

বিজলী আলো বন্ধ হল ২১·০০। উৎপাত। খুলল ভোরে। মিলিটারি এদের ফাঁসী দিতে পারে না ?

কাল রাত্রে দু'ঘণ্টা বৃষ্টির ফলেই আজ দেখি ঘাস চিকণ-সবুজ রঙ ধরেছে।

দিনটা গেল অবিশ্বাস্য আবহাওয়ায়। মোলায়েম ঠাণ্ডা। ১৫·৩০-এ যখন শুতে গেলুম তখন ঘর অন্ধকার করার জন্য দোর-জানলা বন্ধ করলুম বলে পাখা চালাতে হল। না চালালেও হয়তো চলত।

উনিশটায় সেই সুন্দর ঠাণ্ডা দমকা বাতাস। সমস্ত দিন মেঘলা ছিল—এখনও তাই। অল্প বিদ্যুৎও চমকাল।

ঠাণ্ডার ঠেলায় ফিরোজের আর জ্বর নেই।

আঠারো তারিখ লাটসায়েব আসবেন। তারই প্রস্তুতির জন্য রাবেয়াকে কাল ঢাকা যেতে হবে। বিশ তারিখ (ইংরাজী) মেজ ভাই আসবেন।

ফিরোজের আবার জ্বর (২১·০০)।

আশ্চর্য ! রাতদুপুরে হাওয়া বিলকুল বন্ধ হওয়াতে ঘরে মশারির ভিতর আর আরাম বোধ হচ্ছিল না। ঐ সময়টাতেই তাহলে max-heat গেল !

আকাশে চাঁদ, তারা ; মেঘ নেই।

ভোর থেকে মেঘলা ঠাণ্ডা আরামের বাতাস।

বিকেলের দিকে সামান্য একটু গরম।

সন্ধ্যায় অল্পক্ষণের জন্য পূব থেকে জোর বাতাস।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে পূবের বাতাসে বিদ্যুৎ চমকালো।

তার উপর বিদ্যুতের খেল উত্তর বাগে চলে গেল। বাতাসও কালকের মত আজও রাত্রে বন্ধ হয়ে গেল। এখন (২৩·৪৫) কষ্টদায়ক না হলেও মশারির ভিতর অনারাম হবে।

রাবেয়া দুপুরের গাড়িতে ঢাকা গেল।

সাঁওতালরা পুব বাঙলার কতখানি গভীরে ঢুকেছে জানিনে। উত্তর বাঙলায় বগুড়া ও বারেন্দ্রভূমিতে তারা আছে। এখানে বাড়ির সামনে মাটি কাটার কাজ করছে।

এরা বোলপুরের সাঁওতালদের মত বুনো-বুনো নয়। দু'তিন জনে হাত ধরাধরি করে মৃদু গুঞ্জরণে গান গাইতে গাইতে এদের রাস্তা দিয়ে যেতে দেখিনি। বোলপুরীয়াদের মত এদের growth stunted নয়। অনেকটা তন্বঙ্গী শ্যামা বাঙালীর মত। শাড়ীও পরে হুবহু বাঙালী ঝি মেছুনির মত। গামছা আছে, কিন্তু সেটা কোমরে জড়ায়নি। এদের রঙও তৈলচিক্কন নয়। একটু যেন অপরিষ্কারও। খিল খিল করে হাসতেও এদের দেখিনি।

সমস্ত বাংলায় ভীষণ ঝড়, রাত্রে খড়্গাপুরে বৃষ্টি।

ভোরবেলা থেকে ধূ ধূ প্রচণ্ড উত্তরের বাতাস। ঘরে মশারির ভিতর গায়ে চাদর জড়াতে হল। আকাশ মেঘলা। একদিকে আসন্ন বর্ষণের কালো রঙ মাখা।···

ভোর থেকেই সুন্দর দক্ষিণের বাতাস।

কখন মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে লক্ষ্য করিনি। পৌনে তিনটে নাগাদ স্নান করতে যাবার সময় দেখি, উত্তর-পশ্চিম কোণে কালো মেঘ। তার কিছুক্ষণ আগে থেকেই খানিকটে গরম আর গুমোট ছিল বলে পাখা চালাতে হয়েছিল। বাথরুমে থাকা অবস্থাতেই লু উঠলো। খেতে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেশ জোর বৃষ্টি নামল।

উত্তর দিক থেকে। কয়েকদিন আগে W. F. বলেও ছিল বটে, উত্তর-পশ্চিম থেকে ঝড় বইতে পারে।

তোড়ে বৃষ্টি। দু'একবার শিলঙের মত দু ঝাপটা বৃষ্টি মেঘের মত বারান্দা পেরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল।

বোধ হয় ১৫।২০ মিনিটের বেশী বৃষ্টি হয়নি—সমস্তটাই উত্তর থেকে—তবু

ঘরের মাঝখান অবধি. শুধু ভিজে যায়নি, রীতিমত জল দাঁড়াল। চৌকাঠ না থাকার ফল। বেশীক্ষণ এ রকম তোড়ে বৃষ্টি হলে ঘরে জিনিসপত্র রাখবার জায়গা থাকতো না।

রাবেয়া আজ ফিরল না কেন বুঝতে পারলুম না।

সন্ধ্যায় পদ্মার জল অদ্ভুত অলিভগ্রীন হল।

এখনও বেশ মোলায়েম ঠাণ্ডা। অতি মৃদু দক্ষিণের বাতাস (০০·৩০), তবে দু'চারটে মশার ভনভনানি কানের কাছে।

আজও সন্ধ্যার পর সামান্য বৃষ্টি হল। এ কদিন রাতদুপুরে হাওয়া বন্ধ হত। আজ আর তা হল না। পরদিন সকাল পর্যন্ত সুন্দর হাওয়া ছিল।

দুপুরবেলা খুব ঘন মেঘ জমল।

খুব হাঁকডাক। এন্তের জাঁক দেমাক। বুঝি আকাশ ফেটে পড়বে।

আধ আউন্স শিলাবৃষ্টিও হল।

তার পর তিন আউন্স বৃষ্টি। সেও পূর্বদিনের মত উত্তরের বাতাসে জলকণা।

তারপর হাওয়া বন্ধ।

এখন (১৯·৪৫) সুন্দর বাতাস।

পূবের বাতাস যখন বইছিল তখন পশ্চিমের স্রোতের সঙ্গে ধাক্কা লেগে পদ্মার বুকে যা সাদা ফেনার ঢেউ জাগালে, তাও আবার এমন chopped যে সে এক প্রলয় কাণ্ড।

বৃহস্পতিবার সকালের বসুমতী লেখে :—

…"অন্ততঃ আবহাওয়া অফিস বুধবার রাত্রে যে পূর্বাভাস দিয়াছেন তাহাতে অদ্য বৃহস্পতিবার ঝড়বৃষ্টি হইবার কোনো সম্ভাবনার কথা উল্লেখ তো নাই, বরঞ্চ বলা হইয়াছে যে, অদ্য আবহাওয়া শুষ্ক থাকিবে ও দিবাভাগের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইবে।" !

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কলকাতায় কালবৈশাখী, সামান্য বৃষ্টি। সেই যে গেল শুক্রবার বৃষ্টি হয়েছিল, তারপর আর কষ্টদ গরম পড়েনি। ফৈজু ভাই ঠিকই বলেছিল, একবার বৃষ্টি হলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি ভেবেছিলুম, শান্তিনিকেতনের মত উটকো বৃষ্টি হয়ে ফের গরম পড়বে। তা হল না, **Thank God—touch wood ! So far.**

আজও বেশ ঠাণ্ডা। দিনে একবার ঝড় উঠেছিল। রাত্রে ২২টা নাগাদ অল্পক্ষণ সামান্য বৃষ্টি হল। এখন ০০·৩০-এ সারা আকাশ জুড়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আর গুরুগুরু মেঘ ডাকছে—যেন খাঁটি বর্ষাঋতু। অতীব রমণীয়।

তারপর নামল তুমুল বেগে বৃষ্টি। সে কী বৃষ্টি। আর ঝঞ্ঝার বাতাস।

এক্কেবারে খাঁটির খাঁটি বর্ষা।

প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা **in Bonga from 64·5 to 7·30 in the morning.**

সকাল থেকে রীতিমত ঠাণ্ডা বাতাস।

সমস্ত দিন মেঘলা আর ঠাণ্ডা। দুপুরবেলাও শুধু গেঞ্জি গায়ে দিয়ে থাকা যায় না। সকালে তো ড্রেসিং গাউন পরেই কাটাতে হল।

সমস্ত দিনটা গেল খাঁটি বর্ষাঋতুর মত।

রাত প্রায় দশটা থেকে কী বিদ্যুতের খেলা। বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

গেল রাত্রির বৃষ্টিতে আকাশ থেকে শেষ ধূলিকণা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গিয়েছে বলে আজ সকালে দূরের চরের—মনে হয় ওপারের—গাছপালা পরিষ্কার ঘনশ্যাম দেখাচ্ছিল। দেশে ধানক্ষেতের ওপারের গ্রাম যে রকম দেখায়। দূর-দূরান্ত অবধি অবাধ দৃষ্টি ধেয়ে গিয়ে যা-কিছু দেখবার সব দেখা যায়। নদীর বড়ধারা যেখানে শূন্যে লীন হয়েছে—বালুচরের উপর যে কটি সবুজ ঘাস রাতারাতি গজিয়েছে। স্বচ্ছ—একেবারে স্বচ্ছ। মনে হল আমার চোখের উপর যে চামড়ার পরদাটা রয়েছে সেটাকেও যেন কাল রাত্রের বৃষ্টি ধুয়ে পুঁছে ঝকঝকে স্বচ্ছ সাফ করে দিয়ে গিয়েছে।

রাবেয়া সকালে পাবনা গিয়েছিল, সন্ধ্যায় ফিরে এল।

মাইজম ভাইসাহেব কাল ও আজ রাত্রে এখানে খেলেন।

৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কী শীত, কী ঠাণ্ডা! সমস্ত রাত বৃষ্টি হয়েছে নাকি? এখন তো ধমকে ধমকে বাতাসের ঝাপটার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি আসছে উত্তর দিক থেকে (৭°৩০)। যেন ভরা বর্ষার ভোরের বৃষ্টি।

এই আজ প্রথম নদীতে স্নানার্থিনী নেই। একটিও না।

তবু তো স্নান এ দেশে **fetish—necessity** না হলেও। বৃষ্টি থামতেই সেই কনকনে ঠাণ্ডাতেই দু'তিনটি রমণীর আবির্ভাব। ওদিকে যে পোলটা তৈরী হচ্ছে তারও মজুররা কাজে লেগে গিয়েছে।

তিনজন জেলে উড়োন জাল ফেলে মাছ ধরছে। অন্যদিন এ সময়ে ধরে না। বোধ হয় গরম বলে এতক্ষণে মাছ জলের গভীরে ডুবে যায়—যেখানে জাল পৌঁছয় না।

দূরদুরান্ত অবধি কী সুন্দর পেলব ধরণী। বাতাস মাঝে মাঝে যখন গতিবেগ কমায় তখন বিশাল পদ্মার উপর যেন ছোট ছোট নাগ-নাগিনী ক্ষুদে ক্ষুদে ফণা তোলে। দূরে চরের সদ্যজাগা কচি সবুজের প্রলেপ দিয়েছে সবে-গজা ঘাস। তার পিছনে প্রাচীন গাছপালার ঘন সবুজ। তার পিছনে কাজল-নীল আকাশ।

সেই যে তের তারিখে বৃষ্টি হয়েছিল, তারপর আর গরম পড়েনি। সেই অতি সূক্ষ্ম ধূলিতন্ত্রেরও অবসান হয়েছে।

সমস্ত দিন মেঘলা আকাশ। আসন্নবর্ষণ না হলেও চেহারা বর্ষাকালেরই মত। সর্বাঙ্গসুন্দর নিম্বাস (Nimbus) না হলেও ঐ গোত্রেরই বটে। আকাশের কোনো কোনো জায়গা যেন নীলাঞ্জন-লিপ্ত। শুধু মাঝে মাঝে সাদা সাদা ভাব—কাজলটা যেন জলের সঙ্গে ঠিকমত লেপা হয়নি। আবার সমস্ত উত্তর আকাশ জুড়ে পুঞ্জ পুঞ্জ পাক-খাওয়া-খাওয়া কালোয় ধূলায় মেশানো সেই বনসঙ্কর নিম্বাস।

শেষ বালুকণা আকাশ থেকে বিলীন হয়েছে বলে ওপারের হিন্দুস্থান দেখা যাচ্ছে। আমার শালীর ছেলের বয়স ১৫।১৬, সে কত অনায়াসে বললে, 'ওপারে? ওপারে ইণ্ডিয়া।'

এই জেনারেশনের কাছেই পরদেশ 'ইণ্ডিয়া'। প্রার্থনা করি, তার পরের জেনারেশন যেন ইণ্ডিয়াকে মিত্রের চোখে দেখে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই দুই দেশ যদি ঠিকমত সহযোগিতা করে তবে চীনকেও সর্বক্ষেত্রে হারাতে পারবে।

কাল রাত্রে হাওয়া বন্ধ ছিল। পাখা না চালিয়েও খুব কষ্ট হয়নি।

সকালে আকাশ মেঘহীন ছিল। ক্রমে দক্ষিণের বাতাস মেঘ জমাতে আরম্ভ করল। Cumulus—Nimbus-এর দোআঁশলা। দক্ষিণের বাতাসটি গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে যাচ্ছে।

ঢাকাতে শুক্র শনি রবিতে প্রচুর বৃষ্টি হওয়ার ফলে 'সংবাদ' উল্টো গান গাইছে।

মার্কিন বৈজ্ঞানিক বলছেন, ক্যালেণ্ডারের একই দিনে বৃষ্টি হয়। যদি অন্য সময় বেশী বৃষ্টি হয় তবে সে আকাশে মেটেওর-ফেটেওর কি সব কারণে।

আমার ক্যালেণ্ডার তো তা বলে না। তবে কি অন্য Geo-physical Calender রয়েছে?

দিল্লী থেকে সংবাদদাতা লিখছেন, ভারত পাকিস্তানে entente cordial বাড়ছে। সাধু!

সন্ধ্যায় হাওয়া বন্ধ হয়ে গুমোট। আকাশেও মেঘ নেই। রক্তাক্ত সূর্যাস্ত।

এই কি ফের গরম আরম্ভ? Pre-monsoon গুমোট?

রাবেয়া পাবনা গেল। কিসের যেন মুখপোড়ার Pre-census.

Birthday of রাসবিহারী বসু। আশুতোষের ৩৬তম মৃত্যুবার্ষিকী।

নজরুল্ ইসলামেরও জন্ম ১৩০৬ সালে।

কাজী আমিন উল্লা মুনশী তুফায়েল আলী
„ ফকীর আহমদ মুসম্মৎ Zaheda খাতুন
„ নজরুল ইসলাম

তাঁর পিতৃব্য কাজী বজল-ই-করীমের কাছ থেকে নজরুল ইসলাম বিস্তর ফার্সী

শোনেন। আত্মীয়েরা তাঁকে দুখু মিয়া ডাকত, অন্যেরা 'ক্ষ্যাপা'। আসানসোল বেকারি। কাজী রফীকুদ্দীন সব্‌ইন্‌স্‌পেকটর অব পুলিস তাঁকে কাজীর সিমলা (Kazir Simla) গ্রামে (মৈমনসিংহে) পাঠান। সেখানে তিনি class X অবধি ওঠেন। ১৩২৯-এ ত্রৈসপ্তাহিক 'ধূমকেতু' প্রকাশিত। ২৩ বছর বয়সে ১ বছরের জেল। ৩৯ দিনের অনশন। আব্দুল্লা সুহ্রাওর্দীর অনুনয়ে অনশন ভঙ্গ—he carried a message from the nation requesting him to do so—Mrs. M. Rahman took charge of him—বিয়ে, আশালতা সেন (পরে নাম প্রমীলা)—কুমিল্লার মেয়ে—

সকাল থেকে গুমোট। ভাবলুম, এই বুঝি শুরু হল ফের গরম।

দুপুরে পাখা চাল্লালুম। অবশ্য সবসুদ্ধ তেমন কিছু পীড়াদায়ক নয়।

সন্ধ্যা ছ'টায় ঘনঘটা করে এক মিনিটের জন্য দক্ষিণ থেকে ফাইন বৃষ্টি।

এখন অতি ফিনফিনে বৃষ্টি পূব থেকে (১৯'১৭)। ঠাণ্ডা। আরামদায়ক।

বিশীর বাড়ি থেকে রাত্রে ফিরে ঘরটা গরম বোধ হল।

রাত্রে দোমনা হয়ে শুলুম, গুমোটই, পাখা না চালিয়ে। ভোরের দিকে বৃষ্টি হয়েছে। ছাত ভেজা।

কলকাতায় বর্ষাকালীন আবহাওয়া বিরাজ করছে। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ও দু'এক পশলা বৃষ্টি। Main monsoon proceeding to Calcutta.

সকালে চড়চড় করে গ্রীষ্মের রোদ উঠল। ভাবলুম, খেয়েছে, আমাদের ঠাণ্ডার হনিমুন শেষ হল।

তারপর কোথা থেকে ঘন মেঘ জমতে আরম্ভ করলো—যদিও ঠিক বর্ষণদ নয়। আর ধুধু বাতাস। কাঁচের দরজা বন্ধ করে বসতে হয়েছে। কোদাল কাটা পদ্মায় সাদা ফেনা। গাছপালা, মেয়ে-মদ্দের শাড়ী ধুতি হেন বস্তু নেই যা শান্ত থাকতে পারে। চানের ঘাটেও হৈ-হৈ—জনা পঞ্চাশেক প্রচুর তোলপাড় করে স্নান করছে।

আর পূর্ব দিগন্তে মেঘে, জলে, বালুচরে কী অপূর্ব রহস্যময় সমন্বয়ে সব-কিছু পেলব করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে দু ফোঁটা বৃষ্টিও হয়েছে। সর্বব্যাপী অনিশ্চয়তা।

তারপর অনেকক্ষণ হালকা পাতলা বৃষ্টি হল—প্রায় ঘণ্টা-দেড়। বিদ্যুৎ না, মেঘের ডাক না। হাওয়া এখনও বইছে। তবে জোরটা কমেছে।

নারকোল গাছ এখানে সর্বোচ্চশির। কখনো মনে হয় windmill, কখনো বা আনাড়ি হাতে তৈরী দশভুজার মূর্তির মত।

দিনটা সুন্দর গেল। সন্ধ্যায় মেঘলা ছিল বলে ঈদের চাঁদ দেখার কোনো প্রশ্নই উঠলো না।

কত না দৃশ্য দেখা যায় এখানে ঝড় উঠলে।

খাড়ির ভিতরে দুখানি জালি বোট এবং আর সব নৌকো নিশ্চিন্ত। খাড়ির বাইরে কুণ্ডের বাইরে ছিল মহাজনী নৌকো—বালুভর্তি। সে খাড়ির ভিতর আশ্রয় নেবার জন্য রওয়ানা দিলে। একজন জল সেঁচচে—একজন হাল ধরেছে, আর দুজনা জোর বৈঠা চালাচ্ছে। ভাটাতে যাচ্ছে বটে কিন্তু পূব-দক্ষিণের হাওয়া বলে তাকে পুরো লড়াই লড়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুতে হলো। খাড়িতে ঢুকে নিষ্কৃতি।

মাঝ-নদীর চর থেকে আসছে আরেকখানা মহাজনী। ওখানে হাওয়ার থেকে কোনো আশ্রয় নেই। হয়তো বা নৌকোতে বালু। সে যদি পুরো ভেজে তবে নৌকো ডুবিয়ে দেবে। তাই এই ঝড় মাথায় করে পূবের বাতাসের সঙ্গে লড়তে লড়তে এল। খাড়ির মোহনায় পৌছতে এতই বেগ পেতে হয়েছে যে সেখানে পৌছনো মাত্রই একজন রশি হাতে মাটিতে নেবে বাকিটা টেনে নিয়ে এল।

কিন্তু আশ্চর্য, আরেকখানা নৌকা মাঝগাঙে দাঁড়িয়ে—এদিকে আসছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ওর কি ডর-ভয় নেই। ঝড়ের বেগ তো আরো বাড়তে পারে।

কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য, মাল্লাদের ভিতর কণামাত্র দৌড়ঝাঁপ বা অন্য কোনো প্রকারের উত্তেজনা নেই। লড়ালড়ি যুঝাযুঝি সব করে যাচ্ছে অতিশয় আটপৌরে চালচলন সহ। হৈ-হুল্লোড় করলে পুল তৈরীর জন তিরিশেক মজুর।

বেতারে সতর্ক বাণী দেওয়ার এক দেড় ঘণ্টার ভিতরই বৃষ্টি আরম্ভ হল। অবশ্য মেঘ জমতে আরম্ভ করেছিল সকাল থেকেই। ভোরে রৌদ্র ছিল। হাওয়া বইল দুপুর অবধি উত্তর থেকে। অথচ বৃষ্টি আর ঝড় এল পূব এবং দক্ষিণ থেকে।

এখন ঝড়ের দাপট কমেছে। ঘাট পাড় জনশূন্য। পুলের মজুর সব অন্তর্ধান করেছে। নৌকোর ভিতরে মাল্লারা আশ্রয় নিয়েছে। গয়লানী তুফানের শুরুতেই গাই দুটো ভিতরে নিয়ে গিয়েছিল, এখন ঘুঁটে সরাচ্ছে। ওপারে নৌকোটা ওখানেই দাঁড়িয়ে (ওখানে বোধ হয় চড়ার কাছে বলে জল কম) এবং এই বৃষ্টিতে দুটো বাঁদর ছোঁড়া সাঁতার কাটছে। বোধ হয় সেই প্রবাদটা শুনেছে, 'এমন সুবুদ্ধিমানও আছে যারা বৃষ্টির হাত থেকে এড়াবার জন্য পুকুরে ডুব দেয়।'

দুপুরে ঘুমিয়ে উঠে দেখি (১৭·৩০), জোর বৃষ্টি হচ্ছে। যখন অল্পক্ষণের জন্য থামল তখন দেখি, বাগানে রাস্তায় জল দাঁড়িয়েছে—ওবেলা যে রকম দাঁড়িয়েছিল। দিনে দু'বার এরকম ধারা পূর্বে হয়নি।

এখনও খাঁটি বর্ষাকালের পিটির পিটির চলছে।

কেউ বলবে না এটা গ্রীষ্মকাল।

এরকম আর কয়েকদিন চললেই তো এ বৃষ্টি মৌসুমী বৃষ্টির সঙ্গে মিলে যাবে। কারণ খবর এসেছে মৌসুম বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে এগিয়ে আসছে।

এখন অবধি চলেছে বর্ষার মত। কখনো পিটির পিটির; কখনো দমকা হাওয়া। বাতাস একেবারে বন্ধ কখনো হয়নি। বিদ্যুৎও কম। যেটুকু তাও দূরে দূরে। বেতারকেও ব্যাঘাত করে না।

যেন খাঁটি বর্ষা ভোর।

একটুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে বলে ওপারের গাছপালা ঝাপসা হয়ে দেখা যাচ্ছে। নদীঘাট জনহীন। মাত্র দুটি মেয়ে মুখোমুখি হয়ে কোমরজলে শীতে জবুথবু-প্রায় দাঁড়িয়ে—অন্যদিন তারা তলওয়ারের মত খাড়া হয়ে ভীষণ বিক্রমে সর্বাঙ্গ মর্দন করতো—মাঝখানে একটা উপু কলসী ভাসছে। কাছে কাছেই দু' একটা শিশুক এসে জুটেছে। কাল সন্ধ্যায় একখানা জালিবোট ফিরে এসেছে। তার নবদ্বার বন্ধ। পাড়ে ছাতা মাথায় একটি লোক কোনো গতিকে পা টিপে টিপে নিচের দিকে নামছে। পোলটার মেরামতি হচ্ছে বলে ঢালু পাড়ির অনেকখানি নেমে ফের চড়ে সড়কে উঠতে হয়।

অতি সূক্ষ্ম বারিকণা ঐ ওপার হিন্দুস্থান থেকে ধেয়ে আসছে। ভুল বললুম, আস্তে আস্তে সব কিছু ঝাপসা করে দিয়ে এগিয়ে আসছে। যেন পাহাড়ে

কুয়াসার পর্দা এগিয়ে আসছে। এখন এসে পৌঁচেছে স্নানার্থিনীদের কাছে। বালুচর, ওপারের বনরাজি দেখা যাচ্ছে না—যদিও দূরত্বটা বোঝা যাচ্ছে। নদীর মাঝখানে অতি ঝাপসা দেখা যাচ্ছে কাল ঝড়ের সেই দুঃসাহসী হুঁদে-নৌকোটা। ভূতুড়ে, ফ্যানটম বোট যেন।

এ-ছবি জাপানীরা আঁকে চমৎকার।

আবার জোর দমকা হাওয়ায় মেশানো বৃষ্টি। সমস্ত দিন কাটলো ঝোড়ো বৃষ্টিতে—মাঝে মাঝে থেমেছিল বটে। এসেছে সর্বক্ষণ উত্তর দিক থেকে এবং এমনি ট্যারচাভাবে যে উত্তরের চওড়া বারান্দা ভেজা—শুকোবার ফুর্সৎ পায়নি। অথচ ঝড় সাইক্লোন তো আসবার কথা দক্ষিণ থেকে।

সেটাই বোধ হয় এল এখানে ২০'০০। খুলনা থেকে এখানে আসতে লেগেছে প্রায় ছ'ঘণ্টা। এখন একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। তবে যে বেগে হঠাৎ এসেছিল, সেই বেগেই চলছে—বাড়েনি এখনো (২১'০০)। ঝড়ের গোঙরানোটা কিন্তু অদ্ভুত শোনাচ্ছে। বৃষ্টি খুব নয়। বিদ্যুৎও চমকাচ্ছে না।

বর্ধমান—চারদিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার পর ও মাঝে মাঝে বৃষ্টির পর কাল রাত থেকে অবিরাম বৃষ্টি।

২৮।৫ | অদ্য সিউড়িতে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ। শুক্রবারেও হয়েছে।

কাল ২০'০০ থেকে এখন ৮'৩০ নাগাড়ে চলেছে বৃষ্টি—যদিও জোর নয়—আর ঝোড়ো বাতাস। বাতাস আসছে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে। কেন জানিনে বিজলির 'ফ্যুস' এত লাফাচ্ছে যে রেডিয়ো খুললেই এত শব্দ হয় যে কিছুই ভালো করে বোঝা যায় না। এই জলঝড়ে রাবেয়া পাবনা থেকে আসবে কি করে?

উজানে বর্ষা না নামলে নদীর জল বাড়ে না। কিন্তু এই লোকাল বৃষ্টিই পদ্মার জল বেশ বাড়িয়েছে। ভাটির দিকে হাওয়া বইছে বলে কোনো কিছুর সঙ্গে ধাক্কা না খাওয়াতে পদ্মার বুকে তেমন তরঙ্গ উঠছে না—কিন্তু যা উঠছে তাও এর পূর্বে কখনো দেখিনি।

বাম্বুর বিশ্বাস, এটাই মনস্থন। কি করে হয়?

বর্ষাঋতু চলল ১৫'৩০ অবধি। তার পর ঘুমুতে গেলুম। ১৭ নাগাদ উঠে দেখি সব কিছু শুকনো, হাওয়া বন্ধ; বর্ষার ভাব পুরো কেটে গেছে। তবে

আকাশ মেঘলা, যদিও তার ভিতর দিয়ে চাঁদ দেখা গেল। চতুর্থী কি পঞ্চমী? পাবনা অঞ্চলে বোধ হয় বাস্ ছাড়ার সময় অবধি বৃষ্টি ধরেনি। বউ তাই আসেনি।

নৌকোগুলো ফের খাড়ির মুখে জড়ো হয়েছে। নদীপারে সন্ধ্যায় ফের জনসমাগম। এখনও বৃষ্টিহীন অল্প গুমোট আবহাওয়া। গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না।

সন্ধ্যার পর আমার অল্প—যদিও অতি অল্প গরম বোধ হচ্ছিল।

নটায় অতি সুন্দর মলয় বইতে লাগল। এখনও (০১·০০)।

এই দিনেই শান্তিনিকেতনে ৪·৩০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়। Highest of the month according to V. B. Bulletin.

সকালবেলা শুকনো—যেমন তেমন।

দুপুরে ভ্যাপসা পীড়াদায়ক গরম। পাখা চালিয়েও শান্তি নেই। একদিনেই হেন পরিবর্তন! রাজশাহী গরম জায়গা—by nature.

বউ ফিরেছেন।

ঘুম থেকে উঠে বাইরে গুমোটে ফের কষ্ট। যদিও হাওয়া অল্প-স্বল্প ছিল। ঠাণ্ডা হতে হতে বেশ সময় লাগল। এখন ০১·০০ সুন্দর হাওয়া দিচ্ছে।

আজ সন্ধ্যায় বেতার বললে, রুশিয়া স্পষ্ট বলেছে, যে সব আড্ডা থেকে বিদেশী প্লেন গুপ্তচরী করতে রুশ আকাশে উড়বে সে সব আড্ডার উপর বোমা ফেলা হবে। আরো বললে, এসব প্লেন যেন না ভাবে, তারা এমন উপর দিয়ে উঠতে পারবে যেখানে তাদের রকেট পৌঁছতে পারে না।

শাবাশ্! এইবারে তাহলে পাকাপাকি পাঁয়তাড়া কষা আরম্ভ হল। কিন্তু এসব কথা শুনে তো বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। রুশে মার্কিনে লড়ুক না, কিন্তু আমাদের নিয়ে কেন টানাটানি?

আরেকটা প্রশ্ন, ওদের রকেট যদি সব কিছুই যত উপরেই হোক না কেন নষ্ট করতে পারে তবে হাওয়াই আড্ডা ধ্বংস করার হুমকি কেন? ওদের মেরে ফেললেই পার। আমার মনে হয় পারে না। আর ঐ যে মার্কিন বিমান ভেঙেছে ওর চালক কম্যুনিস্ট।

১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

কালকের মতই দিন গেল। চতুর্দিক থেকে ফোরকাস্ট-ও হয়েছে যে বৃষ্টি কমবে। আজও তাই কালকের মত শুকনো গেল। গরম, কিন্তু অসহ্য নয়। কালকেরই মত সন্ধ্যা থেকে ধূ ধূ হাওয়া।

সকালে চারবার দাস্ত হল। মাছের ডিম খেতে নেই। মনকে একাধিকবার বুঝিয়েছি।

আকাশ এত পরিষ্কার যে শরৎকালের মত তারা সব জ্বলজ্বল করছে। ছায়াপথ দেরিতে ওঠার পর তাকেও অতি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভাটার সমুদ্রের মত পদ্মা কখনো গর্জন করছে জোর, কখনো ক্রন্দন খানিকটে কমিয়ে দিচ্ছে।

এত হাওয়া—সে শুধু একেবারে পদ্মার বুকের উপর খাড়া এই বাড়ির কল্যাণে। সে-কথা একাধিক লোক আমাকে বলেছেন।

কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনে। সমুদ্রপারেই বলো আর এখানেই বলো, ধূ ধূ হাওয়ার মাঝখানে মন যেন শান্তি পায় না, কোনো কাজে পুরোপুরি concentrate করা যায় না। একদিকে গায়ে ক্রমাগত হাত বুলোচ্ছে, অন্যদিকে কানের কাছে শব্দ করছে—একসঙ্গে দুটো disturbance

এ ক'দিন গরম ছিল ভ্যাপসা। ঘামও হচ্ছিল। বোধ হয় আজ তাই সকাল থেকে আকাশ মেঘলা করে, এই মিনিট দশ আগে (৮·৩) অতি সূক্ষ্ম এক পশলা বৃষ্টি এক মিনিটের তরে হল। তারপর দূর দূরান্ত অবধি সেই পাতলা জলকণাযবনিকা ঢাকা মাঝনদীর চর, ওপারের সবুজ রেখায় বিলীয়মান জনপদভূমির তরু-বনানী, আকাশের দিগ্বলয়প্রান্ত শ্যাম কাজলে মসীমাখা।

আবার পূবের বাতাস—এতদিন ছিল দক্ষিণের। তারই জোরে মহাজনী নৌকো চলেছে বুক ফুলিয়ে। এদের গতি এতই মসৃণ আয়াসহীন যে এর কাছে রাজহাঁসও হার মানে।

এরই মাঝখানে দেখি, আকাশ-ভরা মেঘের এক জায়গায় অতি ছোট একটা চক্র—তার ভিতর দিয়ে ট্যারচা হয়ে সূর্যরশ্মি পড়েছে শুভ্র বালুচরের উপর—আর সে রশ্মি যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে নীল মেঘের, নীল আকাশের উপর। বালুচর যেন আতশী কাচ হয়ে সূর্যের সঙ্গে চোখ-ঠারাঠারি করছে।

এইবারে রাক্ষুসী পদ্মা ধরেছেন জেব্রার ঢং।

আকাশের অনেক জায়গায় মেঘ ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। ফালি ফালি ডোরা ডোরা হলদে পদ্মার জল, আর অন্য জায়গায় নীলের ডোরা। সেই 'পরশুরামে'র দক্ষিণরায়, মোশয়, ডোরাডোরা আঁজি আঁজি!

শান্তিনিকেতনে যে রকম নিত্য নিত্য আবহাওয়ার চার্ট রেখেও এত বৎসর পরেও কোনও পূর্বাভাস দিতে পারিনে, এখানেও তাই। কখন যে কোন্ দিক দিয়ে ডিপ্রেশন হয় এবং ফলে ঝড়বৃষ্টি হয় (যদি সত্যই তাই হয়) তার কোনো হদিস আগের থেকে পাওয়া যায় না।

গত বছর অনেক দেরি অবধি বর্ষা চালু থেকে বন্যা ঘটালে।

শান্তিনিকেতনের মাটি ভেজা রইল অনেকদিন। কিন্তু শীতের বৃষ্টি, যেটা প্রতি বৎসরের পাওনা, হল না। এমন কি পূব বাঙলায়ও না—বেশীর ভাগ জায়গায় সাত মাস ধরে বৃষ্টি হয়নি।

জোর ঝঞ্ঝা ঝড় হওয়ার কথা বৈশাখ মাসে। হল না। হল ৩০শে বৈশাখে। সেটা আবার চলল একটানা ২৯।৩০ অবধি। সচরাচর কি এরকম হয়?

তার পর এখনো ঠিক গরম পড়েনি। পশ্চিম বাঙলা অন্তত ২৬ তারিখ অবধি ঠাণ্ডা ছিল।

ইতিমধ্যে কলকাতা একদিন বললে, মনস্থন বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে আসছে। তারপর চুপ।

এখন প্রশ্ন সত্যকার আসল বর্ষা নামবে কবে?

এসব অস্বাভাবিক অবস্থার ফলে পেছিয়ে যাবে,না মাঝ-জুনে যথারীতি নামবে।

তেরো তারিখে বৃষ্টি নামার পূর্বে দিনকয়েক যে হাওয়া বন্ধ হয়ে গুমোট করেছিল তা নয়। কাজেই আজকের দিনের জোর হাওয়া দেখে বলা, যে বৃষ্টি হতে অনেক দেরি এটিও অভিজ্ঞতাবিরুদ্ধ।

সুন্দর বাতাসে ভোর আটটা অবধি সুনিদ্রা।

পদ্মার দিকে তাকাতেই দেখি, তিনি এক রাত্রেই ডুবে ডুবে অনেকখানি জল

খেয়েছেন। কুণ্ডের একটা পাশ ডুবে গিয়ে এখন স্রোতের ধারা প্রায় পাড়ের সঙ্গে সমান্তরাল। ছোট্ট চরটি সম্পূর্ণ অন্তর্ধান করেছে।

আকাশে ভালো করে মেঘ জমেছে। বর্ষা-সকালের আবহাওয়া।

খাড়ির সব-কটা নৌকাই যেন একে একে পাড়ি দিয়েছে উজানের দিকে পশ্চিম পানে। তাদের গতি এমনই মসৃণ পিচ্ছল অনায়াস যেন পাকা স্কেটিঙের সর্দারনীর বুক ফোলানো প্রফাইল দেখতে পাচ্ছি পারের থেকে।

এই দেখে মনে পড়ল, আমাদের দেশে যখন কোনো নৌকো পাল তুলে তর তর করে উজানে ধায়, আর দেখে অন্য কোনো নৌকো পাল নেই বলে বৈঠা মেরে মেরে অবিরাম ঘামছে তখন চেঁচিয়ে বলে, 'হালের বলদ বন্ধক দিয়ে পাল কেন।'

কত গরীব আমাদের দেশ! সামান্য একটুকরো কাপড় কেনার পয়সা নেই।

রাত্তি সাড়ে দশটায় লু আরম্ভ হল। উত্তর দিকে দূরে দূরে মেঘের আড়ালে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। শব্দহীন। আকাশেও মেঘ নেই। আজ ধুলো কম। না হলে এই বাতাসেই আমরা ফের ধূলিতন্ত্রের অধীন হতুম। বৃষ্টির আশা কম। কালকের তুলনায় আজ ভ্যাপসা ছিল কম।

ঘণ্টাখানেক এই লু উৎপাত করে চলে যাওয়ার পর এখন (০১·০০) হাওয়া একদম বন্ধ। কী উৎপাত। কাল এই সময় কি হিল্লোলে হিল্লোলে তরঙ্গে তরঙ্গে হাওয়া আসছিল।

আজ সকালে স্নানের ভিড়। দশেরা? এ-সময়ে দশেরা কি রে বাবা? আজ দুপুর এবং এখন (১৮·৪০) সত্যই গরম। ভ্যাপসা, ধুলো, দক্ষিণের হাওয়া নেই। পূবের হাওয়া এখানে ঢোকে না। পদ্মা চলছে বোঝা যায় তার শব্দ থেকে—হাওয়া থেকে নয়। 'জ্যুস' শেষপ্রান্তে।

আজ কত রকম আবহাওয়াই না যাচ্ছে।

সন্ধ্যায় ছিল গুমোট। তারপর সন্ধ্যাবেলাতেই পূবের বাতাস। তার পর পুব-দক্ষিণ থেকে ধু ধু হাওয়া। দরজার একটা পাটি বন্ধ করে দিতে হল; না হলে কাগজ উড়িয়ে নিয়ে যায়। মেঘ ছিল অল্প—তাও খুব বর্ষণপ্রদ নয়, লম্বা লম্বা ফালি ফালি। তারপর অসহ্য গুমোট। হাওয়া এমনই মোক্ষম বন্ধ হল—

এরকম ধারা জীবনে কখনো দেখিনি—যে বেশ কিছু মশা সর্বাঙ্গের চতুর্দিকে ভন ভন করে অস্থির করে তুললো। ওদিকে উত্তর-পশ্চিম আকাশে ঘনঘন বিদ্যুৎ আর মেঘের ডাক। ঠিক বৃষ্টি হব হব ভাব। তারপর হঠাৎ জোর বাতাস ধূলিতন্ত্র। নিরাশ হয়ে দোর জানলা পর্যন্ত বন্ধ করলুম না।

এই হাওয়া-গুমোটের তামাশা ক'বার হয়েছিল জানিনে।

শেষ রাতে অনুভব করলুম, বৃষ্টি হয়েছে। সকালে দেখি ছাত বেশ ভেজা।

সকালে দেখি ছাত ভেজা। অল্প অল্প বাতাস। তাতে ধূলিকণার অত্যাচার কম। এখন ৫ ৫৫-এ ঢাকা ফোরকাস্ট দিলে আজ চাটগাঁ, দক্ষিণ ঢাকা ও দক্ষিণ রাজশাহী বিভাগে ঝড়-বিদ্যুৎ-বৃষ্টি তাবং কিছুই হবে। এই মুহূর্তে এখানে নিদারুণ গুমোট, বাবলাগাছের বিন্দুপারা পাতাটিও নড়ছে। বৃষ্টি হলে বাঁচি। তবে ঈদের বাজারের সর্বনাশ হবে।

ঈদ

আজ আবার নীল চাঁদ দেখলুম। এই নিয়ে জীবনে তিনবার। আর দু'বার বছরের ঠিক এই সময়েই দেখেছিলুম। এবারে ব্লু, কিংবা fine emareld green.

আজ চাঁদের শুক্লা দ্বাদশী। সূর্যাস্ত এখানে—রাজশাহীতে—আজ ১৮·৫২-তে। দেখলুম ঠিক ১৯·০০। পাঁচ মিনিটের ভিতরেই চাঁদ সোনালী হয়ে গেল। বোধহয় অন্ধকার বাড়ল বলে, চাঁদের জ্যোতিও বাড়ল। তাই সবুজ-নীলত্ব লোপ পেল। ১৯·৫৫-এ নিত্যিকার চাঁদ।

অতি সূক্ষ্ম মসলিন মেঘ তখন আকাশ ও চাঁদের গায়ে। এমন কি তখনও সূর্যাস্তের লালিমা আকাশের হেথা হোথা লেগেছিল।

আজ সকালে উঠে বুঝলুম, কালকেরই মত বৃষ্টি হয়েছে।

বেতার বললে, ঢাকাতে বৃষ্টি সত্ত্বেও নমাজের জনসমাগমে মানুষ কম হয়নি।

দিনটা মোটামুটি গরমই। তবে এখন ২২·১৫ হাওয়া বইছে। সন্ধ্যা থেকেই পূব থেকে ছিল। বর্ষা কাছে আসার সঙ্গে পূবের বাতাসের প্রাধান্য বাড়ছে।

কালকের চাঁদের কথা ভুলে গিয়েছিলুম বলে এবং visitors ছিল বলে নীল চাঁদ দেখার চেষ্টা করিনি। দুঃখ হচ্ছে।

সাঁওতাল রমণীর বর্ণনা—শান্তিনিকেতন।

স্পষ্ট মনে হচ্ছে চুলে তেল দেয় না।

খোঁপা কি আমাদেরি মত বাঁধে?

পরণে কমলা রঙের শাড়ী—বেগনী পাড়।

ডান হাতে বাজু বন্ধ।

গলায় সাদা পুঁতির হার।

কানে পেতলের সাদাসিধে গোল একটি কানফুল—just a big full stop।

ডান হাতে সুতো বাঁধা—ওতে কি কবজ?

RAJSHAHI—CALCUTTA

ফিরোজ ভজু স্টেশনে এসেছিল। তাদের মুখ শুকনো। থাক্ সে আমি বলতে পারব না।

বউ ঈশ্বরদী অবধি এল। আমাদের বগিটা অনেকক্ষণ ধরে শানটিং করলে।

আমার মনে হচ্ছিল, আমরা যেন হানিমুনে। বউ ঘুমিয়ে পড়ল। বেচারী ঐ ঢাকা এই পাবনা একাধিকবার বাসে করে ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

রাত দেড়টার সময় আমার গাড়ি ছাড়ল। সেও শুকনো মুখে বিদায় নিল।

এ বড় পীড়াদায়ক। এসব কথা আর লিখব না। এ তো কাল্পনিক পীড়ার জাল বুনে বুনে উপন্যাস লেখা নয়।

সমুদ্র-প্রকৃতি

১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

বাড়ীর সামনে দিয়ে চলে গেছে পিচঢালা চওড়া কালো রাস্তা। তারি সঙ্গে গা মিলিয়ে একফালি ঘন সবুজ মাঠ, ছোঁড়ারা ক্রিকেট খেলে—তার সঙ্গে গা মিলিয়ে ফের আরেক ফালি সোনালী বালু পাড়—এক পাশে জেলেদের বস্তি, গাছ নেই পালা নেই কতকগুলো কুঁড়েঘর—বালু পাড়ির সঙ্গে গা মিলিয়ে আরেক ফালি লম্বা একটানা নীল সমুদ্র।

চোখে পড়ে চার ফালি কালো পথ, সবুজ মাঠ, সোনালী বালু আর নীল সমুদ্র। নীল হল কথার কথা। তা না হলে দিনে যে সুন্দরী কবার কাপড় বদলাল তার হিসেব রাখা দায়—বাকি তিনজন কুঁড়ের বাদশা, তাদের রঙের ফেরফার হয় না।

সমুদ্রের এক দিকটা গিয়ে লেগেছে আডিয়ার নদীর মোহনায়। দুইজনের ধাক্কাধাক্কিতে টক্কর খেয়ে একটা ঝিল তৈরী হয়েছে,—সে এঁকেবেঁকে আমাদের দিকে অনেকটা এগিয়ে এসেছে—জেলেদের গাঁ ছাড়িয়ে। ঝিলটা নিতান্তই খরা, তার উপর নৌকা চলে না, জেলে জাল ফেলে না, তার রঙেরও অদল বদল হয় না। তবু এঁকে বেঁকে গেছে বলে মাঠ, বালু সমুদ্রের ফালি কেটে সব জিনিস যেন দূরে নিয়ে গিয়েছে।

* * *

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

সকালবেলা দেখি বালুপাড়ের গায়ে যেন কে নীলাম্বরী শাড়ী শুকুতে দিয়েছে। আলোআঁধারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। এদিকে দক্ষিণের বারান্দায় পূবের রোদ এসে পড়েছে, নিমগাছের ফাঁকে ফাঁকে। অনেকক্ষণ ধরে বাইরের দিকে চেয়ে রইলুম। মন বোধ হয় শান্ত ছিল তাই কোনো পরিবর্তন লক্ষ করিনি। বেলা যখন বেশ হয়েছিল তখন দেখি পূবের রোদটুকু বারান্দাটি যেন মুছে দিয়ে চলে গেছে।

ওদিকে দেখি নীলাম্বরী শাড়ীর উপর রূপালি জরির অগুনতি চুমকি

কুচি ফুটে উঠেছে। সাদাসিধে নীলাম্বরী কখন যে হঠাৎ জড়োয়া হয়ে গেল টেরই পাইনি।

একসারি খুঁটি পোতা, কাত হয়ে, দেখছিলাম সকালবেলা নীলাম্বরীর পারে। জেলেরা জাল টেনে তুলছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি তারা আর নেই—বালুচর পেরিয়ে, সবুজ মাঠের উপর জেলেনীরা চলেছে মাথায় ঝাঁকা করে বাজারের দিকে।

মাঠের গোরুগুলো ঠিক সেই রকম ছবিতে আঁকা। শুধু compositionটা বদলে গেছে। একদিকে বেশীর ভাগ জড়ো হয়েছে—অন্যদিকে দুটো-চারটে ছিটকে-পড়া।

পেছনের বস্তিতে জেলেনী কলতলায় কাপড় কাচছে। এমনি আঁটসাঁট গঠন যে সমস্ত শরীর দু ভাঁজ করে পায়ের কাছে কাপড় আছড়ানোতেও শরীরের কোনো জায়গা দুলে উঠছে না। আমাদের মালীর বউ নাইতে বসেছে। কাকের কা-কার সঙ্গে কাপড় কাচার ধোপধাপ আর কলতলায় ঝাঁট দেবার শব্দ।

জোয়ার আসার সময় হয়েছে। বাতাসের ফাঁকে ফাঁকে তার প্রথম মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে।

সন্ধ্যেয় গিয়ে দেখি কপাল জুড়ে চওড়া লাল আবীর মেখেছেন, এক কান থেকে আরেক কান অবধি।

অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না—ঘুমিয়ে পড়েছ নাকি?

আজ সন্ধ্যেয় কি বাসর-সজ্জাটাই না পরেছিলে!

এতবড় কালো ঘোমটা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে?

* * *

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

আজ সন্ধ্যেয় গিয়ে বললুম মাটির মানুষ আমি। মাটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এসেছি যেখানে মাটির শেষ। তোমার নীল কোলে জায়গা দাও।

গরম বালুতে পা পুড়িয়ে রোজ আসি—তুমি আমার পা শীতল করে দাও। একদিনের তরে সমস্ত ভেতরটা ঠাণ্ডা করে দাও না কেন?

গভীর অন্ধকার—পরন্তু মহাশিবরাত্রি—শুধু বাক্ আর স্পর্শ। গুরু গুরু গর্জন ঘন ঘন মিশে যাচ্ছে পাগলা হাওয়ার এদিক ওদিক ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে।

কখনো কানে আসছে দুয়ে মেলার শব্দ। কখনো হাওয়া যেন গর্জন থেকে খসে পড়ে যায়। তারপর হঠাৎ গমগমানি যেন নিজেকে একা বোধ করে থেমে যায়। নোনা বাতাস কপালের উপর হাত বুলিয়ে দিয়ে যায়, কখনো বা জোর লাগিয়ে চাদরখানা সরিয়ে দেয়।

তবু যেন অন্ধকারেরই জয়। দূরের গর্জন, মাঝামাঝি অন্ধকার, কাছের স্পর্শ সব কিছু তলিয়ে পড়ে কি যেন অজানা অন্য কোনো অন্ধকারের তলায়।

এই গভীর বিলুপ্তি অতল বিস্মৃতি নিয়ে আসে না কেন?

সমুদ্রপারে কখনো শান্তি পাওয়া যায় না—

* * *

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

ওমর খৈয়াম বলেছিলেন, আমার দুঃস্বপ্ন দুশ্চিন্তা কালো ভারতবাসীর মত। সুরাৎ মাহমুদ তার তলোয়ার চালাতেই তাদের আর সন্ধান পাওয়া যায় না— Scatters and slays with his enchanted sword—আমার হয়েছে সত্যিকার তাই, কাক—দুপুরের শান্তির প্রধান অন্তরায়। সমুদ্রের গুরুগম্ভীর গর্জন, দমকা হাওয়ার দোল-লাগা নারকেলপাতার শিরশিরি সব চাপা পড়ে যায় ঐ কর্কশ লুব্ধ চীৎকারের তলায়। এ চীৎকারে যেন সমুদ্রপারের পচা মাছের গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নীল ফরাস পেতে রেখেছ এতক্ষণ ধরে—নাচ শুরু হোক না।

সমুদ্রের বুক চিরে যেন অন্ধকার বেরিয়ে এসে, আলাদীনের জিনের মত সমস্ত আকাশ বালুপার কালো বিষ ঢেলে একাকার করে দিল।

জলের ভেতরে কি আরেকটি জিন এখনো পোরা রয়েছে নাকি? তার লাথালাথির গমগমানিতে সমস্ত আকাশ পর্যন্ত কেঁপে উঠছে।

পশ্চিম আকাশের লাল কাগজের ফানুস বাতিতে যেন হঠাৎ আগুন ধরল। দেখতে না দেখতে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে আলোটাও নিবে গেল। পূবে-পশ্চিমে একটানা অন্ধকার।

* * *

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

বউমার ঘুম কিছুতেই ভাঙছে না। ডানদিকে বালুচরের লম্বা কোলবালিশ,

বাঁদিকে ঘন ঘোলাটে মেঘ পাকিয়ে পাকিয়ে বানিয়ে তোলা তুলতুলে আরেক কোলবালিশ। কে যে পাখার হাওয়া করছে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু মেঘের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ঘোলাটে শাড়ীর জমি হেথা-হোথা সর্বত্র বারে বারে কেঁপে উঠেছে। দুঃস্বপ্ন দেখছেন কিনা বলা যায় না, মাঝে মাঝে গুমরে উঠছেন, পাখার হাওয়ায় সেটা মিলিয়ে যাচ্ছে—পষ্টাপষ্টি কিছু বলার উপায় নেই।

পাখার হাওয়া ঝড়ের হাওয়া হতে চললো যে। হঠাৎ কখন এক পাশের শাড়ী দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে সাদা ফ্যানার পেটিকোট—না লেসের সেমিজের শেষর দিকটা?

কালোজাম, গোলমোহর, নিম-নারকোলে কী মাতামাতি। সমস্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। বাইরের দিকে তাকাবার উপায় নেই। শুধু ঐ ইলেকটেরির খুঁটিটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে। ওর কোনো নড়নচড়ন নেই। এত বড় সমুদ্র—তিনিও দুলে দুলে ওঠেন প্রাণের কাঁপনে—কিন্তু খুঁটিটার কাঁপন নেই, জীয়ন মরণও নেই।

পারের সবাইকে তাড়াবার জন্য আজ গুমরে গুমরে বড় বড় ঢেউ পারে এসে আছাড় খাচ্ছিল। কি মৎলব কে জানে। তাড়াতাড়ি অন্ধকার টেনে আনার জন্য আকাশে একরত্তি মেঘও ছিল না। কাল অমাবস্যা—আজ এত তাড়া কিসের?

অন্ধকার যেন পেছন থেকে তাড়া করে করে বাড়ীতে ভাগাল।

বারান্দায় বসে আছি জোর আলো জ্বালিয়ে কিন্তু বাইরের অন্ধকারের গায়ে যেন আঁচড়টি কাটতে পারছে না। ওদিকে সমুদ্র হুংকার দিয়ে বারে বারে শোনাচ্ছেন, আজ হোথায় যাওয়া বারণ। কাল মহাশিবরাত্রির আয়োজনে কোন কাপালিকদের ডমরু আজ সন্ধ্যে থেকেই বাজতে আরম্ভ করল।

নোনাগন্ধে খানিক খানিক আভাস পাচ্ছি।

* * *

২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

বড়লোক দেউলে হওয়ার অনেক দিন পরও জাঁকজমক সমানই চলতে থাকে—বরঞ্চ অনেক সময় বেড়ে যায়। পালাপরবে গমগমানি বরঞ্চ বেশী হয়—

ওদিকে আটপৌরে খরচে টানাটানি চলে।

আকাশের একটানা লাল নিভে গেল কিন্তু টুকরো টুকরো মেঘে তার জাঁকজমক জেগে রইল অনেকক্ষণ ধরে—আরো বেশী লাল হয়ে। দেউলে-হয়ে-যাওয়া জমিদারের ইয়ারবকসী যেন এরা। মনিবের শেষের তলানিটুকু খেয়ে মাতলামির লালে লাল। হুজুর লুকিয়ে থেকে গাদা গাদা আবির ছুঁড়ছেন।

আটপৌরে আকাশ ম্লান কিন্তু মেঘে মেঘে পালাপরবের বাড়াবাড়ি জাঁকজমক। আড়াল থেকে অস্তগত সূর্য পেলা দিচ্ছেন। দাক্ষিণ্য থেকেই দারিদ্র্য ধরা পড়ে।

পূবে-পশ্চিমে দেখনহাসি, ইলেকটেরিতে খবর পাঠানো না বয়স্কাউটের নিশানে নিশানে কথাবার্তা। পশ্চিম লালের ইশারায় পুব লাল হল। সেই লাল ফিকে হচ্ছে—কি গোপন কায়দায় তার খবর পূবে পৌঁচচ্ছে? মাঝের বিস্তীর্ণ আকাশ তো ফিকে, কোনো রঙ নেই, ফেরফার নেই—কি করে এর হাসি ওর গায়ে গিয়ে লাগে—এর বেদনা ওর বুকের সাড়ায় প্রকাশ পায়!

* * *

২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

আকাশ যেন উবু হয়ে শুয়ে সমুদ্রকে চুমো খাচ্ছে—এদিকে সমুদ্রের পা ওদিকে মুখ। রঙে রঙে সমস্ত জিনিসটা ঘটল। প্রথম চুম্বনে দিগ্বলয় লাল হল। তারপর নিবিড়তর চুম্বনের কাতরতায় বেগুনি হল, সেই বেগুনি ফিকে হতে লাগল, এদিকে ঢেউয়ের দোলায় সুন্দরীর পা যেন কেঁপে কেঁপে উঠেছে—সমস্ত দেহ শান্ত। চুম্বনের তরঙ্গ শান্ত শরীরের ভিতর দিয়ে ওপার হতে এপারে এসে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফুলে ফুলে উঠছে—কেন্দ্রীভূত আনন্দ এপারে এসে বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

তারপর বেগুনি সম্পূর্ণ কেটে গিয়ে ছাইরঙ হল। এ যেন সর্বশেষ নিবিড়তম চুম্বনে হৃৎপিণ্ডের শেষ রক্তবিন্দু ঠোঁট দিয়ে শুষে নিয়ে চলে গেল। এপার ওপার জুড়ে পড়ে রইল প্রাণহীন ফ্যাকাশে শবদেহ।

কালো চাদরে সর্বাঙ্গ ঢাকা পড়ল। তারপর আকাশে ছোট ছোট মোমবাতির পিদিম জ্বালিয়ে শবের পাহারা।

সেই কালো চাদরে সব কিছু ঢাকা। দক্ষিণমুখো হয়ে বারান্দায় শুয়ে আছি। বাঁদিক থেকে আসছে কান্নার শব্দ—শোক যেন উথলে উথলে উঠছে। ডানদিকে নারকোলের ডগায় বাতাসের ঝিরিঝিরি—যেন মাথার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে।

পায়ের তলায় ঝিল্লির রিনিরিনি। সামনে মোমের ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল জমে গিয়ে কালো চাদরের গায়ে লেগে আছে।

কিসের প্রতীক্ষা? কোন চন্দ্রোদয়ের? যেন তিনি সুধাভাণ্ড নিয়ে অতল গহ্বর থেকে উঠে এসে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়ে কোন মৃতদেহে প্রাণ দেবেন।

* * *

২৩শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

সূর্য অস্ত যাব-যাব করছেন এমন সময় পারে পৌঁছলুম। আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ ছিল, অন্য দিনেরই মত। ভাবলুম কালকের মত আজও ফাগের খেলা জমে উঠবে। প্রথম লক্ষণ দেখাও দিল। আকাশ ফিরোজা সবুজ শাড়ী পরল—আস্তে আস্তে গয়না চাপাবো চাপাবো করছে, এমন সময় দেখি শাড়ীখানাই ফিকে হয়ে হয়ে, কেমনধারা সেই ছাইনীল হয়ে গেল। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখি তারো সেই ফিকে শ্যাওলা সবুজ রঙ। চারদিকই কেমনধারা আধমরা ছাইরঙ ধরতে লাগল।

কালকের দিনের সব সাজসরঞ্জামই ছিল কিন্তু কেন জানিনে খেলা শুরু হতে হতে বন্ধ হয়ে গেল।

তখন দেখি আকাশে দ্বিতীয়বার অতি ক্ষীণ চাঁদের অত্যন্ত ম্লান ঝিলিক।

যেন হিমালয় তার সব রঙ, সব সৌন্দর্য মুছে দিলেন, আড়ম্বর-আভরণহীনতার মাঝখানে দুখিনী কন্যাকে ঘরে তুলবেন বলে। চাঁদের মুখে তাই কি ধীরে ধীরে হাসি ফুটতে লাগল?

অন্ধকার যখন ঘনতর হল তখন চাঁদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আর সবাই, মেঘ জল বালুচর আপন আপন আলো নিভিয়ে দিয়ে চাঁদের দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে।

বরণশেষে বাড়ী ফিরলুম।

ফাল্গুন মাস—কিন্তু কোনো দিকে নবজাগরণের কোনো চিহ্ন নেই। এদেশে শীতের ঘুম নেই, বসন্তের জেগে-ওঠাও নেই।

* * *

২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

মাঝআকাশ থেকে একটুখানি ঢলে-পড়া তৃতীয়ার ক্ষীণ শশী; সূর্য হেলে পড়েছেন কিন্তু তখনো জ্যোতির্ময়। তাই ভস্মভাল শিবের ললাটে হীনজ্যোতি

শশাঙ্ক-কলা। উমা কি এখনো ঘরের কাজ শেষ করে উঠতে পারেননি - বেলা যে গড়িয়ে এল। জেলেদের পাড়ায় কাজকর্মে ভাঁটা পড়েছে—জেলেনীরা রঙীন-শাড়ী পরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে—সমুদ্রপারের লোক বোধ হয় স্বল্পভাষী হয়, ঢেউয়ের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথাবার্তার মেহন্নতে গল্পগুজব জমে না, ঝগড়াঝাঁটিতে গলা চিরে যায়—জেলেরা বোধ করি বাজার গেছে—নারকোলপাতার ছাউনির কুঁড়েঘর ঐ নারকোলগাছের গা ঘেঁষে যেন রোদ থেকে শরীর বাঁচাচ্ছে।

উমার কাজ শেষ হয়েছে। ভস্ম মুছে ফেলে, ঘোর আসমানি রঙ দিয়ে শঙ্করের কপাল ঢেকে দিয়েছেন—তার উপরে দিয়েছেন তিনটান টকটকে ফাগ—আর মাঝখানে এঁকে দিয়েছেন উজ্জ্বল, নবকান্তি, অকলঙ্ক শশাঙ্ক।

হাসি ফুটেছে। সমুদ্রের জল আসমানি রঙ নিয়েছে—ধূসর বালুচর সোনালি হল। সমুদ্রের লোনা হাওয়ার জোর কমল—উত্তর থেকে হিমালয়ের বাতাস এল নাকি উমার চঞ্চল অঞ্চল আন্দোলনে ?

সমুদ্রের একটানা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে—তার মাঝে ডুকরে ডুকরে ওঠা গুমরানো।

নিমগাছ ডাল নাড়ছে, কালোজামের পাতা কাঁপছে, বারান্দার টবে বেতগাছের সরু পাতা ক্ষণে ক্ষণে শিউরে উঠছে। দিনের বেলা তারা রং বদলায়, পাখী এসে বসে তাদের উপর, সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন সূর্যাস্তের কত রকম আলো তাদের উপরে এসে পড়ে—তারা সাড়া দেয়—তাদের জীবনপ্রবাহেও ঢেউ ওঠে, তারাও দোল খায়।

রাতের অন্ধকারে তারা শুধু সমুদ্রের কান্না শোনে—একমনে। বাতাস সে কান্না বয়ে নিয়ে আসে, আর সেই বাতাসের ডাকে সাড়া দিয়ে সমুদ্রের কান্নার সঙ্গে যেন নিজেকে মিশিয়ে দেয়।

সমুদ্রের কান্না থামে না বলে, ওদেরও যেন চোখে ঘুম নেই।

এখানকার সংসারের সব রকমের সব কটা তার যেন সমুদ্রের কান্নার সুরে বাঁধা।

* * *

২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৭

এ খেলা তিনদিন ধরে চলছে। আকাশ, সমুদ্র, বালুচর বিবর্ণ নিরস দেখায় যতক্ষণ সূর্য একেবারে না মিলিয়ে যান—মনে হয় আর সবাই ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে

আছে। সূর্য যেই অদৃশ্য হলেন অমনি কী গোপন লিপ্সায় আকাশের গাল লাল হয়ে আসে—ভাসুরঠাকুর উঠে যাওয়া মাত্রই কনেবউ যে রকম বরের দিকে তাকায়—প্রথমটায় আমেজ লাগার মত। তারি রেশ সমুদ্রের ফেনায় লেগে গোলাপী হয়ে ওঠে—তারি পরশ ভেজা বালুতে গোলাপ জামের ফিকে গোলাপী হয়ে দেখা দেয়। তারপর বরবধূতে কি কথাবার্তা হয় জানিনে—কনে লজ্জায় টকটক করতে থাকেন—ফাগ সিঁদুর সব রঙ তখন হার মানে। আর সে লালের সঙ্গে সঙ্গে পেছনের আকাশ হয় ঘন আসমানি, দূর সমুদ্রের জল হয় গাঢ় পান্না। সমস্ত দিনের মূর্ছা কেটে গিয়ে বিরাট আকাশ যেন গমগম করে ওঠে, পশ্চিম থেকে পূব জুড়ে লম্বা লম্বা রঙিন কড়িকাঠ যেন পূর্বাচল অস্তাচলকে জুড়ে দেয়, দূরে, পূর্বদক্ষিণ সমুদ্রের কোণে।

তারপর লজ্জা-সরম ইশারা ঠারাঠারিতে কি খুশি হয় জানিনে। দেখতে পাই পিদিম যেন কেউ নিভিয়ে দিল—না বৌ কালো কপাটের দরজা বন্ধ করে দিল—না কালো ঘোমটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

দুপুর রাতে ঘুম ভাঙল। এ কী কাণ্ড। চাঁদের আলো জ্বালিয়ে আকাশে তারার ঘুঁটি সাজিয়ে বরবধূতে এ কি খেলা!

* * *

৫ই মার্চ, ১৯৪৭

এখানে সমুদ্র নেই। উঁচুনিচু সবুজ ক্ষেত—মাঝে মাঝে তালগাছ আলের কাছে কাছে দাঁড়িয়ে। তারপর নিকটের পাহাড়—বড় বড় পাথর স্পষ্ট দেখা যায়। তার পেছনে দূরে নীলাভ পাহাড়—লাইন বেঁধে পূর্ব থেকে পশ্চিম সমস্ত দক্ষিণ দিকটা জুড়ে।

বর্ষাকালে এই শুষ্ক দেশও সম্পূর্ণ সবুজ হয়ে গিয়েছিল। বসন্তের মাঝামাঝি এরি মধ্যে ফালি-ফালি হলদে ক্ষেত বেরিয়ে সেই সবুজের গা যেন জখম করে দিয়েছে। সূর্যোদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত আকাশ কি যেন এক ব্যাকুল ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে—পালাবার পর্যন্ত সাহস নেই। পূবের বাতাস আসছে ধীরে ধীরে এবং অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে। মৃদু তপ্ত এবং অল্প ভেজা-ভেজা। দুদিন বাদেই পশ্চিম থেকে হু-হু করে জোর গরম বাতাস বইতে আরম্ভ করবে—পূবের বাতাস এখনো ঠিক মনস্থির করতে পারছে না এদেশে আর আসবে কিনা।

পশ্চিমের হাওয়া পৌঁছায় নি বটে কিন্তু গাছপালা তার খবর পেয়েছে কোন্ আশ্চর্য উপায়ে—সব ফুল গা থেকে আছড়ে ঝেড়ে ফেলেছে। রক্তকরবী ঝরেনি কিন্তু কে যেন আগুন দিয়ে ঝলসে দিয়ে গেছে। শুধু বুগনভিলিয়া আর রাঙাজবা —না স্থলপদ্ম ?

এতদিন ঘুঘু ডাকেনি। তপ্ত মধ্যাহ্নে এখন অত্যন্ত ক্লান্ত তার ডাক। সমস্ত শীতকাল ময়ূর নিস্তব্ধ ছিল—মেঘ আসার কোনো লক্ষণ নেই তবু থেকে থেকে ডেকে ওঠে—ঠিক যেন একা কৈ ? একা কৈ প্রশ্ন শুধায়।

প্রজাপতি পালিয়েছে দল বেঁধে—না তাদেরো ডানা ঝলসে গিয়েছে ?

দুপুরবেলা শুনি সাপে যেন কার গলা চেপে ধরেছে—চাপা গলার ক্ষীণ আর্তরব —একি খাণ্ডবদহনের অগ্নিদেব পশুভোজনের বিরাট পর্ব আরম্ভ করেছেন ?

না দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ? সবুজ অঞ্চল গেছে—এখন যেন অঙ্গবস্ত্র প্যাঁচের পর প্যাঁচ খুলছে গ্রীষ্ম দুঃশাসন—বীভৎস আনন্দ যেন ধীরে ধীরে রসিয়ে রসিয়ে চেখে নিচ্ছে।

ধরণীর কণ্ঠশ্বাস রুদ্ধপ্রায় পত্রে-পুষ্পে ; কূপগহ্বর অন্ধের উপড়ে নেওয়া চোখের মত—ক্ষতজল পর্যন্ত শুকিয়ে গিয়েছে।

* * *

৬ই মার্চ, ১৯৪৭

বহুকাল পূর্বে পড়েছিলুম কারো ফাঁসীর হুকুম হলে রুশিয়ার কোন জেলে জেলরের সুন্দরী মেয়ে কয়েদীর সঙ্গে প্রেম করতে যেত। তার সঙ্গে ফুর্তিফার্তি করে সেপাইদের হুকুম দিতে শেকলে তাকে আচ্ছা করে বাঁধবার। তার পর সেই মেয়ে সিগরেট ফুঁকে ফুঁকে আসত তার কাছে। হাত দিয়ে জ্বলন্ত সিগরেট তার চোখের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে ধরত। কয়েদী মাথা পেছনের দিকে সরিয়ে সরিয়ে দেয়াল পর্যন্ত নিয়ে যেত। তারপর মেয়েটা সিগারেট চোখের উপর চেপে ধরে তাকে অন্ধ করত।

দ্বিপ্রহরের সূর্য ক্রমেই কুয়োর জলের দিকে এগিয়ে আসছে—জল ক্রমেই নীচের দিকে নেবে যাচ্ছে। তারপর শেষের দিন আসবে যেদিন তার স্বচ্ছ টলটলে চোখ কানা হয়ে গিয়ে থলথলে ঘোলাটে কাদা বেরুবে। তারপর তাও শুকিয়ে গিয়ে কাঠ হয়ে যাবে।

থাকবে অন্ধকার কোটর।

* * *

৮ই মার্চ, ১৯৪৭

সকালবেলা এবারে এখানে পৌঁছে দেখি চতুর্দিক নিস্তব্ধ। পূব-পশ্চিম কোনো দিক থেকে হাওয়া বইছে না। সমুদ্র জমে-যাওয়া নীল বরফের মত—স্কেটিং রিঙ্ক। তারি মাঝখানে দক্ষিণ বাতাস এল জোর। নারকোল, গোলমোহর, নিম, বকুল দুলে উঠল—সমুদ্রের সর্বাঙ্গ যেন হাল চালিয়ে চষে দিল।

এ দক্ষিণ বাতাস ঠাণ্ডা নয়, গরমও নয়। এ এসেছে সবাইকে চঞ্চল করে দেবার জন্য। কলতলায় সুন্দরী কাপড় সামলে স্নান করতে পারছে না, নারকোল ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে আপত্তি জানাচ্ছে, কলতলার শ্রীকৃষ্ণ কিছুতেই বিড়ি ধরাতে পারছেন না—এক চোখ সুন্দরীর দিকে, পাশের বাড়ী বারান্দা থেকে ভিজে শাড়ী হেলতে হেলতে ধুলোয় জবুথবু হয়ে পড়ে গেল।

* * *

৯ই মার্চ, ১৯৪৭

সমুদ্রের গর্জনে নানা সুর। কোনোদিন অশান্ত উদ্বেলিত হাহাকার, কোনো দিন গুমরে-ওঠা চীৎকার, কোনো দিন একটানা করুণ আর্তনাদ। যেদিন জোর পুরবীয়া হাওয়া বয় সেদিন সব গর্জন ক্রন্দন ছিন্নভিন্ন হয়ে পারের দিকে আসে—আজ হঠাৎ দক্ষিণ বাতাস বন্ধ হল সন্ধ্যাবেলায়, কিন্তু পূবের বাতাস এল না। আজ তাই সমুদ্রের একটানা কান্না লহমার তরে বিরাম নিচ্ছে না। ওদিকে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ চুপচুপ দাঁড়িয়ে, আজ পর্যন্ত তাকে কখনো কোনো শিহরণে বিক্ষুব্ধ হতে দেখিনি।

কে শুনছে? পারে লোকজন নেই। গয়লাপাড়ার শেষ বাতি নিবে গেছে। ডাইনে বাঁয়ে কোনো কোনো বাড়ীতে আলো নেই। চুনকাম করা দেয়ালের গায়ে খোলা জানালা চৌকো চোখের মত বাইরের দিকে তাকিয়ে—কেমন যেন অন্ধের তাকানোর মত। মাঠে, রাস্তায়, বালুপাড়ে চাঁদের আলোর অতি ক্ষীণ স্তিমিত আস্তরণ। শুধু সমুদ্রের জলে যেখানে চাঁদের আলো পড়েছে সেখানে গালানো রূপা বালুচর থেকে সোজা পূব আকাশে গিয়ে মিলেছে।

জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নেই। হঠাৎ কেমন যেন মনে হয় গাছগুলো সমুদ্রের মতই প্রাচীন। তারা বহুকাল ধরে এই নানা সুরের কান্না শুনেছে। তারা যেন তার কারণও জানে। একে অন্যের দিকে মাথা দুলিয়ে কি যেন বলে, আর সবাই শিরশিরিয়ে উত্তর দেয়, "ছিছি, ছিছি।"

* * *

১১ই মার্চ, ১৯৪৭

টলটল নীল রঙ সমুদ্রের আর দূরের আকাশ ঘন বেগুনি। পশ্চিমের আকাশ লাল টুকটুকে—মাথার উপরে প্রকাণ্ড এক থাবড়া মেঘ শুভ্রমল্লিকার স্তূপের মত জমে বরফ হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণমুখো হয়ে আডায়ারের দিকে চললুম। যেতে যেতে যেখানে আডায়ার নদীর মোহনা সেখানে পৌছলুম। তিনদিকের ঢেউ সেখানে এলোপাতাড়ি মারামারি করে দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ছে। নদীর বালু জমে জমে সমুদ্র ঐ জায়গাটায় অগভীর। গোটা পাঁচেক জেলে গোড়ালি জলে সুতো দিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টায় ডাইনে বাঁয়ে চলাফেরা করছে। সাদা পাল তুলে সায়েব মেম আডিয়ার উজিয়ে চেট্টিনারের বাড়ীর দিকে হু-হু করে ভেসে যাচ্ছে।

মোহনার জল নীল হতে আরো নীল হতে লাগল। দূরের আকাশ বেগুনি ছেড়ে গাঢ় নীল হতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে দুই নীলে মিলে গিয়ে মোহনার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল—দূরের আকাশ আধা আলো-অন্ধকারে আর প্রায় দেখা যায় না। সে-নীল এমনি জোয়ারের মত সব কিছু ছাপিয়ে কাছে আসতে লাগল, যেন মনে হল বাতাস পর্যন্ত নীল হয়ে গিয়েছে। জেলেদের ময়লা কাপড় সে-নীলে ছুপিয়ে রঙ ধরল—আমার মনে হল যেন নীল রঙ ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছি।

নীলের বানে সব কিছু ডুবে গেল। আমি চোখ বন্ধ করলুম। সেখানেও নীল—চোখের সাদা-কালো কী দুই-ই নীল হয়ে গেল?

* * *

১২ই মার্চ, ১৯৪৭

বালুপাড়ে কত অজানা পদচিহ্ন; তার উপর সাগরের ঢেউয়ের কী রাগ। দূর থেকে ছুটে এসে আছড়ে পড়ে, আকুলিবিকুলি হাত বাড়িয়ে মুছে দেবার কী অবিরাম চেষ্টা। উঁচু পাড়িতে বসে দেখি জোয়ারের জলে মুছেই যাচ্ছে, মুছেই যাচ্ছে। এদিকে লোকজনের চলাচল কমে গেল—নূতন পদচিহ্ন আর পড়ে না বললেই চলে। তারপর যতদূর দেখা যায় সাগরের জল ধুয়ে-মুছে সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়েছে।

এবারে ভাটার জল আর এগুচ্ছে না। ঢেউ ভেঙে পড়ে লম্বা লম্বা হাত আর এগিয়ে দিচ্ছে না—এখন যেন লক্ষ লক্ষ রূপার নূপুর নেচে নেচে নাচের গরমে গলে গিয়ে জলে মিশে যাচ্ছে।

সকালবেলা গিয়ে দেখি সেই পরিষ্কার ধোয়া-মোছা বালিতে সাগর ঝিনুকের গয়না সাজিয়ে দিয়ে গিয়েছে—প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গে তারা ঝিলমিলিয়ে উঠল।

বাড়ীতে কুড়িয়ে আনলুম। দেখি ম্লান হয়ে গিয়েছে। যেন সুন্দরীর কানের দুল ভেলভেট বাক্সের কফিনে সাজানো ফ্যাকাশে মড়া।

* * *

১লা আগস্ট, ১৯৪৭

এবারে প্রথম সন্ধ্যায় সমুদ্রপারে গিয়ে দেখি সবাই যেন বেজার মুখে ঘাড় বাঁকিয়ে বসে আছেন। আপন আপন কাজ করে যাচ্ছেন সবাই কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে—বাড়ীর বউরা যেমন মুখ গুমসো করে শাশুড়ীর দিকে না তাকিয়ে আপন আপন কর্তব্য করে যান। আমি এদিক ওদিক ঘুরঘুর করে অনেকক্ষণ চলাফেরা করলুম কিন্তু কেউ একটিবারের তরেও সাড়া দিল না।

সবাই আপন আপন কাজ করলেন আবার—মিনিমাল রেট। আকাশ যে সেই শেলেটের রঙ নিয়ে মুখভার করে বসেছিল তার রদবদল হল না—জল যে সেই ফিকে শ্যাওলার রঙ নিয়েছিল তার উপরে সূর্যাস্তের কোনো রঙ এক লহমার তরে গায়ে মাখল না—আকাশ কতকগুলো সাদা মেঘের বুদ্বুদ ওড়াচ্ছিল, সেগুলোকে নড়ালো না, ফাটালো না—জলের ঢেউ একটানা দড়ি পাকিয়ে পারে এসে সেগুলোকে কুটিকুটি করে ছিঁড়ল, পারের দিকে এগুলো না, সমুদ্রের দিকে পেছুলো না।

আমি অবহেলায় লজ্জা পেয়ে বাড়ীমুখো হলুম।

এমন কি সেই চারজন জুয়াড়ি ঠিক সেই রকম উবু হয়ে আধা আলো-অন্ধকারে জুয়া খেলছে। এই চারটি মাস যেন হুশ করে তাদের মাথার উপর দিয়ে চলে গিয়েছে।

* * *

১৪ই আগস্ট, ১৯৪৭

ফোটোগ্রাফ তোলাবার সময় মানুষ যে রকম কাঠের পুতুল হয়ে বসে, আজ সকাল থেকে জল স্থল আকাশের সেই অবস্থা। যে মেঘের টুকরো ভোর হওয়ার সঙ্গে আডায়ারের আকাশে বাসা বেঁধেছিল সে এখনো ঠিক সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—টেলিগ্রাফের খুঁটিতে শূলবিদ্ধ হয়ে। কৃষ্ণচূড়ার চিকন পাতার স্পন্দন সমস্ত নিস্তব্ধতাকে যেন আরো নিস্তব্ধ রূপ দিচ্ছে, সিগরেটের ডগা থেকে ছাইটুকু মাটিতে পড়ল ডাইনে বাঁয়ে এতটুকু না পড়ে।

কী অসহ্য থমথমে গরম। যেন ইলেকট্রিক উহুনে রান্না হচ্ছে—আগুনের হল্কা চোখে পড়ে না। কালোজাম পচতে আরম্ভ করেছে, নিমপাতা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে, কলতলার কলরব চীৎকার-বিদীর্ণ। দূর জেলেপাড়া থেকে মেয়েটি কলসী কাঁখে করে, আসছে যেন রোদ্দুরের বন্যা উজান ঠেলে ঠেলে। এদিকে অজন্তা-স্তনওয়ালী মালীবউ সবুজ মেরুনের শাড়ী কাচছে, আর থেকে থেকে কপালের ঘাম মুচছে।

এতদিন হাওয়ার গর্জন আর সমুদ্রের হুঙ্কারে বাড়ীঘরদোর ডুবে থাকত বলে বাইরের পৃথিবীর বিচিত্র কোলাহল কানে এসে পৌঁছত না। আজ বাতাস নেই, সমুদ্র ক্লান্ত—তাই অনেক রকম শব্দ কানে এসে পৌঁচচ্ছে, এমন কি পাশের বাড়ীর কড়া পর্দানশীন মুসলমান মেয়েদের জীবনযাত্রার অর্ধগুঞ্জরণ এখানে এসে পৌঁচচ্ছে। রোজার শেষের দিক, কড়া গরম, হাওয়া বন্ধ—তাই সে গুঞ্জরণে ক্লান্তি জড়ানো।

পশ্চিমের বর্ষা এদেশে দুর্বল—পূবের বর্ষার এখনো ঢের দেরি। ইংরাজ রাজত্বের অবসান হয়েছে, দেশী লোক এখনো আসনে বসেননি—তারি ফাঁকে লাহোর কলকাতার অরাজকতার মত গরমের একচোট নির্মম প্রহার!

* * *

১৬ই আগস্ট, ১৯৪৭

যখন বন্ধু কলকাতায় তখন তিনি কাজকর্মে বড্ড ব্যস্ত থাকেন বলে চিঠিপত্র লিখতে পারেন না, যখন বোম্বায়ে তখন dull feel করেন বলে—তা সে বর্ষার জন্যই হোক অথবা কোনো কাজকর্ম নেই বলেই হোক—চিঠি লিখতে পারেন না; তার উপরে, তাঁরই ভাষায় মাঝে মাঝে চিঠি না লেখার spell আসে বলে চিঠি লিখতে পারেন না। এ তিন ফাঁড়া কাটিয়ে চিঠি লেখার শুভলগ্নে পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের বন্ধুত্ব এত পাকাপোক্ত হয়ে যাবে যে তখন চিঠি লেখার আর প্রয়োজন থাকবে না। 'অনুপস্থিতি' নাকি 'দুই বিরহী হৃদয়কে এক করে দেয়'—চিঠিপত্র না লেখার নীরবতা দুই হৃদয়কে আরো এক করে দেয়। তার উপর আরো একটা প্রবাদ রয়েছে—'নীরবতা হিরণ্ময়'।

আমার হাসি পেল, অগোচরে যে অবহেলা রয়েছে সে-ই এসব ফাড়া জুটিয়ে দিয়ে অপরাধী বিবেকদংশনে প্রলেপ লাগায় এবং অজানাতে সেই প্রলেপ 'যুক্তি'র রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। মানুষ ভাবে সে দুর্গন্ধপ্রলেপ বন্ধুর কানে সুধাবর্ষণ করবে।

* * *

১৭ই আগস্ট, ১৯৪৭

কয়েকদিন ধরে বেশীর ভাগ সময় হাওয়া বন্ধ থাকে বলে গরমে মনপ্রাণ কচ্ছপের মত হাত পা গুটিয়ে বসে থাকে। কাল বেতারে বলল আজ এ অঞ্চলে বৃষ্টি হবে। সকালে দেখি হাওয়ার দিক পরিবর্তন হয়েছে। বর্ষার গোড়ার দিকে যে রকম পশ্চিম দিক থেকে হাওয়া বইত ঠিক সেই রকম গরম বাতাস বইতে শুরু করেছে কিন্তু উপরের আকাশে অম্বুহীন পাণ্ডুমেঘ পূবসাগর থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে পশ্চিমের দিকে চলেছে। দুপুরবেলা হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল—বিকেলের দিকে ফের পূবের বাতাস বইতে আরম্ভ করল। ভাবছি এই দুটানার ভেতর আকাশ মনস্থির করে বর্ষণ করবেন কি করে। এযাবৎ যা অবস্থা তাতে তো মনে হয় না বৃষ্টি হবে। অথচ বর্ষায় সমুদ্রের প্রলয় নাচ দেখার জন্যই তো এখানে এলুম। গরমে প্রাণ যায়, নতুন বই আরম্ভ করতে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করিনে।

জানি অভ্যাস নেই বলে লিখতে কষ্ট বোধ হয়। মানুষ সে কষ্ট নানা কারণে সয়ে নিয়ে বই লেখে। কেউ টাকার জন্য, কেউ প্রিয়জনদের কাছে নিজের দাম বাড়াবার জন্য, কেউ আত্মম্ভরিতার তাড়নায়। আমার বেলা শুধু প্রথম কারণটা খাটে, অথচ টাকার জন্য লিখতে মন যায় না। মনে হয় তার চেয়ে অল্প মেহনতে খবরের কাগজে লিখে টাকা পাওয়া যাবে।

* * *

১৯শে আগস্ট, ১৯৪৭

মাদ্রাজ উপকূল দুই বর্ষার সঙ্গমভূমি। পশ্চিমের বর্ষা এখানে আসে ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু এখানে এসে তার আর সে ঝামর মুখ কৃষ্ণগম্ভীর হয়ে বর্ষণ-আশা সঞ্জীবিত করে না। ব্যাঙালোরেই দেখছি পশ্চিমের মেঘ পূব দিকে যাচ্ছে কি রকম পানসে চেহারা নিয়ে। এখানে দেখি সে মেঘ প্রায় সাদা হয়ে গিয়ে শরতের হংসশুভ্র ঝালর হয়ে নীল চন্দ্রাতপে দুলছে। এখান থেকে আর পূব দিকে যেতে চায় না, এক সমুদ্র পার থেকে রওয়ানা দিয়ে অন্য সমুদ্রপারে পৌঁছে আর যেন এগুবার উৎসাহ তার নেই।

তাই কোনো কোনো দিন দেখি অদ্ভুত দৃশ্য। নীচে পশ্চিম সাগরের মেঘ চুপচাপ দাঁড়িয়ে, আর উপরে পূব সাগরের মেঘ মন্থর গতিতে পশ্চিম দিকে

রওয়ানা হয়েছে। আর কখনো বা দেখি পশ্চিমের মেঘ সমুদ্রের দিকে এগিয়ে চলেছে আর ঊর্ধ্বে অতি ঊর্ধ্বে পূবের মেঘ শান্ত শুভ্র স্থির হয়ে সমস্ত আকাশ জুড়ে বসে আছে—দুই স্তরের মাঝখানে বিপুল ব্যবধান।

কখনো আসে পশ্চিম থেকে গরম বাতাস—দাক্ষিণাত্যের তৃষ্ণার্ত উষ্ণ জনপদের বহ্নিদাহণের শুষ্ক ও চর্মদাহক। কখনো আসে বাতাস—ভিজে ভিজে। বঙ্গসাগরের ঠাণ্ডা জলের পরশ পেয়ে পেয়ে সুশীতল।

কাল রাত্রে দুই বাতাসে আর দুই সমুদ্রের মেঘে কি বোঝাপড়া হল জানিনে। মাঝরাতে বৃষ্টি আরম্ভ হল। বাতাস আর বৃষ্টি এল পশ্চিম দিক থেকে।

সকালবেলা দেখি সমস্ত আকাশ কালো কম্বল দিয়ে পালঙ্ক ঢাকা দিয়েছে—দুই মেঘের মাঝখানের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে তারা যে গভীর নিবিড় আলিঙ্গনে গড়িয়ে পড়েছে, বাকি পৃথিবীকে তারা দেখতে দিতে চায় না।

* * *

২৬শে আগস্ট, ১৯৪৭

অশান্ত ক্রন্দন।

সমুদ্রপারে অশান্ত মন নিয়ে যেতে নেই। মন জানে যে সমুদ্র প্রাণহীন তার গর্জনে অথবা ক্রন্দনে কোনো অর্থ নেই এমন কি গর্জন বা ক্রন্দন শব্দ দিয়ে এই অনুভূতিহীন ধ্বনিকে চৈতন্যের স্তরে নিয়ে আসা ভুল। সুস্থ লোক এতত্ত্ব জানে, এবং তার অবচেতন মনেও এ সম্বন্ধে কোনো দ্বিধা নেই বলে সমুদ্রের ধ্বনি সম্বন্ধে সে খানিকক্ষণ পরেই অচেতন হয়ে যায়।

কিন্তু যার অবচেতন মন বিক্ষুব্ধ সে বেশীক্ষণ বুদ্ধিমানের মতন স্বীকার করে বসে থাকতে পারে না যে সমুদ্রধ্বনি নৈসর্গিক প্রাণহীন শব্দ তরঙ্গ মাত্র।

সে শুধায় :

এর হৃদয়ের অন্তস্তলে কি আলোড়ন ? সে আলোড়নের কেন্দ্র কোথায় ? সে কি দূরে উদয়-দিগন্তেরও পেছনে ? সেই আলোড়ন কি দৃষ্টির অগোচরে অন্তরালে উদ্বেলিত হয়ে হয়ে এই সিন্ধুপারে এসে আর নিজেকে সামলাতে না পেরে শুভ্র অশ্রুজলের কোটি কোটি শ্বেত বুদ্বুদে ভেঙ্গে পড়ছে ?

না এ অনাদৃতা সুন্দরী ? ক্ষণে ক্ষণে নীল অঞ্জনের উপর শুভ্র ফেনের আলিম্পন এঁকে রবিকরকে তার চটুল নৃত্যে প্রলুব্ধ করছে। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যভঙ্গের ভয়ে দ্রুততর গতিতে নব নব আলিম্পনের পরিবেশন করে যাচ্ছে। সব চেষ্টা বিফল হল বলে শেষ রশ্মি মেলাবার সঙ্গে সঙ্গে তার সকরুণ ক্রন্দন নিষ্ফল

আক্রোশ গর্জনে পরিণত হচ্ছে ?

না এ অভিমানী শিশু। দূর থেকে দেখতে পাই ছুটে আসছে, তার ঠোঁট কাঁপছে, ডাইনে বাঁয়ে কোণের কাছে বিকৃত ভঙ্গি নিয়ে ফাট-ফাট হচ্ছে, তারপর কাছে এসে পারের উপর আছড়ে পড়ে শতধা অশ্রুতে বিগলিত হয়ে চীৎকার করে কেঁদে উঠছে। পারের মা কিন্তু হাত বাড়িয়ে কোল দিলেন না। ওদিকে কে যেন সেই থমকে-গিয়ে-চুপ করে যাওয়া শিশুকে মায়ের পায়ের কাছ থেকে ভাঁটার টানে সরিয়ে নিল।

না কাণ্ড জ্ঞান বিবর্জিত মাতাল ? বেহুঁশ বেখেয়ালে ক্রেমন্থ খাঁতের উপর বোতলের পর বোতল সোডার ফেনা ঢেলেই যাচ্ছে, ঢেলেই যাচ্ছে। আর সেই মাতলামোর ভেতরে ও যতই দেখছে হুইস্কি-সোডার রঙ আসছে না ততই রোষে ক্রোধে গর্জন করে যাচ্ছে ?

* * *

৩১শে আগস্ট, ১৯৪৭

চোখ বন্ধ করে বসেছিলুম। অন্ধকার নেবে আসছিল মুমূর্ষুর চোখ ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে আসার মত করে।

ভেতরে ভেতরে যেন সাড়া পেলুম—না সত্যি শুনতে পেলুম আমার পাশ দিয়ে কে যেন চলে গেল।

চোখ মেলে দেখি সত্যি তো। আমার চোখের সামনে দিয়ে কে যেন সমুদ্রের উপর সোনালী জল শাড়ী থেকে নিংড়ে ফেলে ফেলে, সমুদ্রকে যেন দুই ভাগ করে সোজা উদয় সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছে—চোখ বন্ধ ছিল তাকে দেখতে পাইনি। শেষ প্রান্তে পৌঁছে ঐ সাদা দেয়াল বেয়ে অভিসারিকা যেন কার বাড়ীর ঝরোকায় দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেল সমুদ্রের উপর তার চলে যাওয়ার সোনালী চিহ্ন ঝলমল করছে—অবাক হয়ে তাই দাঁড়িয়ে আছে। মুখে ঘোমটা নেই।

পূর্ণচন্দ্র।

এক মিনিটের তরে। যার জন্য অভিসার সে যেন তাড়াতাড়ি এসে কালো মেঘের কম্বল দিয়ে সুন্দরীর মুখ ঢেকে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সোনালী রাস্তা যেন মন্ত্রবলে অন্তর্হিত হল। আকাশ-বলুপার সব আড়ি-পাতার-দল অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

* * *

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পাছে অন্য লোকের হাতে পড়ে যায় তাই খবরের কাগজ দিয়ে জানালে সন্ধ্যে সাতটা পনেরোয় দেখা হবে। আমাকে খুঁজে নিতে তোমার অসুবিধে হবে না জানতুম তাই ডাঙ্গায়-তোলা নৌকাখানার আড়ালে সমুদ্রের দিকে মুখ করে বসলুম।

রাক্ষুসে সমুদ্র লক্ষ লক্ষ সাদা দাঁত দিয়ে বালুপারের গায়ে অবিরাম কামড়াচ্ছে। সূর্য ডুবল সাড়ে ছ'টায় আকাশের শেষ লালিমা মোছার সঙ্গে সঙ্গে বেলাভূমি নির্জন হতে লাগল, সাতটা বাজতে না বাজতে বেশ অন্ধকার হয়ে এল, জনমানবের চিহ্ন নেই, আমি এক নৌকার আড়ালে বসে—মনে কোন ভয় নেই, আমাকে ঠিক খুঁজে পাবে, কতবার পেয়েছ, কোনদিন ফাঁকি যায়নি।

নির্জন, অন্ধকার। তোমার আসার সময় হল বলে। চিরকাল এসেছ নিঃশব্দ পদক্ষেপে তাই শুধু চোখ দিয়ে তোমার প্রতীক্ষা করেছি।

অন্ধকারে ঘড়ির কাঁটা জ্বলজ্বল করছে।

তোমার আসার সময় পেরিয়ে গেল।

তারপর সাড়ে সাতটা বাজল, পৌনে আটটা, আটটা। একি! তুমি তো কোনদিন এক মিনিটের তরেও আসতে দেরী করো না। আমাকে কোনদিন খণ্ডিত বিপ্রলব্ধ করোনি। তবে আজ! খবরের কাগজে দিয়ে লগ্ন মুহূর্ত পাকাপাকি জানিয়ে দিয়ে।

এক ঘণ্টা ধরে ঘড়ির কাঁটা দেখছি, বুকের কাঁটা গভীর হতে গভীরতর হয়ে ঢুকেছে।

সোয়া আটটায় উঠে দাঁড়ালুম।

বাড়ীর দিকে চলার মুখে একবার ফের শেষবারের মত পেছনের দিকে তাকালুম।

কৃষ্ণ-সপত্নের আলিঙ্গনে এতক্ষণ মুখ ঢেকে রেখেছিলে? তারি জটার ভেতর দিয়ে আমার অবমানিত প্রত্যাগমনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে গিয়ে ধরা দিলে!

লজ্জা পেয়ো না সুন্দরী। বহু লাঞ্ছিত অপমানিত রক্তসিক্ত এ দেহে আর স্থান নেই যেখানে তোমার দৃষ্টিক্ষেপ নব অবমাননার অচেনা বেদনা হানতে পারে।

তুমি যেন বেত্রাহত গায়ে উল্কি সাজালে!

* * *

২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পূব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ প্রায় চতুর্দিকেই খোলা বলে গোলচক্রবাল, গম্বুজের

মত আকাশ। মনে হয় সোনালী নীল আণ্ডার মাঝখানে বসে আছি হাঁসের বাচ্চাটির মত—ছেলেবেলায় বারুণীতে জাপানি খেলা কিনতুম, গোল কাঁচের ভেতর সোনালী হাঁসের ছানা।

এতদিন ধরে এই হাঁসের বাচ্চার মত অপেক্ষা করেছি এই নীল আণ্ডা ফাটবে কবে আর আমি এই বন্দীশালা থেকে বেরিয়ে যাব। কিন্তু যতই ভাবি ততই কুল কিনারা পাইনে যে এই আণ্ডার বাইরে আছে কি। হাঁসের বাচ্চা ডিমের ভেতরে বসে কি ভাবে জানিনে কিন্তু সে যতই কল্পনার ছুট লাগাক না কেন, সে কি কখনো বাইরের পৃথিবীর কল্পনা করতে পারে। তাই কল্পনা করে কি লাভ।

দুপুর রাতে ঘুম ভাঙ্গল—দেখি চাঁদ যেন আকাশের আণ্ডাতে ফুটো। অনেকক্ষণ ধরে তাকালুম যে এর ভেতর দিয়ে মুক্তির পৃথিবীর সন্ধান মেলে কিনা।

* * *

২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

পশ্চিমের তপ্ত বাতাস থেকে থেকে কালোজাম গাছের ঝুঁটি ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে যাচ্ছে। কৃষ্ণচূড়া আর নিমের চিকন পাতার ঝুঁটি হাতের মুঠির ধরা এড়িয়ে যায় বলে তারা শুধু দোল খায়।

কৃষ্ণচূড়ার বীজপুট চারমাস হল শুকিয়ে গিয়েছে কিন্তু কিছুতেই গাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে পড়তে চায় না, এরা না খসলে গাছ ফুল ফোটাবে কি করে?

এ যেন মরাস্বামী বিধবার সর্বচৈতন্য অভিভূত করে ভূতের মত চেপে বসে আছে, নূতন প্রেমের নব কিশলয় ফোটাতে দিচ্ছে না।

দূরে এক ফালি নীল সমুদ্র—বালুচর আর দিগ্বলয়ের মাঝখানে সেঁটে দেওয়া নীল রিবন। এর দিগন্তব্যাপী বিস্তীর্ণতা এখান থেকে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। মৃত্যুর মত এর রং নীল। মৃত্যু অহরহ মানুষের চতুর্দিকে রয়েছে তবু মানুষ তার উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন নয়—এ সমুদ্রেরও যে শেষ নেই সে কথা মন জানলেও সে সম্বন্ধে সে সচেতন নয়।

গাছ, সবুজ মাঠ, বালুপার, নীলজল সবকিছু রৌদ্রস্নানে পা এলিয়ে দিয়েছে—কেউ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কেউ শুয়ে শুয়ে। মেঘমুক্ত আকাশ শরতের নীলরঙ এখনো ধরেনি—বর্ষার ভয়ে এখনো সেই পুরানো ফ্যাকাশে বরষাতি দিয়ে গা জড়িয়ে রেখেছে। বাতাস নিষ্কর্মা ভবঘুরের মত এ-গাছে ও-গাছে ধাক্কা

দিচ্ছে—মেঘ বয়ে নিয়ে আসার বেগার থেকে যেন রেহাই পেয়েছে।

জেলে পাড়ার নারকোল পাতার ছাউনি বর্ষায় ভিজে কাকের মত জবুথবু হয়ে বসে ছিল। রৌদ্রে এখন যেন পালক শুকিয়ে উস্কো-খুস্কো হয়েছে। যদি একদিন উড়ে চলে যায় তবে নগ্ন দারিদ্র্যের এই চক্ষুশূল থেকে হেথাকার মানুষ নিষ্কৃতি পাবে।

গতিহীন, বেগহীন নির্জীবতা পূব বাঙলার নদীর পারে গড়ে ওঠা মানুষকে বাড়ীর কথা দেশের কথা বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেয়।

২৯শে জুন ১৯৫৫

স্বপ্ন

সকালবেলা ঘুম ভেঙে গেল স্বপ্ন দেখে।

কি স্বপ্ন?

আমি যেন একটি রসিকতা তৈরী করার চেষ্টা করছি। ইংরিজিতে যাকে বলে **humourous story**—ঐ যে-সব বস্তু **Tit-Bits**এ বেরোয়।

কি গল্প তৈরী করলুম?

এক ভদ্রমহিলা ভিখিরি **tramp** কে শুধাচ্ছেন, 'তা, তুমি কাজকর্ম করো না কেন?'

'ম্যাডাম, কাজ দেয় কে?'

'আমি দিচ্ছি। আমার বাগানটি বড় অযত্নে আছে। তুমি ওটাকে একটু সাফ-সুৎরো করে দাও।'

ট্র্যাম একটু ভেবে বললে, 'তাই সই।'

মহিলা বললেন, 'যন্ত্রপাতির কি কি দরকার হবে তার একটা ফর্দ করা যাক্।' বলে তিনি একটা কাগজে 'কোদাল,' 'কাস্তে' এসব লিখলেন। তারপর ভ্যাগাবণ্ডকে বললেন, 'আমার আর তো কিছু মনে পড়ছে না। আচ্ছা তুমি কাগজ পেন্‌সিল্ নিয়ে ভেবেচিন্তে বাকিগুলো লেখো। আমি ততক্ষণ তোমার জন্য গোটা দুই স্যানউইচ নিয়ে আসি।'

ফিরে এসে দেখেন, ভ্যাগাবণ্ড লিখেছে, বেশ বড় বড় হরফে,—

এক খানা খাট
দুটি বালিশ!'

ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর আমি অনেকক্ষণ ধরে ভাবলুম। স্বপ্নে এ রকম গল্প বানাবার প্রবৃত্তি আমার হতে যাবে কেন? আমার বন্ধু-বান্ধবদের কেউই তো কখনো বলেননি যে তাঁরা স্বপ্নে রস-গল্প তৈরী করেছেন। কোন humourist-এর আত্মজীবনীতেও এরকম ঘটনার কোনো উল্লেখ পাইনি।

হ্যাঁ, জানি, কেউ কেউ একটা episode দেখেছেন। যেমন মনে করো, রবিবাবুর 'গানভঙ্গ'। তিনি দেখলেন, বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ) তাঁর বাল্যসখা এক বুড়োকে মজলিসে গান গাইতে হুকুম দিলেন। সে গান গাইতে গিয়ে কেঁদে ফেললে ব'লে, তিনি তার হাত ধরে তাকে সভাস্থলের বাইরে নিয়ে চলে গেলেন।

তাই নিয়ে রবিবাবু 'গানভঙ্গ' লিখলেন।

এরকম ধারা আরো বিস্তর হয়েছে।

কিন্তু এই humourous story by itslf, স্বপ্নেই সম্পূর্ণ তৈরী করে দেওয়া—উপরের episode গুলো, কিছুটা স্বপ্নে বাকিটা জাগরণে—এর উদাহরণ তো জানিনে। এটা কি বরে হ'ল।

তখন মনে পড়ল, আইয়ুব, কচিতে, আমাতে একদিন কথা হচ্ছিল, আমরা উপন্যাস, গল্প, কবিতা, নাট্য সবই লিখতে পারি। ওৎরাবে কি না, সে হচ্ছে অন্য কথা। আমরাই হয়তো তখন বলব, এ গল্প কিন্তু গল্প হ'ল না, এ উপন্যাস কিন্তু উপন্যাস হ'ল না, ইত্যাদি। কিন্তু tit-bits-এর গল্প লেখা আমাদের সাধ্যের বাইরে। এ সব গল্পের উৎস কোথায়, কি করে আরম্ভ হয়, তার কোন পাত্তাই আমরা জানিনে। তাই যদি জোর করে কিছু লিখি তবে সেটা হবে nothing: আমাদের ছোট গল্প লোকে বলবে খারাপ ছোট গল্প, উপন্যাস পড়ে বলবে, খারাপ উপন্যাস, ইত্যাদি, কিন্তু আমাদের জোর-করে লেখা tit-bits প্রচেষ্টাকে লোকে চিনতেই পারবে না, বলবে এটা just nothing।

এ-আলোচনা আমাদের ভিতর কবে হয়েছিল আমার আর মনে নেই। দশ, পনেরো, পঁচিশও হতে পারে, কিন্তু এ আলোচনার কথা আমি বহুবার ভেবেছি।

তাই কি আমার 'অবচেতন' মন যে-সমস্যা তার গোপন কোণে সঞ্চয়ন করে রেখেছিল তাই দিয়ে এই গল্প গড়লে?

কলকাতার ৺কালীপুজো

সকাল ৮·০০ বিকটতম পিচ্-এ তীব্রতম ভলুমে মাইকবাদ্যসঙ্গীত।

চাপা দেবার জন্য রেড়িয়োর একটি যা তা স্টেশনে Classical music লাগালুম। ১০%-ও চাপা পড়লো না। কাজে মন দেবার চেষ্টা করলুম। ইয়াল্লা! হঠাৎ সেই Classical বন্ধ হয়ে তারাও পাল্লা দিতে আরম্ভ করেছে ঐ ফিল্মি গানা দিয়ে।

মোটর স্টার্ট নিচ্ছে না। রোজ সকালে সেটাকে অভিসম্পাত দি। আজ সেটা নন্দনকাননের মধুরতম সঙ্গীত বলে মনে হল—মাইকটা বেশ চাপা পড়েছে। কপাল আমার! অন্য দিনের তুলনায় তাড়াতাড়ি স্টার্ট নিল।

প্যাণ্ডাল যদি লং প্লেইং বাজাতো তবে হয়তো বেঁচে যেতুম। দুটো রেকর্ডের মাঝখানের নীরবতাটাই যন্ত্রণার বহর বুঝিয়ে দেয়। কনফুৎস বলেছেন, নিরেট দেওয়ালটা কোন্ কাজে লাগছে! লাগছে তো তার মাঝখানের ফাঁকটা—দরজাটা। এখানে ঠিক উল্টো। দুটো রেকর্ডের মাঝখানের ফাঁকটা না থাকলে ঐ চীৎকারে অভ্যস্ত হয়ে যেতুম।

ভাগ্যিস ওরা Classical বা রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজাচ্ছে না।

বিনোদ বলতো, জোর করে কুইনিন খাইয়েছে কিন্তু রসগোল্লা হলে আরো কষ্ট হত। এটা ঠিক নয়। Rape case আসামীর উকিল মেয়েটার Connivance ছিল প্রমাণ করতে গিয়ে শুধলো, 'কিন্তু তোমার ভালো তো লেগেছিল?' মেয়েটা বললে, 'উকিলবাবু, জোর করে কেউ মুখে রসগোল্লা পুরে দিলে সেটা কি তেতো হয়ে যায়?'

১০·১৫ গব্বযন্তনা থেকে মুক্তি?

১০·২৫ Alas, false pain! ফের শুরু!

১১·৩২ বেশী না, পাঁচ পাঁচ মিনিটের ভিতর পাঁচবার, পিন গ্রুভে আটকে গাঁ ওঁ উঁ, গাঁ ওঁ উঁ। cf 'বদ্ধ ছিলেম এই জীবনের অন্ধকূপে'।

দুপুর ১২'০০ আমার সুখ-শান্তিরও বারোটা। চিৎকার করে গলা ফেটে গেল। উত্তরের বারান্দায় গিয়ে বুড়ো শয়তান, আর শয়তানের আণ্ডা দুটোই প্যাণ্ডেলে জাত-ইডিয়েটের মত হাঁ করে লৌডস্পীকারের দিকে তাকিয়ে আছে। খাসা excuse আছে—আমার ডাক শুনতে পায়নি।

আমি 'লবদ্বার' বন্ধ করে অতিষ্ঠ। আর এরা তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ভূমার সন্ধানে একেবারে লাউডস্পীকারের সদরে।

এরাই মহাজন! পরিবেশ—তা সে যা-ই হোক—পছন্দ করতে জানে।

আর আমার প্রতিবেশীদের ঈর্ষায় বুক ফেটে যাচ্ছে—আহা, ওরা যদি আমার বদলে এ বাড়ির বাসিন্দা হত।

৩'০০ ওঃ! "কী ভুল করিনু আমি যোগী"

মডার্ন্ কবিতা আকছারই মেশিনারী থেকে নিরন্তর inspirtion পায়।

W. C.-তে বসে শুনছিলুম—উপায়ান্তর নেই অন্তত সেখানে—একটা গানে বার বার যেন পিন গ্রুভে আটকা পড়ে যাচ্ছে। শেষে বুঝলুম, অহহো। এটা deliberate নয়াটেকনীক। গাওয়াইয়া ঠিক groove-এ খাবি-খাওয়া পিনের অনুকরণে হুবহু একই শব্দ পাঁচবার—তারপর কিছু নির্ঝঞ্ঝাট গান—ফের একই শব্দ পাঁচবার—আবার ঐ গাঁ ওঁ উঁ, গাঁ ওঁ উঁর অনুকরণে গান গাইছে।

১৩'১০ আঃ কি আরাম! মহাসঙ্গীত থেমেছে। ঢাকের বাদ্যি নাকি থেমে গেলে ভালো লাগে (সে আমলে গ্রামাঞ্চলেও শব্দকাতর সজ্জন ছিলেন! আশ্চর্য); আমি বলি এই মহাসঙ্গীতর বদলে আমি ঢাকের বাদ্যি any day prefer করবো।

যে গুণী বলেছিলেন,

কী কল পাতাইছ তুমি!
বিনা বাইদ্যে নাচি (নাS) আমি॥

তিনি প্যাণ্ডেলের এ মহাবাদ্য শুনলে কি করতেন!

১৩.৪০ ওরে মূর্খ, ওরে উন্মাদ, ওরে ঘটোৎকচ! ঝাড়া তেরোটি বছর ইস্কুল কলেজে ইংরিজি পড়ে এই প্রবাদটুকু শিখিসনি, ‘অরণ্যানীর লতাগুল্ম বিচ্ছিন্ন করে জনপদে পদার্পণ না করা পর্যন্ত হর্ষোল্লাস করে উঠিসনি।’ কিংবা সেই বোগদাদী মূর্খ অন্-নশ্‌শারের মত আণ্ডার ঝুড়ি সামনে রেখে রাজকুমারীকে বিয়ে করার স্বপ্ন দেখিসনি।

আবার আবার সেই কামান গর্জন।

লাঞ্চ খেতে গিয়েছিল। এবং এরা অত্যন্ত আইন সম্মত আচরণ করে বলে সরকারি কর্মচারীদের মত আধ ঘণ্টার বেশী লাঞ্চ আওয়ারে নেয় না। সোনারচাঁদরা বাঁচলে হয়।

‘কামান গর্জন’ বললুম, কিন্তু কামান গর্জন গম্ভীর সিংহ গর্জনের বত আদৌ কর্ণপটাহ-বিদারক নয়। এমন কি চ্যাংড়া মেশিনগানের ক্যাটক্যাটও প্যাণ্ডেলের তাণ্ডব-আরাবের সামনে জুঁই ফুলের গানের মত মোলায়েম।

সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান
মেশীন গানের সম্মুখে গাই জুঁই ঐ ফুলের গান।

গেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। হুঁ। কিন্তু এই প্রচণ্ড প্রলয় বাদ্যের সামনে তিনি কি গাইতেন?

১৪.০০ রাত্রে আমার সুনিদ্রা হয় না। আমার ভরসা দুপুর। দুপুর থেকে তিনটে অবধি দিবানিদ্রার। ঘুম লেগে আসছে, এবার কে যেন—কেসিয়াস ক্লে-ই হবে—পেটে মারে মোক্ষম গুত্তা। ফের no loudspeaker, এবারে ক্রুশের কাঁটা দিয়ে পাঁজরে খোঁচা। চললো নিদেন আধঘণ্টা।…যা দেখলুম, এ যাবৎ আমার ঘুমটাই একমাত্র হীরো যে ঐ বিটকেল মৃজিকীর সঙ্গে lost battle-এর rearguard action লড়লে।

মা কালী! একটা প্রশ্ন শুধবো মা, তুমি দুপুর বেলা এ্যাট্টু, দিবানিদ্রা দাও না? না এই উৎকট—সেই যে তুলসীদাস বানরদের লঙ্কা আক্রমণের সময়কার বিকট শব্দ অনুপ্রাস সহযোগে প্রকাশ করেছেন—

কটকটহি মরকট বিকট ভট কোটি কোটিগহ ধাবহি—

কি বলছিলুম মা, এই কটকহি-ই কি তোমার অতি বিকটিনী দিবানিদ্রা আয়েশের আফিং !

১৭·৩০ আমি তো অগা। তাই শুধোই, সন্ধ্যা তো হল। দেবীর আরতিটারতি হবে না? তখন তো শাঁখটাঁখ বাজার কথা। সেটা শুরু হলে বাঁচি।

ম্যাডাম কালী ভূতনাথের কোন্ পক্ষ যেন হন। না, সে বুঝি অন্নপূর্ণা—

ভূত নাচাইয়া পতি ফিরে ঘরে ঘরে
না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে !

তা, ও, একই কথা। তা পাষাণ বাপ মরুক আর না-ই মরুক, ভাইয়ের অভিমানে যে বড্ড লাগে এটি বড়ই খাঁটি, আমাদের পাড়াগাঁয়ের ঘরোয়া বাঙালীর গোপন গন্ধে-ভরা বেদনা !

অভিমানে সমুদ্রেতে ঝাঁপ দিল ভাই,
যে মোরে আপন ভাবে তার ঘরে যাই।

১৮·০০ শাঁখ বাজলো না, লাউডস্পীকারও থামলো না। উত্তরের বারান্দায় গিয়ে অবশ্যি শুধনো যায়। সর্বনাশ! ঈশ্বর রক্ষতু! আমার মত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, পাড়ার মুরুব্বিকে উৎসাহিত কৌতূহলী দেখে তারা না আমাকে ডবলাপ্যায়িত করার জন্য আরেকটা লাউডস্পীকার-এর সন্ধানে ভূতের ঘোড়া চেপে ছুট লাগায় !

১৯·০০ 'ডাক্তারে যা বলেক বলুক না কো', আমার দৃঢ়তম বিশ্বাস exercise physical movements of any sort স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় খতরনাক।

কিন্তু আর পারা গেল না। প্যাণ্ডেলের সঙ্গীত উচ্চতর হয়েছে। রাস্তায় নামতে হল।

প্রথমেই শুনলুম, 'লাউড্ স্পীকার বলছে, 'আজ রাত্রি আটটার সময় নির্ধারিত যাত্রা হবে না।' আমি প্রথমটায়

উল্লাস বোধ করেছিলুম। সঙ্গে সঙ্গে বললে 'কাল হবে'।

সেটা নিশ্চয়ই মিন লা. স্পী. হবে না। সেটা কি এর চেয়েও খুনীয়া হবে? কে জানে!

এখান থেকে প্রায় একশ গজ দূরে একটি ছোট্ট ঘরে আরেক কালী। প্যাণ্ডেল লাউডস্পীকার কিছুই নেই। দু'চারটি বউ বাচ্চাদের নিয়ে দাঁড়িয়ে। রাস্তায়ও যুবতী মা-ই বেশী। সন্তানের যেন অমঙ্গল না হয়।

২০১'৫ এবারে আরম্ভ হয়েছে যা তা অতুলনীয়। আধঘণ্টা ধরে রেকর্ড বাজছিল না। এখন organizer-রা বেসুরা গান গাইছেন, মাইক চরম চড়ায় তুলে। তবলাও চলছে। চতুর্দিক নিরব হয়ে যাওয়ার ফলে এবারে আমার suffering চরমে উঠেছে। কালীপূজোয় রাত জাগাটা তো স্বাভাবিক।

সকাল ১০'৩০ ফের রেকর্ড চলছে।

গান

কীই বা হত তোমার রাজার
একটি মোরে দিলে
কীই বা ক্ষতি হত কাহার
বিরাট এ নিখিলে
তোমার বিশ্ব বসুন্ধরা
অনন্ত বিভবে ভরা
কণাটুকু যেতো ফুরাতো
করুণা বর্ষিলে।

চন্দ্রসূর্যগ্রহগ্রহ
সাজাও আলিম্পন
তারায় তারায় বাঁধো তুমি
অলখ্য আলিঙ্গন
তোমার এ যে স্বপ্ন-ছবি
মিথ্যে হত এর কি সব-ই
প্রিয়ার চোখে আমার চোখ
যদি যেতো মিলে।

সুর
পণ্ডিত রতনজাংকর

কথা
সৈয়দ মুজতবা আলী

কলকাতা ১৯৬৩।

২১শে নভেম্বর ১৯৪৭
মৌলবী বাজার

প্রিয় কণামিয়া,

কিসের কণা ভাবিয়া মনে হদীস নাহি পাই
হলপ তবু করিতে পারি তাঁহার সাথে নাই
জ্ঞানের যোগ, ইলিম আর বুদ্ধি যারে কয়
পেয়ছ মেলা সুযোগ তবু দাওনি পরিচয় !
না হলে এতদিনে
আসিতে হেথা, বলিতে হাসি, 'নিয়েছি আমি চিনে
যেমন করে মেঘের ডাকে ময়ূর উঠে নাচি
অলখকর-পরশ পেয়ে কুমুদ উঠে বাঁচি
—তপ্ত—খর নিদাঘ-দাহ দিবার অবসানে—।
অজানা কোন্ টানে ?
কিসের পরিচয় ?
ডাউকি হতে ছুটিল জল সাগরে হবে লয় ?
মেঘের বাণী, শুক্লা নিশি, সিন্ধু পারের ডাক,
চিনেছি আমি ভাষায় ভরা কভু বা নির্বাক ।

উপযুক্ত তত্ত্বকথা করিতে সপ্রমাণ
চলিয়া আসো ত্বরিতগতি চড়িয়া মোটর যান ।
সঙ্গে এনো তাবৎ লেখা তব
অছাপা ছাপা বেবাক মাল প্রাচীন আর নব ।

কহেন গুণী, 'বাড়ীর জোরে বিশেষ এক প্রাণী
তেরিয়া হয়ে বীরেরে যায় হানি ।'
আম্মো তাই সাহস করি তবে
—হুঙ্কারিয়া টঙ্গি ঘরে নাচিয়া ভৈরবে
মনের সুখে করিব গালাগাল,
বলিব, 'তব তাবৎ লেখা নেহাৎ জঞ্জাল
রদ্দি ওঁচা, ভ্যাপসা পচা, থাড্ডো কেলাশ অতি
ওরে রে দুর্মতি

বাড়াস কেন এ দুনিয়ার বিভীষিকার ভার
নাম যে কণা, কণামাত্র সন্দেহ নেই আর।'

১২ই জুন ১৯৫৫

মডার্ন কবিতা

এখানে কত রকম গরমই না পড়ে।
এবং বৃষ্টিও নামে কোনো প্রকারের নোটিশ না দিয়ে।
কাল দুপুর রাতে হঠাৎ ঝমাঝ্‌ঝম।
সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল, প্রাণ যেন গান গেয়ে উঠল।

আজ সকাল থেকে ভ্যাপ্‌সা গরম।
কি করি, কি করি, কি করে গরম ভুলি।

এমন সময় এক বন্ধু এলেন এক ঠোঙ্গা কালো জাম নিয়ে!
কত বৎসরের পরে কালো জাম!

মনে পড়ল,
বন্ধুরা হাসাহাসি করেছিল,
আমি যখন একদিন এই রঙের একটি মেয়েকে ভালবেসেছিলুম,
কারণ আমার রঙ তখন ছিল ফর্সা,
—আজ আমার ছেলে ফিরোজের মত—।

হার্ট্‌টা দুম্‌ করে বন্ধ হয়ে গেল।

HEINE

[আজ সকালে হাইনের কবিতা অনুবাদ করলুম]

সত্যি সত্যি আমরা দুজনে মিলে
অদ্ভুত এক গড়েছি প্রেমের জোড়া
প্রিয়া মোর পায়ে না পারে দাঁড়াতে ভালো
আর আমি? আমি একবারে হায় খোঁড়া।

ব্যামোতে কাতর সে যেন বেরাল-ছানা
আমি তো কুকুর শুয়ে শুয়ে কাতরাই,
আমার মনেতে সন্দেহ আছে মেলা
দুজনার সাথে বেশ কিছু আছে বাই।

তার মনে লয় কমলিনী তিনি নাকি
কল্পনা করে গড়েছে আপন মনে
ফ্যাকাশে চেহারা—তাই লয় মোর মন
নিজেরে হেরো না, চন্দ্রমাসম গণে!

কমলিনী ঐ খুলিল পাপড়িগুলি
চন্দ্রমা পানে তুলে ধরে তার আঁখি
কোথায় না ভরা সফল জীবন পাবে—
হাতে তার, হায়, কবিতাটি শুধু রাখি।

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষে

শতাব্দী হয়েছে পূর্ণ। আজি হতে শতবর্ষ পরে
নরনারী বালবৃদ্ধ কাব্য তব বক্ষোপরি ধরে
ভাবিয়া অবাক হবে কী করে যে হেন ইন্দ্রজাল
বঙ্গভূমে সম্ভবিল। পরাধীন দীন দগ্ধ-ভাল
অন্ধভূমি। তারি তমা বিনাশিতে উদিল যে রবি
স্বর্গের করুণা সে যে। বঙ্গ কবি হল বিশ্বকবি।
তারপর এ যুগের লোকে স্মরি মানিবে বিস্ময়
কোন পুণ্য বলে মোরা পেনু তার সঙ্গ, পরিচয়!

নববর্ষ

স্নেহের মুকুল,

তুমি তো আক্কেল ধরো, বলো তো আমারে
নববর্ষ লয়ে কেন ফাটাফাটি প্রতিবারে!
পুরনো বছরটারে বাতাস কুলার
দিয়ে কেন ঝাঁটা দিয়ে করে দেয় বার?
কি দোষ করেছে, কও, পুরানো বছর
তারেই তো নিয়ে বাবা, করে নিলে ঘর
তিনশ পঁয়ষট্টি দিন। গেল কি খারাপ,
উঠেনি কি সূর্য বুঝি, দেয় নি কি তাপ?
উঠোন বাজারে মাছ ভালো মন্দ যাই,
ব্লেডেতে কাটিয়া মাছ দিন কাটে নাই?
মদ্য খেয়ে চাচা বুঝি হয় নাই টং
পুপু পুটু মীরামাই করে নাই ঢং
যার যাহা, অভিরুচি? টেটেন পটের
বীবী সেজে বেরয় নি? মেজদা ঘটের
বুদ্ধিটি খরছ করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের
মাথায় বুলায়ে হাত এনেছে এন্তের
খরছ করেনি তারো বেশী? পদি সিসি
করেনি ক্যাটের ক্যাট? ভাঙা ফাটা শিশি
করেনি কি বিক্রি, রামা, টুপাইস তরে?
বৌদি চষেনি মাঠ চক্করে চক্করে
টাট্টু ঘোড়া যেন হায়! যাবে অলিম্পিকে।
বড়দা করেনি রাঙ্গা বাড়িটারে পিকে?
পাকু মাম গুড়গুড়ি বাবুজী জামাই
করেনি কি দিবারাত্রি শুধু খাই খাই?
রকেতে দুজনা বসি করি নি কি প্ল্যান
টুপাইস কামাবো বলি—খুদা যদি দ্যান!

কে জানে জর্মনি বসে হয়তো ভাইয়া
করে রেখে আছে ব্লণ্ড গণ্ডা দুই বিয়া !

(২)

তবে কি পুরানা সাল ছিল দিশী সস্তা
তাহারে বিদায় দিয়া ভরি বস্তা বস্তা
আনিবে জর্মন মাল কিংবা সে বিলাতি
নববর্ষ—গ্যারাণ্টিড পাকা সে বেসাতি !
চলিবে দশটি সন এক নব বর্ষে
কই, দিদি, বলে না তো চোখেতে সরষে—
দেখি যবে, বলে কিনা এরেও বিদায়
দেওয়া হবে। বারো মাস হয়ে গেল, হায় !

(৩)

তুমি তো সেয়ানা মেয়ে চালাও সংসার
বলো দেখি তবে কেন এহেন ব্যাভার ?—
বাজে খর্চা একদম—পুরানাটা যবে
দিব্য কাজ দিয়ে যায় ; নয়া আনা তবে ?

বর

মুখ খান্ কেনে মেঘলা মেঘলা
চউক্ষে কেনে পানি
ঠোঁট ফুলাইয়া থাকলে পরে
কেমুন কইরা জানি।

কনে

ছলে বলে বানছো আমায়
কাইরা নিছো মন
কাইলকা যা কইছিলাম, নাগর
আছে নি স্মরণ ?

বর

জেওর-বেসর যত চাইছ
ঢ্যাইল্যা দিমু পায়
একটু খানি হাস কন্যা
পরাণ জইল্যা যায় ॥

পিলসুজ পরে হেরো জ্বলে দীপশিখা ;
চতুর্দিকে যে আঁধার ছিল পূর্বে লিখা
মুহূর্তেই মুছে ফেলে।
কিন্তু অবহেলে
মাভৈ বলিয়া তারে ছেড়ে দেয় স্থান
যে-আঁধার পায়ে ধরে মাগে পরিত্রাণ।

'দিনলিপি'তে উল্লিখিত ব্যক্তিগণের পরিচয়।

১। রাবেয়া—লেখকের স্ত্রী।
২। ফিরোজ—লেখকের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
৩। ভজু—লেখকের কনিষ্ঠ পুত্র।
৪। বিশী—প্রফুল্লকুমার বিশী (লেখক শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর মধ্যম ভ্রাতা)

পত্রাবলী

॥ পুত্রদ্বয়কে লিখিত পত্র ॥

(১)

১৮ই মে ১৯৫৫

বাবা ফিরোজ,

এই বারে তুমি আমাকে দেখেই চিনতে পারলে। এর পূর্বে যতবার তোমাকে দেখতে গিয়েছি তুমি আড় নয়নে তাকিয়েছ, তোমার মায়ের হাঁটুতে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে পেছিয়েছ আর ভেবেছ, এ লোকটা কে ?

এবারে চট করে তুমি আমাকে চিনে নিলে।

দু' মিনিট যেতে-না-যেতেই বললে 'মোটর'।

আমি তৎক্ষণাৎ বাক্স খুলে তোমাকে মোটর দিলুম।

তুমি খুশী হয়ে ভল্লুকে কাছে নিয়ে মোটর নিয়ে খেলা করলে।

খানিকক্ষণ পরে আবার এসে বললে, 'মোটর।'

আমি বললুম, 'ঐ তো ফিরোজ'। মোটরটা দেখিয়ে দিলুম।

তুমি বললে 'না, কঁ-ক্-ক্, 'কঁ-ক্-ক্' সেই মোটর।'

বুঝতে পারলুম না।

তোমার মা বুঝিয়ে দিলে, তুমি খেলনার মোটর চাও না, তুমি চাও আসল মোটর—যে মোটরে, তুমি যখন কটকে এসেছিলে, ঘুরে বেড়াতে।

তোমার ঠিক মনে আছে।

আব্বু

(২)

২৮শে মে ১৯৫৫

বাবা ফিরোজ,

তুমি যে সব কথা বলো তার মানে কি তুমি বুঝতে পার ? অনেক সময় তুমি না বুঝে আবোল-তাবোল বলে যাচ্ছো আবার অনেক সময় দেখি যা বলতে চাও ঠিক তাই বলেছ—কথাগুলো আদপেই অর্থহীন নয়।

মাঝে মাঝে তাই ধোকা লাগে।

তোমার মা বলছিলেন তুমি নাকি একদিন ঘড়িটাকে নিয়ে বড্ড ঝুলোঝুলি লাগিয়েছিলে। পাছে তুমি সেটা ভেঙে ফেলো তাই তিনি তোমাকে ওটা

কিছুতেই দিতে রাজী হচ্ছিলেন না। শেষটায় তুমি নাকি হঠাৎ মাটিতে পা মেরে বললে, 'লাথ মারো দুনিয়াকো'

বলেই গুম গুম করে বেরিয়ে গেলে !

পরে জানা গেল, ওটা নাকি ফিল্‌মি গানার এক লাইন ! তুমি তোমার আজীজ ভাইয়ের কাছ থেকে শিখেছ !

আব্বু

(৩)

১২ জুন ১৯৫৫

বাবা ফিরোজ,

তুমি নাকি একদিন আদর করে ভজুকে জিজ্ঞেস করলে, 'ভজু, তোর আব্বু কোথায় ?'

আমি তখন ঢাকাতে তোমাদের দেখতে গিয়েছিলুম। তুমি 'তোমার ; আব্বু'কে পেয়ে ভারী খুশী। কিন্তু ভজুকে ভালোবাসো বলে দুশ্চিন্তা হল—আমার তো তাই মনে হয়—এর আব্বু একবারও আসেনি কেন ?

আব্বু

(৪)

৪ জুলাই ৫৫
গাড়ীতে পাটনা থেকে হৈদ্রাবাদ।

বাবা ফিরোজ,

তুমি বড় হলে আমারই মত গরমকাতর হবে না প্রার্থনা করি। যদিও জানি গরমকাতর হবেই। কারণ সেপ্টেম্বর মাসেও এক মিনিটের তরে পাখা বন্ধ হলেও তোমার ঘুম ভেঙে যায়।

তাই মনে করি বর্ষা ঋতু তোমার জীবনেও সেই স্থান দখল করবে যেটা সে আমার জীবনে করেছিল।

বর্ষাকালে ফসল হয়, তাই অন্নপ্রাণ মানুষ তাকে ভালবাসে। যাদের কবিত্ব-বোধ আছে তারা তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়। আমার কাছে তার সর্বাধিক মূল্য তার শৈত্যল্যে। তুমি বলবে, সে কি, বাবা তার কবি-মনোবৃত্তি নিয়ে এটাকেই সব চেয়ে বেশী দাম দিলে ! হ্যাঁ বৎস, তাই।

যৌবনে আমি ১২৬° ভিতর দিয়ে থাইবার পাস পার হয়েছি। কষ্ট পেয়েছি, কাতর হয়ে পড়েছি, কিন্তু তাই বলে ভ্রমণের উৎসাহ কমেনি।

এখন কিন্তু মস্তকে বজ্রাঘাত হয়। এই গরমে কোথায় যাব! বাড়িতেই প্রাণ অতিষ্ঠ।

ভোজপুর। (শাহাবাদ Dt)

কচুরীপানা নেই।

আমবনের জমা-জলে গাছের কালো ছায়া। দেখে মনে হয়, গ্রামের কলহ বর্জন করে, গাঁওবুড়োরা সভায় বসেছেন।

ধান পর্যন্ত ফলাচ্ছে জলে ক্ষেত ভর্তি করে। মাঝে মাঝে পলিমাটি, আমার দেশে ওরকম নেই। বাঁশ!

বর্ষার ঘোলা জলে সন্ন্যাসীর স্নান। গঙ্গা থেকে দূরে, নিশ্চয়ই ইঁদারা নেই।

প্লাটফর্ম :

বুড়ী সম্পূর্ণ দন্তহীন—হাতে উল্কি বাহারে-পেড়ে শাড়ী বাসন্তী রঙের ওড়না—হাতে বিরাট বিরাট মকর-মুখো রূপোর বালা—সোনালী রেশমী চুড়ী। নাত্নী পাশে। সোনালী ওড়না, কিন্তু হাতে সোনা রূপো নেই, শুধু কাঁচ। নাত্নীর বয়স ১০।১২ কিন্তু সবসুদ্ধ নিয়ে বুড়ীটাই সুন্দরী।

আরেক মেয়ে লম্বা ঘোমটা টেনে, বস্তার আড়ালে কখনও ঘোমটা টেনে, কখনো মাছি তাড়াতে তাড়াতে আম খাচ্ছে—গোগ্রাসে।

(দিলদার নগর)

হঠাৎ মাঠ কতদূরে চলে যায়, আবার কাছে আসে।

বর্ষা এসে আমার দেশ আর এদেশের তফাৎ ঘুচিয়ে দিয়েছে—সম্পূর্ণ না, অনেকখানি।

বিহারের বিখ্যাত আমবাগানের পাশ দিয়ে ছুটে চলেছি।

(৫)

১৯.৭.৫৫

ফিরোজকে ট্রেনে

অতএব হাতের লেখা টলটলায়মান।

আমার মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে তুমি কি আমার মত এত সব দেশ-

বিদেশ দেখবে? আজ আমি পাটনা থেকে দানাপুর—আরা—বক্সার হয়ে দিল্লী যাচ্ছি।

কী নিবিড় ঘন বর্ষাই না নেমেছে। আকাশ বাতাস সবই শ্যামল স্নিগ্ধ শীতল। কামরার সব শার্সী তোলা, তবু সব কিছু ঠাণ্ডা। বাইরের ভুবন ঝাপসা। দূর দিগন্তের সবুজ গ্রাম, তার উপর নীলাকাশের সুনীল মেঘ নেমে এসেছে। বৃষ্টি-কণা সারাক্ষণ তাকে ঝাপসা করে দিচ্ছে। কখনো দেখতে পাই, কখনো পাইনে।

ধরণী যেন সর্বাঙ্গ উন্মোচন করে নববরষণের মুক্তিস্নানে আনিদ্র আসুপ্ত হয়ে আছেন।

কী সুন্দর দৃশ্য। হয়তো তুমি একদিন দেখবে।

তোমার
আব্বু

(৬)

ট্রেনে-টলটলায়মান

২৫.৭.৫৫

বাবা ফিরোজ,

তুমি যখনই গাড়ীতে যাও না কেন, মোগলসরাই থেকে দুদিকে চোখ রাখবে। চুনার, বিন্ধ্যাচল অঞ্চল অপূর্ব সুন্দর।'

১৯২৬এ প্রথম এ জায়গা দেখি।

১৯৫৫য় আজ আবার যাচ্ছি।

সেই সৌন্দর্য!

আব্বু

(৭)

৩ অক্টোবর '৫৫

বাবা ফিরোজ,

আমার একটা বইয়ের নাম 'দেশে বিদেশে'। বাংলায় ইডিয়ম 'দেশ, বিদেশে'। অর্থাৎ সর্বত্র, অর্থাৎ 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে।' আমি কিন্তু 'দেশে বিদেশে' শব্দার্থে লিখেছি অর্থাৎ এ বইয়েতে কিছুটা 'দেশের' বর্ণনা পাবে যথা পেশাওয়ার ইত্যাদি, আর বাকিটা 'বিদেশের' অর্থাৎ এস্থলে কাবুলের।

'দেশ-বিদেশের' অন্য অর্থ ধরে।

আমি যদি কখনো 'দেশ-বিদেশে' লিখি তবে তাতে যত্রতত্র সর্বত্রর বর্ণনা পাবে। সে-বই তা হলে বিয়াল্লিশ-ভলুম হবে। তার ফুরসৎ আমার নেই।

রবিঠাকুর লিখেছেন, (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২৬ খণ্ড, পৃঃ ৩২৪) রাণী খুঁজতে বেরিয়েছিলাম দেশে বিদেশে।

তিনি 'দেশে বিদেশে' কি অর্থে ব্যবহার করেছেন। একটু অনুসন্ধান ক'রো তো।

আব্বু

পুঃ আজ আমি খুব বকবকানিতে আছি। এ চিঠির আগে আরেকটা চিঠি লেখা হয়ে গেছে।

(৮)

১৯.১০.'৫৫

বাবা ফিরোজ,

তোমরা যখন কটকে এসেছিলে তখন আমার alsatian কুকুর 'মাস্টার'কে বড় ভালবাসতে। বরঞ্চ বলা উচিত, মাস্টার তোমাদের অনেক বেশী ভালোবাসতো। কে কতখানি কাকে ভালোবাসতো সে কথা আরেকদিন হবে।

তোমার মা তখন স্থির করলেন, তোমাদের জন্য একটি কুকুর পুষবেন।

আমি যখন এবারে ঢাকায় গেলুম, তখন দেখি, ছোট্ট একটি ফুটফুটে কুকুর। কী সুন্দর। আর কী তেজ! এক লাথি মারলে সে তিন টুকরো হয়ে যাবে। অথচ আমাকে যা তাড়া লাগালে! তিন মিনিটেই কিন্তু দোস্তী হয়ে গেল যখন দেখলে, তোমরা সবাই আমার দিকে হাসি মুখে এগিয়ে আসছো।

ওর নাম কি? জাম্বু। সে কি, এক ফোঁটা পাপীর নাম জাম্বু!

তোমার মা বললেন, গাণ্ডেরিয়ায় তোমার মাসীমার যে কুকুর আছে তার নাম জাম্বু। তুমি যখন সেখানে থাকতে তখন ঐ জাম্বুর সঙ্গে তোমার খুব ভাব-সাব ছিল বলে ওকে তুমি জাম্বু বলে ডাকতে আরম্ভ করলে। বুঝলাম, তোমার বয়সে কুকুর মানেই জাম্বু।

তার সঙ্গে আমার কী বন্ধুত্বই না জমে উঠেছিল। আমি তাকে আদর করতুম, আর সে ন্যাজটি বর্মি পাখার মত গোল করে মেলে দিয়ে ফ্যাশানেবল মেয়েদের মত দোলাতে আরম্ভ করতো। যখন ঘুমিয়ে থাকতো তখনো মাঝে মাঝে চোখ একটুখানি খুলে দিয়ে মিটমিটিয়ে দেখতো আমি তার পাশে বসে আছি তো। তোমরা দু' ভায়েতে যখন তার উপর বড্ড বেশী চোটপাট করতে তখন সে এসে

আমার কাছে আশ্রয় নিত। অবশ্য বেশীক্ষণের জন্য নয়। আবার যেত তোমাদের কাছে। ভজু হামাগুড়ি দিয়ে দিয়ে কাছে এসে ন্যাজে দিত টান, আর তুমি দুই হাতে তার মুখ ফাঁক করে যে রকম উপর নীচ টানতে তা দেখে পুরাণের কোন এক বকাসুর-বধ না কিসের এক ছবি মনে পড়তো। জাম্বুর তখনকার অবস্থা সত্যই করুণ। মুখ দু'দিকে চেরা বলে চিৎকার পর্যন্ত করতে পারছে না। তোমাদেরও ডর ভয় নেই। বোঝো না যে-কোন মুহূর্তে ঐ একরত্তি কুকুর তোমাদের কুটি-কুটি করে দিতে পারে। কিন্তু সে নিয়ে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আমার 'মাস্টার' যে কিনা তাগড়া 'অ্যালসেসিয়ান' তাকে নিয়েও তোমরা কটকে ঐ 'অপকর্ম' করতে। সেও জাম্বুর মত অকাতরে সইত।

* * * *

তোমার মা লিখেছেন, সে রাস্তায় বেরিয়ে গিয়ে পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে পাগল হয়ে যায়। তোমাদের স্কুলের চারটি মেয়েকে কামড়েছে। তোমাদের গায়েও নাকি আঁচড় রয়েছে। তোমাদের দু' ভাইকে ১০টা না ১২টা Injection নিতে হয়েছে। ভাবো দেকিনি, কী কাণ্ড। তোমরা দুজনাই আমারই মত **delicate**—নাজুক। তোমাদের কী কষ্ট হচ্ছে, তাই আমি ভাবতে ভাবতে—

[পত্র অসমাপ্ত]

(৯)

৩।১০।৫৬
আজ ঢাকাতে এলুম

বাবা ফিরোজ,

আজকাল আমি 'জলে ডাঙায়' লিখছি। তার ইতিহাস তোমাকে বলি। ১৯৫৩ ইংরিজির শীতের শেষে আমি মৈমনসিং গিয়েছিলুম। তখন আমি 'অবিশ্বাস্যে'র শেষ অধ্যায়গুলো লিখছি। রোজ সকালে বারান্দায় এক কোণে বসে বই লিখি (তুমি তখন বড্ড জ্বালাতন করতে—তোমার ইচ্ছে, আমি তোমার সঙ্গে খেলাধুলা করি) আর তোমার মা আমাকে মাঝে মাঝে চা দিয়ে যান।

একদিন চুপ করে বসে আছি। তোমার মা জিজ্ঞেস করলেন, 'লিখছ না যে।'

আমি বললুম, 'অবিশ্বাস্য' শেষ হয়ে গিয়েছে। তাই বসে বসে ভাবছি অন্য

কি বই আরম্ভ করি।' তোমার মা এক মুহূর্ত না ভেবেই বললেন, 'বাচ্চাদের জন্য একখানা বই লেখ।'

আমি তদ্দণ্ডেই 'জলে-ডাঙায়' লিখতে বসে গেলুম। এর কয়েকটা instalment আমি ৪৮-৪৯ সনে 'বসুমতী'তে প্রকাশ করেছিলুম বটে কিন্তু তার পর ওটার কথা আর ভাবিই নি। তাই নূতন উৎসাহে বইটা লিখতে আরম্ভ করলুম।

উৎসাহের কারণ :—

(১) তোমার মা বলেছেন,

(২) দেখলুম, তোমার বয়স যখন ১২।১৪ হবে, তখন আমি তো এ-লোকে থাকবো না; তাই তোমার জন্য তোমার ঐ বয়সের উপযোগী—কিছু লিখে রেখে গেলে তুমি খুশী হবে। উপস্থিত 'জলে ডাঙায়' বসুমতীতে বেরচ্ছে।

আজ এখানে শেষ বর্ষা যাচ্ছে। এখানে এটাকে 'হাতিয়া' নক্ষত্রের বৃষ্টি বলে। এরপর নাকি এদেশে আর বৃষ্টি হয় না।

চওড়া বারান্দায় বসে শুনছি, ঝিল্লির ঝিলিঝিলি তার সঙ্গে ব্যাঙের 'কর্ কর্ কর্ কর্'। সামনে দেয়ালে বেয়ে ওঠা মধুমালতীলতা দুলছে, লাল সাদায় মেশানো ফুলগুলো কাঁপছে,—

দাঁড়াও, এই লতাকে যে 'মধুমালতী' বলা হয় তার কোনো হদীস নেই। কারণ এগুলো তো এসেছে রেঙ্গুন থেকে—এখনও একশ' বছর হয়নি। অথচ 'মধুমালতী' প্রাচীন নাম। ইংরিজিতে একে বলে Rangoon Creepers, (ইংরিজিতে 'শিউলি'কে বলে Sorrow Flowers, টগরকে বলে Twister Jasmine, বেলকে বলে Wood apple, সজনেডাঁটাকে বলে Drum sticks, ঢ্যাঁড়শকে বলে Lady's fingers—এগুলো ইংলণ্ডে নেই বলে কোন ইংরেজ এগুলো বুঝবে না,—অর্থাৎ এগুলো Anglo-Indian শব্দ)। ঠিক ঐ রকম মাধবী কি ফুল কেউ জানে না। গুরুদেব এক নাম-না-জানা লতাকে মাধবী নাম দেন। তারপর গান রচেন, 'হে মাধবী দ্বিধা কেন?' 'পারুল'ও তাই। কেউ জানে না ওটা কোন্ ফুল। শান্তিনিকেতনের কাছে যে 'পারুল বন' আছে সেটা গুরুদেবের দেওয়া নাম। এখানকার ফুল সত্যই পারুল কিনা, কেউ জানে না।

ভেবেছিলুম বর্ষার মোলায়েম বর্ণনা দিয়ে তোমাকে আজ গল্প বলবো। তা আর হল না। পারুল মাধবীর শব্দতত্ত্ব নিয়ে সময় কেটে গেল।

কিন্তু আজ সত্যই মেহুর সন্ধ্যা। আজ সপ্তদশী। এখন আটটা বেজেছে। সপ্তদশীর চাঁদ কখন ওঠে ঠিক জানিনে। বাইরে অন্ধকারটা জমাট নয়। আকাশ যেন কোন ঘোর রঙের চশমা পরে তাকিয়ে আছে। বাতাস যেন ভিজে কাঁথা পরে আমার চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করছে। দু'এক ফোঁটা জল আমার লেখাকে চুপসে দিচ্ছে। সেক্রেটারিয়েটের ঘড়ি আটটা হাঁকছে। শামাপোকা জোরালো বাতির চতুর্দিকে ঘুরছে। ডানাগুলো আস্বচ্ছ (অস্বচ্ছ নয়) ইংরিজিতে যাকে বলে ডায়েফনাস্।

সমস্ত জীবন কাটলো এই রকম একা বসে বসে।

আব্বু

।। কনিষ্ঠ পুত্রকে লেখা পত্র ।।

১৭।১০।৫৫

বাবা ভজ্জু,

তোমাকে নাকি ফিরোজ জিজ্ঞেস করলো—আমি যখন ঢাকায় গিয়ে তোমাদের আদর করছিলুম—'কবীর, তোর আব্বু কই ?'

আব্বু

উপরের পত্রগুলি যখন সৈয়দ মুজতবা আলী লেখেন, তখন তাঁর পুত্রেরা নিতান্তই শিশু। এ চিঠি তারা বড় হয়ে পড়বে, সেই আশাতেই লেখক লিখেছেন। প্রতি চিঠিতেই প্রবাসী পিতার বুভুক্ষু বাৎসল্য প্রকট। ফিরোজ—জ্যেষ্ঠপুত্র সৈয়দ মুশাররফ আলীর ডাকনাম, ভজ্জু—কনিষ্ঠ পুত্র সৈয়দ জগলুল আলী।

॥ শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তীকে (জরাসন্ধ) লিখিত পত্র ॥

(১)

প্রিয়বরেষু,

নববর্ষে আপনার সহী-সালামতের জন্য আল্লার দরগায় দোওয়া মাঙছি। আপনার "জরীন কলম" হ'ক, আপনি আরো বহু বহু বৎসর ধ'রে বাঙালীকে আনন্দ দান করুন, এটা আসল। তৎপর যা করে আসছেন, অর্থাৎ 'অপরাধ' কি, 'অপরাধী' কারে কয়, সে-সম্বন্ধে বাঙ্গালীকে চিন্তা করতে ও সহিষ্ণু হতে শেখান। আল্লার কসম, এগুলো আমার উপদেশ নয়। আমার হৃদয়ের কামনা, প্রার্থনা, আমি ভেবেছিলুম, আপনি আমার খোঁজ নেবেন। তা তো নিলেন না। অবশ্য আমারই কসুর অধিকতর। আসলে ব্যাপারটা এই, আমার বয়স ৬৪ (জন্মাষ্টমীর সূর্যাস্তে জন্ম !) এবং তার চেয়ে বেশী অথর্ব। উৎসাহের তোড়ে যদি বা আপনাকে pin down করলুম, তারপর সেটা আর follow up করতে পারলুম না।...৪।১।৭০ আবার রাজশাহী যাচ্ছি ধর্মপত্নী ও দুই সৈয়দজাদা (যথাক্রমে ১৭ এবং ১৫) সেখানে থাকেন, এটা আমার বাৎসিক 'হজ'।

পরশুদিন শচীনবাবুর ওখানে গিয়েছিলুম। তাঁর অজানতে দুখানা বই চুরি করে আনি। 'ন্যায়দণ্ড' তথা 'গল্প লেখা হল না'। পড়ে বড় আনন্দ পেয়েছি, বড় আনন্দ পেয়েছি। সে-কথা জানাবার জন্যই এই কার্ড। শেষের বইখানা বাবাজীউদের জন্য নিয়ে যাবো, জানেন বোধ হয়, আজকাল কোনো প্রকারের printed matter পাকিস্তানে নিয়ে যেতে দেয় না। ওদিকে বাবাজীবনরা আপনার, রাজশেখরবাবুর ভক্ত। 'সিব্রাম'ও ওদের ভারি পছন্দ। একদা মনে করতো 'সিব্রাম' greatest writer of Bengal. সে এক মজার ব্যাপার, বড় ব্যাটা ফিরোজকে একদিন বলেছিলুম, সিব্রামকে আমি চিনি। তাচ্ছিল্যি করে ব্যাটা বললেন, 'রেখে দাও ! তুমি আবার লেখক। সিব্রামদা তোমার সঙ্গে কথাই কইবে না।' আমি মনস্তাপ জানিয়ে সিব্রামকে আদ্যন্ত জানালুম। তারপর ফিরোজ ছুটিতে কলকাতা এলে তাকে সিব্রামের ওখানে নিয়ে গেলুম। সে এক দৃশ্য। সিব্রাম ফ্যালফ্যাল করে ফিরোজের দিকে তাকিয়ে, আর ফিরোজ মুগ্ধ নয়নে। সিব্রাম বেচারী ফিরোজের জন্য ফ্লুরি থেকে ফেব্রাদ্জীনির কেক কিনে এনেছিল। আমিও যে খুব একটা নিরেস লেখক নই সেটা সিব্রাম

একবার ফিরোজকে বোঝাতে গেলে সে with one murderous sweep of hands সেটা বন্ধ করে দিলে।…এবারে বলুন, কোন্ সাহসে ফিরোজকে বলি, আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে ?

৫নং পার্ল রোড গুণমুগ্ধ
কলিকাতা-১৭ সৈ. মু. আলী

---

(২)

Dec. 6/7 '71

শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদবরেষু,

আপনার ৬।৪।৭০এর চিঠি আমি পাই সিলেটে। দেশে ফিরে আসা মাত্রই মোকা জুটে যায় জর্মনি যাওয়ার। তারই তদ্বির- (কে যেন বলেছেন "একদা বসুন্ধরা ছিলেন বীরভোগ্যা, এখন তদ্বিরভোগ্যা।") তদারকির মধ্যিখানে—অবশ্য বিছানায় শুয়ে শুয়েই—আপনার সঙ্গে দু'দণ্ড রসালাপ করবো তেমন কিস্মৎ আমার ছিল না। তড়িঘড়ি ফের বিদেশ।

আপনি সহৃদয়। তাই আব্দুর রহমান—সেও বড্ডই দরদী ছিল—আপনার হৃদয়ে সরাসরি ঢুকে গেছে। আপনার মত কোনো সজ্জন যখনই তার প্রশংসা করেন তখনই আমার মনে বড় বেদনা জাগে, তার সম্বন্ধে তো আরো অনেক অনেক কিছু বলার ছিল, কিন্তু আপনি কৃতী লেখক, বিলক্ষণ অবগত আছেন, কোনো চরিত্র অঙ্কনে একটা অপটিমাম মাত্রা আছে। কিংবা বলতে পারেন, আপনার ("আমার" না বলে "আপনারই" বললুম, কারণ সে ছিল আমার দৈনন্দিন জীবনের ডালভাত আর আপনার কাছে সে রস-প্রতিম)। আবদুর রহমান আমার কাব্যের উপেক্ষিতা উর্মিলা। কিন্তু থাক। নিজের কথাই সাত কাহন !

বলতে ভুলে গিয়েছি, ঐ তিন মাসের সফর এ্যাসন তক্লীফদেহ্ হয়েছিল যে মাসাধিককাল অধম দণ্ডবৎ, লাঠ্যাবৎ (বিবেকানন্দ পন্থ) হয়ে শয্যাশায়ী। নয়া পুরনা বেবাক আলীপুর আমার কাছে বার্লিনের চেয়ের সুদূরতর। মধ্যিখানে নকশলাইট—আমার কাছে most welcome ! ড্যাং ড্যাং করে চলে যাবো।

আমার দুই ব্যাটা ১৮ এবং ১৬ আপনার লেখার—যাকে বলে Fan—grand-admirers. শুধু বড় ব্যাটা শুধোলে, "এই জরাসন্ধবাবু (আমার বাচ্চারা তাদের জননীর মত—['ত্যাম্নো তাই'] ঈষৎ Old-fashioned হিন্দু নামে "বাবুটা" হরবকৎ

জুড়ে দেয়) বললেন, "মার্কিন criminologist ওঁকে বললে এ দেশে born criminal নেই, (অপরাধ নেবেন না, আমার কথাগুলো ঠিক ঠিক মনে নেই; আপনার কেতাবখানাও নেই। বললে পেত্যয় যাবেন না, আপনার তাবৎ কেতাব কভু কড়ি ফেলে, কভু বা ফোকটে যোগাড় করেছি কিন্তু ধন্যি আমার চেলারা, তেনারা পঙ্গপালের মত আপনার বেবাক বই গিলে ফ্যালেন—except যেগুলো আমি কোন গতিকে বাবাজী ও তাদের গর্ভধারিণীর জন্য পাচার করি; জানেন তো পাকিস্তানে আমাদের তাবৎ বই ব্যান্ড্!) তার অর্থটা কি?" মা কালীর দোহাই দিয়ে বলেছি, আপনি ভাববেন না, আপনার লেখাতে কোনো এমবিগিটি—ঝাপসাপারা—ছিল। আপনার রচনা limpid, sparkling, flows like oil from a bottle. আমি বললুম, "বাবাজী, যখন কলকাতা আসবে (ভারত-পাক "লড়াইয়ের" পর ওদের পক্ষে এ দেশে আসা কঠিন হয়ে গিয়েছে) তখন তোমাকে চারুবাবুর কাছে নিয়ে যাবো। সেখানে মোকাবেলা করো।" "চারুবাবু! আমি বলছি জরাসন্ধের কথা।" আমি বললুম, "ঐ ঐ! যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিরন্নব্ব্ই। যাহা জরাসন্ধ তাহা চারুচন্দ্র।" তখন বলে কি জানেন, "ওঁর মত great writer তোমাকে কি তাঁর বাড়ীতে ঢুকতে দেবেন? অর্থাৎ টাপেটোপে বোঝালে I am a very poor writer; great writer—আপনি—আমাকে পাত্তা দেবেন কেন?

"ন্যায়দণ্ড" কেন আপনার কুল্লে বই আমার ভালো লেগেছে, লাগে এবং লাগবে। আপনি "জনপ্রিয়" থাকুন। বিদগ্ধদের জন্য মেলা উত্তম উত্তম লেখক যথা কালিদাস, দান্তে রয়েছেন। আমি বিদগ্ধ নই। আমি (উপস্থিত আপনার এফিডেভিট মাফিক মেনে নিচ্ছি, তর্কস্থলে, যে আমি বিদগ্ধ, কল্চর্ড্, হাইব্রাও, connoisseur, gourmet, comme its fant, যাবতীয়) আপনার ভাষা ও শৈলী (language & style) অর্থাৎ form, বিষয়বস্তু (content) দুইই বড্ড ভালোবাসি। তদুপরি আপনি a great raconteur = recounter.

৫নং পার্ল রোড
পোঃ সার্কাস এভিনিউ
কলিকাতা-১৭

গুণমুগ্ধ,
সৈয়দ মু আ—

।। শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্রকে লিখিত পত্র ।।

(১)

ভাই গজেনদা,

কাল বিকেলে তোমার ১১।১২ র চিঠি পেয়েছি। (১) পারতপক্ষে P. O. Bolpur ছাড়া বাকি ঠিকানাটা আদ্যন্ত বাংলায় লিখবে। ('ডক্টর'টা কিছুদিনের জন্য নামের পূর্বে জুড়ে দিয়ো। পাড়ায় ডাকঘরে আরেকটু পরিচিত হওয়ার পর drop করবে) কারণ আমাদের পাড়ার পিয়ন অল্পই ইংরিজি জানে। প্রায়ই অন্যলোকের চিঠি পাই, (যদিও typed) ; তার থেকে knowledge by inference, আমার চিঠিও অন্যের বাড়ি যায়। পরস্ত্রী আমার কাছে আসুক··· etc. etc. এই knowledge by inference সংস্কৃতে রসিয়ে দেওয়া আছে।

(ক) দেবদত্ত মোটা

(খ) দেবদত্তকে কেউ কখনো দিনের বেলা খেতে দেখেনি (অতএব knowledge by inference) ;

(গ) দেবদত্ত রাত্রে খায়।

(২) অবধূতের কিছুটা ছাপা হলেই পাঠাবে বুঝেছি, অন্য উপদেশ পরামর্শও বুঝেছি। কিন্তু যতদিন না আসে, বলতে পারো, বিষয়বস্তুটা কি? মনে হচ্ছে 'হিমালয়-ভ্রমণ'—তা ছাড়া ?

(৩) 'পৌষ ফাগুনের পালা' তুমি খুব সম্ভব আমাকে এযাবত দাওনি। এবারে বীবীর ওখানে তালাশ করে দেখলুম যে কটা একবার দিয়েছিলে সেগুলো তখনই পড়া হয়ে যায়, এক 'পৌষ ফাগুন' তার সঞ্চয়নে নেই। অতএব পাঠিয়ে দিলে পড়বো নিশ্চয়ই—অবশ্য অবসর মত দিন পনেরোর ভিতর।

(৪) Same applies to 'সোহাগপুরা'।

কিন্তু দাদা, মতামত দিতে আমার বড় বাধো বাধো ঠেকে। তোমার মত কুতুবমিনারী লেখকের প্রশংসা করা বিড়ম্বনা, তোমার লেখা অপছন্দ করার অর্থ, আমার রুচির অভাব। এক মার্কিন নাকি লণ্ডনে Titianএর ছবি দেখে বউকে বলে, "Gee, I don't think I like that one." পাশে দাঁড়িয়েছিল একজন গাইড। বললে, "Sir, Titian is not being tested ; your taste is being tested !"

তবেই কও, এই ডিলেমার সল্যুশন কি ? By the way, before I end, যে কোনো দিন abruptly তোমাকে, ভানুকে সবাইকে চিঠি লেখা হয়তো বন্ধ হয়ে যাবে—আমার অনিচ্ছায়। কেন, শুধোলে উত্তর বড় দীর্ঘ হবে। তখন চটো না।

নীচুপটি আ

পোঃ বোলপুর

বীরভূম।

(২)

ভাই গজেনদা,

তোমার বই পড়ছিলুম। বহুকাল পূর্বে (1921) দ্বিজেন্দ্রনাথ 'বড়বাবু' আমাকে বলেন, 'কথাটা "কষ্টে সৃষ্টে" নয় ; হবে "কষ্টে শ্রেষ্টে"।' তিনি কি কি যুক্তি দিয়েছিলেন আজ আর মনে নেই। আমার মনে হয় 'কষ্টে সৃষ্ট' না হয় বোঝা গেল, কিন্তু 'কষ্টে সৃষ্টে'-র 'এ'কারটা এল কোত্থেকে ? তদুপরি by itself 'কষ্টে সৃষ্টে' ঠিক মানে কি ধরে ? আমরা আজকাল তো বুঝি 'অতিকষ্টে'। এবং 'অতিকষ্টে' সক্ষম হয়েছি অর্থাৎ 'সৃষ্টি' করেছি। তাহলে তো, 'অতি কষ্টে সৃষ্টে কাজটা করতে পেরেছি' অর্থ দাঁড়ায়, 'অতি কষ্টে সৃষ্ট সৃষ্টি করেছি। ডবল ডবল পুনরাবৃত্তি। অথচ 'কষ্টে শ্রেষ্টে', 'সুখে দুঃখে', 'হাসি কান্নায়', 'তকলীফে বেতকলীফে' কাজটা সেরেছি—এটাই তো ভালো।

তাই তোমার বইয়ের (পৌষ-ফাগুনের পালা) p. 524, line 4-এ গাঁইয়া উচ্চারণে 'কষ্টসৃষ্ট' নূতন করে প্রশ্নটা মনে তুললো।

তুমি এসব শব্দ সমাস নিয়ে মাথা ঘামাও, তাই আরেকটা বলি : 'চুল চেরা' বোধহয় আসলে ছিল 'চুন্-চেরা'—ফার্সীতে আছে—ঐ একার্থে। 'কখন' ? 'কেন' (চেরা) ? বলে অযথা সূক্ষ্মতর্ক করা। 'ন'টা কি ভুলে 'ল' হয়ে গিয়েছে ! অবশ্য 'চুলচেরা' by itself সুন্দর image মনের চোখে আনে—কিন্তু সংস্কৃতাদিতে এর নজীর নেই !

Happy New year

আ।

পুনঃ 'ব্যবহারিক (না ব্যাবহারিক ?) শব্দকোষ' সম্বন্ধে আমার সতর্কবাণী পেয়েছ ? উত্তর কই ?

॥ শ্রীনারায়ণ সান্যালাক লিখিত পত্র ॥

প্রিয়বরেষু

আজকের ভাষায় যাকে বলে 'রসোত্তীর্ণ', আপনার 'সত্যকাম' তাই হয়েছে কিনা সে বিচার না করে প্রথমেই বলি, এই obscurantism ও revivalism-এর যুগে আপনি এ-পুস্তক লিখে বাঙালী হিন্দুর চোখে জ্ঞানাঞ্জন লাগাবার চেষ্টা করেছেন। সে যদি—অঞ্জন মাখতে না চায়—আশা করি ইতিমধ্যে ভট্টপল্লী তথা নবদ্বীপের স্মার্ত সমাজ par excellence আপনাকে হুনো দেননি—তবে সে-দোষ আপনার নয়। এখনো যে দেশে বারেন্দ্ররাঢ়ী-বৈদিকে সহজে বিয়ে হয় না; পূর্ববঙ্গের শরণাগত গুহ রাঢ়ী ঘোষ-বোস দ্বারা কুলীন বলে স্বীকৃত হয় না, কায়েত মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বামুন বাড়ী গেলে—এবং এ ব্যাটাদের তিন পুরুষের কেউ সন্ধ্যাহ্নিক করেনি কিঞ্চি এ-পুরুষ পঞ্চমকারে আকণ্ঠ নিমগ্ন—খড়ম পেটা হওয়ার সম্ভাবনা, বিয়ের মরশুমে যে-সব নিমন্ত্রণ পত্র আসে সেগুলো আমি খুঁটিয়ে খুটিয়ে দেখি, কটা অসবর্ণ বিয়ে হল তার শুমারী, % রাখার চেষ্টা করি। আমার এক অনুজপ্রতিম বারেন্দ্র (আপনারই মত সান্যাল) মুখুয্যে 'শাদী' করেছে। সে-দেশে সত্যকামের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রতি ধর্মভীরু দ্বিজের কর্তব্য। আপনি সেই কর্মটি অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করেছেন। আপনাকে অভিনন্দন জানাই, শতংজীব, সহস্রংজীব, শঙ্কর আপনাকে জয়যুক্ত করুন!

আপনি আদৌ ভাববেন না, আমি কৌলিক ঐতিহ্য তথা আচার-অনুষ্ঠান বাবদে চার্বাক পন্থী। কিন্তু সে কাহিনী এখানে তুলবো না।

সত্যকাম তথা অন্য বহুবিধ কারণে যে সব ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের উপনয়ন হয়নি, (অর্থাৎ, বিশেষ করে, যে-সব অব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণ পর্যায়ে তুলতে হবে) তাদের নিয়ে 'ব্রাত্য'—সে তো আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন। এক জর্মন পণ্ডিত ঝাড়া বিশটি বছর খেটে (কারণ ব্রাত্যদের সম্বন্ধে তথ্য হেথা হোথা সর্বত্র ছড়ানো) পাঁচশ পাতার কেঁদো কেতাব লেখেন, নাম স্রেফ ব্রাত্য। আমার বড়ই বাসনা ছিল, কেউ বইখানার অনুবাদ করে। হিন্দু উপকৃত হত। দেখতো সে একদা কতখানি dynamic, catholic ছিল, শুধু যুক্তি দিয়ে বিচার করতো না (আপনার কথায় 'যে সত্যের পিছনে, শিব সুন্দর নেই'—সেটা বেকার)

হৃদয়ের logic'ও শুনতো, বলতো: 'If tradition (স্মৃতি) help us, good ! If not, without it—and so much the better !' আর আজ !

আপনি সত্যকামের কাহিনী বললেন (আজকার দিনের লোক উপনিষদ মাথায় থাকুন, রবিঠাকুরও পড়ে না—তাই 'উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন' লাইনগুলো কেতাবের পয়লা বা আখেরে দিলে ভালো করতেন, মায় উপন্যাসটির নাম), রামমোহনও শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে সতীদাহ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, agnostic বিদ্যেসাগরও শাস্ত্রের দোহাই দেন। তখন বঙ্কিম (for whose religious views I have little understanding, except that কৃষ্ণচরিত্র which is a mervellously written book with a very wrong thesis to prove !) তাঁকে লেখেন, আপনি শাস্ত্রের আশ্রয় নিচ্ছেন কেন ? শাস্ত্র কেউ মানে না। মানে লোকাচার। আপনি তাই Humanitarian grounds-এর উপর নির্ভর করুন।' বিদ্যাসাগর খুব সম্ভব কোনো উত্তর দেন নি। তিনি জানতেন, শাস্ত্রের বরাৎ দিলে তবু বা কিছু হতে পারে। Rational, humanitarian consideration have precious little chance.

অর্থাৎ Voltaire-এর যুগ এই পোড়া বাঙলাদেশে এখনো আসেনি ! আমরা জানা মতে ১নং চৈতন্য, ২নং বিবেকানন্দ—সাহস যা দেখাবার, to rebel against শাস্ত্র, এঁরাই কিছুটা দেখিয়েছেন।

মুসলমানের ভিতর, গোড়ার দিকে, কিছুটা দেখান আকরম খান। মোল্লাদের হুনো খেয়ে সে-বই আর reprint করেন নি। নজরুল ইসলাম গোড়ায় বিদ্রোহী, শেষের দিকে very traditionalist !

এবারে আপনি একটু Voltaire পড়ুন। বিশেষ করে CANDID.

আপনার গল্পের প্লটটি যদ্যপি উপনিষদ থেকে নেওয়া তথাপি ইটিকে সম্পূর্ণ অভিনব না বললে পাপ হবে। Very dexterously managed.

আপনার গল্প বলার ধরনটি চমৎকার। আপনি excellent raconteur.

তবে এ পুস্তকে romantic রাজবাড়ীর রোমাঞ্চকর ঘটনায় হঠাৎ ছেদ টেনে স্মার্ত নৈয়ায়িক পরিবারের দীর্ঘ কাহিনী সাধারণ পাঠককে খুশী করবে না। সে ওটা skip করবে। আম্মো করেছিলুম। তবে—অন্তত আমার কাছে—স্মার্ত যে কি করে নৈয়ায়িক হয়—Contradiction মনে হয়—সেটা দেখবার জন্য ফিরে এসে সেটি পড়ি। মন দিয়ে। কারণ এতে আমার personal interest আছে।

আমার যদ্দূর জানা, বৈশেষিক বৌদ্ধ জৈন চার্বাকপন্থীদের বাদ দিন ; এক বেদান্ত ছাড়া আমাদের সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, মীমাংসা সবকটাই ঈশ্বরকে ignore করে (ন্যায়), 'প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ' (সাংখ্য), বা God-কে Special position দেয় না। ন্যায়ের ভিৎ সাংখ্য ও বৈশেষিকের উপর! আর স্মৃতি তো দর্শন নয়—নিছক theology (মাকড় মারলে ধোকড় হয়!) প্রকৃত নৈয়ায়িক স্মৃতিকে বিলকুল উপেক্ষা করে। কারণ স্মৃতি নির্ভর করে entirely on আপ্তবাক্য, authority-র ডাণ্ডা! ন্যায়ের প্রথম starting point (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান (inferance e. g. ক) দেবদত্ত মোটা খ) দেবদত্ত দিনের বেলা খায়—গ) অতএব 'অনুমান' (I infer) দেবদত্ত রাত্রেও খায়, ৩) উপমান 'শব্দ' (credible testimony, যেটাকে 'শাস্ত্র' 'আপ্তবাক্য' 'সংহিতা' বলতে পারেন, এবং সেটা স্মৃতির the starting point, ('কস্যচিৎ ভাইপোস্য' বেনামিতে বিদ্যেসাগরের একটি humorous লেখাতে এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাবেন। সেখানে বড় ভাই নৈয়ায়িক, ছোট ভাই স্মার্ত। দুজনাকে নিয়ে রগড়।)। হ্যাঁ, আলবৎ, হিন্দুসমাজে বাস করতে হলে লোকাচার মানতে হয় তাই পাঁড় নৈয়ায়িকও অসবর্ণে বিয়ে দেয় না, সগোত্রে বিয়ে করে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু পট্টন্তরী তথা লোকাচারের অন্যান্য গোঁড়ামির Care করে না, অর্থাৎ সমাজপতি স্মার্তরা যতক্ষণ না খড়্গহস্ত হয়ে তার হুঁকো জল বন্ধ করার ভয় না দেখান। এঁরাই হচ্ছেন typical নৈয়ায়িক। আপনি বলবেন, আপনি স্বচক্ষে দেখেছেন, নৈয়ায়িক পাঁড় স্মার্তের মত পট্টন্তরী নিয়ে মাথা ফাটাফাটি করছে। আমি বলবো, 'আম্মো দেখেছি, মেড়ো লণ্ডনের খানদানী Dorchester হোটেলে হাত দিয়ে খানা খেয়ে টেবিলক্লথে হাত মুছছে।' কিন্তু Dorchester হোটেলের বর্ণনাতে সেটা typical নয় সেটা accidental (যেমন, প্রেমের triangle সৃষ্টি করে, সমস্যা সমাধান করতে না পেরে লেখক একজনকে মোটর অ্যাকসিডেণ্টে মেরে ফেললেন। ব্যস, সমস্যার সমাধান ভেল! আমি বললুম, 'এটা আবার কি?' লেখক গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'কেন, মানুষ মোটর দুর্ঘটনায় মরে না?' তুলনাটা টায়টায় মিললো না ; মোদ্দা—reality is no criterion for artistic achievement ('রসোত্তীর্ণ হওয়া')।

আচার্য গোষ্ঠিকে নবন্যায়ের পণ্ডিত না করে খাঁটি স্মার্ত করলে এ ঝামেলা হত না। আচার্য গৌতম তো নৈয়ায়িক ছিলেন না—অবশ্য ন্যায় শাস্ত্রের তখন জন্মই হয় নি।

তা সে থাক! এটা অত্যন্ত বাহ্য। কেন যে আমি উল্লেখ করলুম জানিনে। বোধ হয় 'বিদ্যে' ফলাবার জন্য। কিংবা আপন নৈয়ায়িক গুরুর স্মরণে। পথ দিয়ে যেতে যেতে সরস্বতী পুজোর বহ্বাড়ম্বর তথা বাহ্যাড়ম্বর দেখে তিনি মুখ ফিরিয়ে আমাকে বলেন, 'বর্বর, অনার্য, দ্রাবিড়সম্ভূত!' আমি বললুম, 'স্বয়ং শংকরও তো সাকারকে দ্বিতীয়স্থান দিয়েছেন।' তিনি বললেন, 'তাঁর গুরু ছিল বৌদ্ধ, আর সে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ।' আমি বললুম 'তাতে তো আপনার খুশী হওয়ার কথা। ভগবন! আপনিও ভগবানের থোড়াই পরোয়া করেন—বৌদ্ধদের মত।' তিনি বললেন, 'ওরে মূর্খ! তোর কিচ্ছু হবে না। তোর শাস্ত্রচর্চা বন্ধ্যা-গমন, ন দেবায় ন ধর্মায়।' (সেই দিনই প্রথম শিখি, এস্থলে 'ন ধর্মায়' বৌদ্ধ ধর্মকে refer করে, অর্থাৎ আমার শাস্ত্রচর্চা (হিন্দু) 'দেবায়' কাজে লাগবে না, (বৌদ্ধ) 'ধর্মায়'ও না।

আবার বলি এটা অত্যন্ত বাহ্য।

আলী

নীচু পট্টি,
বোলপুর

॥ শ্রীযুক্ত বোপদেব শর্মাকে (জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) লিখিত পত্র ॥

(১)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

'যে কোন নিশ্বাসে' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আপনি লিখেছেন, 'যদি অর্থের সন্ধান কর, রসের সন্ধান কর, আওয়াজের অন্তরালে কোন ধ্বনি-ব্যঞ্জনার সন্ধান কর, তা হলেই তুমি প্রতিক্রিয়াশীল ফিলিস্টাইন প্রমাণিত হয়ে যাবে।'

অতিশয় খাঁটি কথা।

কিছুকাল পূর্বে আমি একখানা বিদেশী জর্নলে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ পড়ি। নাম ছিল, বোধ হয়, **Lady Chatterly's lovers. Lady Chatterly** অশ্লীল কিনা সেই সম্পর্কে যে মোকদ্দমা হয় এবং তার পটভূমি নিয়ে তথ্যবহুল, ধীর, সংযত প্রবন্ধটি।

তাতে আছে, আদালত উকীল মক্কেল তাবৎ সজ্জন যখন শ্লীল অশ্লীলে পার্থক্য করার মত সংজ্ঞা পেলেন না তখন তাঁরা বললেন, "শুধোও সাহিত্যিকদের, তারা কি বলে"।

তারপর লেখক বলেছেন, 'সাহিত্যিকদের বেশীর ভাগই সরল চিত্তে স্বীকার করলেন, সেরকম কোনো **dividing line**-এর সংজ্ঞা তাঁরা দিতে অক্ষম।'

তারপর লেখক বলেছেন, 'কিন্তু একদল ঝানু সাহিত্যিক আছেন তাঁরা জানেন, অশ্লীলতম রচনাকেও (যেটা নিয়ে কারো মনে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়) যদি তাঁরা ঘুণাক্ষরে অশ্লীল বলেন, তবে সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক চেঁচিয়ে উঠবে—(এবারে আপনার ভাষাতেই বলি, তুমি 'প্রতিক্রিয়াশীল ফিলিস্টাইন'।—এটা কিন্তু মিনিমামেস্ট !) "এরা—ফাসিস্ট, হিটলেরাইট, ইমপেরিয়ালিস্ট, এবং (হালের বুলি) কলনিয়ালিস্ট"।' এই দলের পিছনে আছেন কিছু কমুনিস্ট এবং কিছু অন্তত আমেরিকার পুস্তক প্রকাশক (এবং বিশেষ করে পর্ণগ্রাফির) সম্প্রদায়।

আঁদ্রে জিদ একবার কমুনিস্টদের সমালোচনা করে বেধড়ক মার খান। উপরে বর্ণিত 'ঝানু সাহিত্যিকরা' সেই তত্ত্বটি জানেন, এবং 'ফাসিস্ট' নামে পরিচিত হতে চান না।

Obscurantism-এর বিরুদ্ধে লেখা দুটি প্রবন্ধ আমার জীবনকে **richer** করেছে। একটি আনাতোল ফ্রাসের **Life and Letters**-এ আছে, দ্বিতীয়টি

Edmand Wilson-এর লেখা এলিয়টের সমালোচনা। ফ্রাঁসের সেই আপ্তবাক্য পুনরায় স্মরণ করি : I have passed the age when one loves what one does not understand—I love light. নমস্কার জানাবেন। কাগজ খতম।

গুণমুগ্ধ

শান্তিনিকেতন। সৈ. মু. আলী

পুঃ বড়বাবু (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বলতেন, to imitate-এর বাংলা 'অনুকরণ'; to ape-এর বাংলা 'হনুকরণ'। এ দেশে বিলিতির 'হনুকরণ' হচ্ছে।

(২)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার পত্রের সর্বশেষে আছে, 'আপনাদের প্রতিষ্ঠা কি এতই ঠুনকো জিনিস যে পাঁচজন অর্বাচীনের হাততালি না পেলেই তার বনেদ ধ্বসে যাবে।'

এতে প্রথম ইঙ্গিত আছে, আমি সাহিত্যিক (এটা উপস্থিত আমি মেনে নিলুম ১, (২) আমার প্রতিষ্ঠা আছে, (৩) সেটা বাঁচাবার জন্য আমি অর্বাচীনদের হাততালি খুঁজে বেড়াই। এই তিন নম্বরের ইঙ্গিতটা হে সৌম্য, ভালো করে না জেনে কি করা উচিত?

এখন বক্তব্য, আপনি চান, সাহিত্যিকেরা স্পষ্ট ভাষায় বলুন যে অধুনা সর্ব সাহিত্যে যে Obscurantism চলছে সেটা সাহিত্য নয়, ও পথে চললে সাহিত্যের সর্বনাশ হবে। এই তো? আশা করি আমি আপনার মুখে এমন কোনো কথা চাপাইনি যেটা আপনার বক্তব্য নয়।

অর্থাৎ আপনি চান, সাহিত্যিকরাই সাহিত্যের গতি নির্দেশ করুন।

তাহলে নিবেদন, সাহিত্যে থাকে রস, এবং সেই গোড়ার জিনিস নিয়ে আলোচনা করেন, আলঙ্কারিকেরা। তাঁরা বলে দেন কোনটা উত্তম রস, উত্তম সাহিত্য, আর কোনটাই বা অধম।

আলঙ্কারিক ভরত থেকে আরম্ভ করে অভিনব গুপ্ত ইত্যাদি—এঁরা কি

সাহিত্যিক ছিলেন ? এঁরা কি কাব্য, নাট্য, আখ্যান, উপাখ্যান, মহাকাব্য ইত্যাদি প্রথম লিখে নিয়ে নাম করে ফেলে তবে সাহিত্যের গতি নির্দেশে হাটে নেমেছিলেন ? আমার যতদূর জানা, এঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। (Creative মাল)। অবশ্য এঁদের কারো কারো লেখা সরস, কিন্তু তবু তাঁদের সাহিত্যিক বলি না, বলি আলঙ্কারিক। ৺সুরেশ সমাজপতি, অতুল গুপ্ত এঁরা সাহিত্য সৃষ্টি (Creative সাহিত্য) করেছেন বলে জানিনে।

ইয়োরোপীয় সাহিত্যগুলির ইতিহাস তথা ইউরোপীয় আলঙ্কারিকদের কথা আমি বড় একটা জানিনে (আমি সমস্ত জীবন, ধর্ম, দর্শন, শব্দতত্ত্ব নিয়ে কাটিয়েছি)। কিন্তু আপনি বলতে পারবেন, প্লেটো থেকে আরম্ভ করে ক্রোচে পর্যন্ত, এঁদের কজন Creative liteature সৃষ্টি করে, সাহিত্যিক নামে প্রখ্যাত হওয়ার পর, 'অর্বাচীনদের হাততালি' উপেক্ষা করে সাহিত্যের গতি নির্দেশ করে গেছেন।

আব্দুল করীম খান, ফৈয়াজ খান ইত্যাদি বড় বড় গাওয়াইরা যে ফিল্মি গানার বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লেখেন নি, কিংবা বক্তৃতার কেম্পেন করেননি সে কি 'অর্বাচীনের হাততালি' থেকে বঞ্চিত হওয়ার ভয়ে ? পাঠান মোগল আমলেও দেখতে পাই, চিত্র স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তাঁদের ইতিহাস-লেখকরা, এঁরা এমারৎ বানাতেন না।

মাইকেল আঞ্জেলো, রাফায়েল ইত্যাদি বড় বড় ভাস্কর চিত্রকরদের ক'জন বাৎলে দিয়েছেন ঐ সব কলা কোন্ পথ দিয়ে যাবে। সব যুগেই নিকৃষ্ট আর্ট, নিকৃষ্ট movement in art থাকে। এঁরা কি তখন পোলেমিক লিখেছিলেন !

এবারে একটি অতি নিকৃষ্ট উদাহরণ দেই—পাচক এবং ভোজনরসিক কি একই ব্যক্তি ? আমার অগ্রজের মত ভোজনরসিক (তিনি খান অতি অল্প, বলেন, 'আমি পেটুক নই'—এটা অবশ্য এস্থলে অবান্তর) আমি ত্রিজগতে দেখিনি। তিনি ডিম সেদ্ধ করতেও জানেন না। আমার মা অতিশয় নিপুণা পাচিকা ছিলেন। হালের চপ-কাটলিস, পুডিং-মাডিঙের বিরুদ্ধে তিনি প্রবন্ধ লেখেন নি।

বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে আমার কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই, কারণ পূর্বেই নিবেদন করেছি, সাহিত্যের তথা লিটারারি ক্রিটিসিজম এবং এসথেটিকসের সঙ্গে আমার পরিচয় অতি অল্প। আবছা আবছা মনে হয় ; যাঁরা সাহিত্যসৃষ্টি করেন তাঁরা জানা-অজানাতে আপন আপন 'স্কুলের' সমর্থন করে সাহিত্যের গতি নির্দেশ করতে

বাধ্য, অর্থাৎ নিরপেক্ষ থাকতে পারবেন না। পক্ষান্তরে যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেন না, কিন্তু সাহিত্যরস আস্বাদন করেন তাঁরাই এ-কাজের উপযুক্ত—আমার আবছা-আবছা বিশ্বাস ইতিহাসের হেথা-হোথা ব্যত্যয় থাকলেও প্রধানত সাহিত্য-রসিকরাই সাহিত্যের গতি নির্দেশ করার চেষ্টা করেছেন (তাতে কোনো ফল হয়েছে কিনা তাও জানিনে)। আপনি একটু চিন্তা করে জানাবেন। ইতিমধ্যে অতিশয় অনিচ্ছায় সবিনয় নিবেদন, আল্লা সামনে, আমি সস্তা দামী কোনো হাততালির জন্য কখনো লিখিনি। তবে একথা নিশ্চয়ই সত্য, আমি পণ্ডিত-জনদের জন্য লিখেছি অতি অল্পই। প্রধানত লিখেছি সেই ম্যান ইন দি ষ্ট্রীটের জন্য, যে হয়ত সামান্য ইংরিজি জানে, বাংলাটা মোটামুটি বুঝতে পারে এবং সিরিয়স বই পড়তে নারাজ। হঠাৎ মনে পড়ল দশম শতাব্দীর কবি আব্দুর রহমান (অদহমান) তাঁর কাব্য, অপভ্রংশে লেখা সন্দেশ রাসকে বলেছেন, 'পণ্ডিতজন কুকবিতার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন না, আর অজ্ঞজন অজ্ঞতাবশত কবিতায় প্রবেশ করে না। এজন্য যে মূর্খ নয়, এবং পণ্ডিতও নয়, অর্থাৎ মধ্যম শ্রেণীর, আমার এ কাব্য তার জন্য।'

আপনি যদি এ কাব্য খানা পড়ে না থাকেন তবে দয়া করে জোগাড় করে নেবেন। Quite apart from our present discussion, এরকম উত্তম কাব্য আমি জীবনে কমই পড়েছি। আব্দুল রহমান কৃত সন্দেশ রাসক edited by হজারী প্রসাদ দ্বিবেদী, হিন্দী গ্রহরত্নাকর লিমিটেড, হীরাবাগ, বোম্বাই-৪)।

এবং finally বলুন তো, আমার নিজের প্রতি আমার যা কর্তব্য আছে সেটা পোলেমিকে ঢুকে সফল হবে, না, যেটুকু সময় পাই সেটা সৃষ্টি কর্মে (তা সে ভালো হক মন্দ হক) লাগালে। আমাকে আক্রমণ করে এ যাবৎ যে সব incompetent লেখা বেরিয়েছে আমি তো তার একটারও উত্তর দিইনি। তাতে সময় নষ্ট, শক্তিক্ষয় এবং সব বেফায়দা।

আমিও শারীরিক কুশলে নেই। বিশ্বভারতীতে চাকরী নিয়ে আমার সর্বনাশ হয়েছে।

আশা করি আপনি কুশলে আছেন। সশ্রদ্ধ নমস্কার জানবেন।

শান্তিনিকেতন।

গুণমুগ্ধ
সৈয়দ মুজতবা আলী

॥ প্রাণতোষ ঘটককে লিখিত পত্র ॥

Indian council for
cultural relations

২১শে সেপ্টেম্বর '৫০

প্রিয়বরেষু,

আসবার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারিনি—তখন কলকাতায় বড্ড ডামা-ডোল। এমন কি হাওড়া হয়েও আসিনি; এসেছিলুম দমদম হয়ে এ্যারোপ্লেনে।

এসে অবধি প্রায়ই ভেবেছি আপনাকে লিখি কিন্তু গোড়ার দিকে কাজে ব্যস্ত ছিলুম এবং শেষের দিকে দিল্লীর বাতাবরণের চাপে এমনি নির্জীব হয়ে পড়ি যে আর কোনো কাজে মন যায় নি—সামান্যতম চিঠি লেখাতে পর্যন্ত না।

মৌলানা সাহেব আমাকে কলকাতা থেকে ধরে নিয়ে আসেন উপরের প্রতিষ্ঠানটির সেক্রেটারি রূপে। আমার অপরাধ আমি আরবী, ফার্সী এবং ফরাসী জানি। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান (এবং বর্তমানে একমাত্র) কর্ম হচ্ছে আরবী-ফার্সী-তুর্কী-ভাষী মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংস্কৃতিগত যোগসূত্র স্থাপনা করা। দিল্লীর পররাষ্ট্র বিভাগ ভাষা এবং অন্যান্য বিষয়ে অজ্ঞতা বশতঃ এ-কর্মটি করতে পারেন নি বলে মৌলানা সাহেবের শরণাপন্ন হন। মৌলানা সাহেবের জন্ম মক্কায়, পড়াশোনা করেন অজহরে কাইরোতে। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সব ভাষাই জানেন এবং অতি উত্তম আরবী লিখতে পারেন।

উপস্থিত আমরা একখানা আরবী ত্রৈমাসিক চালাচ্ছি। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ করে মিশর এবং ইরাকের কৌতূহলের অন্ত নেই—আমরা সেই কৌতূহলের উপর নির্ভর করে ভারতবর্ষের সনাতন বাণী এবং পরবর্তী যুগের কৃষ্টি সামঞ্জস্য এবং বর্তমান যুগের গান্ধী রবীন্দ্রনাথ তাঁদের সম্মুখে পরিবেশ করবার চেষ্টা করছি। সাধারণের মনোরঞ্জন করবার জন্য পঞ্চতন্ত্র অনুবাদ করছি (পঞ্চতন্ত্রের কিয়দংশ একাদশ শতাব্দীতে 'কালিয়া দিমনি' নামে আরবীতে ও 'ইয়ার-ই-দানিশ' নামে ফার্সীতে অনূদিত হয় এবং সেই সময় থেকে এই বই মধ্যপ্রাচ্যে 'আরব্য-রজনী'র মত জনপ্রিয় হয়ে আছে)।

তুর্কীতে সংস্কৃতের অধ্যাপক আছেন; আমরা ইরানে একজন সংস্কৃতের অধ্যাপক পাঠিয়েছি। কাইরো, বাইরুৎ, দমস্কস, বাগদাদেও পাঠাবার বাসনা রাখি।

তা ছাড়া ছাত্র-পাঠানো, বিদেশী ছাত্রের আমন্ত্রণ, ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ,

কলা-নিদর্শনের ফিল্‌ম ও ল্যাণ্টার্ন-স্লাইড, সঙ্গীতের রেকর্ড, বেতার-যোগে যোগাযোগ স্থাপনা—এসব বিস্তর কাজ সামনে পড়ে আছে। ভারতবর্ষের মৌলবী মওলানারা আমাদের কাজে সাহায্য করছেন,—পূর্বেই বলেছি বিদেশ থেকেও কৌতূহলের' উৎসাহ পেয়েছি।

আসছে বছর দক্ষিণ পূর্ব-এশিয়া বিভাগ খোলা হবে। তখন কাজ হবে, সিংহল, বর্মা, মালয়, থাই এবং ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করা। তারপর ক্রমে ক্রমে চীন-জাপান, পশ্চিম ইয়োরোপ ও আমেরিকা।

ঈষৎ অবান্তর, তবু বলি—ইংলণ্ডে কোনো বুদ্ধ, মহাবীর, চৈতন্য, গাঁধী জন্মাননি তবু Brilish Council for Cultural Relations প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আর আমাদের কর্তারা উপস্থিত একলক্ষ টাকা খরচ করছেন। ওদিকে ইংরেজ দু'শ বৎসর ধরে বিদেশে আমাদের মুখে বিস্তর কলঙ্ক প্রলেপ প্রাণপণ 'প্রেমসে' লেপেছে—তার বিরুদ্ধে লড়তে হলে কত টাকার প্রয়োজন বিবেচনা করুন!

যাক্—আপনাকে আর পাঁচালী শোনাবো না—পূজোর হিড়িকে নিশ্চয়ই বড্ড ব্যস্ত আছেন।

তবু দিনকাল কি রকম কাটছে জানাবেন। আমি মাসিক দৈনিক বসুমতী বহুকাল হল দেখিনি—বাংলা বলতে এখানে 'দেশ' 'আনন্দবাজার' আর 'সত্যযুগের' সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝলকের তরে দর্শন হয়। 'আনন্দবাজার' ইত্যাদি দৈনিক হাওয়ায় আসে এবং এখানে অপরাহ্ণ তিনটের সময় বিলি হয়।

এখানে বাসা পেয়েছি Constitution House-এ। পার্লামেণ্টের মহামান্যবর সদস্যরা এখানে সেশনের সময় বাস করেন। এঁরা M. P.; কেউ বলে 'মহাপুরুষ' কেউ বলে 'মহাপাপী' কেউবা বলে 'মহা-পাষণ্ড'। খোদায় মালুম, কোনটা ঠিক।

আশা করি কুশলে আছেন।

মুজতবা আলী

102 Constitutin House
New Delhi—1

(২)

২৮।১।৫৭

সদন্তঃকরণেষু,

আপনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, আপনি জানেন। কিন্তু উপস্থিত শোকাতুর হয়ে আছেন বলে নিবেদন করছি ;—

অশৌচ ও শ্রাদ্ধ-শান্তির ব্যবস্থার গূঢ় অর্থ, অশৌচের ক'দিন শোক করার পর, শ্রাদ্ধ শান্তি করে পুনরায়, সাধারণের মধ্যে আপন স্থান গ্রহণ করবে। শোকের অন্ত নেই, তাই পাছে মানুষ ক্রমাগত শোক করে করে তার কর্তব্য অবহেলা করে তাই শাস্ত্রকার ক'দিন পর দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যাবে তার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণের, অর্থাৎ তার জ্ঞান আছে বলে, আশা করা গিয়েছে, সে অল্পদিনেই মন বেঁধে কর্তব্য-কর্মে ফিরে যেতে পারবে—তাই তার অশৌচ (period of mourning) সব চেয়ে কম। পাছে না জেনে কেউ তাকে কোনো প্রকারের পীড়া দেয় তাই ঐ সময়ে শোকাতুরকে বিশেষ বেশ পরতে হয়—ইংরেজ যে রকম কালো পোশাক পরে, কিম্বা বাহুতে কালো পটি বাঁধে।

অতএব এখন কাজকর্মে মন দিন। কর্তব্য কঠোরতর হল, সাহায্য কমে গেল। কিন্তু দয়াময় চরম সহায়।

আমি কর্মে উপস্থিত থাকার জন্য বৃহস্পতিবার কলকাতা আসার ব্যবস্থা করেছিলুম কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পুনরায় দাঁত নিয়ে শয্যাশায়ী হলুম। কাল শেষ injection নিয়েছি। তবে আশা করি শীঘ্রই দেখা হবে।

আপনার

শান্তিনিকেতন সৈয়দ

(৩)

২১।২।৫৭

প্রিয়বরেষু,

আপনি আমি একই সময়ে চিঠি লিখেছি ; আশা করি আমারটা পেয়েছেন। সেটাতে দৈনিক বসুমতীতে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করার বাসনা রাখি তার কিঞ্চিৎ ইঙ্গিত ছিল।

লোহার ব্যবসাতে আপনাকে একদিন যেতে হবে সে-কথা আমি জানতুম কিন্তু এত শীঘ্র, সেটা ভাবিনি। এতে আপনি বিচলিত হবেন না। রবীন্দ্রনাথ

যদি পাট্টা কবুলীয়ৎ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কয়লা বেলচা নিয়ে বছরের পর বছর কাটিয়ে থাকতে পারেন তবে আমরাই বা এত নিরাশ হব কেন ? তবে আপনার এই ব্যবসা থেকে একদিন বেরনো আপনার পক্ষে হয়তো কঠিন হতে পারে। ভীষ্মদেব শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠিরকে বলেছেন, যে ব্যক্তি বৃক্ষের উচ্চ শাখাতে আরোহণ করেছে তাকে অহরহ জাগ্রত থাকতে হয়। কাবুলীরা বলে ; এ যেন সিংহের পিঠে চড়ার মত। ঘুমাবার উপায় নেই। পড়ে গেলেই সিংহ খেয়ে ফেলবে। আমাদের গ্রাম্য কবিও বলেছেন,

এমন অনেক বন্ধু আছে, আশা গাছে দেয় রে তুলে,
ভালোবেসে নামায় এসে এমন বন্ধু ক'জন মেলে ?

কিন্তু জগদ্বন্ধু তো আছেন।

বসুমতীর জন্য হয়তো সুদক্ষ একজন কর্মচারীর প্রয়োজন হবে। তৈরী মাল নয়। খানিকটা কাঁচা। যে আপনার নির্দেশ নেবার মত খানিকটা তালিম পেয়েছে কিন্তু স্বাধিকারপ্রমত্ত নয়। এখন থেকেই এবিষয়ে কিছু কিছু চিন্তা করে এদিক ওদিক নজর ফেলবেন। সময় এলে আমিও দু' একজনের নাম উল্লেখ করবো।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা এইবারে নিবেদন করি।

অরবিন্দ ঘোষ জেল থেকে খালাস পেয়ে উত্তরপাড়াতে বলেছিলেন, বিপ্লব কার্যে যুক্ত থাকার সময় প্রায়ই তিনি হৃদয়ঙ্গম করতেন, দেশকে তিনি কোন্ দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, সে সম্বন্ধে তাঁর যেন সুস্পষ্ট ধারণা নেই—পদাতিক নাই বা জানলো তার লক্ষ্য কোথায়, কিন্তু সেনাপতিকে সে বিষয়ে স্থির-নিশ্চয় হতে হয়। অরবিন্দ তারপর বলেন, কিন্তু কাজের চাপে নির্জনে গিয়ে সে-বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ তিনি পান নি। তাই তিনি বাঙ্গলার জনসাধারণ এবং কর্মীদের কাছ থেকে কিছু দিনের জন্য অনুপস্থিতি কামনা করেছিলেন। এ-সব খুব সম্ভব আপনার জানা কথা, এবং এটাও নিশ্চয় জানেন, তারপর চন্দননগর হয়ে পণ্ডিচেরী চলে যান।

লোহাতে ঢুকে আপনাকেও পরিষ্কার জানতে হবে লক্ষ্য আপনার কি। এখন ব্যবসাটির বিস্তৃতি ও পরিমাণ আপনি চিনে নেবেন। পরে কিন্তু আপনাকে একদিন নির্জনে গিয়ে চিন্তা করতে হবে আপনার লক্ষ্য কি, অর্থাৎ ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর হয় কি প্রকারে, কোন্ দিকে চললে মারের হাত থেকে যথা সম্ভব সুরক্ষিত হওয়া যাবে। কিছুদিন পর কিয়ৎকালের জন্য এই নির্জনের সাধনাটি

আপনি অবহেলা করবেন না। আমি আপনাকে কি উপদেশ দেব, কিন্তু আমার যদি দেবার মত কিছু থাকে তবে এই একটি মাত্র উপদেশ।

'বসুমতী'তে প্রকাশিত নামের তালিকাতে আমার নাম দেবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ আমার সঙ্গে আপনার ঈশ্বর পিতৃদেবের কোনো লৌকিকতার সম্পর্ক ছিল না। তবে বাদ দিলেও দুশ্চিন্তা হত—আপনারা আমার মনের খবর পেয়েছেন কিনা তাই ভেবে।

ঐ সময়টা আমি দৈঃ এবং মাঃ উভয় বসুসমতীর প্রত্যেকটির ছত্র পড়েছি। 'যুগান্তর' এবং 'স্টেটসম্যান'ও। আপনারা শোকাতুর ছিলেন বলে, কোনো জায়গাতেই ৺পিতৃদেবের কোনো পাকা জীবনী বেরয়নি। তার জন্য মনে মনে ব্যবস্থা করবেন। ইতিমধ্যে তাবৎ কাগজের কাটিং একটা জায়গায় রাখবেন। আমি আসছে বছর একটি ছোট প্রবন্ধ লিখব। (আমার প্রথম ইচ্ছে হয়েছিল, শ্রাদ্ধের দিনই লেখাটি প্রকাশ করার, কিন্তু মন তখন শোকাতুর ছিল, দেহের পীড়াও ছিল—লেখাতে সংযম থাকতো না, এবং আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে পাঁচজন অজ্ঞ বলে ভুল বুঝতো)। ইতিমধ্যে কলকাতায় এলে কাগজপত্র নিজেই দেখে নেব। নতুবা সময় এলে আপনাকে পাঠিয়ে দেবার জন্য স্মরণ করিয়ে দেব।

আজ এখানে শেষ করি।

আপনার ভ্রাতা এবং ভগ্নীদের আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানাবেন।

"এ গৃহে শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্রবচন-বলে,
পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা যাক্ দূরে চ'লে ;
পুত্রে পুত্রে মাতা দুহিতায় বিরোধ হউক দূর,
পত্নী-পতির মধুর মিলন হোক্ আরো সুমধুর ;
ভা'য়ে ভায়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা' হোক্ আজি অবসান,
ভগিনি যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;
জনে জনে যেন কর্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,
নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।"

—অথর্ববেদ

শান্তিনিকেতন
মুজতবা আলী

।। শ্রীঅমলেন্দু সেনকে লিখিত পত্র ।।

(১৪৯/এ বকুলবাগান রোড, কলিকাতা-২৫)

(১)

২ জুলাই, ৫৩

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমি শব্দতাত্ত্বিক নই, কাজেই আমার সাহায্য নিয়ে অভিধান নির্মাণ করা যুক্তিসঙ্গত হবে না। বিশেষতঃ আমার কাছে ভালো অভিধান (আরবী, ফার্সী, তুর্কী ভাষায়) নেই যে সেগুলো দেখে ত্রুটিবিহীন অভিমত দিতে পারি।

যদি অপরাধ না নেন তবে বলি, কিছুটা ফার্সী শিখে নিন, যাতে করে অন্ততঃ সে ভাষার অভিধান কাজে লাগাতে পারেন।

আমি যে অর্থগুলো দিলুম সেগুলো ভাসাভাসা—সাহিত্যিকের জন্য প্রশস্ত, শব্দতাত্ত্বিকের জন্য যথেষ্ট নয়। এগুলো আমার বরাতে ফেলে অভিধানে ব্যবহার করলে অবিচার করা হবে।

শামী-কবাব – শাম (Syria) দেশে প্রচলিত এই অর্থে শামী-কবাব। মাংস পিষে বড়ার মত চেপ্টা করে ভাজা কাবাব। সীনা কলীজহ—পাঁজরের মাংস টুকরো টুকরো করে তার সঙ্গে lever (আস্ত কিম্বা টুকরো টুকরো করে) মিশিয়ে শুকনো মাংসের ঝোল।

ফালুদা—প্রায় ice-cream.

জরীন কলম—সোনার কলম।

জহ্নুধারা—জহ্নুমণির দেহ হইতে নির্গত (ধারা) কণা—জাহ্নবী অর্থে।

চাটিম চাটিম—তবলার বোলের অনুকরণে।

শব্দ—cf. সেতারের পিড়িং পিড়িং। Onomatopoeic.

পেতলে নিয়ে—পাতলা করে নিয়ে। পেতলে নিয়ে অচলিত Slang.

কানজোখা—কান পর্যন্ত উঁচু।

হাঁসুলি বাঁক—হাঁসুলির মত বাঁকা।

শুল্কদ্ধরণিক—যা ইচ্ছা লিখুন।

আশা করি কুশলে আছেন।

মুজতবা আলী

(২)

১৮।৭।৫৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার প্রথম চিঠির উত্তর তখন ভালো করে দিতে পারিনি। চাকরির চাপ কখন যে জগদ্দল পাথরের মত নেমে আসে আর কখন যে হঠাৎ হাল্কা হয়ে যায় তার হদীস পাওয়ার চেষ্টা আবহাওয়া দপ্তরের ভবিষ্যদ্বাণী করার মত। না হলে তখনই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল, আপনি যে অশেষ পরিশ্রম স্বীকার করে আমার বইখানার ভুলত্রুটি ধরে দিয়েছেন তার জন্য। সংস্কৃতের উপর (কথা যখন উঠল তখন বলি কোনো ভাষার উপরই) আমার যথেষ্ট দখল নেই বলে নানা রকমের বালসুলভ ভুল করে থাকি। তার উপর বিশ্ববিদ্যালয় আইন করেছেন, মূল ভাষাতে যে রকম বানান থাকবে—অর্থাৎ দীর্ঘ হ্রস্ব, স শ—বাঙলাতে তার-ই কাছে আসবার চেষ্টা করবে। এরও ব্যত্যয় বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছেন—যদি বানানটি চালু হয়ে গিয়ে থাকে তবে পুরনো বানানই চলবে। আমি এই ব্যত্যয় মেনেই লিখেছিলুম ‘সাবাস’। সে দিন হঠাৎ দেখি রবিঠাকুর তাঁর অতি শেষদিকের লেখাতে লিখেছেন ‘শাবাশ’ (কথাটা ‘শাদ’ [‘আনন্দ’], যার থেকে ‘শাদী’, ‘বিয়ে’ অর্থে ব্যবহার হয়, ‘বাশ্‌’ —‘থাকা’ —খুব সম্ভব সংস্কৃত ‘বস্‌’ ধাতু) কিম্বা ‘শাহ’—রাজা, বাশ্‌ থেকে হবে। যা-ই হোক না কেন ‘শ’, ‘স’ নয়) কাজেই আবার বানান বদলাতে হ’ল। এখন বলুন তো বাঙলা লিখি কি প্রকারে !

আরবী, ফার্সী, তুর্কী (তুর্কীস্থানের জগতাই তুর্কী ভাষা ও এশিয়া মাইনরের ওসমানলী তুর্কী ভাষাতে তফাৎ বাঙলা অভিধানে এখনো করা হয়নি), উর্দু, সংস্কৃত, পর্তুগীজ আর অনেক ভাষা থেকে শব্দ এসেছে। এসব তাবৎ ভাষা শিখে, তাদের বানানে হ্রস্ব দীর্ঘ জেনে তবে বাঙলা লিখতে হবে। উত্তর হতে পারে অভিধান দেখো। কোন্ অভিধান। রাজশেখরবাবুর বইখানা অতি উত্তম কিন্তু তিনিও তো ঐ কর্মটি করতে অক্ষম। জ্ঞানবাবুর অভিধান আরো বড়িয়া কিন্তু তিনি মেলা “গ্রাম্য” অথচ চালু কথা দেননি, এবং বানানের হ্যাপা সেখানেই তো বেশী। তবে ?

‘ওয়াকিফ-হাল’ না লিখে আমি ‘ওকিব-হাল’ লিখেছিলুম, পাছে বাঙালী পাঠক এর ‘ছদ্মবেশ’ বর্জিত চেহারা চিনতে না পারে। বিশ্বভারতীর পুলিন সেন প্রথম কয়েক অধ্যায় প্রুফ দেখার সময় (সেগুলোর সমাস জোড়া, বানান consistency চমৎকার হয়েছে) ওটাকে ‘ওয়াকিফ-হাল’ করে দেন। তা

হলে হেস্ত-নেস্তকে 'হস্ত্‌নীস্ত্‌' এবং 'অকুস্থল'কে 'ওয়াকেয়াস্থল' লিখতে হবে। সুচতুর পাঠক কিম্বা / এবং আপনার মত দিকসুন্দরী-বল্লভ (আমার সুরসিকা সব চেয়ে চিংড়ি ছোট-বোন ডিকশনারির নাম দিয়েছে 'দিকসুন্দরী'—অর্থাৎ যে সুন্দরী বানানের গোলকধাধাঁয় দিক বাৎলে দেন, তারপর ফিক করে হেসে বলেছিল, 'অবশ্য বাঙলাতে ওনারা দিক দেখান না, দিক্‌ করেন বেশী।' প্রভাত মুখো 'দিক্করী'—যে দিক্‌ করে—'রমণী' অর্থে ব্যবহার করেছেন। তাঁর 'কুর্চশেখর তুথাঞ্জন…' এবং 'খট্রে খট্রে দিক্করিগণ' পদ্য পড়েছেন কি? অপূর্ব!) পূর্বপর (context—'পূর্বপর' ঠিক প্রতিশব্দ কিনা জানি না—আপনাকে চিঠি লেখা এক 'গব্বযন্তনা') বিবেচনা করে মানে ধরতে পারবে ঠিকই কিন্তু সাধারণ পাঠকের উপর এই শব্দতত্ত্বের গর্দিশ কাঁপানো নিশ্চয়ই আর্য-আচরণ নয়।

কিন্তু যে প্রশ্ন মনে নিয়ে এ-পত্র লিখতে আরম্ভ করি সেটি—আপনার 'দিকসুন্দরী' কতদূর এগলো? ইতিমধ্যে ওদুদ সাহেবের বইখানা বেরিয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই। ওটি কিন্তু অতি সাবধানে ব্যবহার করবেন।

(১) শিলওয়ার, শল্‌ওয়ার ইত্যাদি। জিন্দেগী, জিন্দগী। পশ্‌তু, পুশ্‌তু। আরবী-ফার্সী-উর্দুতে (জগতাই উসমানলী তুর্কীতে এবং সিন্ধী-মপলা ভাষাতেও —বিবেচনা করি আরবী হরপে লেখা সর্ব ভাষাতেই) vowel points অর্থাৎ জের-জবর-পেশ দেওয়া হয় না। তাই লেখা হবে জ-ন-দ-গ-ী (দীর্ঘ vowel points দেওয়া হয়)। সেই ভাবে প-শ-ত-উ। প্রথম vowel points নিয়েই বেশীর ভাগ মতভেদ হয়। তার কারণ ওটা সাধারণত তাড়াতাড়িতে বলা হয়। তাই ওটাকে vague indistinct vowel বলা হয়। ইংরোজীতে about, polite, err-এও এই vague indistinct vowel. এই vague indistinct vowel থেকে পৃথিবীর যাবতীয় অন্যান্য vowelএর সৃষ্টি। (Daniel Jones-এর An English pronouncing Dictionary-র প্রথম পৃষ্ঠায় এর একটি উত্তম ছবি দেওয়া হয়েছে) (আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস প্রাচীন যুগে ঋ-এর উচ্চারণ ছিল এই vague indistinct vowel+a trill)। কাজেই শুনতে পাবেন—যদিও তাড়াতাড়ি বলা হয় বলে ঠিক ধরা যায় না—শিলওয়ার, শু……, শ… · etc। তাই আরবী ইল্‌ম্* = জ্ঞান বাঙলায় 'এলেম', তাই ম-হ-ম-ম-দ বাঙলায় মুহম্মদ, মোহম্মদ, মহম্মদ, 'মামদো! (ঋষি < আর্য, মহম্মদ < মামদো!) অ-হ্‌-সা-ন (আরবী), ফার্সী—ইহ্‌সান, উর্দু—এহসান, বাংলা—আসান

---

* এর থেকে 'মালুম', 'তালিম', 'মুয়াল্লিম'।

(মুশকিল আসান)। ইংরেজ লেখে **Peshawar:** পাঠান বলে পি, কিম্বা প্‌শাব্‌র।

কাজেই ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কোনো লাভ নেই।

রুবাইয়াতের অন্ত্যানুপ্রাস aaba হবে। তার একটা দৃষ্টান্ত পাবেন 'দেশে বিদেশে'র ৩৭৪ পৃঃ—সন্‌গে ওতন্ etc—'। মাঝে মাঝে a a a a ও হয়।

আরো দু'একটা কথা উত্থাপন করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু পেটের অসুখে কাতর হয়ে পড়েছি। বাঙালীর birthright—আমাশয়।

নমস্কারান্তে

A. I. R মুজতবা আলী

কটক

পুনশ্চ

আপনি আমার লেখার যে প্রশংসা করেছেন তার দাওয়াই হিসেবে আপনাকে 'উষা' কাগজের আষাঢ় ১৩৬১র (33 B, Amherst street থেকে প্রকাশিত) শেষ পাতা পড়তে অনুরোধ করি। লেখক 'সেন'। কে বলে বদ্যিরা বড্ড ঐক্যবদ্ধ? আপনি বলেন, আমার লেখা আসমানের তারা, উনি বলেন, পিঠের পাঁচড়া (সিলেটি প্রবাদ)।

আপনার রাস্তা Tawnsend না Tawnshend? অভিধান বলেন, দুইটারই উচ্চারণ Taunzend.

(৩)

২৩।৭।৫৪

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আপনার চিঠি পেয়েই উত্তর দিচ্ছি। একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম।

বাঙলা ভাষায় আরবী, ফারসী এবং উর্দুর মূল এবং বানান নিয়ে সব চেয়ে বেশী আলোচনা হয়েছে 'মোহম্মদী' নামক মাসিকে। অথচ সেগুলোর ব্যবহার আজ পর্যন্ত কোনো কোষকার করেননি! রাজশেখরবাবুর অভিধানের প্রথম প্রকাশ ভুলে ভুলে ছয়লাপ ছিল। তার বহু ভুল দেখিয়ে এক বাঘা মৌলবী

সায়েব মোহম্মদীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত অনেক লেখা ঐ মাসিকে বেরিয়েছে। এমন কি গত বৎসর ঢাকা থেকে প্রকাশিত মোহম্মদীতে মৌলনা আক্রম (আক্রমণ !) খাঁর অভিধানের (ইটি তিনি শেষ করতে পারেন নি) কিছুটা বেরিয়েছে। এই সব back number না দেখলে আপনার অভিধান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কারণ দু'চারটি শব্দের মূল আমাকে রীতিমত হকচকিয়ে দিয়েছিল।

'ছবী'কে না হয় 'ছবি' লিখলেন, কিন্তু 'বুকের মাঝে বাজলো যে বিন্' (বীণা) লিখবেন কি ?

অথচ আপনিই নজীর লিখেছেন।

কোষকারের অন্যতম প্রধান কাজই তো নিক্তি ধরে মাপা, এটা অচলিত না সুচলিত না অচল। তা না হলে তো সবাই অভিধান লিখত—আমিও লিখতুম। এ যেন কসাই বলছে, বকরীর গলা কাটবো কি করে, বড় মায়া হয়।

তাই দেখুন Oxford-কে Concise করতে গিয়ে কোষকারকে কতখানি ভাবতে হয়েছে। এ শব্দটি ইংরাজিতে মাত্র একবার ব্যবহৃত হয়েছে—কিন্তু প্রয়োগ করেছেন শেক্‌স্‌পিয়ার—দেব কি দেব না ?

এককালে 'চলন্তিকা'য় 'সৈয়দ' শব্দ ছিল না যদিও 'শেখ' ছিল, 'মোগল' 'পাঠান'ও ছিল। আমার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর তিনি 'সৈয়দ' দিলেন—অবশ্য কাকতালীয়ও হতে পারে।

পূর্ব বাঙলার ভদ্র সাহিত্যে আজকাল হরবকত, ফজর, জোহর, আসর, মগরিব, এশা এই 'পঞ্চসন্ধ্যার' (পাঁচ নমাজের) উল্লেখ থাকে। আমার মা-ও বলতেন মগরিবের একটু আগে, কিম্বা আসর মগরিবের দরমিয়ান (অর্থাৎ মধ্যে) এবং এই পদ্ধতিতে সময় বোঝাতেন। আপনি এগুলো দেবেন, না দেবেন না ? ঐ তো আপনার গব্বযন্তনা—আমাদের কাছ থেকে এককণাও 'হমদরদী' পাবেন না। (সহ+অনুভূতি, হম্+দর্দ, Sym+Pathos)

ধর্ম জানেন, আমি মস্করা করিনি। আমার এখনো মনে পড়ছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেনামীতে লেখা ('কস্যচিৎ ভাইপোস্য') ব্রজবিলাস কিম্বা তার পরের কোনো বেনামী লেখাতে আমি 'কট্টর' পেয়েছি।* এবং 'চাটিম চাটিম' 'আঁধারের আলোতে' না হলে 'শ্রীকান্তে' পড়েছি। কোনো এক মজলিসে পিয়ারী গাইবেন, তবলচী চাটিম চাটিম বোল তুলছে। আমি সিলেটের খাজা বাঙাল। এসব 'লবজো' আমি তো আর গড়তে পারিনে।

---

* 'ফয়তা' পেয়েছি 'ফতোয়া' অর্থে এবং ঐ অর্থেই 'তৈলবট'।

সুনীতিবাবুর শব্দগুলো দেখিনি। বলি কি প্রকারে? ওস্তদ সায়েবের অভিধান সম্বন্ধে আর কিছু বলতে আমি নারাজ। অপ্রিয় কথা বলতে আমার বড় বাধে।

চট্ট+আর্য=চাটার্জী, বন্দ্যো+আর্য=ব্যানার্জী—ইত্যাদি। বড়বাবু (৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) বলেন, চট্ট+উপাধ্যায় ইত্যাদি থেকে নয়। তাঁর প্রবন্ধে এই আলোচনাটি পড়েছেন কি? যতদূর মনে পড়ে ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর সঙ্গে একমত ছিলেন।

Tawnshend, Tawnsend দুটোই ইংরেজীতে আছে। উচ্চারণ একই—Taunzend / Daniel Jones তাই বলেন। কিন্তু তাংলে অর্থাৎ বাঙলায় টাউনজেণ্ড লিখলে চিঠি মারা যাবে।

নমস্কারান্তে

কটক মুজতবা আলী

---

(৪)

১২।১০।৫৪

সদন্তঃকরণেষু,

পূজার পাঁচটা লেখা শেষ হতে না হতেই গৃহিণী দুটি শিশু নিয়ে এখানে উপস্থিত। একটার ২ বছর ৮ মাস, আরেকটার ৮ মাস। তাছাড়া আলসেশিয়ান কুকুরছানা, রোডেসের মুর্গীমোর্গা, হাঁস, ফুলবাগান সব্জীবাগান, বাবুইটু পাখী (গাছে, তার বাসার সুব্যবস্থা), পুকুরের পদ্ম,—কত বলবো? বিরাট ধুন্দুমার! আমি ‘লবদ্বার’ বন্ধ করে মুর্শীদের নাম জপ করছি। একদম Paradise lost!

অপরাধ নেবেন না কিন্তু আমার মনে হয়, ঢাকার লোক যদি কলকাতায় জন্মায় তবে তার দু কূলই যায়। কুট্টির স্ল্যাঙ সে শেখবার সুযোগ পায় না, আবার ‘সামবাজারী’ও ‘সেখে’ না। অবশ্য যদি কেহ শ্যামবাজার অঞ্চলে মানুষ হয় তবে আলাদা কথা। পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আপনি সে অঞ্চলে বড় হননি। না হলে ‘রেতে’ এবং ‘রান’ সম্বন্ধে প্রশ্ন শুধাতেন না।

পক্ষান্তরে আমি পনরো বছর বয়সে সিলেটের যাবতীয় slang শিখে ঘটি দেশে আসি। তারপর বছর দুই শ্যামবাজারের ‘রক্‌-ক্লাবে’ বকাটে ছোঁড়াদের

সঙ্গে বিস্তর আড্ডা মারি। আমি নিজে বিশ্ববকাটে এবং একটি 'তুখোড় ইয়ার' (বিদ্যাসাগর পশ্য)।

অতএব এ বাবদে আপনি আমার কাছে 'ছোড্ড এড্ডা পোলাজ'। আপনি আমাকে যাবতীয় বিষয়ে টিড দিতে পারবেন, কিন্তু দাদা, বাঙাল ঘটির এ-হেন অপূর্ব মাকাল-ভেরেণ্ডা সংযোগ আপনি পাবেন না। এমনকি 'কুট্টি' গল্প সঞ্চয়ন আমার ভাঁড়ারে যা আছে তা কোনো ঢাকাইয়ারও নেই। কলকাতায় দেখা হলে আমার চ্যালেঞ্জ রইল।

আমার এই ইয়ার্কিপনা কখনো যায়নি। প্যারিস, ভিয়েনা, বার্লিন, লণ্ডন এবং প্রাগে এই কর্মটি আরও মনোযোগ সহকারে করি। আমার জীবনের নীতি,—বই পড়বে গুণীদের, আর মিশবে 'অজ্ঞদের' সঙ্গে। গুণীদের সঙ্গে মিশে আর লাভ কি? তাঁদের যা বলার তা তো তাঁদের কেতাবেই রয়েছে। বরঞ্চ তাঁরা often very disappointing. পক্ষান্তরে অজ্ঞদের কোনো pretension নেই। তাই পদে পদে তারা চমক লাগাতে জানে। তাই ইয়োরোপের বহু শহরে আমি সর্বদাই দিন কাটিয়েছি লাইব্রেরিতে, রাতটা 'পাবে'-'পাবে'—তাড়িখানায়। Smutty jokesএর আমার যা 'সঞ্চয়িতা' (বিধুশেখর শাস্ত্রী যখন রবিবাবুকে বললেন শব্দটা ভুল তখন তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন আজ আর মনে নেই কিন্তু ওটা বর্জন করেননি) সেটি—কি আর বলবো, দম্ভ করতে নেই, মুর্শীদের মান—'ক্রন্দসী' নিয়ে নিশ্চয়ই আমি শেষদিন পর্যন্ত কাজিয়া-কোঁন্দল করবো। 'যে অর্থটি লোকে নেবে সেইটিই অর্থ বাকী সব অনর্থ'—correct to a point. কিন্তু যে শব্দের অর্থ এখনো জনসমাজে liquid, সেখানে আসল অর্থ, অভিধানে যা বলে, কবি যা mean করেছেন সেইটে বাদ দিয়ে এমন অর্থ নেব যেটা ব্যাকরণকে বলাৎকার করে, অভিধানকে অপমান করে এবং 'অনর্থ' বের করে কবিতাটির রসভোগ থেকে বঞ্চিত করে? তাহলে বেগুনকে 'প্রাণনাথ' বললেই হয়! আশা করি এই সরেস কুট্টি গল্পটি জানেন। নাহলে 'পঞ্চতন্ত্রে'র 'রেডুকৎসিয়ো আড্ আবসুর্ডুম' দ্রষ্টব্য।

আপনি ঠিক বলেছেন, কার্ত্তিক কেন কাতিক হবে?

চাটিম চাটিমে আপনার দ্বন্দ্ব কি বুঝতে পারলুম না। সানাইয়ের পোঁ, সেতারের পিড়িং পিড়িং—ঠিক সেই রকম শরৎবাবু বললেন, তবলার চাটিম চাটিম্। 'পোঁ', 'পিড়িং পিড়িং'-এ যখন প্রশ্ন উঠছে না মিষ্টি না কর্কশ, তখন চাটিম চাটিমের বেলা উঠছে কেন? সব কটাই তো অনমটোপোয়েইক—না কি

জানি বলে ইংরিজিতে। তা হলে বাতাসের শনশন ভ্রমরের গুনগুন মিষ্ট না কর্কশ শুধাতে হয়।

শব্দে আপনি আসল root না দেখিয়ে immediate root দেখানোটা prefer করেন। তার থেকে বুঝতে পারছি, আপনার মন আমার যুক্তিতে সাড়া দেয়নি। পুনরায় নিবেদন করি।

(ক) কোনো অভিধান (একটু বড় সাইজের হলেই) immediate source থেকে শেষ শব্দ পর্যন্ত দেখায়, এবং

(খ) কোনো অভিধান (একটু ছোট সাইজের হলেই) শুধু শেষ শব্দ দেখায়।

আজ পর্যন্ত ত্রিভুবনে আমি কোনো অভিধান দেখিনি যেখানে (গ) শুধু immediate source দেখায়—এক রাজশেখরবাবুর অভিধান ছাড়া।

(Inter alia—'জোলাপ' সম্বন্ধে আমার আরবী অভিধান বলে শব্দটি ফার্সী গুলাপ (গুল্ [ফুল]+আপ্ [অপ্, cognate with sanskrit অপ্=জল] থেকে। আরবী ভাষায় 'গ' এবং 'প' অক্ষর নেই বলে 'গুলাপ' শব্দ 'জুলাব' হয়ে গিয়েছে। সেই আরবী শব্দ পুনরায় ফার্সীতে ফিরে আসে 'জুলাব' রূপেই (যে রকম ফার্সী গওহর, আরবী জওহর,—তারপর আবার ফার্সীতে জওহর এবং গবেষণার ফলে পুনরায় 'গওহর'ও চালু হল। বাঙলাতেও তাই দুটোই আছে—গৌহর proper nounও চালু আছে, আবার 'জওহর' (Prime Minister) [আমাদের P.M-এর নাম অবশ্য জওয়াহির বা জওয়াহর জওহর-এর বহুবচন]। 'জহুরী', জউরী=jewellerও আছে)।

যে 'গুলের' (ফুলের) 'আব' (জল) খেলে জোলাপ অর্থাৎ purgative হয় সেটা বোধ হয় আসলে ইসবগুল।

আমার কাছে ১০।১১ শতাব্দীর এবং পূর্বেকার আতিসেন্না ও অল-বীরুনীর ডাক্তারী বই নেই। থাকলে, হয়ত প্রমাণ করা সম্ভব হত যে এরা মেক্সিকো আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বেই purgative জুলাব জানতেন।

এ বিষয়ে আমি কিন্তু নিঃসন্দেহ যে বাঙলা-জোলাপ ইংরেজি থেকে আসেনি। উর্দু-হিন্দীতে জোলাপ রয়েছে, ফার্সীতে আছে, আরবীতে আছে, তার থেকে না নিয়ে নিয়েছি ইংরেজি jalap থেকে—যে শব্দ ইংরেজীতে আদপেই চালু নেই, সাধারণ ইংরেজি অভিধানেও থাকেই না, ১৭, ১৮ শতাব্দীতে বাঙলা দেশে ইংরেজরা ব্যবহার করতো বলে শুনিনি, সেইটে এল ইংরিজি jalap থেকে? উচ্চারণটাও লক্ষ্য করুন। ফার্সীতে পরিষ্কার জোলাব, উর্দুতেও তাই। আর

ইংরেজি jalap উচ্চারণ জ্যালাপ ! ইংরেজি a-এর hat, fat, cat তো আমরা নিই হ্যাট, ফ্যাট, ক্যাট রূপে, কিম্বা হেট কেট রূপে, 'হোট' 'কোট' রূপে নয়। এই সম্পর্কে oxfordএ julep শব্দটাও দেখে নেবেন।

অবশ্য আরবরা ভুল করে থাকতে পারে। হয়ত তাদের জোলাব ফার্সী গুলাপ থেকে আসেনি। এসেছে স্প্যানিশ jalapa থেকে। তাই বা কি করে হয় ? স্পেনিশে j অক্ষরের উচ্চারণ পরিষ্কার আরবীর (স্কচ loch-এর মত)। তারা কোন দুঃখে ওটাকে 'জ' করতে যাবে ! আর আপনি যে সব যাবতীয় বেজাতের ফিরিস্তি দিয়েছেন তার মধ্যে একমাত্র স্প্যানিশদের সঙ্গেই আরবদের যোগসূত্র ছিল।

(Inter alia বাংলা লাশ, আমার মতে আরবী থেকে আসেনি। ফার্সী 'লাশ' শব্দ এসেছে আবেস্তান—সংস্কৃত 'নষ্ট' থেকে 'নাশ' হয়ে 'লাশ' হয়ে। তুর্কীর প্রশ্ন এখানে আদপেই ওঠে না।)

পোর্তুগীজ সম্বন্ধে আপনার অবোধ্য কি লিখেছিলুম মনে পড়ছে না। যদি সে চিঠি ছিঁড়ে না ফেলে থাকেন (আমার বিনীত অনুরোধ ছিঁড়ে ফেলবেন ; না হলে আমি আপনি গত হওয়ার পর কোনো গাধা সেগুলো ছাপিয়ে দেবে এবং গুণীরা বলবেন, আমার Philologyতে claimও ছিল। আমার নেই ; আমি আপনাকে কাঠবেরালির সেবা করছি মাত্র) তবে জানাবেন।

Mary, পোর্তুগীজ থেকে, এটা পাবেন 'মাইরি' শব্দের under-এ।

চ্যাটার্জী, ব্যানার্জি আপনার অভিধানে না থাকতে পারে কিন্তু চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি পঞ্চকুলীন ব্রাহ্মণ ঘোষ বসু ইত্যাদি পাঁচ কায়েত, শেখ সৈয়দ মোগল পাঠান, কৈবর্ত, নমশূদ্র, হাড়ি ডোম ইত্যাদি থাকবে না এও কি বিশ্বাস্য ? এদের নিয়েই তো আপনার বাঙালী জাত।

'মোহম্মদীকে' লিখে কোনো উত্তর পাবেন না। পেলে পাবেন কলকাতার-ই সাহিত্য পরিষদ কিম্বা অন্য কোনো লাইব্রেরিতে।

'অবদান' তো চলে গেল। তা যাক্। উপায় নেই। আমি একটু মস্করা করে শব্দটা ব্যবহার করে থাকি।

এযাত্রা এই পর্যন্ত। আপনি যে লিখেছেন ৮ পাতা চিঠি শিগগির কারো কাছ থেকে পেয়েছি বলে ইত্যাদি, এত 'শিগগির' কথাটার ব্যবহার আমার কাছে সম্পূর্ণ নূতন মনে হল। আমি শিগগিরের ব্যবহার শুধু ভবিষ্যতের জন্যই দেখেছি। অতীত হলে দেখেছি, 'হালে', 'ইদানীং', 'এদানির', 'কিছুদিনের মধ্যে' ইত্যাদি

দেখেছি। এদের কোনোটাই আপনি যে অর্থ দিতে চেয়েছেন সেটি প্রকাশ করে না, কিন্তু তার জন্য 'শিগগিরের' প্রয়োগও দেখিনি। বিবেচনা করে জানাবেন।

বিজয়ার আলিঙ্গন জানবেন।

কটক

ভবদীয়
মুজতবা আলী

পুনশ্চ—১৭।১০।৫৪

আমাদের 'জিলিপি' শব্দটা কোথা থেকে এসেছে জানেন কি? আমি জানিনে। পেটের অসুখের সময় দিল্লীতে গরম জিলিপি ঔষধার্থে খেতে বলা হয়।

(৫)

প্রিয়বরেষু,

হরিচরণবাবুর অভিধানে ৺ স্বরবর্ণের শেষে আছে। এবং তাতে এক পৃষ্ঠাব্যাপী চন্দ্রবিন্দু সম্বন্ধে আলোচনা আছে। আপনি সেটি পড়েছেন কি? তাতে পাণিনি থেকে কেচ্ছা শুরু।

আমি ১২।৩।৫৮ কলকাতা যাব। তার পর ঢাকা। ২০।৪।৫৮-এ কলকাতা ফিরে আসবো। কলকাতায় কোথায় উঠবো জানিনে। ঢাকার ঠিকানা, **C/o, Mrs. Ali, Qamarunnesa Hostel, 10, Segun Bagicha, P. O. Ramna, Dacca.**

আপনাকে দিয়ে আমার একটা কাজ করিয়ে নেবার বাসনা ছিল—অনেক দিন ধরে। ভরসা পেলে বলি।

Santiniketan

সৈ. মু. আ.

।। শ্রীমতী অর্চনা মিত্রকে (২৯।১ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড কলিকাতা-১৯) লিখিত পত্র ।।

(১) ১১

স্নেহের অর্চনা,

প্রথমে দুটি বড় প্যাকেট, পরে ছোট একটি, সর্বশেষে যে-পত্রিকায় তোমার 'বনফুল' আছে এ-সব পেয়েছি। এ পর্যন্ত মাত্র একটা ভুঁইফোঁড় প্রকাশক ভিন্ন এখানে কলেজ স্ট্রীটের কোনো প্রকাশকই পশ্চিম বাংলার কোনো বই বিক্রির ব্যবস্থা করেনি। তুমি একবার ঘুরে যাও না। **Permit** পেতে তোমার অসুবিধা হবে বলে মনে হয় না। তবে পশুপতি থান পায়নি। অন্তত কেউ একজন নিখোঁজ বা/এবং মারা গেছে না বললে নাকি পারমিট মেলে না। তোমার সেই ঠাকুরমা, যে তোমাকে হামেশা "দিক্" করতো, তাকে ঢাকাতে এনে গঙ্গাপ্রাপ্তি করাতে পারো না ?

এখানকার খাদ্যাদি আক্রা নয়। তবে ওষুধের দাম, বেবিফুড গয়রহ অগ্নিমূল্য। আশু ভবিষ্যতে চালের অভাব হবে কিনা বলতে পারিনে।...এখানে যা-সব হয়ে গিয়েছে তার গোর নিত্যি নিত্যি খোঁড়া হচ্ছে। একটা জিনিস আমাকে বড্ড বিচলিত করেছে। ধর্ষণের ফলে হাজার হাজার কুমারী অন্তঃসত্ত্বা হয়েছে। এদের অনেকের চতুর্দশ কুলে কেউ নেই। সমাজেও এরা স্থান পাবে না, অনেকেই—আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও। এই যে তার সন্তানটি হতে যাচ্ছে তার প্রতি এর অনুভূতিটা মিশ্র। একদিকে কোন্ পশুর চেয়ে অধম বর্বর পাঠানের সন্তান এটা, অন্যদিকে ত্রিসংসার ঐ তার একমাত্র সম্বল। এবং অনেক ক্ষেত্রে কি আমরা দেখিনি যে বিবাহিত রমণীর আইনত জাত সন্তান বর্বর পশুর মত সমাজের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে—তবু মা তাকে ছাড়তে পারে না !

আশা করি তুমি/তোমরা কুশলে আছে। গণ্ডা দুই সাহিত্যিক এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে এল, কিন্তু কোনো লেখিকা স্থান পেল না। তাজ্জব !

আন্‌কল্—আ

১৩৭ F ধানমণ্ডী,
রাস্তা—১, ঢাকা—২,
বাঙলাদেশ।

(২)

খবরদার—!

আম্মো ছেলেবেলায় একটি হাতের লেখা কাগজ চালাই। অবশ্য দাদার উপদেশ আদেশের উপর ভরসা করে। কাগজটার নাম ছিল "কুইনিন"—ম্যালেরিয়ার সে আমলের দাপট থেকে আজকের দিনের মস্তানরা বিস্তর বহুৎ শিখতে পারবে। আমার বয়স ১৫, দাদার সতেরো। ঐ বয়সে সর্ব বালক হয় সব-জান্তা (all knowing age, কুকুর-ছানার যে-রকম ছ'মাস বয়সে হয় all growing age, চটি জুতো থেকে সোফার মখমল তাবৎ জিনিস চিবিয়ে কুটি কুটি করে), তদুপরি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাকে আগা-পাশ-তলা রিফর্ম করার দুর্বার কামনা জাগলো আমাদের চিত্তে। তাই কাগজের নাম করা হল "কুইনিন"—আমরা শুদ্ধ্‌মাত্র তেতো কথাই শোনাবো।

বলা বাহুল্য, আমরা অত্যল্পকালের মধ্যেই ঝাঁকে ঝাঁকে দুশমন বানিয়ে ফেললুম। কিন্তু কাগজ বন্ধ হওয়ার আরো একটি কারণ ছিল। আজ না হয় আমার হাতের লেখা বগের ঠ্যাঙ কাগের বাসার মত চিত্তিরবিত্তির। তখন ছিল রীতিমত খুশ্‌খৎ, বিলকুল বদ্‌খৎ বা "বদ্‌খদ" ("বদ্‌খদ" আর "বদ্‌খৎ" একই কথা) নয়। অতএব আমারই উপর পড়লো তাবৎ পত্রিকা আদ্যন্ত লেখার ভার। লাও ঠ্যালা!

এই দুই কারণে কাগজটি অচিরাৎ তাঁর সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করলেন।

আশীর্বাদ না জানিয়ে হুঁশিয়ারি জানালুম। সম্পাদকমণ্ডলী অপরাধ নেবেন না। কিমধকমিতি।

—সৈয়দ মুজ্‌তবা আলী

।। শ্রীসবিতেন্দ্রনাথ রায়কে (ভানু রায়) লিখিত পত্র ।।

(১)

ভাই ভানু রায়,

As usual শনির সন্ধ্যায় প্রুফ পেয়েছি। আমার শরীর আরো খারাপ। ম্যাপে একটা অতি নচ্ছার আতসী কাঁচ দিয়ে হিটলারের Russian অভিযানের অজানা-অচেনা জায়গাগুলো pen down—ঘণ্টা দুই নাগাড়ে—করার দরুন কাল থেকে double image দেখছি—তাই একটু সময় লাগবে। তবে স্থির করেছি, যেমন যেমন হবে পাঠিয়ে দেবো। "ধ্বনি" যুদ্ধের তাবৎ material যোগাড় করার পর এই হাল—লিখতে গেলে—বেশীক্ষণ একসঙ্গে, হঠাৎ সব blotted out হয়ে যায়। খুব সম্ভব এই সপ্তাহেই কলকাতা গিয়ে nursing home-এ ঢুকবো—অবশ্য আমার main trouble এর জন্য। তখন ডাক্তার যদি outside worldএর সঙ্গে contact না রাখতে দেয়, কিংবা কাজ করতে না দেয় তবে, ভাই, তোমাকেই সব করতে হবে—'বড়বাবু' বাবদে। আমার ছোকরাটির অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আরো দু'একটি প্রাচীন দিনের লেখা—of course after 1949—পাওয়া গেছে। তোমার যদি মনে হয়, তোমার বইয়ের size যথেষ্ট বড় হচ্ছে না, তবে আমাকে পত্রপাঠ জানিয়ো। কবে কলকাতা যাবো জানিনে বলে এ কয়েকটা দিন জরুরী চিঠি বা প্রুফ Regd. পাঠিয়ো। এমনিতেই চিঠি হারায়—redirection-এ riskটা greater. 'ধ্বনি'র উত্তর কবে লিখতে পারবো ? কে জানে ! একটু wait করো Please.

আ

(২)

ভ্রাত ভানু,

আমি দুই ব্যাটাকে তাদের বাপপিতেম'র ভিটে দেখাতে সিলেট গিয়েছিলুম। ফিরে এসে তোমার কার্ডদ্বয় পেয়ে আনন্দিত হলুম। 'বড়বাবু' সম্বন্ধে আমি আর নূতন কি বলবো!

এবারে তিনশটি টাকার একখানা Cross চেক শ্রীমোহিত চৌধুরী, Bus

Proprietor, Nicha Patti, Bolpur. এই ঠিকানায় রেজিস্ট্রি করে পাঠালে কৃতজ্ঞ থাকব। সঙ্গে সঙ্গে একখানা p. c.-তে তাঁকে জানিয়ো, তাঁর নামে চেক গেল এবং টাকাটা আমার বাড়ি চালানোর খরচারূপে। তুমি যে আমার প্রকাশক সে খবরটাও দিয়ো।

বিমল মুখুয্যে (বড়দা)-কে ফোন (473419) করে জানিয়ো আমি মার্চের শেষ সপ্তাহে বা এপ্রিলে দেশে ফিরবো। তাকে স্বয়ং পরে লিখব। গজেনদাকে নমস্কার ও তোমাকে শুভ ঈদের আলিঙ্গন।

আশীর্বাদক
সৈয়দ মুজতবা আলী

নিচের ঠিকানায় একখানা "বড়বাবু" পাঠাতে পারো ? Per Regd. Post.

A. S. Mahmud Esq.
Pakistan National Oils Ltd.
Motijheel (মতিঝিল)
Dacca E. Pak.

পুনঃ P. C.-তে 07 Paise স্ট্যাম্প লাগিয়ো।

Thanks.

।। শ্রীমতী সুনন্দা সেনকে (লাবান, শিলং) লিখিত পত্র ।।

(১)

৬। ১১। ৫৮

বৌদি,

তোমার চিঠি পেলুম। আমি একটা জিনিস এ জীবনে কখনো করে উঠতে পারলুম না। আর পারবো না বলে পঞ্চাশের পর সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি এবং সর্ব ভুবনের গালাগাল খাই। সেটা balancing of the budget—টাকার নয়, সেটা তো আছেই, কিন্তু তার জন্য গালমন্দ শুনতে হয় না—হয় সময়ের। আপন পড়া, তাও হতচ্ছাড়া, ছন্নছাড়া, নিয়ে এত বেশী সময় কাটিয়ে দিই যে অন্য কোন কাজ করে উঠতে পারিনে। বিশ্ব-সংসার চটে যায়, ভাবে হৃদয়হীন, দায়িত্বজ্ঞানহীন। আমি পড়ে পড়ে গাল খাই। তোমার short hand কি ক্রমেই long hand হচ্ছে ? পাস করছো কবে ? চাকরি নেবে কখন ?

আমি যা জমিয়েছিলুম তা ত বিলেতে গিয়ে ফুঁকে দিয়ে এলুম।

"যত টাকা জমাইছিলাম
শুঁটকী মৎস্য খাইয়া
সকল টাকা লইয়া গেল
গুলবদনীর মাইয়া।"

এবারে নাগাড়ে শুঁটকী মৎস্য পেলেও আর টাকা জমবে না। তবু ভরসা আছে গরমে শিলং আসবো। বউ বাচ্চা আসবে কিনা সে ত বর্তমান পরিস্থিতি থেকে কিছুই ঠাহর করতে পারছিনে।

আশা করি তোমরা কুশলে আছ। তোমার কর্তা কিরকম আছেন? বসন্তকালে বিরহ নাকি বড় পীড়াদায়ক—কবিরা বলেন।

শান্তিনিকেতন। আলী সাহেব

(২)

২৩শে নভেম্বর, ১৯৫৮

বৌদি,

আজ তোমার পাঠানো জামাটি পেয়েছি, আমি এই দুপুরের গরমে সেটা পরে উল্লাসে নৃত্য করছি। জানিনে, তুমি আমার একটি গল্প "চাচা কাহিনীতে" পড়েছ কিনা; তাতে বরোদার রাজা আবিসিনিয়ার রাজাকে একখানি লাল কাশ্মিরী শাল উপহার দেওয়াতে তিনি নাকি খুশীর তোড়ে, সেই রেড-সীর গরমে অঙ্গে শাল জড়িয়ে জাহাজময় উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করে করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। আমার অবস্থা তাই, সেই বর্ণনা পড়ে নিয়ো—আমার হাল মালুম হবে। ইউরোপে পুরোনো বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গে গল্পগুজোব করেছি আর ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখেছি। এবং ভালো ভালো বর্দ্যো ব্যার্গান্তি খেয়েছি। তবে অল্প-স্বল্প—ও জিনিস বেশী মাত্রায় খেলে সুখ পাওয়া যায় না। সত্যি বলছি বিনয় নয়—আমার লিখতে ভাল লাগে না, ওর ভিতর কেমন যেন একটা দম্ভ আছে। আজ এখানেই থাক, লেখাগুলো নিয়ে নাকের জলে, চোখের জলে।

শান্তিনিকেতন আলী সাহেব

॥ শ্রীমনোরঞ্জন চৌধুরীকে (লাবান, শিলং-৪) লিখিত পত্র ॥

[১৯৬৫ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত ‘পঞ্চতন্ত্র’ কয়েক পর্যায়ে ‘পণ্টক’ শব্দ ব্যবহৃত হয়। পড়ে মনে হল উদ্দিষ্টরা একাধারে অবিজ্ঞ এবং চালাকের ভানকারী। একটু পালটিয়ে ‘পণ্ঠক’ শব্দটি অধিকতর অর্থবাহী হয় কিনা বিবেচনা করতে লেখায় যে উত্তর পাই সেই পূর্ণ চিঠিটি এতৎসহ প্রকাশের জন্য পাঠাচ্ছি। চিঠির বয়ান ‘পণ্টক’ শব্দের কৌসুলীর হলেও পরবর্তী এক কিস্তিতে তদীয় পণ্টক শব্দ ব্যবহার কালে উল্লেখ করেছিলেন—‘অথবা পণ্ঠক, যেমন কোন পাঠক মনে করেন’ (হুবহু ভাষাটি মনে নেই)।]

জনাব চৌধুরী সাহেব,

আপনার নামটি আমার স্পষ্ট মনে আছে, কিন্তু আশ্চর্য, চেহারাটি মনে নেই—(বোধ হয় শ্যামবর্ণ ছিপছিপে) সাধারণত উল্টোটাই হয়। নয় কি ?

‘পঞ্চতন্ত্র’ five days wonder, ওর স্থায়ী মূল্য নেই। এবং যেই হাল্কা-শৈলী ছেড়ে কদিচ কখনো সিরিয়স বিষয় নিয়ে আলোচনা করি অমনি পাঠক-কুল কড়া কড়া চিঠি লেখেন। আমি ভাঁড়—ওদের মতে—আমি আবার ‘জ্যাঠামো’ করতে যাই কেন ? আপনি কিন্তু প্রাচীন দিনে আত্মীয়তার স্মরণে দয়া রাখবেন।

‘পণ্ঠক’ বলতে আমার কি আপত্তি ? কিন্তু ঘটিরা বলে পাঁটা (পাঁঠা) মাতাব্যথা (মাথাব্যথা) কতা (কথা)। তাই পণ্টক। ঘটিরা ‘পাঁঠা’ বলে না, বলে পাঁটা।

তদুপরি ‘পাঁঠা’ বা ‘পাঁটা’ বা ‘পণ্টক’ অর্থ গবেট, গাড়ল—সে ত ঠিক হতে পারে না—ঠক হতে হলে তো বুদ্ধির প্রয়োজন।

আপনার আশীর্বাদ মাথা (মাতা) পেতে নিলুম।

শঙ্কর আপনাকে জয়যুক্ত করুন। কিমধিকমিতি ॥

পোঃ আঃ বোলপুর, খাকসার
পশ্চিমবঙ্গ সিতু

পুঃ দয়া করে ‘জনাব’, ‘সায়েব’, ‘ভবদীয়’ লিখবেন না। আমাকে আগেরই মত দেখবেন।

পাঠকের নিবেদন

'অবধূত' যখন তাঁর 'মরুতীর্থ' নিয়ে মুরুব্বীহীন হালে নিঃশব্দে বাংলা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ করলেন তখন উভয় বাংলার বাঙালী পাঠক মাত্রই যে বিস্মিত হয়েছিলেন সে-কথা নিশ্চয়ই অনেকের স্মরণে আছে। এ তো মরুতীর্থ নয়; এ যে রসে রসে ভরা 'রসতীর্থ'।

হিন্দু তীর্থের প্রতি মুসলমানের কোনো কৌতুহল থাকার কথা নয়, কিন্তু এই গ্রন্থ প'ড়ে পূর্ব পাকিস্তানী একটি মুসলমান তরুণ আমাকে বলে, সে নিশ্চয়ই হিংলাজ দেখতে যাবে—সে তখন করাচীতে চাকরি করে, তার পক্ষে যাওয়া সুকঠিন ছিল না। আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম, 'অমন কর্মটি করো না। আর্টিস্টের মডেলের সন্ধানে কেউ কখনো বেরোয়! যে 'ভিখারিণী-ছবি তুমি পর্শুদিন একশ' টাকা দিয়ে কিনলে তুমি কি সে ভিখারিনীর সন্ধানে বেরোও, যাকে মডেল-রূপে সামনে খাড়া রেখে আর্টিস্ট ছবি এঁকেছিল? বরঞ্চ বলব, তাঁর সঙ্গে দৈবাৎ রাস্তায় দেখা হলে তুমি তো উল্টো ফুটে চলে যাও! কারণ, সে তো তোমার হৃদয়ে কোনো ঈস্‌থেটিক্‌ আনন্দ দিতে পারে না। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, অবধূত-মহারাজ সাধু ব্যক্তি; সে সাধুতা তিনি লেখক হিসাবেও রক্ষা করেছেন এবং তাঁর পুস্তকে তিনি অতিরঞ্জিত করেননি। কোনো কোনো সাধু-বাবাজী 'বড়-তামাক' সেবন করেন; অবধূত কখনো করেছেন কিনা বলা কঠিন—অন্তত তাঁর ডেরাতে সে 'খুশবাই' আমি পাইনি কিন্তু একথা বর্‌হক্‌ সত্য, তাঁর সৃষ্টিতে গঞ্জিকা-বিলাস বিলকুল নদারদ। কাজেই হিংলাজে গিয়ে তুমি টায়-টায় তাই পাবে, দফে দফে সে-সব জিনিসই পাবে যার বয়ান অবধূত 'ইমানসে' দিয়াছেন, তাঁর ইন্‌ভেনট্রিতে ফাঁকি পাবে না। এবং পাব না—এবং সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা—তাঁর বই পড়ে যে কাব্যরস, যে কলাসৃষ্টিরস, সে ঈস্‌থেটিক ডিলাইট পেয়েছিলে সেই অনবদ্য অমৃত। তার শেষ প্রমাণ, সূর্যোদয় তো আমরা নিত্যি নিত্যি দেখি; তবে সূর্যোদয়ের ছবি কিনি কেন?'

তাহলে প্রশ্ন, অবধূত কি খাঁটি রিয়ালিস্টিক লেখক?

অবধূত কি বাস্তব জগৎ ছাড়িয়ে যেতে পারেন না?

কল্পনার ডানা জুড়ে দিয়ে তিনি যদি আমাদের নভোলোকে উড্ডীয়মান না

করতে পারেন তবে বাস্তবের কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে কী এমন চরম মোক্ষলাভ ![1]

এর উত্তর অতিশয় সরল। অবধূত যদি তাঁর কল্পনা, তাঁর সৃজনীশক্তি, তাঁর স্পর্শকাতরতা মরুতীর্থের পাতায় পাতায় ঢেলে না দিয়ে থাকতেন তবে পুস্তকটি রসকষহীন মরুই থেকে যেত। বড় জোর সেটা হত গাইড বুক। গাইড বুক, বড়ই প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, আর্ট আরম্ভ হয় ঠিক সেই জায়গা থেকে যেখানে প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়। রাধু মালী কেনেস্তারায় করে নাইবার জন্য যে-জল এনে দেয় তাতে প্রয়োজন মেটে বটে, কিন্তু নন্দলাল কর্তৃক বহুবর্ণে বিচিত্রিত কুম্ভ মস্তকে ধারণ করে যখন তন্বঙ্গী মরাল গমনে জল নিয়ে আসে তখন সঙ্গে সঙ্গে আসে আর্টের উপাদান, সেই জলের সঙ্গে সঙ্গে আসে কল্পনার উৎস, সৃষ্টির অনুপ্রেরণা—সেই পুণ্যবারিই মরুতীর্থকে 'শ্যামল সুন্দর' করে তোলে, সে তখন দেয় 'তৃষ্ণা-হরা সুধা-ভরা সঙ্গসুধা' এবং কে না জানে 'সঙ্গ' ও 'সাহিত্য' বড় কাছাকাছি বাস করে।

কিন্তু ঐ এক 'মরুতীর্থ'ই তো অবধূতের একমাত্র বা সর্বশ্রেষ্ঠ রসসৃষ্টি নয় যে সুদ্দ্‌মাত্র এইটে বিশ্লেষণ করেই আমরা পুস্তক ও লেখকের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে যাবো, এবং প্রশ্ন, রসের হাটে ভ্রমণকাহিনী কোন্ কাতারে বসার হক্ক ধরে, বাজারের বৈচিত্র্য নির্মাণে তার সেবা কতখানি , সে পাবে কোন্ শিরোপা ? বিশেষতঃ বাংলা সাহিত্যে ? লোকে বলে 'ঘরমুখো বাঙালী' ; কাজেই তার কাছ থেকে আর সব কিছুই আশা করা যেতে পারে, শুধু ভ্রমণকাহিনীটি মাফ করে দিতে হয়। তাই যদি হয়, তবে বলবো, 'পালামৌ'-র পরই 'মরুতীর্থ'। এবং তার পরও তাকে কেউ আসনচ্যুত করতে পারেনি। বলা বাহুল্য, এসব আলোচনায় আমরা গুরু রবীন্দ্রনাথকে বাদ দি।

তবে কি অবধূত শুধু ভ্রমণকাহিনীর কীর্তনিয়া—পার্ এক্সেলাঁস ?

অধীন সমালোচক নয়, বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপকও নয়। তার প্রধান পরিচয় —সে যা মনে করে—পাঠকরূপে। সে বই পড়তে ভালোবাসে এবং যত্তপি ঈশ্বরেচ্ছায়, বা নসীবের গর্দিশে, যাই বলুন, সে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাওয়ার ফলে বাংলা ছাড়াও দু-একটি অতিশয় ধনী তথা খানদানী ভাষার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচিত হয়েছে, তথাপি সে সব চেয়ে বেশী ভালোবাসে আপন মাতৃভাষা বাংলাতেই বই

---

[1] 'যেখানে মানুষের আত্মপ্রকাশে অশ্রদ্ধা সেখানে মানুষ আপনাকে হারায়। তাকে বাস্তব নাম দিতে পারি, কিন্তু মানুষ নিছক বাস্তব নয়। তার অনেকখানি অবাস্তব, অর্থাৎ তা সত্য। রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃঃ ২৮৫।

পড়তে। এবং কোনো বই পড়ে—বিশেষ করে সে-বইয়ের লেখক যদি অখ্যাতনামা হয়, তাকে যদি নববধূর মত লজ্জিত শঙ্কিত পদে বাংলা বাসরে প্রবেশ করতে দেখে তবে আঙ্গিনা থেকে তার কল্যাণ কামনা করে, বয়েস ছোট হলে আশীর্বাদ জানায়। আবার বলছি, পাঠক হিসাবে। 'অবধূত' 'শংকর' আদিকে আমি উদ্বাহু হয়ে অযাচিত অভিনন্দন জানাই, বাংলা সাহিত্যের তাঁদের প্রবেশ-লগ্নেই। পরবর্তী কালে কেউ কেউ আমাকে আরো আশাতীত আনন্দ দিয়েছেন, কেউ কেউ দেন নি, কিন্তু সে নিয়ে আমার ক্ষোভ নেই, কারণ এ-দুজনা আমাকে নিরাশ করেন নি।

অবধূতের বয়স হয়েছে, তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য। আমিও তদ্বৎ। পূর্বেই নিবেদন করেছি, আমি সমালোচক বা অধ্যাপক নই,—তাঁর রচনা সম্বন্ধে আমার লিখবার যেটুকু হক্ক আছে সে শুধু, তিনি লেখক পার্-একসেলাঁস, আমি তার অসংখ্য গুণমুগ্ধ পাঠকদের ভিতর পাঠক পার্ একসেলাঁস, পাঠকোত্তম। আমি 'উদ্ধারণ পুরে'র কাছেই বাস করি, এর সঙ্গে আমার আবাল্য পরিচয়। এ 'ঘাট' দিয়ে উভয়ে একসঙ্গে না গেলেও শীঘ্রই আমরা 'ওপারে' মিলিত হব। সৃষ্টিকর্তার কাছ থেকে সৃষ্টির চরম রহস্য জেনে নেবার পূর্বেই অবধূতের 'সৃষ্টি' সম্বন্ধে আমার বিস্ময় প্রকাশ করে যাই।

আমার পরিচিত কোনো কোনো কনিষ্ঠের ধারণা—যার উল্লেখ এইমাত্র করলুম যে, অবধূত আসলে ভ্রমণকাহিনী লেখক। বাইরের দিক দিয়ে দেখতে গেলে এ ধারণা ভুল নাও হতে পারে। কারণ বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি,—গেরুয়াধারীকে সরাসরি প্রশ্ন শুধনো অনুচিত—তিনি দীর্ঘকাল সন্ন্যাসী-শ্রমণজনোচিত স্থান পরিবর্তন বা পর্যটন করেছেন, এবং সে-কারণে তাঁর রচনাতে সব সময়ই অল্পবিস্তর আনাগোনা থাকে, এবং পরোক্ষভাবে সেটাকে ডাইনামিক করে তোলে। এটা সদ্‌গুণ, কিন্তু এটা অবধূতের একমাত্র গুণ তো নয়ই, প্রধানতম গুণও নিশ্চয়ই নয়।

আবার, কোনো কোনো কনিষ্ঠের ধারণা—এরা সাধারণত আমার সমুখে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে—অবধূত প্রধানত সন্ন্যাসীদের মধ্যে যে ফক্কুড়ী ধাপ্পাবাজী আছে সেটার নিরতিশয় নগ্নরূপ আমাদের সামনে সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলিয়েছেন। এটাও পূর্বেকার মত আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। ফক্কড়ী, ধাপ্পাবাজী, বুজরুকী,[২]—এরই মোলায়েম নাম 'ধরাধরি' বা 'তদ্‌বীর' (অবধূতের

২। বুজরুকী শব্দটি এসেছে ফার্সী বুজুর্গ থেকে—অর্থ অতি ভদ্র ; মুরব্বী, সাধুজন, উচ্চস্থানীয় ; সেইটার অভিনয়, বাঙলায় ভণ্ডামী।

ভাষায়ও বোধ হয় আছে, 'বসুন্ধরা পূর্বে বীরভোগ্যা ছিলেন ; অধুনা তদবীরভোগ্যা')—এসব তো সর্বত্রই আছে, এবং এ-বাবদে সন্ন্যাসীদের নিদারুণ টিট দিতে পারে হাল্ফিলের গৃহীরা, এবং কলকাতায় তাদের সন্ধানে বিস্তর তক্লীফ বরদাস্ত করতে হয় না ; বস্তুত তাদের অনাচারে প্রাণ অতিষ্ঠ। হাট-বাজারে, মেলা-মজলিসে, সাহিত্য-বিদ্যালয়ে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে—যেখানে বিশ্বজ্ঞান, বিশ্বপ্রেম সেখানেই তো বিশ্ব ফক্কুড়ী—এ তো পাড়ার পদিপিসিও জানে। তার দাওয়াই কি, সেও তো অজানা নয়। শুধু অজানা—এ-খাটাশের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? অবধূত সমাজ-সংস্কারক নন—ডন্ কুইক্সটের মত নাঙ্গা তলওয়ার দিয়ে বেপরওয়া বায়ুযন্ত্র (উইণ্ডি-মিল) আক্রমণ করা তাঁর 'ধর্মে' নেই। লোকটি বড়ই শান্তিপ্রিয়। শুধু যেখানে বর্বর পশুবল অত্যাচার করতে আসে, এবং সে-পশুবল ফক্কুড়ীতেও সিদ্ধহস্ত সেখানে অবধূত, ফক্কুড়ীর মুষ্টিযোগ ফক্কুড়ী ছাড়া নান্যপন্থা বিদ্যতে বিলক্ষণ জানেন বলেই সেটা বীভৎস রুদ্ররূপে দেখাতে জানেন। কিন্তু এটা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, শীলের দিক। লেখক হিসাবে এটা তাঁর নগণ্যতম পরিচয়। কারণ লেখক হিসেবে 'হীরো' রূপ তিনি কস্মিনকালেও আত্মপ্রকাশ করতে চাননি।

আর্ট ও জীবন নিয়ে সব চেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন কবিরাজ গ্যোটে। সে আলোচনা বহুস্থলে এতই সূক্ষ্ম যে আপনার আমার মত সাধারণ পাঠক দিশেহারা হয়ে যেতে বাধ্য। তবে সে আলোচনার ভিতর না গিয়ে সরাসরি আর্টের ভিতর জীবন ও কোনো কোনো স্থলে লেখকের জীবনীরও অনুসন্ধান করা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টি সংকট-সঙ্কুল। একটি দৃষ্টান্তই এস্থলে যথেষ্ট। বাংলাদেশে কেন, পৃথিবীর হাস্যরসিকদের ভিতর 'পরশুরামে'র স্থান অতি উচ্চে। অথচ যে-সব সৌভাগ্যবান তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চেনবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই জানেন, হাস্যরস ঠাট্টা মস্করা দিয়ে তিনি মজলিস না জমিয়ে বরঞ্চ সুযোগ দিতেন আমাদের মত রামা-শ্যামাকে। একবার তাঁকে আমি একখানা চিঠিতে লিখি, তাঁর বাড়ীর ও পাড়ার ছেলেদের সামনে আমি ম্যাজিক দেখাব, তবে তিনি সে-স্থলে সশরীর উপস্থিত না থাকলেই ভালো। তিনি কাতর কণ্ঠে উত্তর লেখেন, 'আমাকে গুমড়োমুখো দেখে ভাববেন না, আমার রসবোধ নেই।' অবধূতের বেলা ঠিক তার উল্টো। তাঁর লেখাতে ব্যঙ্গ আছে, বিদ্রূপ আছে,—যেন হাসতে হাসতে তিনি বুজরুকির মুখোশ একটার পর একটা ছিঁড়ে ফেলছেন ; কোনো কোনো স্থলে সেই সুবাদে তিনি বিকট বীভৎস রসেরও অবতারণা

করেছেন কিন্তু অকারণে হাস্যরস অবতারণা করতে তাঁকে বড় একটা দেখা যায় না। অথচ অন্তরঙ্গজনের মধ্যে অবধূতের অন্য রূপ। সেখানে তিনি অভিনয়সহ যে বিশুদ্ধ হাস্যরস উপস্থিত করেন সে যে কী স্বচ্ছ, কী চটুল—যেন পার্বত্য নির্ঝরিণী আপন বেগে পাথর থেকে পাথরে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে চলেছে—তাঁরাই শুধু জানেন যাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ। তাঁর একটি অভিনয় এমনই অনবদ্য যে সেটি টেলিভিজনে দেখানো উচিত। চুঁচড়ো চন্দনগর অঞ্চলে এক বিশেষ সম্প্রদায়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে ভোজন করা অভদ্রতার চূড়ান্ত। নিমন্ত্রণকারী সোনার থালার চতুর্দিকে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন সাজিয়ে নিমন্ত্রিতের সামনে গলবস্ত্র হয়ে, হাত কচলাতে কচলাতে প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বার বার শুধু ফরিয়াদ জানাবেন, তিনি অতিশয় দরিদ্র, সামান্যতম অন্নব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করতেও সম্পূর্ণ অক্ষম ; এবং নিমন্ত্রিতজনও অতি-বড়-গাওয়াইয়ার মত তালের আড়ির সঙ্গে কুআড়ি লাগিয়ে, ইস্টিকের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই—থালার সামনের পিঁড়িতে বসাটাও নাকি পবিত্র, যুগ যুগ সঞ্চিত সর্ব ঐতিহ্যভঞ্জনকারী সথ্‌ৎ বেয়াদবীর চূড়ান্ত—বলবেন, প্রায় চোখের জল ফেলে, যে, এরকম অত্যুত্তম ব্যবস্থা তাঁর চতুর্দশ পুরুষের কেউ কখনো দেখে নি, এ বাড়ির গৃহিণী রন্ধনে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী, আর হবেই বা না কেন, এঁরা যে পুরুষানুক্রমে দেশের অভিজাত সম্প্রদায়ের গৌরীশঙ্কর, 'নীলকণ্ঠ'! এহেন রসময় চাপান-ওতর বাস্তবে কতক্ষণ ধরে চলতো বা এখনো চলে সে অভিজ্ঞতা আমার নেই, কিন্তু অবধূত মৌজে থাকলে নিদেন আধঘণ্টা, এবং উভয়পক্ষের সেই নিছক কথার তুবড়ী-বাজী ফুলঝুরি শুধু লেখাতে প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কারণ একা অবধূতই দুটি পার্ট একসঙ্গে প্লে করে যান। ক্ষণে গল-বস্ত্র কাঁদো-কাঁদো গৃহস্থ, ক্ষণে বাষ্পাকুল-কণ্ঠ নিমন্ত্রিতজন। ক্ষণে বিপজ্জলে আকণ্ঠনিমগ্ন কাতর নিমন্ত্রণকারী, ক্ষণে চরম আপ্যায়িত, কৃতজ্ঞতার ভারে আজানুন্যুব্জ, আনন্দাশ্রুতে চক্ষুদ্বয়সিক্ত নিমন্ত্রিত।

এবং এখানে এসে সত্যই অবধূতকে জোব্বার খুঁট দিয়ে চোখ মুছতে হয়!

অথচ আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পেলুম, গেরুয়ার খুঁট না, যেন শৌখীন নিমন্ত্রিতের জেব থেকে বেরিয়ে এল ফুলফাটা-লেস-লাগানো হাওয়া-তোড়্-হাল্কাসে-হাল্কা বেড্‌শীট সাইজের রুমাল! বিশ্বাস করবেন না, আমি পেলুম ভুরভুরে আতরের খুশবাই। বলা বাহুল্য, নিমন্ত্রিতজন কণামাত্র খাদ্য স্পর্শ করবেন না—ভাবখানা এই, আমাদের কারোরই বাড়ীতে অন্নাভাব নেই, তদুপরি খানদানী

নবাব মাত্রই ডায়াটে থাকেন।

এই অভিনয় করার পরিপূর্ণ বিধিদত্ত দক্ষতা ছিল অতি বাল্যকাল থেকেই আরেকটি লেখকের—চেখফ্। পাঠশালে যাবার সময় থেকেই তিনি বাপ-কাকা পাড়া-প্রতিবেশী সক্কলের অনুকরণ করে অভিনয় করতে পারতেন—কেউ কেউ খুশী হয়ে তাঁকে লেবেন্‌চুস লাট্টুটা উপহারও দিতেন।

এই অভিনয়দক্ষতা আপন কলমে স্থানান্তরিত করতে পারলেই লেখকের 'সকলং হস্ততলং'—লেখা তখনই হয় convincing; তার বিগালতার্থ, অভিনয় করার সময় যেরকম প্রত্যেকের আপন আপন ভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা অপরিহার্য, লেখার বেলাও তাই। এখানে কর্মটি কঠিনতর। কারণ এখানে অঙ্গভঙ্গী করতে পারবেন না, চোখের জল ফেলে দেখাতে পারবেন না। অর্থাৎ টকি-সিনেমার কাজ গ্রামোফোন রেকর্ড দিয়ে সারতে হচ্ছে। আসলে তার চেয়েও কঠিন, কারণ, কণ্ঠস্বর দিয়ে বহুৎ বেশী ভেল্কিবাজী দেখানো যায়। অনেকের অনেক রকম ভাষা—কেউবা স্ল্যাঙ ব্যবহার করে, কারো বা ইডিয়ম জোরদার, কেউ কথায় কথায় প্রবাদ ছাড়ে, কেউ বলে ভশ্চাযের মত সংস্কৃত-ঘ্যাঁষা ভাষা, কেউ কিঞ্চিৎ যাবনিক—এ সব-কটা করায়ত্ত না থাকলে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের কথাবার্তা convincing ধরনে প্রকাশ করা যায় না। এ বাবদে বাংলা দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ : মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। আমি এ-বিষয় নিয়ে অন্যত্র দীর্ঘ আলোচনা করেছি; এ-স্থলে বলি, এ্ যেন একটা মিরাক্‌ল্। মাইকেল বাল্যাবস্থায় যশোর ছাড়েন, তারপর সেখানে আর কখনো যান নি। তদুপরি অনেক কাল কাটালেন বাংলার বাইরে। অথচ পরিণত বয়সে এই নাটকে, অর্ধশিক্ষিত হিন্দু কর্মচারী, তার অশিক্ষিত হিন্দু চাকর, অশিক্ষিত মুসলমান চাষা, তার চেয়েও অগা তার বউ, এবং আরো চার-পাঁচজন—সবাই মিলে অন্তত সাত-আট রকমের কথা বলে খাঁটির চেয়েও খাঁটি মধুর যশোরী ভাষায়, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শেডে।

'আলাল', 'হুতোম', 'পরশুরাম' পেরিয়ে এ-যুগে এলে পাচ্ছি দুজন-লখক যাঁদের কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় আছে। অবধূত জানেন খাস কলকাত্তাই—কিন্তু এ-কলকাত্তাই হুতোমের কলকাত্তাই নয়, কারণ এর থেকে বহু আরবী-ফার্সী শব্দ উধাও হয়ে গিয়েছে, ইংরিজি ও হিন্দী ঢুকেছে এবং অভাব-অনটনের ভিন্ন জীবন প্যাটার্ন নির্মিত হওয়ার ফলে এক নূতন ইডিয়ম সৃষ্ট হচ্ছে—এবং গজেন্দ্র মিত্র জানেন কলকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মধ্যবিত্ত

শ্রেণীর ঘরোয়া মেয়েলি ভাষা। যত দিন সাধুভাষা চালু ছিল ততদিন এ দুটোর অল্পই কদর ছিল, কিন্তু চলতি ভাষা—সেও প্রধানত কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ভাষা—কল্‌কে পেয়ে আসন জমানোর সঙ্গে সঙ্গে এগুলোর চাহিদা বাড়বেই। জনগণের কথ্য ভাষার শিকড় দিয়ে লিখিত ভাষা যদি নিত্য নিত্য প্রাণরস আহরণ না করে তবে সে একদিন শুকিয়ে গিয়ে 'ডেড ল্যান্‌গুইজ্‌' হয়ে যায়—সংস্কৃত, লাতিনের বেলা যা হয়েছিল, এ-দেশের 'শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে'র যা হয়েছে। তাই বাঙলা থেকে সাধুভাষা বর্জন করে আমরা ভালোই করেছি। ভাষাটির কাঠামো ছিল ঢাকার কিন্তু সব চেয়ে বেশী প্রচলন হল মেট্রপলিস্‌ কলকাতায়। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম এঁদের সকলেই রাঢ়ী ও কর্মভূমি কলকাতায়। এঁরা ঢাকার শব্দ, ইডিয়ম, প্রবাদ, বচন-ভঙ্গী আমদানি করতে পারেন না, আবার কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের এসব মাল—পূর্বে যাকে বলেছি 'শিকড় দিয়ে প্রাণরস আহরণ করা'—সাধুভাষার সঙ্গে ঠিক জুৎসই লাগসই হয় না, ফিট্‌ করে না। এখন সে অসুবিধা ঘুচেছে। (ঢাকা মেট্রপলিস্‌ হতে চলল—সেখানকার লেখকরা যদি সাধুভাষাতে প্রাণরস সঞ্চার করতে পারেন তবে সেও নবীন পত্র-পুষ্পে পল্লবিত হবে)।

কিন্তু এহ বাহ্য।

অবধূতের আনাগোনা বাঙলাদেশের বাইরেও বটে। বক্ষ্যমাণ 'নীলকণ্ঠে' যাদের সঙ্গে আমাদের ভবঘুরে প্রতিনিয়ত কথা বলছেন তারা বাঙালী নয়, অথচ বাঙলার মারফতেই তাদের চরিত্র convincing করতে হবে। সে আরও কঠিন কর্ম। কিন্তু লেখক যে রকম গোড়ার 'মজুমদার' 'রায়সায়েবের "ঘোড়ার" পিঠে চড়া', 'সুবাসী দিদি' কলকাত্তাইদের ফুটিয়ে তুলেছেন, ঠিক তেমনি অবাঙালী 'অমরনাথ' 'জুলিমেম' এবং আরও গণ্ডায় গণ্ডায়। ভাষা করায়ত্ত থাকলে হাতীকেও বাঙলা বলানো যায়!

* * *

অবধূতের প্রতিটি গ্রন্থ পড়ে আমার মনে প্রশ্ন জেগেছে, এ-লোকটি কিসের সন্ধানে দুনিয়াটা চষে বেড়ায়? তার পায়ে চক্কর আছে সে তো বুঝি, এবং বলা উচিত কিনা জানিনে—তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত হয়ে খবরটা পেয়েছি—যে, তিনি তন্ত্রে বিশ্বাস করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে যে তাঁর গভীর জ্ঞান আছে সে-তত্ত্ব আবিষ্কার করতে বেশীক্ষণ সময় লাগে না। কিন্তু তান্ত্রিক একবার পথ

পেয়ে গেলে তো ঘুরে বেড়ায় না! গ্যোটে বলেছেন, চরিত্রবল বাড়াতে হলে জনসমাজে যাও; জিনিয়াসের সাধনা করতে হলে নির্জনে, একাগ্র মনে। আমার মনে তখনই প্রশ্ন জেগেছে, 'আর যারা সাধু-সন্ন্যাসীর পিছনে পিছনে ঘোরে?' বরদার মহারাজ আমাকে বলেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর সঙ্গে কাজ করার সময় প্রতি শনিবারের সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল অবধি সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে নর্মদার পারে পারে (হিমালয়ের পরেই নাকি সেখানে ওঁদের পরিক্রমা-ভূমি) ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ পেয়েও ছিলেন। সেই সন্ন্যাসীর করুণ কাহিনী পাঠক উপেন বাঁড়ুয্যের অদ্বিতীয় পুস্তক 'নির্বাসিতের আত্মকথা'য় পাবেন। এঁকে আনা হয়েছিল বারীন-উল্লাস-উপেনদের চরিত্রবল গড়ে দেবার জন্য। কিছুদিন এঁদের সঙ্গে থাকার পর ইনি প্রত্যেককে সনির্বন্ধ অনুনয়-বিনয় করেন, বিপ্লবীদের ভয়াবহ পন্থা পরিত্যাগ করতে। এঁরা যখন কিছুতেই সম্মত হলেন না তখন তিনি, সেই মুক্ত পুরুষ, শব্দার্থে সজল নয়নে বাগান-বাড়ি ছেড়ে চলে যান। যাবার সময় অতিশয় দুঃখের সঙ্গে যে ভবিষ্যৎবাণী করে যান সেটা আন্দামানে অক্ষরে অক্ষরে ফলে।

আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, কিন্তু কেমন যেন ঠিক বিশ্বাস হয় না, অবধুত খুব সম্ভব এরকম একটি লোকের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বা ঘুরে মরছেন। বিবেকানন্দ এ রকম লোক পান নি—বরঞ্চ অন্যেরা, তিনি কিছু পেয়েছেন কিনা, তার সন্ধানে লেগে যেত—এবং রামকৃষ্ণ মুক্ত পুরুষ হলেও এ ধরনের লোক নন। তিনি তো সর্বত্রই লোকচক্ষুর সম্মুখে বিরাজিত। তাঁর সন্ধানে বেরুনো নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে তো আমাদের কাজ চলে না। তিনি জীবন্মুক্ত। ছেলেবেলা থেকেই ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। আমরা খুঁজি এমন একজন, যিনি পঞ্চাশবার ফেল মারার পর ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছেন। আমরা ফেল করেছি আড়াইশ' বার। তিনিই বুঝবেন আমাদের বেদনাটা কোন্‌খানে। যে সাধক সাধনার পথে খানা-খন্দে পড়ে হাড়-হাড্ডী গুঁড়িয়েছেন তিনিই তো শুধু আমাদের 'খবরদার! হাফিজ্! চিৎকার করে আগে-ভাগে হুঁশিয়ার করতে পারেন।

কিন্তু কেন এই না-হক্ক মানুষে'র সন্ধানে হায়রানি?

উত্তরে সর্বদেশের, সর্বযুগের গুণীজ্ঞানী মানী অভিমানী তত্ত্ববিদের সেরা বলেন, ভগবানের মহত্তম সৃষ্টি মানুষ, অতএব মানুষের সন্ধানে বেরুতে হয়। চণ্ডীদাসও বলেছেন 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'। উত্তম

প্রস্তাব। অবধূতও বলেছেন, এই বক্ষ্যমাণ 'নীলকণ্ঠে'ই—'হিমালয়ের পথ ঘাট মঠ মন্দির নিয়ে বিস্তর লেখা হয়ে গেছে। সেই সব গ্রন্থ পাঠ করলে হিমালয় সম্বন্ধে জানতে বাকী থাকে না কিছুই। সুতরাং আর একবার হিমালয়ের পরিচয় দিয়ে লাভ কি! তার চেয়ে হিমালয়ের মানুষদের সম্বন্ধে কিছু বলে নি আমি। অনেকের কাছে হিমালয়ের সব থেকে বড় আকর্ষণ হিমালয়বাসী সন্ন্যাসীরা। আমি চেষ্টা করছি এই সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে কিছু জানাতে। (কারণ) অনেকের কাছে সন্ন্যাসীরা পরম পবিত্র রহস্যময় জীববিশেষ।'[৩] (এর পর অবধূত আরো তিনটি শব্দ দিয়ে একটি বাক্য রচনা করে মনে মনে প্রশ্ন শুধিয়েছেন বা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন, কিংবা উভয়ই, কিন্তু সে-প্রশ্ন, সে বিস্ময় নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে। তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর মত ভাষার জউরী প্রথম যে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন ঐ দিয়েই তিনি কর্ম সমাধান করতে পারতেন, অথচ কেদার বদ্রীর পথে গঙ্গা যমুনার এমনই হুহুঙ্কার যে নিদেন তিনটি বার চিৎকার না করলে মানুষ নিজের গলা নিজেই শুনতে পায় না)।

ফার্সীতে একটি দোঁহা আছে :

'কুনদ্ হম্ জিন্স্ ব্হস্ পর্ওয়াজ্,
কব্তর ব্ কব্তর বাজ্ ব্ বাজ্।'

The same with same shall take its flight
The dove with dove and kite with kite'

'স্বজাতির সনে স্বজাতি উড়িবে মিলিত হয়ে
পায়রার সাথে পায়রা, শিকরে শিকরে লয়ে।'

অতএব হিমালয়ের হোক বা পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থলেরই হোক, সাধু-সন্ন্যাসীদের চিনতে হলে তাঁদেরই একজন হতে হয়। অবধূত এ বাবদে তাঁর একাধিক গ্রন্থে এ তত্ত্বটির উল্লেখ করেছেন। এই সর্বজনীন গণতন্ত্র আমাকেও

---

[৩] শ্রীশ্রীঠাকুরকে অবধূত সাতিশয় শ্রদ্ধা করেন, এ-কথা আমরা জানি কিন্তু খণে বিশ্বাসী, খণে agnostic, খণে nihilist, খণে কি, খণে কি না—মা কালীই জানেন—এই লোকটির ধোঁকা যায় না, ঠাকুরের সর্বনী ঁত বাবদে। বলছেন, শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন, ' "সব মতই মত সব পথই পথ।" বিদুর বাবার পথটা কি জাতের পথ তা আমি দেখেছি। ও-পথে ভগবানকে পাওয়া যায় না, শয়তানকে পাওয়া যেতে পারে।' "নীলকণ্ঠ" পৃ ১৬৯।৭০।

আনন্দ দেয়। লণ্ডনের এক প্রাতঃস্মরণীয়া সমাজসংস্কারিকা নারী যখন দেখলেন যে, পতিতাদের জন্য তিনি কোনো সেবাই করে উঠতে পারছেন না, তখন তিনি তাদেরই সমাজে প্রবেশ করলেন (আশা করি কেউ অন্যায় সন্দেহ করবেন না, যে আমি সাধুসন্ন্যাসী, পীর-দরবেশ ও পতিতাদের এক পর্যায়ে ফেলছি! এই অধমের পরিবারের মাত্র শতবর্ষ পূর্বেও রীতি ছিল যে সর্বকনিষ্ঠকে সন্ন্যাস গ্রহণ করে বনে চলে যেতে হত)। মহিলাটি শেষ পর্যন্ত সেখানে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পর সে-সমাজ ত্যাগ করে যে গ্রন্থ রচনা করেন সেটি অতুলনীয়, অমূল্য।

অবধূত মৌনব্রত, অজগরব্রত, পনছীব্রত[৪] সবই করলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যামো সঠিক চিনতে পারলেন প্রজ্ঞানাথ। সার্থক তাঁর নাম।

প্রজ্ঞাবলে ব'লে দিলেন 'তোমার পথ আলাদা। হয় তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে থাকবে নয়ত ছুটে বেড়াবে।' আর যোগাভ্যাস বাবদে বললেন 'তোমার জন্য ঐ নাক-টেপাটেপি নয়, তোমার ধাতে সইবে না। দূর ছাই বলে ফেলে দিয়ে আবার ছুটে বেড়াবে।'

সেই ভালো। নইলে তাঁর অবস্থা বিশ্বকবি বর্ণিত 'ঘোড়া'র মত হয়ে যেত। 'অন্য সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য়; এ দৌড়য় বিনা কারণে; যেন তার নিজেই নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার একান্ত শখ। পালাতে পালাতে একেবারে বুঁদ হয়ে যাবে, ঝিম হয়ে যাবে, ভোঁ হয়ে যাবে, তারপর "না" হয়ে যাবে।'

'না' হয়ে গেলে (নত্বং, নাহং, নায়ং লোকঃ !) 'নীলকণ্ঠ' লিখত কে!

কিন্তু আমরা ভুল করছি না তো?

স্পষ্ট দেখতে পারছি তিনটি 'অবধূত'। যে অবধূতকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি, যে অবধূত বই লেখেন এবং যে অবধূত লাট্টুর মত চক্কর খায়। তিন জনাই কি একই ব্যক্তি? নিশ্চয়ই নয়। অন্তত তৃতীয় অবধূতকে দ্বিতীয় অবধূতের সঙ্গে গোবলেট করলে দুজনারই প্রতি ভাহা অবিচার করা হবে। বহু সার্থক লেখক প্রথম পুরুষে রসসৃষ্টি করেছেন; তাই বলে কি লেখক ও তাঁর

---

[৪] অজগর আহার সংগ্রহের জন্য কোনো প্রচেষ্টাই করে না—এর বিরুদ্ধ মতবাদ আমি দক্ষিণ ভারতে শুনেছি। একাধিক গুণী বলেন, সে নাকি বড় মধুর শিষ দিয়ে পশুশাবক, এমন কি অত্যাধিক কৌতূহলী বালকবালিকাকে আকর্ষণ করতে পারে।

‘আমি’ চরিত্র একই ব্যক্তি? ডি ফো আর রবিনসন, সুইফট আর গালিভার কি একই ব্যক্তি? এমন কি এই নীলকণ্ঠেই তিনি যে একাধিকবার আত্মচিন্তা করতে করতে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন সে পরিচয়ের সঙ্গে লেখক অবধূতের কি সব সময় মিল আছে?

বিশেষ করে আমি একটি বিষয়ের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ফার্সী অলঙ্কার শাস্ত্রে আছে—সার্থক রস-সৃষ্টি করতে হলে চাই শনাখ্‌তন্‌-ই-হদ্দ-হর্‌-চীজ্‌’। অর্থাৎ সনাক্ত করতে পার। (শনাখ্‌তন্‌) প্রত্যেক বস্তুর (হর্‌চীজ) সীমা (হদ্দ)।’[৫] তার বিগলিতার্থ; প্রচণ্ডতম আত্মসংযম। বার বার ভুলে যাই আমরা ‘সব কিছু বলতে গেলে কিছুই বলা হয় না’ বার বার প্রলোভন;[৬] আসে, আরো একটুখানি বলে নি; তাহলে কেচ্ছাটার আরো জেল্লাই বাড়বে। শৈলী ভাষা বাবদে পার্ফেকট্‌ আর্টিস্ট হাইনে পর্যন্ত প্রথম যৌবনে এ-প্রলোভন থেকে মুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর গুরু, সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, আলঙ্কারিক বারণ (ব্যারন্‌) ফন্‌ শ্লেগেলের কাছে তাঁর প্রথম কবিতাগুচ্ছ নিয়ে গেলে তিনি বলেছিলেন, ‘এ কি! তোমার বল্লভার গালে অতগুলো তিল দিয়েছ কেন?’ হায়, আমরা বার বার ‘হদ্দ সনাক্ত’ করতে পারিনে, ভাবি তিল যখন সৌন্দর্য বৃদ্ধি[৭] করে তখন এঁকে দিই মানস সুন্দরীর গণ্ডদেশে গণ্ডাদশেক তিল!

পূর্বে লিখিত কোনো কোনো অনবদ্য গ্রন্থেও অবধূত মাঝে মধ্যে ভুলে যেতেন ‘স্টপ্‌ ইটিং হোয়াইল ইট্‌ ইজ্‌ টেস্টিং!’—অর্থাৎ খাঁটি বাঙালীর কৃত্রিম ‘উচ্ছ্বাস’ থেকে তিনি সব সময় নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন নি—বস্তুত তাঁর সব চেয়ে মশ্‌হুর কেতাবেই সব চেয়ে বেশী চন্দ্রশেখরীয় ‘উদ্‌ভ্রান্ত’ উচ্ছ্বাস—কিন্তু ‘নীলকণ্ঠে’ তিনি যে পার্ফেকট্‌ ক্যাডেন্‌স্‌ অব্‌ রেস্ট্রেন্ট্‌ দেখিয়েছেন, সেটি আজকের দিনের কোনো বাঙালী লেখকই দেখাতে পারবেন না। এবং এই ‘হদ্দ সনাক্ত করাটা’ তিনি ‘নীলকণ্ঠে’ করেছেন অবহেলে, অক্লেশে। যেন

---

[৫] ‘রসের সৃষ্টিতে সর্বত্রই অত্যুক্তির স্থান আছে, কিন্তু সে অত্যুক্তিও জীবনের পরিমাণ রক্ষা করে তবে নিষ্কৃতি পায়।’ রবীন্দ্রনাথ, রচনাবলী, ২৭ খণ্ড, পৃ ২৮৪। পুনরায়, ‘প্রাণের ধর্ম সুমিতি, আর্টের ধর্মও তাই।’ সমপুস্তক, পৃ ২৬০।

[৬] ‘লোভ পরিমিতিকে লঙ্ঘন করে, আপন আতিশয্যের সীমা দেখতে পায় না।’ পৃ ২৬০।

[৭] হে শিবাজী, হে সুন্দরী, তব কপোলের ঐ ক্ষুদ্র তিল লাগি
হে তরুণী সাকী বোখারা সমরকন্দ দিতে পারি আমি॥
এমনই হৃদয় মুগ্ধ করিয়াছ তুমি।

ভানুমতী কড়ে আঙুল দিয়ে লৌহ ত্রিপিটক অদৃশ্য করে দিলেন—ছাতি না ফুলিয়ে, মাস্‌ল্ না বাগিয়ে, ঘেমে নেয়ে কাঁই না হয়ে। এই এফর্টলেসনেস পৃথিবীর সর্বকর্মক্ষেত্রেই চরমতম কাম্য।

হেঁটমুণ্ডে শূন্যে ঝুলে আছেন যোগীবর, আরেক উলঙ্গ যোগী গড়াগড়ি দিচ্ছেন বরফের উপর, নায়ক স্বয়ং পেরিয়ে গেলেন মারাত্মক ধ্বস্, তারপর সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত—পাঠক সর্বক্ষণ শুধোচ্ছে কি করে হল, তার পর কি হল ? 'নো রিপ্লাই ? সে কি মিসি বাবা !' এমন কি কলির কেষ্ট ঠাকুর—'অ ! কন্ কি কর্‌তা ? আমাগো লাঙ্গুলবারিয়ায় টিতেন সাধুর নামডাও শোনেন নাই কানে—পোরা-কপাল—' বসমতী যশোবতী গুজরাতী (জাতে 'পরেখ'—বাঙলা 'পরখ', পরশপাথর থেকে—ঠিক পরখ করে চিনে নিয়েছে সচ্চা মাল) ফরাসীতে যাদের বলে 'ভোরাইওর' এস্থলে 'মাজোকিট ভোয়াইওর'—[৮] একমাত্র প্যারিসেই যাঁরা অজ্ঞাতবাসে ঘাপটি মেরে থাকেন, তাদেরই এক মহাপ্রভু দৈবযোগে হয়ে গেছেন নীলকণ্ঠে এসে মঠের মোহান্ত—ইনিই তাহলে নীলকণ্ঠের নীল গরল—এবং গণ্ডায় গণ্ডায় কত সাধু কত চোট্টা কত সাধারণ জন, কত মাছি কত পিস্‌। আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে স্পর্শ করেছে কেদারনাথ দর্শনাভিলাষিনী পুণ্যশীলা মেমসায়েব জুলি আর তার স্বামী এন্‌ড্রেন্। আমি হিন্দু নই, কেদারবদ্রী দর্শন করলে আমার অশেষ পুণ্য হবে, এ-ফতোয়া আমার তরে নয়, কিন্তু মনে

৮। সব দেশেই এক রকম লোক আছে যারা পাপাচারের, এমন কি অনৈসর্গিক পাপাচারের নিষ্ক্রিয় 'দর্শক'রূপে আপন কাম চরিতার্থ করে। ফরাসীতে 'দেখা' = 'ভোয়ার', 'দর্শক' = 'ভোয়াইওর'—(আমরা 'দৃশ্' থেকে 'দ্রষ্টা' ইংরেজ to see থেকে 'Seer', 'ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা' মুনি ঋষির জন্য ব্যবহার করি, ফরাসীতেও সেরকম 'ভোয়ার' থেকে 'ভোয়াইওর' সদর্থে ব্যবহার হওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয় নি—সেখানে 'Voyant' = 'ভূতভবিষ্যৎ দ্রষ্টা' এবং 'Clairvoyant' = 'clear-seer' সমাসটিও আমরা চিনি। ফরাসী ভাষার বাঙালী পড়ুয়া যেন দুম্ করে কোন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মহাজনকে 'ভোয়াইওর' না বলে বসে। 'Romain Rolland, Oh, c'est un grand voyeur !' ব'লে এক গুজরাতী নিরীহ সজ্জন প্যারিসের ফরাসী সমাজকে প্রথমটায় স্তম্ভিত করে দেন ; পরে তারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে ঠাঠা করে অট্টহাস্য তোলেন) এবং এই সম্প্রদায়ের কামনা—শব্দার্থে—পূর্ণ করার জন্য প্যারিসের 'অন্ধকার' অংশে প্রচুর প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু টিকিট এতই আক্রা যে অধীন সরজমিনে তদন্ত করতে পারে নি। এদের অন্যতম প্রোগ্রামে একজন আরেকজনকে বেধড়ক চাবুকও কষায়, পেরেকওয়ালা জুতো দিয়ে লাথি মারে, এবং নানাবিধ দুঃসহ যন্ত্রণা দেয়। এর গাহককে 'মাজোকি সই ভোয়াইওর' বলা হয় এবং একদা আরব ছোঁড়ারা প্রোগ্রামে প্রধান অংশ নিতে বলে—হয়তো—'ভোয়াইয়ূ' শব্দের অর্থ—'স্ট্রীট আরব'।

করুন, আমি যদি কেদার যাবার জন্য স্বপ্নাদেশ পাই, আর ত্রিযুগীনারায়ণ পেরিয়ে গৌরীকুণ্ডে পৌঁছনো মাত্রই ঝাড়া তিন দিন ধরে চলে ঝড়, বজ্রপাত—তাঁবু পর্যন্ত উড়ে চলে যায়—'হাজার হাজার দৈত্য রে-রে করে চতুর্দিক থেকে ছুটে আসছে যেন—কী! 'বিধর্মী চলেছে মহামহিম (লর্ড)[১] কেদারনাথকে দর্শন করতে, এতখানি স্পর্ধা বুঝি নীলকণ্ঠের সহ্য হচ্ছে না'—এবং সর্বশেষে 'বিরাট এক ধ্বস নেমে কেদারনাথের তিন মাইল আগের রামওয়াড়া চটি লোপাট করে নিয়ে গিয়েছে'—তখন আমার মনের অবস্থা কি হয়। বেচারী বিদেশিনী যবনী মেমসায়েব জুলির জীবনে এই দুর্দৈবই ঘটেছিল। একেবারে মুষড়ে গিয়ে ভেঙে পড়ে—স্বামীকে বললে, 'চলো ফিরে যাই।' তার স্বামী অবধূতকে বলছেন, 'জুলি মনে করছে, লর্ড কেদারনাথকে দর্শন করতে হলে যতটা পবিত্র হওয়া উচিত, ততটা পবিত্র আমি (স্বামী) নই।'

কেদারবদ্রী-গামীর কাফেলা তো চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছেই—তার এবং মানসাদি বহু তীর্থ-যাত্রীর বর্ণনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দিয়েছেন 'নীলকণ্ঠে'র বহু বহু পূর্বের বিস্তর 'জরীন-কলম' বাঙালী, ইংরেজি, জর্মন, ইতালিয়ান ইত্যাদি লেখক আপন আপন মাতৃভাষায়—কিন্তু নীলকণ্ঠে চলেছে অবধূতের বাছাই করা আরেকটি চরিত্রের কাফেলা, হেঁটমুণ্ড সাধক, যশোমতী, মেমসায়েব যাদের কয়েকজনের উল্লেখ এইমাত্র করেছি কিন্তু হায়, অবধূত, রসসৃষ্টিতে 'হদ্দ' কোথায় সেটা 'সনাক্ত' করে ফেলেছেন এবং আমাদের কৌতূহল যখন চরমে পৌঁছয়, আমরা কলরব তুলে শুধোই, 'এটা কি করে হল? তার পর কি হল' তখন তিনি মৃদু হাস্য করে স্টপ্‌স্ ঈটিং বিকজ ইট ইজ টেস্টিং। মাথা চাপড়ে বলতে ইচ্ছে করে 'পোড়া কপাল আমাগো। লাঙ্গলবারিয়ার হীতেন সাধুর লগে লগে আর বেবাকগুলির নামডাক ভী ভালা কইরা বুঝাইয়া কইলা না, কর্তা!'

কটাক্ষ করা এ-পাঠকের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে, কবিগুরু কি ক্লেরভইয়াঁসের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছিলেন যে তাঁর পরিনির্বাণের স্বল্পকাল মধ্যেই এই গৌড়ভূমিতে তিন-তিন হাজারী পাঁচ-পাঁচ হাজারী পাতার মনসব নিয়ে পিল পিল করে বেরুবেন উপন্যাসের আমীর-ওমারহ—কেতাব নয়, পুঁথি নয়,

---

[১] 'লর্ড' কেদারনাথ সম্বন্ধে আমার এক মুখুজ্যো ভাতিজাও লেখে 'ঠাকুর দেখতে তেমন কিছু না, কিন্তু সন্ধেবেলায় যখন ডিনারের ইভনিং জ্যাকেটটি পরেন তখন বড্ডই মাইডিয়ার দেখায়।' তবে কেদার না হয়ে ইনি পথমধ্যের অন্য কোন্ "লর্ড"ও হতে পারেন।

আস্ত এক-একখানা ইটের থান, না, তারই পাঁজা হাতে নিতে—এবং এদেরই-উদ্দেশ্যে বলেছিলেন 'মানবের প্রাণের লয়টাকে দানবের লয়ে সাধনা করা চলবে। কিছুতেই তাল পৌঁচচ্ছে না শমে।' ১০ অবধূত সমে পৌঁছতে জানেন। তিনি নিজেই এক জায়গায় আধারহস্যছলে বলেছেন—কারণ সোজাসুজি ধর্মোপদেশ তিনি দেন না, নীতিও প্রচার করেন না—'সাক্ষাৎ অমৃত কি না! খাঁটি অমৃত কি আর তাড়ির মত ভাঁড় ভাঁড় খেতে হয়?' কারণ এর হদীস্-সবূৎ রয়েছে তাঁর, আমার, আপনার গুরু রচিত, পাতঞ্জলের যোগসূত্রের ন্যায়সাহিত্যের সূত্রাবলীতে: 'উপকরণের বাহাদুরি তাব বহুলতায়, অমৃতের সার্থকতা তার অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্যে। আর্টেরও অমৃত আপন সুপরিমিত সামঞ্জস্য।'১১ এ তত্ত্বটি বুঝে নিলে অবধূতের বাক্‌সংযম পাঠককে গভীরতর আনন্দ দেবে—আপনা কল্পনাজাল বোনার পথ দেখিয়ে দেবে।

এ-বাবদে শেষ প্রশ্ন: নীলকণ্ঠে তথাকথিত অলৌকিক কারখানা, ধর্মের নামে নিকৃষ্টতম পাপাচার, লাঙ্গলবারিয়ার জীতেন সাধুর পন্থা, 'মাজোকিস্ট ভোয়াইওর' বিহুর বাবার পন্থা—পাতার পর পাতায় প্রাচীন নবীন একটার পর আরেকটা সমস্যা যেন পাণ্ডোরার কৌটো থেকে বেরিয়ে—ঐ কালাকমণী-চটির বেশুমার ছারপোকারই মত—চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে, এবং সর্বাপেক্ষা মহামোক্ষম সমস্যা যেটি স্বয়ং অবধূতই তুলেছেন তিনটি শব্দ দিয়ে, যদ্যপি একটিই যথেষ্ট হত (তাজ্জব মানতে হয়, লোকটা কী সরল, কী 'নাইফ' এরকম সিংহের গহ্বরে মাথা গলায়!) এবং যার উল্লেখ আমি পূর্বেই করেছি সেটি আবার বলি—শোনা জিনিসই মানুষ ফের শুনতে চায়—'অনেকের কাছে সন্ন্যাসীরা হলেন পরম পবিত্র রহস্যময় জাববিশেষ।' তার পর বলছেন, 'সত্যিই কি তাই!' (তিনি অনায়াসে প্রথম শব্দটি মাত্র দিয়ে, তাও শেষের 'ই'টি খারিজ করে দিয়ে লিখতে পারতেন, 'সত্যি!'—কারণ ফার্সীতে বলে দানিশমন্দ্‌রা এক হরূফ্‌ ব্যস আস্‌ত্‌—'বুদ্ধিমানের জন্য একটিমাত্র হরফই যথেষ্ট—সমূচালফ্‌জ্‌ [লজ্জো] তকৃফাজিল-ফজুল—বস্‌—এন্তের।' কিন্তু আমার মত অগা পাঠকও এন্তের। আমার মাথায় নিদেন তিনটে শব্দের তিনটে ডাণ্ডশ মারলে তবে কিনা একটা শব্দ মগজে সিঁধিয়ে ঘিলুর ঘিয়ে ভাজা হয়)।

সে-প্রশ্নের উত্তর? সে-সমস্যার সমাধান? এবং বাদবাকিগুলো?

১০-১১। রবীন্দ্রনাথ, সমগ্রন্থ।

এবার আর 'ফোনের মিসিবাবা' না—এবারে উচ্চতর পর্যায়ে যাই। বিচারপতি পণ্টিয়ুস্ পিলাটুসের ('জেস্ট্রিং! পাইলট') সওয়ালে খৃষ্ট যখন বললেন 'আমি এসেছি সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে!' তখন পিলাটুস্ শুধোলেন 'সত্য কি?' হোয়াট ইজ ট্রুথ? এবং খৃষ্ট কোনো উত্তর দেবার পূর্বেই (উত্তর পাবেন কি না তার প্রতীক্ষা না করেই) কেউ কেউ বলেন, স্মিতহাস্য করে বিচারালয় ত্যাগ করলেন।[১২]

এখানেও তাই। অবধূত শুধোচ্ছেন বা/ এবং বিস্ময় প্রকাশ করে বলছেন, 'সত্যি?' এবং ঐখানেই দিলেন খতম করে! কিংবা মুলতুবী—'সিনে ডাইই'। কেন?

আবার তা হলে গুরুপদপ্রান্তে বসি। তিনি প্রব্লেম ও তস্য 'পাণ্ডিত্য-পূর্ণ', আকছারই দম্ভে প্রকম্পিত সলুশন্-বিজড়িত কাব্য উপন্যাসাদি সম্বন্ধে বলছেন, 'মেঘদূত কাব্য থেকে একটা তত্ত্ব বের করা যেতে পারে, আমিও এমন কাজ করেছি, কিন্তু সে তত্ত্ব অদৃশ্য ভাবে গৌণ।...কাব্য হিসাবে কুমারসম্ভবের যেখানে থামা উচিত সেখানেই ও থেমে গেছে, কিন্তু লজিক হিসাবে প্রব্লেম হিসাবে (আমার সমস্যা হিসাবে) ওখানে থামা চলে না। কার্তিক জন্মগ্রহণের পর স্বর্গ উদ্ধার করলে তবেই প্রব্লেমের শান্তি হয়। কিন্তু আর্টে দরকার নেই প্রব্লেমকে ঠাণ্ডা করা, নিজের রূপটিকেই সম্পূর্ণ করা তার কাজ। প্রব্লেমের গ্রন্থিমোচন ইন্টেলেক্টের বাহাদুরি, কিন্তু রূপ-কে সম্পূর্ণতা দেওয়া সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনার কাজ। আর্ট এই কল্পনার এলেকায় থাকে, লজিকের এলেকায় নয়'।[১৩] অবধূত এ তত্ত্বটি হৃদয়ঙ্গম করেছেন। নীলকণ্ঠ তার প্রকৃষ্টতম নিদর্শন।

* * *

১২। আসলে পিলাটুস উচ্চশিক্ষিত খানদানী রোমবাসী, ইংরেজ ভাইসরয়দের মত পরাধীন ইহুদিদের উপর শাসন করতে এসেছেন জেরুজালেমে। তাবৎ গ্রীকদর্শন তাঁর নখাগ্রদর্পণে এবং সোক্রাতেস যখন প্রশ্নে প্রশ্নে তথাকথিত পণ্ডিতজনকে না-জবাব করে দিতেন এবং পণ্ডিত শেষটায় বিভ্রান্ত হয়ে শুধালো 'তা হলে তুমিই বলো "সত্য কি?"'—সোক্রোতেস তখন মৃদুহাস্য করে চলে যেতেন বা বলতেন 'আম্মো জানিনে'। এ-সব তত্ত্ব পিলাটুস জানতেন, এবং আরো ভালো করেই জানতেন, ইহুদিদের ভিতর দর্শনের কোনো চর্চা নেই। তাই 'সত্য'-এর স্বরূপ নির্ণয় তিনি রাস্টিক, সরল-বিশ্বাসী খৃষ্টের কাছ থেকে চান নি।

১৩। পুনরায় 'ইব্সেনের নাটকগুলি তো একদিন কম আদর পায় নি, কিন্তু এখনই কি তার রঙ ফিকে হয়ে আসে নি।' 'সাহিত্যের মাত্রা'। সমগ্রন্থ পৃঃ ২৬০।

উত্তম গ্রন্থের চুম্বক দেওয়া, বিশ্লেষণ করা, 'তুলনাত্মক সাহিত্যের' দৃষ্টিবিন্দু থেকে তাকে ঐ 'জ'াঁর'-এর আর পাঁচখানা বইয়ের সঙ্গে তুলনা করা নিষ্প্রয়োজন; পরিচয় করিয়ে দেওয়া যায় মাত্র। কিন্তু সে-পরিচয় দেওয়ার সময়ও লেখক—অবধূতের সর্বকালীন ও আমার জানা মতে তাঁর সর্বাগ্রগণ্য গুণমুগ্ধ পাঠক হিসেবে—এ-পরিচিতি দেবার হক্ক আমার একান্ত, অন্তত সেই কারণেই—অধমের মনে ধোকা লাগে, মিছরির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে তার সুতোটার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি না তো? কে জানে, আমি যে-সূত্রটি ধরে এ-পরিচিতি পেশ করেছি সেটা অতি অবশ্য সূত্র বটে, কিন্তু হয়তো ঐ মিছরির সুতোরই মত! সুতো চিবিয়ে তো কোনো পাঠক মিছরির রস পাবেন না! সান্ত্বনা এইটুকু যে, বহুশত বৎসর ধরে অস্মদ্দেশীয় আলঙ্কারিকমণ্ডলী কালিদাসের পরিচিতি দিতে গিয়ে লিখেছেন—এবং সেটিকে অজরামর করার হেতু গদ্যে প্রকাশ না করে শ্লোকাংশে বেঁধেছেন, 'উপমা কালিদাসস্য'। তাঁদের মতে অমুকের কাছে যাও 'পদলালিত্যের' জন্য, অমুকের কাছে যাও 'অর্থগৌরবের' তরে—আর কালিদাস?—ও:! তার 'উপমাটি' উত্তম; এবং তাঁদের শেষ সুচিন্তিত আপ্তবাক্য, সর্বগুণসম্পন্ন কবি কিন্তু মাঘ! আজ আমরা জানি, সুদ্ধমাত্র তুলনার বাহাদুরি দেখিয়ে কেউ মহৎ কবি হতে পারেন না—উত্তম তুলনা দিতে পারার গুণটি অলঙ্কারশাস্ত্রপেটিকাসঞ্চিত একটি নিরাড়ম্বর অলঙ্কার মাত্রই, এবং এ সাদামাটা তুলনা-অলঙ্কারের কথা দূরে থাক সর্বোৎকৃষ্ট অলঙ্কার পরিয়েও কুরূপাকে সুরূপাতে পরিবর্তিত করা যায় না—কালিদাস ছিলেন সর্বগুণ-সম্পন্ন অলঙ্কারাতীত বিশ্বকর্মা, তুলনা-নির্মাণে দক্ষতা ছিল তাঁর সামান্যতম কৃতিত্ব।…তাই এ-স্থলে আমি যে পরিচিত দিলুম সেটা হয়ত কালিদাসের বেলায় গোড়াতে যে-রকম হয়েছিল সেই রকম নিতান্তই আত্যন্তিক, ঐকান্তিক, অবান্তর, গুরুত্বহীন পরিচয়। কিন্তু ভরসা রাখি, কালিদাসের মত বিশ্বকর্মা না হয়েও অবধূত ভবিষ্যতে একদিন কালিদাসের মত সুবিচার পাবেন, কারণ, ন্যায়াধীশ-মহাকালের সম্মুখে সবাই সমান।

মহাকালের দরবারে কালিদাস অবধূত বরাবর—এ কথাটা আমাকে পুনরায় বলতে হল। কারণ আমি জানি, একাধিক জন, এমন কি অবধূতের গুণীগ্রাহকও ঈষৎ ভ্রূ কুঞ্চিত করে শুধোবেন, আমি যে এক নিশ্বাসে চেখফ্, কালিদাস ইত্যাদি প্রাতঃস্মরণীয়দের সঙ্গে অবধূতের নামোচ্চারণ করি তার অর্থ কি এই, যে, আমার মতে এঁরা সবাই সমগোত্রের! এর উত্তর যে-কোনো অন্ত দিনের চোস্ত

ক্যারেটের আলঙ্কারিক, যে-কোনো বটতলার চতুরানন চতুর-আনী মোক্তার চতুর্মুখে চতুর্ভদ্র সাফাই গাইতে পারবেন কিন্তু আমার এ সবেতে কোনো প্রয়োজন নেই। অধীনের নাক-বরাবর অতিশয় সুচিন্তিত তথা অলঙ্কারশাস্ত্র-সম্মত নিবেদন মাত্র একটি : অবধূত কেন, তাঁর চেয়ে শতগুণে নিরেস কোনো কবিকেও যদি আজ অধিক পরিচয় করিয়ে দিতে চাই এবং প্রয়োজন-অনুরোধে তৃতীয় পক্ষের দোহাই কেটে তাঁকে/ তাঁদেরকে আবাহন জানাতে হয়, তবে কি আমি বে-ওকূফ নাদানের মত স্মরণ করবো পাড়ার আকাট যেদো-মেদোকে? না, গঙ্গাস্বরূপা তৃতীয় কন্যা মাতা কুন্তীদেবীর অনুকরণে স্মরণ করবো ধর্মরাজ, পবনেশ্বর, বাসবাধিপতিকে? কালিদাস, চেখফ, রবিকবিকে?—না, বিবাহ-বাসরের 'প্রীতি-উপহার'-রচক পোয়েট লরিয়েটকে, দাস্যমনোবৃত্তি-সঞ্জাত অধুনা-বিস্মৃত ভি. আই. পি কুলের চরম পদলেহনাবতার ভি. আই. পি'র ঘোষ-'কবিকে'? অবশ্য, অতি অবশ্য, যদি অবধূত মহাকালের মোকদ্দমা হেরে যান (যদ্যাপি আমার বিশ্বাস ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্রকে সাক্ষীরূপে না ডেকে যেদো-মেদোকে ডাকলে মক্কেল অবধূত মোকদ্দমা তো হারবেনই, এস্তক সুপ্রীম কোর্টে আপীল করবার তরে সার্টিফিকেট অবধি পাবেন না!) তবে সম্পূর্ণ দোষ আমারই। আমি যে-কেস হাতে নিয়েছি সেটি মর্মান্তক। কারণ অবধূত আমাকে বাঙলা সাহিত্যের হট্টগোলের মাঝখানে তাঁর নাম সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করার জন্যে মোক্তার পাকড়াননি। বস্তুত আমিই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায়, আপন খুদ্, খুশ-এখতেয়ারে, অবধূতের সত্য মূল্য নিরূপণার্থে, সাহিত্য আদালতের 'নিরপেক্ষ-বন্ধু', 'আমিকুস্ কুরিআত্র্যা'রূপে অবতীর্ণ হয়েছি। সে-স্থলে হয়তো অবধূত বাধা দিতে পারতেন কিন্তু তিনি এবাবদে সুবুদ্ধিমান বলে সাহিত্যিক, দেওয়ানী, ফৌজদারী সর্ব আদালৎ এড়িয়ে চলেন। এটি 'এক্সপার্টি', এক-তরফা মোকদ্দমা।

কিন্তু আদালতের তুলনাটা কথায় কথায় উঠল। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ', রবিকবির 'যোগাযোগ' কোনো আদালত বিচার করবে না। নীলকণ্ঠও কোনো এজলাসের সম্মুখে দাঁড়াবেন না।[১৪] সাহিত্যে সর্বকালের সবজনের সর্বশ্রেষ্ঠ

---

[১৪] বছর কয়েক পূর্বে কিন্তু রসসমুদ্রে এহেন একটা টর্নাডো-ম্যালস্ট্রোম হব-হচ্ছে হব-হচ্ছে'র পাঁয়তারা কষছিল এমন সময় জানিনে কার হুকুমে শেষ পর্যন্ত কিছুই হল না। রীতিমত 'বিল' তৈরী হয়েছিল ; ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশসায়েব স্থির করে দেবেন, কোন্ নাটক উত্তম, অভিনয় করা যেতে পারে।

বিচারক পাঠক স্বয়ং। 'আদালতের' বাইরে আমিও নগণ্য পাঠক। সে কিরে আমি এ-প্রস্তাবনার প্রস্তাবনাতেই একাধিকবার বার কেটেছি। এবং আমি অতিবৃদ্ধ পাঠক বলে একাধিক নবীন পাঠক আমাকে শুধোবে,।

'নীলকণ্ঠ বইখানা ভালো ?'

'অত্যুত্তম।'

'সর্বোত্তম ?'

'এতাবৎ লিখিত বইয়ের মধ্যে সর্বোত্তম, কিন্তু এ-কেতাব সর্বোত্তম হবে না, যদি ইটি সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁকে অনুপ্রেরণা না যোগায় যে এটাকেও পেরিয়ে গিয়ে তিনি আরো উত্তম কেতাব লিখতে পারেন।'

* * *

এবারে শেষ কথা।

'চেনা বামুনের গলে পৈতা কেন মিছে ?'—ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। অবধূতের গলায় আমি আবার পৈতে পরাতে যাচ্ছি কেন—বিশেষত তিনি যখন উৎকৃষ্ট রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ? কিন্তু তিনি যে গেরুয়া পরেন, এবং যতদূর জানি, গেরুয়া পৈতে দুটো একসঙ্গে পরা নিষিদ্ধ। তবু যে আমি নব-'পরিচিতির' এই পৈতেটি তাঁর দণ্ডে জড়িয়ে দিচ্ছি তার কারণ তিনি মায়াজালে বদ্ধ হয়ে কিছুদিন ধরে আমাদের সঙ্গে বাস করছেন—তিনি যা করুন, করুন—আমাদের উচিত তাঁর সাহিত্যিক খ্যাতি-পরিচিতির পৈতেটি তাঁর সামনে নিবেদন করা। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি আল্লার কসম খেয়ে বলতে পারি, এ-পৈতেটিও ভস্ম করে তিনি একদিন অন্তর্ধান করবেন—নীলকণ্ঠের কণ্ঠে কিংবা ধূর্জটির জটায়। সেই পৈতেটি এই (এবং একমাত্র এই পৈতেটিই আমার চেনা এক নম্বরের অবধূত, দুই নম্বরের লেখক অবধূত ও তিন নম্বরের গ্রন্থের 'আমি' অবধূত তিনজনকেই একসঙ্গে পরানো যায়) :

তিন অবধূতেরই বোধ হয় সব চেয়ে প্রিয় শ্লোক—

ঘৃণা লজ্জা ভয়ং শোকো জুগুপ্সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

'ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, নিন্দা করার প্রবৃত্তি, কুল, শীল তথা জাতের বড়াই' —এসব থেকে মুক্ত হতে হবে। অত্যুত্তম প্রস্তাব। তাই 'নীলকণ্ঠে' দেখতে পাই, খেতে না পেয়েও তাঁর কষ্ট হচ্ছে না দেখে তিনি উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছেন—সন্ন্যাসীবর ক্ষুধা জয় করে ফেলেছেন!—পরক্ষণেই আনগ্ন গাত্রে বরফে গড়াগড়ি

দিলেও তাঁর শৈত্য বোধ হয় না দেখে তিনি তো সপ্তম স্বর্গে! নীলকণ্ঠের উচ্চতর স্তরে যে দুটি সাক্ষাৎ কৃতান্তদ্বয়, দারুণ অন্নাভাব ও নিদারুণ শৈত্য, এ দুটিই—নামে অবধূত এখন সিদ্ধিতে অবধূত—জয় করে ফেলেছেন! এবারে তিনি টেলিফোন খুঁজছেন, লর্ড কেদারনাথের সঙ্গে একটা র‍াঁদেভু স্থির করে তাঁর সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করবেন বলে!

আর লজ্জা ঘৃণা ভয় ইত্যাদি সে তো অবধূত কবে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছে—পুস্তকে বিনয়বশত যা বলুক বলুক। আমি পুনরায় এক কোমর গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে পৈতে স্পর্শ করে পাঁচপীরের কসম খেতে রাজী আছি।

কিন্তু হায়, অবধূত এ-পৃথিবীতে এসেছেন অশুভক্ষণে। তাঁর নির্ঘণ্ট দীর্ঘ, তিনি কোন্ কোন্ পাশ হতে মুক্ত হতে চান, তিনি কোন্ কোন্ রিপু জয় করতে চান। অনেকগুলো জয় করতে করতে তো উঠছেন তিনি ঊর্ধ্ব থেকে ঊর্ধ্বতর লোকে—চিত্তলোক এবং ইহলোক উভয়েতেই—পৌঁছে গেছেন গরুড়চটি। সম্মুখে আর চড়াই নেই—কেদার ক্রোশমাত্র দূরে। অবধূত নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা দিলেন। কিন্তু, হা হতোস্মি, সকালে দেখেন, একি! রাতারাতি হড়্‌হড়িয়ে নেবে গেছেন যাত্রারম্ভস্থল দেবপ্রয়াগে!···আবার আরম্ভ হল নূতন করে রিপুজয় চিত্তজয় অজগর-পন্থা পক্ষী-পন্থা মারফৎ, আরোহণ করলেন না জানি আরো কত উচ্চ ভূমিতে। এবারে রাতারাতি হড়্‌হড়িয়ে চুঁচড়োয়—হ্যাঁ আমাদের এই চুঁচড়োয়!

কেন? কেন এ-দুর্দৈব?

আমার দৃঢ় বিশ্বাস—অবশ্য অবধূত এবং বাঙালী পাঠক আমার সঙ্গে একমত না হলে আমি বিস্মিত হব না—তিনি অবধূতে একজোটে যে-সব পাশ ছিন্ন করার মৎলব নিয়ে সেগুলোর নির্ঘণ্ট নির্মাণ করেন তখন একটি পাশের কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলেন। সেটি কি?

ইংরিজিতে বলে milk of human kindness। দুঃখীর প্রতি দরদ, অপমানিতের প্রতি সহানুভূতি, অত্যাচারীর প্রতি প্রকাণ্ড আক্রোশ (এমনিতে অবধূত রাগের পাশে বাঁধা পড়েন না)—এক কথায় পীড়িত বঞ্চিত, ধূলিলুণ্ঠিত জনের প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তাঁর বুক যেন বেদনাভরে, করুণাভারে ভেঙে পড়ে যেতে চায় (যে অবস্থায় পূব বাংলার মেয়ে বলেছিল 'ইচ্ছা করে, হৃদয়ভারে, গামছা দিয়া বান্ধি'), কিন্তু থাক্, এটা গুছিয়ে বলবার মত ভাষা আমার নেই।

এই মিল্ক্ অব্ হিউমেন কাইণ্ডনেসের পাশ সম্বন্ধে না তিনি সচেতন, না তিনি তপস্যা করেন সেটা ছিন্ন করতে। তবে কি মুক্তপুরুষের হৃদয়ে আমাদের

মত বন্ধুজনের প্রতি করুণাধারা প্রবাহিত হয় না? অবশ্যই হয়। লক্ষগুণে বেশী নয়। কিন্তু তার পূর্বে মুক্ত হওয়ার জন্য এ-পাশও ছিন্ন করতে হয়।

কিন্তু আমি নিরাশ হচ্ছিনে। এই নীলকণ্ঠ হিমালয়েই, এই পথ দিয়ে যাবার সময়ই ক্ষুদ্রহৃদয়দৌর্বল্য বশতঃই (milk of human kindness!) ধর্মপুত্র স্বেচ্ছায়-সঙ্গী সারমেয়টিকে ত্যাগ করতে সম্মত হন নি। ধর্মরাজ তৎসত্ত্বেও তাঁর জন্য স্বর্গদ্বার খুলে দেন। সেই ব্যত্যয় কি আবার হতে পারে? নীলকণ্ঠের উপাসক মাত্রই এর উত্তর দিতে ভয় পাবেন। আমি তাঁর উপাসক নই। আমি নিরপেক্ষ তৃতীয়পক্ষ। আমি নির্ভয়ে বলবো, এই 'ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্বল্য' হৃদয়ে ধারণ করেই অবধূত নীলকণ্ঠের হৃদয়ে স্থান পাবেন। কিন্তু খৃষ্ট সাধুর স্মরণে বলি, 'মোক্ষ? মোক্ষ নিশ্চয়ই চাই, প্রভু, কিন্তু not just yet!' অবধূতের মোক্ষটিও যেন বিলম্বে আসে। কারণ, পূর্বোক্ত খৃষ্ট সাধুই বলেছেন, তখন মুক্ত পুরুষ মৌন হয়ে যান। অবধূত পূর্ণ তিন বৎসর নীলকণ্ঠে মৌনব্রতী ছিলেন—আমাদের কোনো ক্ষতি হয় নি, কারণ, তারপর তিনি বাংলা সাহিত্য-মজলিসে তাঁর সাধনার ধন সঙ্গীতে পরিবর্তিত করে গান গাইলেন এক যুগ ধরে।

এবারে মৌন হলে সাহিত্যের সাধারণ পাঠক, সাধারণ 'মানুষ' বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অথচ তিনিই গেয়েছেন,

'জয়, মানুষের জয়!'

এই একটিমাত্র জয়ধ্বনি আছে দগ্ধপৃথ্বীতলে যে জয়ধ্বনিতে কি হিন্দু কি মুসলমান, কি কৃষ্ণ কি শ্বেত সর্বমানুষ আত্মহারা হয়ে যোগ দেয়॥

এই সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি অবধূত বিরচিত "নীলকণ্ঠ হিমালয়" ভ্রমণকাহিনীর ভূমিকা